বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা

ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস

এম্. এ., পি-এইচ্. ডি. (কলিকাতা),

সাহিত্য-ভারতী (বিশ্বভারতী)

শহিদ লাইব্রেরী

কাজীপাড়া, বারাসত

চব্বিশ পরগণা

প্রকাশক ঃ
কাজী আবদুল ওদুদ,
শেহিদ লাইব্রেরীর পক্ষে
কাজীপাড়া (নর্থ)
বারাসত, চব্বিশ পরগণা।

প্রথম প্রকাশ ঃ রবিবার ৫ই বৈশাখ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ
১৮ই এপ্রিল, ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসনৎকুমার চৌধুরী
শিও প্রিণ্ট
২০এ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯ এবং
শ্রীতারকচন্দ্র নাথ
ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস
৫২/৯ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত সুধী প্রধান

শ্রীযুক্তা শান্তি প্রধানের

করকমলে

কৃতজ্ঞতা

মরহুম কাজী আবত্নস শেহিদ, মরহুম কাজী আবত্নল ময়িদ ও মরহুম কাজী কামরুল ইসলাম ট্রাষ্ট ফাণ্ড (কাজীপাড়া), সমাজ কল্যাণমূলক এই গবেষণা কার্যের জন্য অত্রগ্রন্থ প্রকাশের বিভিন্ন খরচ বাবদ পুরস্কার-স্বরূপ তুই হাজার টাকা প্রদান করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

—গ্রন্থকার

গ্রন্থকারের নিবেদন

সর্বাগ্রে আমি আমার পরম গুরু স্বর্গতঃ পিতা অধরচন্দ্র দাস ও মাতা বরদাসুন্দরী দাসের পুণ্যকথা স্মরণ করি।

আমার সহোদর দাদা শ্রীযুক্ত হাজারীচরণ দাসকে প্রণতি জানাই।

কাজী আবদুল মুজিদ, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী আবদুর রসিদ. মোসাম্মেৎ খায়রুন্নেসা ও কাজী নুরুল ইসলাম এই গ্রন্থ প্রকাশের সর্বপ্রকার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন।

আচার্য ডক্টর সুকুমার সেন, আচার্য ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য সহযোগিতা না করলে আমার এ কাজ সুসম্পন্ন হত না। তাঁদের কাছে আমি চির-ঋণী রইলাম।

শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ কর (সাংবাদিক), শ্রীবরীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আই. এ. এস, কাজী আজিজার রহমান, শ্রীচিন্ময় চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅজিতকুমার সান্যাল, শ্রীনরেশচন্দ্র গুপ্ত, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীরঞ্জিতকুমার বসুমল্লিক, শ্রীগণেশচন্দ্র দাস, মহম্মদ হরমুজ আলি, শ্রীপ্রীতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীঅহিভূষণ মুখার্জী, শ্রীপূর্ণচন্দ্র সরকার, ডাঃ কাজী আবুল হাসেম, শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ, ডাঃ ভবানীপ্রসাদ রায়, শ্রীমধুসূদন হাউলী, শ্রীদীনেন বিশ্বাস, বৌদি শ্রীমতী সরলা দাস, সহধর্মিনী শ্রীমতী করুণাময়ী দাস প্রমুখ আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, জাতীয় গ্রন্থশালা (কলিকাতা), আচার্য ডক্টর সুকুমার সেনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ, হজরত একদিল শাহ্ সাধারণ পাঠাগার, শেহিদ স্মৃতি পাঠাগার এবং আরো অনেক প্রতিষ্ঠান আমাকে এই কার্যে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে
কোয়ার্টার নং ৮২ বি/৩
শালিমার বি, এফ, সাইডিং,
হাওড়া-৩।

শ্রীগিরীন্দ্র নাথ দাস

বিষয় সূচী

চিত্র সূচী

প্রকাশকের নিবেদন

পরম সৃষ্টি-উৎস আল্লার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সমাজের খেদমতে পেশ করার সাফল্যে আমরা আনন্দিত।

যতদূর জানা যায় সুফী বা পীর-দরবেশগণের জীবনাদর্শ অষ্টম শতাব্দী হতে প্রথম এ দেশে আসতে শুরু করে। সর্বপ্রথম তাঁরা সিন্ধু প্রদেশে বসতি স্থাপন করেন এবং তাঁদের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় লোক ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বহিরাগত ও এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমান, স্থানীয় হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মিশে বসবাস করতে থাকেন।

আরবগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো নিয়ে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া ভূখণ্ডে ইস্‌লামকে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব, ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদ ধ্বংস করে হালাগু, শেষ নামমাত্র খলিফা, মোস্তাসিম বিল্লাহকে সবংশে নিহত করেন। সেই সাথে খেলাফতের শেষ চিহ্নটুকু জগত থেকে বিলুপ্ত হয়। খেলাফতের সূত্র ধরে তুর্কীগণ বিজেতা হিসাবে প্রবেশ করলেন এদেশে। তুর্কীদের আগমনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় হিন্দুদের মধ্যে।

তুর্কীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে সফল হলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁরা সফল হন নি। ভারতের ইতিহাসে হিন্দু-মুস্‌লিম সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব আজও বিদ্যমান। মুস্‌লিম সংস্কৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মত এদেশে সফল হতে পারে নি।

সুফী বা পীর-দরবেশগণের তৌহিদ অর্থাৎ সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং স্বাধীনতা-ভিত্তিক জীবনধারার অনুপ্রেরণা নিয়ে রামানন্দ, নানক, চৈতন্য প্রমুখ সংস্কারকগণ হিন্দু সংস্কৃতিকে নূতন করে প্রাণবন্ত করলেন। আর এদেশীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে ইস্‌লামের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে দেশীয় প্রাচীন রীতি-নীতির সংমিশ্রণ ঘটল। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগলদের সময় হতে মুসলমানগণ এ বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। তাঁরা মুস্‌লিম সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। এই সময়ে জোড়া-তালি দেওয়া মুস্লিম-

সভ্যতার বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদে আলফিসানী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আলফিসানী মুসলমানদের জানালেন জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের কথা, ঘোষণা করলেন ইস্‌লামের মহৎ আদর্শের কথা। তিনি বিশেষভাবে বললেন যে, রাজনীতির খাতিরে ইস্‌লামের বিশ্বজনীন মানবীয় সভ্যতাকে বিসর্জন দেওয়া চলবে না। দেশ এবং কালগত কারণে ইস্‌লামের মৌলিক জীবনধারার (সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা) কোন পরিবর্তন হয় না। এ বিষয়ে বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব মুসলানদের সাংস্কৃতিক আন্দলনের নেতৃত্ব দেন শেষ মুহূর্তে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী বাধার জন্য তিনি কিছু করে উঠতে পারেন নি। কারণ গণ-চেতনায় উদ্ব্ুদ্ধ ইউরোপীয় শক্তির নিকট মুস্লিম শক্তি তখন হীন বলে প্রতি-পন্ন হয়। উনবিংশ শতকে ভারতীয় স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায় ইংরেজদের সহিত হাত মিলিয়ে তার সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠায় প্রচার করেন যে,—হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতাই ভারতের একমাত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতা। অপর দিকে আর এক সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির কথা জোর দিয়ে প্রচার করলেন। এই সময়ে মুসলমানরা ছিলেন দিশেহারা।

সর্বপ্রথম কবি মুহম্মদ ইকবাল প্রচার করলেন যে এই ভারতবর্ষ তাঁদেরও দেশ। অতীতে যে সকল সাধক, পীর-দরবেশ এই দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জন মানসে স্থান লাভ করেছেন তাঁদের অনুসরণ করা কর্তব্য। মুস্লিমদের পূর্ব-পুরুষ (সুফী বা পীর-দরবেশ) এদেশে এসে ত্যাগ, ধৈর্য্য, হৃদয়ের প্রসারতা প্রভৃতি মানবিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে ইস্‌লাম সর্বকালের এবং সর্বমানবের জীবন ধারার একমাত্র অবলম্বন। তিনি আরও বল্‌লেন যে, এদেশবাসীকে অতীতের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে আসতে হবে আধুনিক চিন্তা-ভাবনার জগতে। মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার অন্তরায় জাতীয়তাবাদ। সেই জাতীয়তাবাদের সম্পর্কে ইকবাল গাইলেন :—

সব দেবতার সেরা সে দেবতা
যাহারে কহিছ স্বদেশ ফের!
বসন তাঁহার বনেছে কাফন
আরবি বদন ইসলামের।

(অনুবাদ : মনির-উদ্দীন ইউসুফ)

এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য'—

জাতি প্রেম ছুটিয়াছে মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থ-তরী গুপ্ত পর্ব্বতের পানে।

বিশ্বমানবতার আদর্শে সঙ্কীর্ণ এই কল্পিত ধারাকে প্রতিরোধ করে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকৃত মুস্লিমের পরিচয় রয়েছে।

হজরত মোহম্মদ (দঃ) মানবাতাবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে। সুফী বা পীর-দরবেশগণ এই মানবতার আদর্শকে বাস্তবায়নের জন্য, ভৌগলিক সীমা পেরিয়ে যেখানে মানবতার পতন ঘটেছে সেখানে হাজির হয়ে জীবন-পণ সংগ্রামে রত হয়েছেন। সমগ্র মানব-জাতির অগ্রগতিতে—সুফী বা পীর-দরবেশগণের প্রয়োজনীয়তা এখনও নিঃশ্বেষিত হয় নি। সুতরাং সুফী বা পীর-দরবেশগণের জীবন-সম্বলিত সাহিত্যের ইতিহাস কোন সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নয় বরং তা হচ্ছে গোটা মানব জাতির ইতিহাস ও আদর্শ।

সমগ্র বিশ্বে পরিপূর্ণ জীবন-ধারার জন্য এক সর্বজন গ্রাহ্য আদর্শের প্রয়োজন। ইস্লামের আদর্শ হলো সকল জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত এবং অর্থনৈতিক অবস্থার কৃত্রিম বিভেদগুলির মূল উচ্ছেদ করা।

এই কারণে সুফী বা পীর-দরবেশগণের জীবনাদর্শ তথা ইস্লাম, কোন দেশ ও কাল সম্পর্কিত গণ্ডীর মধ্যে সীমিত নয়। এই কারণে এই সকল মহৎ ব্যক্তিবর্গের ইতিহাস ও সাহিত্য সমগ্র মানব-জাতির ইতিহাস ও সাহিত্য।

ইতি—

কাজি আবদুল ওদুদ
শেহিদ লাইব্রেরীর পক্ষে

ভূমিকা

আর্য ভাষার উৎপত্তি ধর্মকে আশ্রয় করে। বাংলা ভাষারও উৎপত্তি হয়েছে তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য–জৈন-বৌদ্ধাদির মিশ্রিত ধর্মাদর্শকে আশ্রয় করে।

বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকে বাঙালী নর-নারীর সমাজ-চিত্র তাতে সর্বপ্রথম প্রতিফলিত হতে শুরু করে। মধ্যযুগের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সে ধারার রূপান্তর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে বঙ্গদেশে তুর্কীগণের আগমন ঘটে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তুর্কী সুলতানগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে এখানে ইসলাম ধর্ম বিস্তারের পথ আরো প্রশস্ত হয়, এবং তখন থেকে হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামি রীতি-নীতি-অনুসারী আর এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ফলে নব দীক্ষিত মুসলিমগণের পক্ষে বংশ পরম্পরায় অর্জিত হিন্দু-সংস্কার তৎক্ষণাৎ পূর্ণ মাত্রায় পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া হিন্দু ও মুসলিম পরস্পর পরস্পরের পাশাপাশি বসতির ফলে স্থানীয় সামাজিক ও ব্যবহারিক কারণে এক মিশ্র সংস্কৃতি সে সময় থেকেই গড়ে উঠতে থাকে। হিন্দু ও মুসলিমের উভয় তরফ থেকে সমন্বয়ের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সে সংস্কৃতি দৃঢ়তর হয়। ইসলাম ধর্ম প্রচারক পীর ও পীরানী প্রভাবান্বিত হিন্দু মুসলিমের সেই মিশ্র সংস্কৃতিকে 'পীর-সংস্কৃতি' বলা হয়েছে।

মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম প্রচারক পীর-পীরানীগণের অলৌকিক কীর্তিকলাপপূর্ণ কাহিনী-সাহিত্যে পীর সংস্কৃতি-ভিত্তিক সেই সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন হয়। তখনই বাংলা সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় এক বিশেষ রূপান্তর। সমগ্রভাবে রূপান্তরিত সেই সাহিত্য–

শাখাই হল পীর-সাহিত্য শাখা। অতএব বাংলার পীর-সাহিত্য, বাংলা-সাহিত্য ও তার ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য মূল্যবান অঙ্গ।

বাংলা পীর-সাহিত্য প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত। যথা,—১। পীর লোককথা, ২। পীর কাব্য, ৩। পীর জীবনী গদ্য-রচনা ও ৪। পীর নাটক।

পীর লোককথা, যা অনাদৃত অবস্থায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে, তার সামান্য কিছু সংগ্রহ করে এখানে প্রদত্ত হল। বলা বাহুল্য কত পীর লোককথা যে এদেশে ছড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য।

পীর কাব্য, মঙ্গল কাব্য জাতীয় পাঁচালী কাব্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ডক্টর সুকুমার সেন মহোদয়ের আগে আর কেউ এ শাখাটি নিয়ে আলোচনা করেন নি। অথচ এই শাখাটি সাহিত্য গুণসম্পন্ন হয়েও এতদিন তা বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে অনাদৃত ছিল।

পীর জীবনী গদ্য-রচনাগুলির কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত। আবার কিছু কিছু গদ্য-রচনা গ্রন্থ, পীর চরিত-গ্রন্থরূপে বিবেচিত।

পীর নাটক সমূহ সাধারণভাবে ঐতিহাসিক এবং কল্পনাশ্রয়ী নাটকের অন্তর্ভুক্ত।

কাব্য-শাখার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কতকগুলি পীর পাঁচালী নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হল। বাকী শাখাগুলি অর্থাৎ পীর জীবনী গদ্য-রচনা, পীর নাটক ও পীর লোককথা,—যাদের নিয়ে ইতিপূর্ব্বে আদৌ আলোচনা হয় নি,—সে সব সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে আলোচিত হল। তাছাড়া পীর-পীরানীর বিশেষ প্রভাবযুক্ত অঞ্চল চব্বিশ পরগণার পূর্ব্বভাগ ও যশোহর-খুলনা জেলার পশ্চিম ভাগের প্রায় সকল পীর-পীরানীকে নিয়ে কিছু বিশেষ আলোচনা করা হল। আশাকরি এ সবই বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকে সম্পূর্ণতা দান,—বাংলা জীবনী গদ্য-রচনা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাংলা লোক-সাহিত্যের ইতিহাস তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধতর করতে সাহায্য করবে।

পীর-পীরানীগণকে সাধারণভাবে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। যথা—ঐতিহাসিক পীর-পীরানী ও কাল্পনিক পীর-পীরানী।

এ দেশের অসংখ্য পীর-পীরানীর কথা জানা যায়। সকল পীর-পীরানীর নামে সাহিত্য রচিত হয় নি। এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান-প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত পীর-সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

মধ্যযুগীয় সাহিত্য-ধারার পাঁচালী কাব্য রচনার ধারা রুদ্ধ হলেও আধুনিক যুগধারায় জীবনী গদ্য-রচনা রচিত হতে আরম্ভ হওয়ার পর সে ধারা আজও রয়েছে অব্যাহত। কাল্পনিক এমন কি প্রাচীন ঐতিহাসিক পীর-পীরানীর জীবনী নিয়ে যদি ভবিষ্যতে গ্রন্থ রচনা বন্ধ হয়ে যায়ও তবু সাহিত্যের ইতিহাসে ঐ সব রচনাবলীর উল্লেখযোগ্য স্থান অবশ্যই থাক্‌বে।

বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা

প্রথম ভাগ

ঐতিহাসিক পীর

১। পীর গোরাচাঁদের সমাধিস্থান
(হাড়োয়া)

২। পীর একদিল শাহের সমাধিস্থান
(কাজীপাড়া)
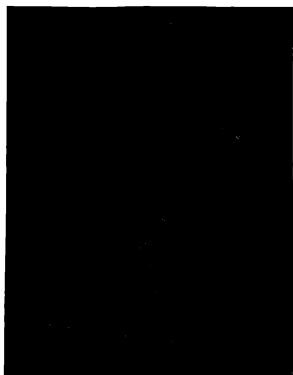
৩। পীর গোরা সঈদ বা পীর দায়ূদ আকবরের সমাধিস্থান
(সুহাই)
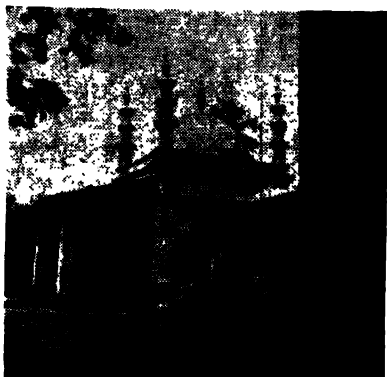
৪। পীর বড় খাঁ
গাজীর সমাধিস্থান
(ঘুটিয়ারী শরীফ)

৫। পীর শাহ্ সুফী
সুলতানের সমাধিস্থান
(পাণ্ডুয়া)

৬। তিতুমীর এখানে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে
শহীদ হয়েছিলেন।
(নারিকেলবেড়িয়া)
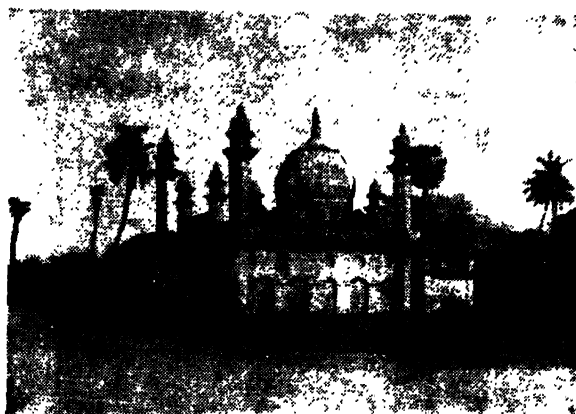
৭। দাদাপীর সাহেবের সমাধিস্থান
(ফুরফুরা শরীফ)
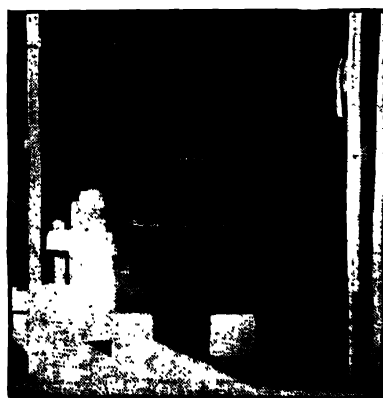
৮। ঠাকুরবর সাহেবের সমাধিস্থান
সমাধির গায়ে পৈতা জড়ানো
(চারঘাট)

৯। চাঁদ খাঁর মসজিদের ধ্বংসাবশেষ
(শ্রীকৃষ্ণপুর)
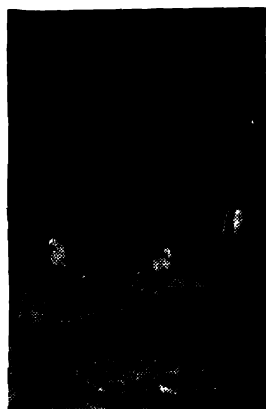
১০। ওলাবিবির দরগাহ্
(গৈপুর)

উপক্রমণিকা

'পীর' শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধ বা প্রাচীন এবং ভাবার্থ আধ্যাত্মিক গুরু। শব্দটি ফারসী শব্দ। ফারসী 'পীর' শব্দের ন্যায় বৌদ্ধগণ কর্তৃক ব্যবহৃত 'থের' শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। সংস্কৃত 'স্থবির' শব্দেরও অর্থ বৃদ্ধ।

পীরগণ ছিলেন ইসলাম ধর্মপ্রচারক। তাঁরা সুফী নামে অভিহিত।

'সুফী' শব্দটি আরবী 'তসাউফ্' বা 'সুফ্' শব্দ থেকে এসেছে। 'তসাউফ্' শব্দের অর্থ পবিত্রতা। 'সুফ্' শব্দের অর্থ পশম।

কারো মতে, যাঁরা পশমী বস্ত্র পরিধান করতেন তাঁরা সুফী। কারো মতে, 'আহল্-উস্-সফ্ফা' অর্থাৎ হজরত মহম্মদ (দঃ) এর সময় যাঁরা মসজিদের মেঝেতে বসে সাধনা করতেন তাঁদের থেকেই সুফী শব্দের উৎপত্তি। কারো মতে, 'সাফ্-ই-আউয়াল' অর্থাৎ যাঁরা সামনের সারিতে নামাজ আদায় করতেন, তাঁদের থেকেই সুফী শব্দের উৎপত্তি। (সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ) ।১।

সুফীবর সহল তস্তরী বলেন, তিনিই সুফী যিনি মালিন্য হতে মুক্ত।

বাগদাদের সুফী মারুফ্-আল্ করখী বলেন, -ভক্তিই মুক্তির পথ, কিন্তু তা মানুষের সাধনায় মিলে না, -তা আল্লাহ্‌র দান। তিনি যাকে করুণা করেন তাকে দান করেন। ...'তসাউফ্' হল সত্য বস্তুসমূহের উপলব্ধি। আর সৃষ্ট জীবগণের হাতে যা রয়েছে তা ত্যাগেই উপলব্ধির সূচনা। এক কথায়— বিষয় নিস্পৃহতার উপরই তত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

সুফীবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে John A. Subhan তাঁর Sufi Saints and shrines in India গ্রন্থে লিখেছেন : Sufism is that mode of religious life in Islam in which the emphasis is placed not so much on the performances of external ritual as on the activities of the inner self -in other words it signifies Islamic Mysticism. তিনি আরো লিখেছেন :—This term has been popularised by western writers, but the one in

common use among Muslims is 'Tasawwuf' while its cognate 'Sufi' is used for the mystic.

প্রখ্যাত তাপস জনিদ বাগদাদী বলেন;—সুফী হলেন পরিত্রাতা ঋষি। মৃত্তিকাবৎ তাঁর ওপর সমুদয় জঞ্জাল নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু তা হতে সমুদয় কল্যাণ বহির্গত হয়। যিনি সংসারে নির্লিপ্ত তিনিই সুফী।

সুফীদের নিজেদের কথায় 'সুফী' শব্দের ব্যাখ্যা আছে;—একদা তাপস মহম্মদ ওয়াসা, 'সোফ্' নামক স্থূল কম্বল-বিশেষ পরিধান ক'রে 'কতিবা' নামক এক সাধু-পুরুষের নিকট উপস্থিত হন। কতিবা তাঁকে 'সোফ' পরিধান করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ওয়াসা নিরুত্তর থাকেন। কতিবা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন;—তুমি উত্তর দাও না কেন?

ওয়াসা বল্লেন;—যদি বলি বৈরাগ্যবশতঃ 'সোফ' পরেছি, তবে আত্মশ্লাঘা করা হয়। যদি বলি দারিদ্রতা হেতু সোফ পরেছি তবে ঈশ্বরকে নিন্দা করা হয়। তাই নিরুত্তর আছি।

উক্ত কথোপকথন থেকে বোঝা যায় যে, সুফীরা ছিলেন—একদিকে বৈরাগী, অন্যদিকে দরিদ্র। সুতরাং সুফীদের নিজেদের কথায় প্রমাণিত হচ্ছে,—সংসার-বিরাগী পশম-বস্ত্র পরিধানকারীরা ছিলেন সুফী।

কালক্রমে ইসলামের মত ব্যবহারিক ধর্মেও এমন একটি মতবাদ গড়ে ওঠে যার প্রধান নীতি সংসার ত্যাগ না হলেও এই মতাবলম্বীদের অনেকেই সংসার বিরাগী ছিলেন। এই মতবাদকে বলা হয় তসাউফ্ফ এবং মতাবলম্বীদের বলা হয় সুফী।

অথচ ইসলামধর্মে সংসার ত্যাগের বিধান নেই। হজরত মহম্মদ (সাঃ) সংসার ত্যাগের মনোভাবকে শুধু নিরুৎসাহই করেন নি সংসারত্যাগীর স্থান তিনি নির্দেশিত করেছেন ইসলামী ভ্রাতৃগোষ্ঠীর বাইরে। ইসলামে বৈরাগ্য নেই। তবে কেন এমন একদিন এল যখন সংসার ত্যাগ করে কিছু ব্যক্তিকে সুফী হতে হল?

হজরত নবী করিম (সাঃ)-এর পরও কিছুদিন খেলাফতের আদর্শ চলেছিল। সে আদর্শকে সমুন্নত রাখতে হজরত ইমাম হোসেন কারবালায় শহীদ হলেন। এর পর খেলাফতের নাম করে দামেশ্‌কে বংশ-ভিত্তিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। ইসলামী ধারা হারিয়ে গেল গতানুগতিক সামন্ততান্ত্রিক স্রোতে। উম্মিয়া

রাজবংশ, আব্বাসিয়া রাজবংশ সেলজুক রাজবংশ, উসমানিয়া-তুর্কী রাজবংশ, ফাতেমী খান্দান, তৈমুরী খানদান, সাকাভী খানদান প্রভৃতি কত না রাজবংশের উত্থান-পতনে আকীর্ণ হল মুসলমানের ইতিহাস। আদর্শ বিবর্জিত হল, মানবতা পরিত্যক্ত হল, সাম্যের গলায় বসানো হল ছুরি, ভ্রাতৃত্ব একটা দূরাগত প্রতিধ্বনিতে রূপান্তরিত হল, ন্যায়পরায়ণতার ক্ষীণকণ্ঠ ক্ষমতাগর্বীর অট্টহাসির দাপটে স্তম্ভিত ও নির্বাক হয়ে রইল। মূল জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেথায় হোথায় গড়ে উঠল অসংখ্য আশ্রম ও খান্‌কা; মৃত ব্যক্তির কবরের উপর নির্মিত হল বড় বড় 'মাজার' ও তাতে চল্‌ল গুহ্যপন্থায় সাধন-ভজন। বাগদাদের অভিজাত শ্রেণীর ভোগোন্মত্ততা রোমনগরীর উচ্ছৃঙ্খল বিলাসের সহোদরা হল; এক মুসলমান অমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হল, অন্য মুসলমান উদর-পূর্তির জন্য আশ্রয় নিল ভিক্ষাবৃত্তির। তখনও শাহী মসজিদে আজান হাঁকছে 'মুয়াজ্জিন'; মুহূর্তের জন্য অবারিত হচ্ছে মসজিদী সাম্য এবং স্বৈরাচারী সম্রাটদেরকে 'খতীব' ঘোষণা করে চলেছে 'খলিফাতুল মুসলিমীন' বলে।

সাধারণ মানুষ দেখলো এ সেই গতানুগতিকতা, সেই বিভেদমূলক সমাজ, —যার মধ্যে অহঙ্কার ও হীনমন্যতাকে আইনের অনুশাসনে শৃঙ্খলিত করে পাশাপাশি বাস করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। কোথায় শান্তি কোথায় সাম্য! রসুলুল্লাহ্‌র সকল সামাজিক প্রচেষ্টা যেন একটা স্বপ্ন বলে প্রতীয়মান হল। সমাজে বিভেদকে পাকাপাকি করার জন্য যত্নের বিরাম নেই শাসক-গোষ্ঠীর। উদারতার নামে আমদানী হতে থাকে কত না ইসলাম-বিরোধী মতবাদ।......দিন যায়, মানুষ বুঝে,—রাজতন্ত্র চিরস্থায়ী; গরীবের দুঃখ চিরস্থায়ী; পাপ চিরস্থায়ী; তার বিপরীত পুণ্যও চিরস্থায়ী।...সুতরাং আর ভয় নেই স্বৈরাচারী শাসক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের। মানুষ এখন যত ইচ্ছা ইসলামের চর্চা করুক—ধর্মে উদার Laissez-faire-নীতি অবলম্বিত হোক্। চলুক—শিয়া-সুন্নীর 'মজহবী'-দ্বন্দ্ব; শরীয়ত ও মা'রেফতের মধ্যে বিভেদ রচিত হোক্; কেউ সংসারকে মায়া কিংবা দুঃখের নিকেতন ভেবে বিজন মরু-কান্তারে প্রয়াণ করে পরলোকের জন্য সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করুক। সুলতানের প্রাসাদের অনুরূপ করে তৈরী করা হোক সংসারত্যাগী ফকিরের সমাধি ও আস্তানা। স্বৈরাচারী সম্রাট নগ্নপায়ে ফকিরের দরবারে আগমন করে প্রমাণ

করুন তিনি ধর্মভীরু। বিভ্রান্তি, বিভ্রান্তি;—জীবন, মায়া-মরীচিকায় রূপান্তরিত হয়ে সাধারণ বোধ-বুদ্ধির আওতার বাইরে চলে যাক্।

হ'লও তাই। শরীয়তের অনুসারী মানুষ 'জেহাদে'র কথা ভুলে শুধু নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত অনুশীলন করতে লাগলেন। মা'রেফতের অনুসারী মানুষ 'নফ্‌সকুশী'তে ডুবে গিয়ে ভাবলেন - জেহাদে আকবরের অনুশীলন হচ্ছে! স্বৈরাচারী সুলতান তাঁর ঐশ্বর্য-পিপাসা চরিতার্থ করার জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে সেটাকে বল্‌লেন,—কুফরের বিরুদ্ধে জেহাদ।

অসাম্যের উপর স্থাপিত বিভেদমূলক সমাজে লোভ, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, অসংযম প্রভৃতি যে-সব মনোভাব ব্যক্তি-চরিত্রকে অধিকার করে, সুফীগণ স্বাভাবিকভাবেই সেগুলিকে ধর্মজীবন লাভের পরিপন্থী বলে দেখলেন এবং এই দেখাকে মানুষের অন্তরস্থিত বিকৃতি বলে নির্দেশ করলেন। সুতরাং সুফীপন্থায় পূর্বোক্ত বিকৃতি-সংহারই হল সাধনার পথে প্রথম কর্তব্য। সাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ে জন্ম নিল ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

এইভাবে সুফীরা ইসলাম-সমর্থিত ব্যক্তি-চরিত্রের উপযোগী ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংযম-সেবা ও খোদাপ্রেমের প্রচারক হন। বহু ঈশ্বরবাদের স্থানে একেশ্বরবাদকে সংস্থাপিত করা, সর্বমানবের প্রতি মমত্ববোধ, সাম্যবোধ এবং ব্যক্তিগত শুদ্ধির বাণী প্রচার করার দায়িত্বও তাঁরাই গ্রহণ করলেন। তাঁদের চরিত্রের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা, তাঁদের দৃষ্টির উদারতা ও হৃদয়ের প্রেমার্দ্রতা সাধারণ মুসলিমের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল। তাঁদের ব্যক্তিত্বকে ঘিরে রচিত হল শ্রেয় ও প্রেয়ের তেজস্তিলকীয় মাহাত্ম্য। এইরকম সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে সুফীবাদের উদ্ভব হয় ও তার জনপ্রিয়তা ক্রমে বেড়ে চলে। (সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ।[৩১]

অতঃপর দেখা যায় হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর তিরোধানের শতাব্দীকাল মধ্যেই মুসলমানগণ ধীরে ধীরে সংসার ত্যাগের ও সমাজ সম্পর্কে উদাসীনতার মনোভাবকে শুধু হজমই করে নেয় নি বরং তেমন মতবাদের অনুসারীকে মহত্ত্বের দ্বারা চিহ্নিতও করেছে। এই সময়ের মধ্যে ইসলামের হৃত আদর্শকে পুনরুদ্ধার করতে ইব্রাহিম, ইমাম মালিক প্রমুখ নির্যাতিত হয়েছিলেন। হজরত বায়োজিদ বিস্তামী, হজরত বাবা অদহম শহীদ, হজরত শাহ্ জালাল এয়মনি,

হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি, হজরত গোরাচাঁদ এবং আরো বহু পীর-দরবেশ এদেশে ধর্মাদর্শ প্রচারার্থে আগমন করেন। তাঁরা জাতির কথা সমাজের কথা ভাবেন নি। যেখানে মানুষের পতন হয়েছে, মানুষের করুণ বিলাপ ধ্বনিত হয়েছে, তাঁরা সবকিছু বিস্মৃত হয়ে সেইসব মানুষকে আপনার ক'রে নিয়েছেন,—তাদের জন্য প্রয়োজনে অনেকে জীবন পর্যন্ত দান করে শহীদহ য়েছেন।

স্থফীগণের এদেশে আগমনের ইতিহাসে দেখা যায়,—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বহু আরব বণিক দলে দলে বাণিজ্যপোত ও নৌচালনা করে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করতেন। এইভাবে তাদের সঙ্গে এদেশের বহু প্রাচীন সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরের বৌদ্ধ-বিহারের ধ্বংসস্তূপে আবিষ্কৃত একটি প্রাচীন আরবীয় মুদ্রা (আব্বাসীয়া খলিফা হারুন-উর্‌ রসিদ এর রাজত্ব কালে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে আল্‌ মুহম্মদীয়া টাঁকশালে মুদ্রিত।) থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। (স্থফীবাদ ও আমাদের সমাজ)।৬১

খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বন্দর আরবদের উপনিবেশে পরিণত হয়। হজরত স্থলতান বায়েজিদ বিস্তামী সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষার্ধে ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে চট্টগ্রামে এসে থাকবেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্ম বহু বিস্তৃতি লাভ করে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে গাজী ইখতিয়ার-উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক প্রথমে রাজশক্তি নিয়ে গৌড়-লক্ষ্মণাবতী অধিকৃত হয়। পরবর্তী সময়ে অনেক পীর দরবেশ বঙ্গে আগমন করেন। এই সময়ে সনাতনী রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কর্তৃক অনুসৃত বর্ণাশ্রম প্রথার অপপ্রয়োগে উচ্চ-বর্ণের লোকের নিকট সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্ণের লোকেরা সামাজিকভাবে নির্যাতন ভোগ করতে বাধ্য হতেন। তাঁরা ইসলামের উদারতায় আকৃষ্ট হয়ে মুসলিম হলেন।

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন,—হিন্দু সমাজের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার হাত থেকে নিস্তার লাভের আশায় ভারতের পতিতেরা দলে দলে সাম্যবাদী নবধর্ম গ্রহণ করল। ভারতের জাতীয় রাজশক্তি ও তৎ প্রতিষ্ঠিত সমাজ তাদের প্রতি কোনদিন ন্যায় বিচার করেনি; সেজন্যে এরা একবার আশ্রয় করে বৌদ্ধধর্মে, —আবার মুসলমান রাজশক্তি একটা সাম্যবাদী সমাজ পদ্ধতির স্থবিধা

দেখানোর পর ছুটে চলে যায় সেই দিকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে,—যে সব স্থানগুলোকে ব্রাহ্মণেরা ব্রাত্যদের দেশ আর বৌদ্ধ প্রধান দেশ বলে 'ব্রাহ্মণ-বর্জিত' স্থান হিসাবে ঘৃণা করত, সে সব আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান প্রধান। (বাঙ্গালার ইতিহাস)।

ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন,—সামাজিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এই উদারতা এবং সমান অধিকারের আদর্শই ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। (মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ)।[৫২]

পীর দরবেশদের দরগাহ ও আস্তানায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রবেশ-অধিকার থাকায় সেগুলি সবার পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়। পীর-দরবেশদের সামান্য আস্তানাগুলি শাস্ত্রের নীরস আলোচনা বা ধর্ম সংস্কারের পরিবর্তে প্রাণের লীলা ও আত্মার স্বাভাবিক স্ফুরণে পূর্ণ ছিল। এই আস্তানাগুলি বিজিত ও বিজেতার মিলনস্থল। (পূর্ব্ব পাকিস্তানের স্বফী সাধক)।[২৫]

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টার সূত্রপাত হয় সমন্বয়ের অগ্রদূত তৎকালীন পীর-দরবেশগণের মাধ্যমে। তাঁদের সে প্রচেষ্টার লিখিত কোন নিদর্শন আজ নেই। তাঁরা এদেশের ভাষাকে আয়ত্ত করেছিলেন, এ দেশের ভাবজগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন,—প্রাকৃতিক অবস্থাকে মেনে নিয়েছিলেন,—নির্যাতিত সাধারণ মানুষের দুঃখের ভাগ নিয়ে সামগ্রিকভাবে মানবীয় কল্যাণকর পরিস্থিতির সঙ্গে মিতালি করেছিলেন। অপরপক্ষে তাঁরা মানুষের প্রতি সামাজিকভাবে অন্যায়-অত্যাচার, ব্যক্তিস্বার্থগত শাসন-শোষণ প্রতিরোধের জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এদেশের আত্মার সঙ্গে নিজেদেরকে একাত্ম করে দিয়েছিলেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আবু রয়হান মোহাম্মদ ইবনে আহম্মদ আল্-বেরুনী সংস্কৃত ভাষা ও ভারতবর্ষীয় জ্ঞান জগতের পরিচয় লাভ করেন এবং "কিতাব্-আত্ তহকীক-আল্-হিন্দ্" নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ইসলামি আদর্শভিত্তিক জ্ঞান-জগতের দ্বার ভারতীয়দের নিকট উন্মুক্ত করার মাধ্যমে সমন্বয়ের সূত্রপাত লিখিত আকারে উপস্থাপিত করেন। সামগ্রিক কল্যাণকর সেই ইসলামী ভাবজগত তথা সংস্কৃতির সাথে ভারতীয় কল্যাণকর ভাবজগত তথা সংস্কৃতির সমন্বয় প্রবাহ অগ্রসর হয়ে চল্‌তে থাকে। সম্ভবতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলানা আক্রাম খাঁ, হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর

কথায় এসে 'সর্ব ধর্ম-সমন্বয়কে তাঁর চরিত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য' বলে বর্ণনা করেছেন। (সাধক দারা শিকোহ) ।৬৩

রেজাউল করিম সাহেব লিখেছেন —সূফী মতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সকল ধর্মের সহিত খাপ খেতে পারে। (সাধক দারা শিকোহ) ৬৩

কিন্তু সংস্কৃতি সমন্বয়ের নামে যা ধর্ম অর্থাৎ বিশ্ব-কল্যাণ আদর্শ থেকে বিচ্যুত, ইসলামে তার কোন মূল্য স্বীকৃত নয়।

পীর-দরবেশগণ এসেছিলেন ইসলাম ধর্মাদর্শ প্রচার করতে, এসেছিলেন ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শকে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করতে, ইসলাম ধর্ম-বৃত্ত বহির্ভূত কোন সংস্কৃতির সঙ্গে আপোষের মাধ্যমে সামগ্রিক কল্যাণাদর্শ থেকে সরে আসবার জন্য নয়। কারণ ইসলামি আদর্শে ধর্ম ও সংস্কৃতি পৃথক নয়। একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ প্রাপ্তির জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রামই হল ইসলাম ধর্মের লক্ষ্য এবং সেই মানসিকতাই ইসলামী সংস্কৃতি। অতএব সংস্কৃতির যে-সব আচার-ব্যবহার সামগ্রিকভাবে সমাজ কল্যাণের সহায়ক নয়,—ইসলামে তার অনুমোদন নেই।

বঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে সংস্কৃতি নামক যে আচার-ব্যবহার, (যাতে বর্ণাশ্রম প্রথার অপপ্রয়োগ বশতঃ) স্থানীয় অগণ্য অন্ত্যজবর্গীয় লোকের জীবনে মানবতা-অবমাননাকারী ভয়াবহ হতাশা টেনে এনেছিল তাকে সজোরে আঘাত করতে গিয়ে পীর-দরবেশগণকে কঠোর সংগ্রাম এবং স্থান বিশেষে শহীদ হতে হয়েছিল। তাঁদের উচ্চাদর্শের নিকট আনুগত্য দিয়ে নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলামের পতাকা তলে এলেন। কিন্তু বিরোধীদের মধ্যে সুবিধা-বাদীগণ উপায়ন্তর না দেখে সহাবস্থানের হস্ত প্রসারিত করলেন। তৎকালীন সহাবস্থান নীতির বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে তাঁরা বিশ্ব-কল্যাণকর মানবতাদর্শ থেকে বহু দূরে সরে গেলেন, সংস্কৃতি সমন্বয়ের নামে বিচ্যুত জীবন দর্শনকে নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির মানসে এগিয়ে এলেন এবং সাধারণ মানুষকে সেদিকে প্রলুব্ধ করার জন্য সচেষ্ট হলেন।

এ-বিষয়ে কয়েকটি রূঢ় বাস্তব বক্তব্য প্রকাশিত আছে। কেহ লিখেছেন, হিন্দু-মুসলিমের কুসংস্কারও মিলতে লাগল। ক্রমে গাজীমিয়া, পাঁচ পীর, পীর বদর, খাজা খিজিরের পূজা চলল। ভেবা গাজী খাঁর 'সখী সরবর' তীর্থ হিন্দু-

মুসলমান-শিখের তীর্থস্থান।······বাংলাদেশে সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ, হিন্দু মুসলমানের উপাস্য। (ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা)।[৫০]

তত্ত্বগতরূপে দৃষ্ট হলে ইসলাম এতই অসহিষ্ণু ও হিন্দু ধর্ম এতই স্বতন্ত্র ও মিশ্রবর্জনকারী যে এ দুয়ের সহাবস্থান অসম্ভব। কিন্তু বাস্তব অবস্থা যে কোন তত্ত্বের চেয়ে শক্তিশালী ও অমোঘ, এবং এক শতকের মধ্যেই বাংলাদেশের মুসলিম শাসকেরা উপলব্ধি করেছিলেন যে এদেশকে অধিকৃত রাখতে এবং দিল্লীর প্রতাপ অস্বীকার করে স্বাধীনতা বজায় রাখতে গেলে স্থানীয়দের বিরোধীতে পরিণত করা চলে না এবং সকল ভূস্বামীদের পরিবর্তন করাও তাঁদের আয়ত্তের মধ্যে নয়।······স্থানীয় ঐতিহ্যের প্রাবল্য ও স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক প্রভাব এতই শক্তিশালী যে, তারা বহু স্থানেই সত্যপীরের পূজা প্রভৃতি হিন্দু-ভাবাদর্শ ও সর্ব-প্রাণবাদী মনোভাবকে আত্মস্থ করেছিল।······ যাই হোক্, কঠোরভাবে ব্যাখ্যাত নীতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্থাপিত ক্রিশ্চান ধর্মের মত ইসলামও বহুদিন হল এর উন্মেষ কালাগত মতাদর্শ থেকে সরে এসেছে। (এক্ষণ)।[৪]

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,—ধর্ম, আধ্যাত্মিক জগতের, কিন্তু সংস্কৃতি পার্থিব জগতকে নিয়ে। মানবীয় আচার পদ্ধতি, শিক্ষা দীক্ষা, মানসিক উন্নতি, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব এই সবের সমন্বয়ে এক অপূর্ব মনোভাবই হচ্ছে সংস্কৃতি। একথা সত্য যে ধর্মের আদর্শ সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু তাই বলে ধর্ম ও সংস্কৃতি একই বস্তু নয়। সেই জন্য বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন যতই কঠিন হউক না কেন বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন কঠিন তো নয়-ই, বরং যুগে যুগে প্রত্যেক দেশেই তা হয়ে আসছে। পৃথিবীর কোন শক্তি এ সমন্বয়ের গতি রোধ করতে পারবে না, সমন্বয়ের কাজ অনন্তকালব্যাপী চলতে থাকবে, এতে কারো কোন বাধা টিকবে না। (সাধক দারা শিকোহ ঃ ভূমিকা)।[৬৩]

সাধারণভাবেই আমরা অনুভব করি সংস্কার থেকে সংস্কৃতি শব্দটির উৎপত্তি। সংস্কার বশতঃ যিনি যে কাজ করেন, বা যা চিন্তা করেন, বা যে আচার-ব্যবহার করেন,—তা তাঁর সংস্কৃতি। যে সংস্কার কোন জাতির আচার-ব্যবহার ও চিন্তা-ভাবনার পরিচায়ক তা সেই জাতির সংস্কৃতিরও পরিচায়ক। সংস্কৃতির পরিধি যে কতখানি বিস্তৃত সে প্রসঙ্গে সাহিত্যিক গোপাল হালদার লিখেছেন ঃ

সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান (Sciences) ও সমস্ত সৃষ্টি-সম্পদ (Arts)—অর্থাৎ আমরা যা জেনেছি (প্রকৃতির নিয়ম, নীতি প্রভৃতি), যা করেছি (যন্ত্রশিল্প, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, মানসিক প্রয়াস, চিন্তা-ভাবনা, নৃত্য-গীত, চিত্র-কাব্য প্রভৃতি)। আর্ট বা শিল্প এই সংস্কৃতিরই একটি এলাকা। শিল্প বলতে বোঝায় বাস্তব সৃষ্টি আর মানস-সৃষ্টি দুই-ই; কারণ দুই ই সৃষ্টি। (বাঙালী সংস্কৃতির রূপ)।"[২]

সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা থাকুক, পীর-দরবেশগণের আগমনের পর বঙ্গদেশের সংস্কৃতির কি পরিচয় আমরা পাই! আমরা পাই,—পীর-দরবেশ অর্থাৎ সুফী মতাবলম্বী সাধক ও ধর্মপ্রচারকগণের প্রচারিত আদর্শভিত্তিক ভাবনা এবং তদ্‌জাত সংস্কার থেকে উৎপন্ন কর্মধারা অনুসরণ করার মানসিক অবস্থা। বঙ্গে ইসলাম আগমনের পর হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে তা মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করেছে। একেই বলা হল হিন্দু-মুসলিমের মিশ্র-সংস্কৃতি বা পীর-সংস্কৃতি। এই পীর সংস্কৃতি উৎপত্তির পশ্চাতে ত্রিমুখীন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যথা—ধর্মপ্রচারকগণের উদার ও সংস্কারমুক্ত মনোভাব, এদেশের প্রকৃতি (Natural environment) এবং সংস্কার বা culture. পীর সংস্কৃতির নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি থেকেও তা প্রমাণিত হতে পারে,—

ক) মুসলিমগণ পীরের আত্মার শান্তি কামনা করে জিয়ারত করেন। হিন্দুগণ পীরের প্রতি ভক্তি নিবেদন করতে নানাবিধ অর্ঘ্য প্রদান করেন।

খ) জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল ভক্ত পীরের দরগাহ্‌ অর্থাৎ সমাধিস্থানে বা নজরগাহ্‌ অর্থাৎ কল্পিত দরগাহে হাজত, মানত ও শিরনি প্রদান করেন।

গ) মুসলিম আদর্শে দরগাহে কোরান পাঠ হয়, কিন্তু নামাজ অনুষ্ঠান হয় না। হিন্দু আদর্শে লুট প্রদত্ত হয়, সন্তান কামনায় বা রোগ নিরাময় কামনায় দরগাহে ইট বাঁধা হয়, ফুল প্রদত্ত হয় এবং ভক্তগণ কর্তৃক শান্তি-বারি গৃহীত হয়। বৌদ্ধ আদর্শে অনেক জায়গায় জীব হত্যা না করে পীরের স্মরণে গরু, মুরগী প্রভৃতি বনে নিয়ে গিয়ে হাজত-স্বরূপ মুক্ত করে দেওয়া হয়।

ঘ) পীরগণের মৃত্যু-বার্ষিকীতে হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণ দরগাহ বা নজরগাহে সাড়ম্বরে মেলা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন। দরগাহের সেবায়েতগণ অতিথি সৎকার করেন।

ঙ) হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ পীরের অলৌকিক কীর্ত্তি-কথা-ভিত্তিক কাব্য, নাটক বা জীবন-চরিত রচনা করেছেন। এই সকল কাব্য, নাটকাদি রচনা, পঠন-পাঠন এবং শ্রবণের মাধ্যমে তাঁরা আনন্দলাভ করার সাথে ধর্মানুষ্ঠান করছেন বলে মনে করেন।

এ সবকে ভিত্তি করে পীর-সংস্কৃতি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হতে থাকে।

পীর-সাহিত্য

সুফী মতাবলম্বী ইসলাম ধর্মপ্রচারক পীরগণকে কেন্দ্র করে যে বাংলা জীবনী সাহিত্য গড়ে উঠেছে, সংক্ষেপে তা-ই পীর-সাহিত্য।

বাংলা পীর-সাহিত্য, 'মঙ্গল' জাতীয় সাহিত্য। মঙ্গল এই জন্যই বলা হয়েছে, পীরভক্ত হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের সংস্কার এই যে, পীরের জীবন কাহিনী ও তাঁর অলৌকিক শক্তিকথা পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে শ্রোতা বা পাঠকের পুণ্য অর্জন হয়, যার ফলস্বরূপ তাঁদের জীবনে মঙ্গল বা কল্যাণ হয়ে থাকে।

আবার 'বিজয়' অর্থে 'মঙ্গল' শব্দটি গ্রহণ করলেও বলা যায় যে, ইসলাম ধর্মপ্রচারক পীরের বিজয় অভিযানকে নিয়েই পীর-সাহিত্য গড়ে ওঠায় তা মঙ্গল সাহিত্য বটে ;

এখানে পীর-সাহিত্য বলা হল ; কারণ, এই সাহিত্যধারায়, পীর-কাব্য পীর-নাটক, পীর সম্বন্ধে গদ্যে রচিত জীবন-কথা ও পীর লোক-কথা পৃথক পৃথক ভাবে স্থান পেয়েছে। অতএব পীর-সাহিত্য, যা হিতের সহিত বর্তমান, তাকে সাহিত্য পদবাচ্য করলে সাহিত্যে, মঙ্গল বা কল্যাণের কথা আপনা আপনিই এসে পড়ে। সুতরাং পীর-সাহিত্যকে আর আলাদাভাবে পীর মঙ্গল সাহিত্য বলে উল্লেখ করার তেমন আবশ্যকতা এখানে নেই।

পীর-সাহিত্যকে প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত করা হল। যথা—১। পীর-কাব্য, ২। পীর জীবনী গদ্য রচনা, ৩। পীর নাটক ও ৪। পীর লোক-কথা।

বাংলা পীর-সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে কিছু কিছু বক্তব্য আছে, যাতে এ-দেশের সমাজ ব্যবস্থায় অনৈশ্লামিক চিত্র, ইতিহাসের অঙ্গ হিসাবে এসে পড়েছে। ইসলামী মূল আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে এ-দেশের কিছু কিছু মুসলিমের পক্ষে অগ্রগামী হওয়ার চিত্রও তাতে রয়েছে। অবশ্য তাদের কোনো প্রবাহ আজো রুদ্ধ হয়নি। সাহিত্যরূপ সমাজ-দর্পণে তার প্রতিফলন হওয়াই স্বাভাবিক। তাই বাংলা পীর-সাহিত্য, হিন্দু আদর্শের ওপর ইসলামী আদর্শের

প্রভাব বিস্তার ও ধীরে ধীরে তা সংমিশ্রিত হওয়ার একটা তথ্যনির্ভর ধারাবাহিক সাহিত্য-ইতিহাস বটে। হিন্দু আদর্শ থেকে ইসলামী আদর্শে উত্তরণের প্রচেষ্টার মধ্যে ঠিক এই কারণেই অনৈশ্লামিক চিত্র সম্বলিত কিছু ইতিহাস তাতে থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গে এ দেশে ইসলামী রেনেসাঁসের অগ্রদূত সাপ্তাহিক মুখপত্র 'মিজান'-এর (১৫ই জুন ১৯৫৫) সম্পাদকীয় অংশের বক্তব্য লক্ষণীয় ;—

"এ-দেশের মুসলমানরা প্রধানতঃ হিন্দুদের বংশধর। তাঁদের পূর্বপুরুষরা এককালে হিন্দুই ছিলেন, তাই মুসলমানদের মধ্যে আজো অনেক হিন্দু আচার-আচরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এসব কাজ অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা জ্ঞাতসারে করেন না। সত্যি কথা বলতে কি, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভাব রূপান্তরিত হয়ে তাঁদের ধর্মীয় চেতনার মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে, অথচ সে সম্পর্কে তাঁরা অসচেতন। তাই শরীয়তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সীমা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ এখানে বড় কথা নয়,—বড় কথা হচ্ছে মুসলমানের সচেতন মুসলমান হওয়া ও তাঁর কৃত কার্যাবলীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবগত হওয়া।"

পীর-সাহিত্যের মূল্য

যে কোন সাহিত্য, তার সাহিত্য গুণ যত লঘুই হোক, তবু তা সাহিত্য হিসাবে কিছু না কিছু মূল্যবান বটে। কোন রচনা, সাহিত্য হয়ে উঠেছে কিনা তার মানদণ্ড নির্ণয়ে নানা মনীষীর নানা মত। সাধারণ ভাবে অনেকে সাহিত্যের মূল্য তার রস বিচারের মাধ্যমে নির্ধারণ করেন। অবশ্য রস বিচার সহজসাধ্য নয়। এক জনের কাছে যে রচনা সুন্দর বলে অনুভূত হবে, অন্যজনের কাছে তা ততখানি সুন্দর বা আদৌ সুন্দর নাও হতে পারে। একেবারে অজ পল্লীগ্রামের নগেন মাহাতো বড় জোর সুর করে পাঁচালী পড়তে পারে, এবং পড়ে সে রসাস্বাদন করে আনন্দ অনুভব করে কিন্তু তার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের রক্ত করবী'র রস গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আবার কল্‌কাতার অমুক সাহিত্য সংঘের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমুক, 'উর্ব্বশী' কবিতার রস-মাধুর্য অনুভব করে তার তারিফ করতে পারেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে 'পীর গোরাচাঁদ' পাঁচালীর রসাস্বাদনে কিছু মাত্র তৃপ্তি না পাওয়া স্বাভাবিক।

সাহিত্য তা যত প্রসাদগুণ সম্পন্ন হোক্, কালের অমোঘ গতিতে তার মূল্যমানের তারতম্য হতে বাধ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরুত্ব বা রসমাত্রা-বোধ কম হয়ে থাকে। কারণ সমাজ বিবর্তনশীল বলে যে সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র তাতে প্রতিফলিত হয়, তা অন্য কোন সমাজ ব্যবস্থার মানুষের কাছে ততখানি হৃদয়গ্রাহী হয় না। তাছাড়া যে সাহিত্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানকেন্দ্রিক কাহিনী নিয়ে রচিত, তাকে অন্য স্থানের লোক সেই পরিবেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হওয়ায়, সামগ্রিকভাবে অনুধাবন ও রস গ্রহণ করতে পারে না। তাই বলে সেই স্থানের এবং সেই কালের সাহিত্য মূল্যহীন নয়।

সাহিত্যের অন্যতম প্রধান চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তা সমাজ-দর্পণ বা সমাজ-চিত্র। কোন স্থান ও কালের সমাজ জীবনে যে উত্থান-পতন, যে দ্বন্দ্ব-সন্ধি ঘটে, যে হাসি-কান্না দেখা দেয়, যে প্রেম বিরহ যে আনন্দ-বেদনা জাগে, যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়, তার স্থায়ী দর্পণ হল তখনকার সেই স্থানের সাহিত্য। অতএব সেই সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শৈল্পিক, দার্শনিক অবস্থা প্রভৃতির একমাত্র পরিচায়ক হল তার সাহিত্য। অতএব পীর-সাহিত্যের রসমূল্য কারো কাছে যত কম থাক, সমাজ-চিত্র হিসাবে তার সাহিত্য মূল্য কোন দিন অপাংক্তেয় হতে পারবে না।

পীর-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমি

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচারকগণের আগমন ঘটতে থাকে। সুফী পীর-দরবেশগণ সেই সময় থেকে এ-দেশের জনসাধারণের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। তখনও বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়'-এর পদগুলি রচিত হয় নি।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ হল স্বর্ণযুগ। এই যুগেই বাংলা কাব্য সাহিত্যের নানাদিকে চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে দেবতা বা দেবতা স্থানীয় চরিত্রকে কেন্দ্র করে প্রশস্তিজ্ঞাপক কাব্যের ব্যাপক প্রসার দেখা যায়, এবং দেব ধর্ম-ঠাকুর, দেবী মনসা, দেবী চণ্ডী, ঠাকুর রামচন্দ্র, ঠাকুর কৃষ্ণচন্দ্র, পীর-দরবেশ প্রভৃতিকে নিয়ে পাঁচালী-কাব্য রচিত হতে থাকে।

দেব-দেবীকে নিয়ে রচিত পাঁচালী কাব্যধারা আধুনিক যুগে এসে প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল,—কিন্তু পীর-দরবেশগণকে নিয়ে রচিত কাব্যধারা রুদ্ধ হল না। এর মূল কারণ হ'ল, দেব-দেবী চরিত্র ভিত্তিক সাহিত্য ধারার পাশে এই পীর দরবেশ-গণের মানবীয় জীবন-ভিত্তিক সাহিত্য ধারার উত্তরণ ও তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রসার এবং তৎকালের মানবতাবাদের ব্যাপক প্রভাব বিস্তার। পীর-দরবেশগণের চরিত্র ভিত্তিক সাহিত্য ধারায় সম্পূর্ণভাবে মানবতাবাদ-আদর্শ হ'ল সোচ্চার,—যার ফলে তাতে এল খরবেগ। তাই বাংলা সাহিত্যের এই স্বর্ণযুগে শ্রীচৈতন্যদেব থেকে আরম্ভ করে তৎপরবর্তীকালের আদর্শ মানব-জীবন ভিত্তিক সাহিত্য রচনার প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা দিল। এইভাবে বাংলা সাহিত্যে পীর-পীরানীগণের জীবন কথা,—কাব্যে, তা থেকে আধুনিক যুগে গদ্যে রচিত হ'ল এবং শেষ পর্যন্ত নাটকের যুগে সে কাহিনী নাট্যরূপ নিয়ে অভিনীত হ'তে আরম্ভ করল।

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বাঙালী নর-নারীর সমাজ-চিত্র এই পীর-সাহিত্য মাধ্যমেই প্রথম লিখিত আকারে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার সূত্রপাত হতে থাকে। পীর পাঁচালী কাব্যসমূহ হল তৎকালীন বাঙালী মুসলমান সমাজের সংস্কৃতির একমাত্র পরিচায়ক। আধুনিক যুগে উপন্যাস ও গল্প সাহিত্য বা

জীবনী সাহিত্য রচিত হওয়ার পর থেকে পীর-পাঁচালী কাব্য প্রকাশের প্রবাহ-বেগ কমতে থাকে। আজ কাহিনী-কাব্য সৃষ্টির দিন অতিবাহিত হয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে পীর-পীরানীর জীবন চরিত্র কাহিনী কাব্যাকারে রচিত হওয়ার দিন অতীত হয়ে গেছে। পীর কাব্য-সাহিত্য তাই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে বাঙালী মুসলমানগণের একমাত্র সমাজ-চিত্র স্বরূপ হয়ে রইল; এবং সেই কারণেই এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

মধ্যযুগ অর্থাৎ তুর্কী-সুলতান কর্তৃক বঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের সময় থেকে হিন্দু-সংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতির সাথে মিশে যেতে আরম্ভ করে,—যার শেষ পরিণতিতে হিন্দু-মুসলিমের বাঙালী সংস্কৃতি আজ একটা অখণ্ড বাঙালী সংস্কৃতিরূপে গড়ে উঠেছে। যে যে ভিত্তিতে এই মিশ্রণ হয়েছে তা প্রধানতঃ ;—

১। মুসলিম রাজশক্তি বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার লাভ করলে তার প্রভাব থেকে হিন্দুগণ মুক্ত থাকতে পারেন নি, সহাবস্থান নীতি অনুসৃত হয়েছিল।

২। চিশতিয়া ও সুহরাবর্দীয়া তরীকার সুফীগণও অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা প্রাথমিক যুগে ভারতবর্ষে আগমন করেন। হিন্দু অদ্বৈতবাদের সঙ্গে উক্ত তরীকাদ্বয়ের সুফী সাধকগণের মতাদর্শের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার ফলে তাঁদের মতবাদ এ-দেশে স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছিল। আবার, হজরত আবদুল কাদের জিলানী প্রবর্তিত কাদেরীয়া তরীকা ও হজরত বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দ প্রবর্তিত নক্‌শবন্দীয়া তরীকায় দ্বৈতবাদ বা স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য স্বীকার করা হয়।[৩১] হিন্দু দ্বৈতবাদ তাঁদের অনুকূলে যাওয়ায় কাদেরীয়া ও নক্‌শবন্দীয়া মতবাদও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং পীরগণ প্রভাবিত হিন্দু মুসলিম নর-নারীর মধ্যে এক সমন্বয়ভাব গড়ে ওঠে। ফলে পীর-সংস্কৃতি হিন্দু ও মুসলিমের মিশ্র সংস্কৃতি রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। সুফী মতবাদ-আশ্রিত মানবতাবাদের আদর্শ, বাঙালী হিন্দুর মনন শক্তিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

৪। হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ, জন্মগত ভাবে প্রাপ্ত হিন্দু সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে সক্ষম হন নি।

৫। গুরু-শিষ্য সম্পর্কিত মানসিকতায় আচ্ছন্ন স্থানীয় সামাজিক

আবহাওয়ায়, পীরগণকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করার দুর্বলতা, তৎকালীন সাধারণ মুসলিমের পক্ষে ত্যাগ করা সহজ ছিল না।

পীর-পীরানীগণের ব্যাপক প্রভাব ভাগীরথী নদীর দক্ষিণ প্রান্তের পূর্ব অঞ্চলে যেরূপ পড়েছিল, সমগ্র বঙ্গের আর কোথাও সেরূপ পড়েনি। এ-বিষয়ে ডক্টর সুকুমার সেনের বক্তব্য অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—চব্বিশ পরগণার পূর্ব ভাগ ও প্রাক্তন যশোহর জেলার পশ্চিম ভাগ - এই অঞ্চল অনেক দিন হতেই পীর প্রভাবিত। বড় খাঁ গাজী ও গোরাচাঁদ পীর উভয়ের পীঠস্থান আছে এই অঞ্চলে। এখনও যারা পীরের গান গেয়ে কলিকাতায় ভিক্ষা করে তারা পূর্ব চব্বিশ পরগণার লোক। ঊনবিংশ শতাব্দের মাঝের দিকে এই সব অঞ্চলে পীরের ছড়াগান কেমন ধরণের ছিল, সে পরিচয় দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে সন্নিবিষ্ট প্যারডি হতে পাওয়া যায়। এ প্যারডিতে পীরের গানের স্বচ্ছ, আসল কাঠামো ঠিক আছে। যেমন,—

ধূয়া ঃ মানিকপীর, ভবপারে যাবার লা,
জয়নাল ফকিরি নেলে, ফেনি খালে না।

আরম্ভ ঃ আল্লা আল্লা বল রে ভাই নবি কর সার,
মাজা দুলিয়ে চলে যাবা ভবনদী পার।

শেষ ঃ ষাঁড়ের মাথায় শিং দিয়েছে, মানষির মাথায় কেশ,
আল্লা আল্লা বল রে ভাই পালা কল্লাম শেষ।

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস)।[৪১]

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই পীর-কাব্য রচিত হতে সুরু করে। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে সত্যপীর কাব্য রচিত হয়েছে। বাংলা পীর-সাহিত্যের অবির্ভাব কাল্পনিক পীর কাব্য দিয়ে। সত্যপীরই সেই কাল্পনিক পীর। সত্যপীর হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনকারী দূতস্বরূপ।

তাছাড়া হিন্দুর অনেক দেব-দেবী, হিন্দু—মুসলিমের পীর-পীরাণী হিসাবে সাহিত্যে আগমন করেছে। হিন্দুর ওলাই চণ্ডী পীর-সাহিত্যে হয়েছে ওলাবিবি। অনুরূপ ভাবে বনদেবী থেকে বনবিবি, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও মস্‌নদ-আলি থেকে মছন্দলী, উদ্ধার দেবী থেকে উদ্ধার বিবি, বাস্তুদেবী থেকে বাস্তু বিবি প্রভৃতি। (পুঁথির ফসল)।[২৬]

ঐতিহাসিক পীরগণের জীবনীভিত্তিক কাব্য, গদ্য-রচনা ও নাটক ক্রমান্বয়ে এসেছে। লোককথা আগে ছিল, এখনও আছে।

খুব সম্ভবতঃ কাল্পনিক পীরের সর্ববৃহৎ কাব্য, কবি কৃষ্ণহরি দাসের 'বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথি'। এই কাব্যের রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল। মনে হয় এ'টিই সত্যপীরের সর্বাধুনিক পাঁচালী-কাব্য। ঐতিহাসিক পীর জীবনীভিত্তিক সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধুনিক পাঁচালী কাব্য 'পীর একদিল শাহ্ কাব্য'। এই কাব্যের রচনা কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ অথবা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে।

পীর জীবনী গদ্য-সাহিত্য আনুমানিক বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত হতে আরম্ভ করে। মনির্-উদ্দীন ইউসুফ সাহেবের 'হজরত ফাতেমা' নামক গ্রন্থ বাংলা ১৩৭৩ সালের পয়লা বৈশাখে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে এই শ্রেণীর আরো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

পীর নাটক আনুমানিক উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে রচিত হতে আরম্ভ করে। নাট্যকার সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের 'বনবিবি' নাটকের রচনাকাল ১৯১০ খৃষ্টাব্দ।

পীর লোককথাগুলি, যা বড়পীর সাহেবের জীবনী-গদ্য সাহিত্যে অলৌকিক কীর্তি-কলাপ শীর্ষক অংশে প্রকাশিত হয়েছে, তা বঙ্গদেশের সমাজ-ভিত্তিক নয়। বঙ্গদেশের সমাজভিত্তিক পীর লোককথা খুব সম্ভবতঃ আবদুল আজীজ আল্ আমীন সাহেব রচিত 'ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী' নামক গ্রন্থে বাংলা ১৩৬২ সালের পয়লা ফাল্গুন তারিখে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

পীরের পাঁচালী-কাব্য আজো বহু বাঙালীর ঘরে পঠিত হয়। সত্যপীরের পাঁচালী, সত্যপীরের শিরনি প্রদান ব্রত পালন উপলক্ষ্যে পঠিত হয়।

প্রতি বৎসর পীরের দরগাহে 'মেলা' উপলক্ষ্যে লোক-গায়কগণ ঢোলক হারমনিয়ম খঞ্জনী প্রভৃতি সহযোগে পীরের গান পরিবেশন করে থাকেন।

পীরের জীবনী-গদ্য সাহিত্য আজো গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ ভক্তিভরে পাঠ করেন।

পীর নাটক আজো বাংলার বহুগ্রামে খুব উৎসাহ সহকারে অভিনীত হয়। সাধারণ দর্শকের সমবেত হওয়া এবং সেই অভিনয় দেখে স্বতঃস্ফূর্ত অভিপ্রকাশ

করা তার জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত। আমি জানি ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে চব্বিশ পরগণার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত ভবানীপুরে 'বনবিবি' ধোনা দুখের পালা নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

পীর-লোককথা এবং পীরপ্রবাদ বিশেষভাবে পল্লী অঞ্চলে আজো বহুল প্রচলিত।

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত কয়েকখানি পীর-সাহিত্যের নাম ও তাদের প্রকাশকাল উল্লেখ করা হল ;—

১। শঙ্করাচার্য ও রামেশ্বর বিরচিত সত্যনারায়ণের পাঁচালী : সম্পাদনায় কৃষ্ণচরণ পণ্ডিত। সম্পাদনাকাল—বাংলা ১৩৫৫ সালের আশ্বিন মাস।

২। হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি সাহ্ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান : গৌরমোহন সেন : দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা ১৩৬৫ সাল।

৩। ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী : মোহাম্মদ গোলাম ইয়াছিন : বাংলা ১৩৫৩ সাল (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

৪। হজরত ফাতেমা : মনিরউদ্দীন ইউসুফ : বাংলা ১৩৫৩ সাল।

৫। মেয়েদের ব্রতকথা (সত্যনারায়ণ ব্রত) : সম্পাদনায় পণ্ডিত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য : অনুমান ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ।

৬। খাজা মঈমুদ্দীন চিশ্তি : মওলানা আব্দুল ওয়াহীদ আল্কাসেমী' : দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ।

৭। হজরত বড়পীরের জীবনী : মৌলবী আজহার আলী : দ্বিতীয় সংস্করণ ত্রয়োদশ মুদ্রন, বাংলা ১৩৫৪ সাল।

৮। বাঁশের কেল্লা (ঐতিহাসিক নাটক) : প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : আনুমানিক ১৯৫১-৫৫ খৃষ্টাব্দ।

৯। হজরত একদিল সাহের জীবনী : কাজী সাদেক উল্লাহ : ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী।

১০। তিতুমীর (নাটক : শ্রীশ্যামাকান্ত দাস : ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস।

১১। হজরত বড় পীরের জীবনী : কাজী আশরাফ আলী : চতুর্থ সংস্করণ, আনুমানিক ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ। ইত্যাদি।

পীর মঙ্গল-কাব্য

পীর কাব্যে 'মঙ্গল' শব্দটির অর্থ 'কল্যাণ' রূপে গৃহীত হয়েছে। মনসার গান এক মঙ্গলবারে গায়ক-গায়িকাগণ আরম্ভ করে পরের মঙ্গলবারে সমাপ্ত করতেন বলে তাকে 'মঙ্গলকাব্য' নামে অনেকে অভিহিত করেন। পীর মঙ্গল-কাব্য সে অর্থে মঙ্গল-কাব্য নয়। পীরের মাহাত্ম্য-কথা আলোচনা করলে বা পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে, পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের মঙ্গল হয় বা পুণ্য সঞ্চয় হয় —এমন বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে, এবং সেই অর্থে পীর-কাব্য, 'মঙ্গল-কাব্য'-শ্রেণীভুক্ত।

পীর-মঙ্গল-সাহিত্য ধর্ম-বিষয়ক আখ্যান-সাহিত্য,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে ধর্ম ইসলাম ধর্ম। সাম্য, মৈত্রী, সংহতি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বলে তাকে 'বিশ্বজনীন' এই বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। ইসলাম যেহেতু বিশ্বজনীন, সেই হেতু এই ধর্ম এবং ধর্মাদর্শ ভিত্তিক সাহিত্য সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। তবে সংস্কৃতি যে কারণে কোনো ধর্মের কঠোর রীতি-নীতির নিখুঁত অনুসরণ করে না,—ঠিক সেই কারণেই পীর মঙ্গল-কাব্যে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ ধর্মাশ্রিত সংস্কৃতির সমন্বয় সাধিত হয়েছে। ঠিক সেই কারণেই পীর মঙ্গল সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক—এরূপ কোন বিশেষ অভিপ্রায় বিচার করা যাবে না।

পীর যে একজন অসাধারণ পুরুষ, তা বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হয়েছে 'পীর একদিল শাহ্' কাব্যের নিম্নলিখিত বক্তব্যের মধ্যে ;—

আল্লার দরবারে বিবি করে মোনাজাত,
কবুল হইল গিয়া খোদার দরগাতে।
আল্লার হুজুরে আরজ করিল যখন,
কাঁপিতে লাগিল তবে আল্লার আসন।
এলাহি কহিল তবে জীবরিলের তরে,
আমার আরশ কাঁপে কিসের খাতেরে।

—(প্রতিলিপির প্রথম খাতা, তৃতীয় পৃষ্ঠা)

জীবরিল জানালো যে 'খানা-পিনা' ত্যাগ ক'রে আশক মুরি নাম্নী এক মহিলা পুত্র কামনায় 'মোনাজাত' করছে। হে এলাহি! আপনি আপনার দরবারের এক লাখ আশী হাজার 'ওলি'র একজনকে আশক মুরির পুত্ররূপে প্রেরণ করে তার সাধনার সফলতা দান করুন। এলাহি তাতে সম্মত হলেন,—

পয়গম্বর বলে বাবা একদিল খন্দকার,
আল্লার হুকুম হইল জনম লইবার।
জনম লইতে যাও একদিল গুণমনি,
কাফের তুড়িয়া লও আলেমের সিরনী। (১১৪)

লক্ষণীয় যে, পীর একদিল শাহ্ আসছেন এলাহির দরবার থেকে, কিন্তু এখানে তাঁকে বেশীক্ষণ থাকতে হবে না,—

পয়গম্বর কহেন তবে একদিলের ঠাঁই,
অবশ্য যাইতে হবে কিছু চিন্তা নাই।
যাহ বাছা একদিল জননীর উদরে,
আড়াই রোজ বাদে আইস খোদার দরবারে। (১১৫)

অর্থাৎ এলাহি-প্রেরিত ব্যক্তি, মহান্ পুরুষরূপে মর্তে আগমন করতঃ কারো মনের গভীর দুঃখ নিরসন করছেন এবং অসাধারণ হিসাবে অন্তরে স্থানলাভ করছেন।

এই ধরনের কাহিনী হিন্দু ধর্মাশ্রিত মঙ্গলকাব্যেও দৃষ্ট হয়।
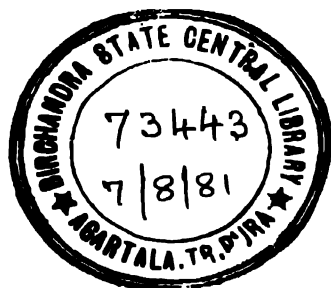
পীর মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

দেব-দেবী চরিত্র-কেন্দ্রিক মঙ্গল কাব্যের ন্যায় পীর মঙ্গলকাব্যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি নিম্নরূপ ;—

১। পাঁচালী কাব্যসমূহ দ্বিপদী বা ত্রিপদী ছন্দে রচিত।

২। কবির আত্ম পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে।

৩। কাব্যের মধ্যে কয়েক স্থলে ভণিতা থাকে।

৪। আল্লাহ্ বন্দনা বা হামদো-নায়াত এই সব কাব্যের অঙ্গ।

৫। মূলতঃ ধর্মভিত্তিক কাব্য।

৬। দেব-দেবী-মাহাত্ম্যবৎ পীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

৭। কাল্পনিক পীর-কাব্যাংশে মানবরূপে দেবতার লীলা দৃষ্ট হয়।

৮। কাহিনী কাল্পনিক (কাল্পনিক পীর-কাব্যাংশে)।

৯। দেবে-মানবে বা দেবে-দেবে সংঘর্ষ নয়, মানবে-মানবে বা মানবে-মানবরূপী রাক্ষসের যুদ্ধ বর্ণনা। এ সংঘর্ষ ব্যষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির বা সমষ্টির সঙ্গে সমষ্টির বা শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর হলেও মূলতঃ তা একটি আদর্শের সঙ্গে অন্য আদর্শের সংঘর্ষ।

১০। লৌকিক এবং অলৌকিক শক্তি পরিচায়ক কাহিনী।

১১। কাব্যসমূহ একক বা দলবদ্ধভাবে গাইবার উপযুক্ত।

১২। কয়েকটি পীর কাব্যে দেব-দেবীর ন্যায় পীরের স্বর্গ থেকে মর্তে আগমন ঘটেছে। কৃষ্ণহরি দাস, আশক মহম্মদ প্রমুখের পীর-কাব্য এর উদাহরণ।

১৩। ছদ্মবেশীর ছলনা বর্ণনা, যা সত্যপীর কাব্যে লক্ষণীয়।

১৪। নর ও নারীর চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

১৫। পশু নদী, নৌকা প্রভৃতির বহুতর নাম বিবরণ আছে।

দেব-দেবী মঙ্গল-কাব্যের বৈশিষ্ট্য থেকে পীর মঙ্গল-কাব্যের অনেক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। সেগুলির সাধারণ কয়েকটি নিম্নরূপ ,—

১। দেব বা দেবী স্বয়ং নররূপে মানব কল্যাণার্থে মর্তে আগমন করেন — কিন্তু পীর বা পীরানী কখনই আল্লাহ্ নন, আল্লাহ্ তা'লার বান্দা মাত্র। তাঁরা আল্লাহের আজ্ঞায় কল্যাণকর কাজ করেন।

২। দেব-দেবীর, মানব মানবীরূপে লীলা নয়,—মানবেরই যথার্থ মানবোচিত ক্রিয়াকলাপ পীর বা পীরানীগণের চরিত্রে দৃষ্ট হয়।

৩। পীরের আগমন ব্যক্তি-পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য নয় —একমাত্র আল্লাহ্-মাহাত্ম্য প্রকাশ করণের জন্য ও জনসাধারণের মঙ্গল বা কল্যাণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করার জন্য।

৪। ঐতিহাসিক পীরকাব্যে পীরের স্বর্গ থেকে আগমনের কল্পনা 'পীর একদিল শাহ্' কাব্য ব্যতীত দৃষ্ট হয় না।

৫। দেবতা মানুষের স্তরে অবনমিত হয়েছেন,—কিন্তু পীর কোনদিন আল্লাহ নন্,—তাঁর অবনমনের কোন প্রশ্ন নেই। তিনি আল্লাহ্ তা'লার দরবারেও পীর, মনুষ্য সমাজের নিকটও তাই।

৬। দেব-দেবী কেন্দ্রিক মঙ্গল-কাব্য কবির স্বকপোল-কল্পিত, কিন্তু পীরমঙ্গল কাব্য (কাল্পনিক পীর ব্যতীত) বাস্তব ঘটনা-ভিত্তিক।

৭। দেব-দেবী কাব্যে মানবমহিমা, দেব-দেবী মহিমায় উন্নীত করা হয়েছে, কিন্তু পীর-কাব্যে পীর-মাহাত্ম্য প্রকাশ কার্যতঃ আল্লাহ মাহাত্ম্যের প্রকাশ ব্যতীত আর কিছু নয়।

৮। স্বর্গ থেকে দেব-দেবীগণের মর্তে আগমন তাঁদের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে; পীরগণ আল্লাহকে সর্বশক্তিমান-জ্ঞানে মানবোচিত কর্তব্য পালনের ব্রত উদ্‌যাপন-হেতু অগ্রসর হয়েছেন।

৯। দেব-দেবী চেয়েছেন নিজেদের জন্য মানবের পূজা পেতে,—পীর চেয়েছেন মানবগণকে আল্লাহ-অভিমুখী করতে।

১০। দেব-দেবী মঙ্গলাদর্শে ভক্তগণ, দেব-দেবীর নামে কল্পিত স্থানে ঘট স্থাপন করতঃ পূজা করেন বা গীত-স্তোত্র পরিবেশন করেন,—এমন কি কোন কোন স্থলে মূর্তিও স্থাপন করে পূজা করা হয়;—কিন্তু পীর মঙ্গল আদর্শে (কেবলমাত্র কাল্পনিক পীর-পীরানী ব্যতীত) দরগাহে পূজার প্রচলন নেই। দরগাহে পীরের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে 'জিয়ারত' করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার নিকট 'মোনাজাত' করা হয় মাত্র।

পীরমঙ্গল কাব্যে আরো যে সব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলির কয়েকটি নিম্নরূপ ;—

১১। গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ বর্ণিত হয়নি।

১২। বারোমাসী বর্ণনা নেই।

১৩। চৌতিশা স্তব নেই।

১৪। নারীর পতিনিন্দা নেই।

১৫। স্বর্গারোহণ বর্ণনা নেই।

১৬। কোন কোন কাব্যে, যেমন পীর গোরাচাঁদ কাব্যে, নামেমাত্র নারী-চরিত্র স্থান পেয়েছে।

১৭। অধিকাংশ কাব্য আকারে খুব ছোট।

১৮। কাব্য হিসাবে সমাজের উচ্চ শিক্ষিত লোকের নিকট তেমন মূল্যবান নয়,—কিন্তু গ্রামের গরিষ্ঠতম অংশের নিরক্ষর সাধারণ মানুষের নিকট খুবই মূল্যবান।

১৯। বাঙালী মুসলিম সমাজের চিত্র এতে সর্বপ্রথম অঙ্কিত হতে আরম্ভ করেছে।

২০। কোথাও হাস্যরস পরিবেশনের প্রচেষ্টা নেই।

২১। আরবী-ফারসী শব্দের বহুল অনুপ্রবেশ হয়েছে।

২২। প্রায় সমস্ত কাব্যে সেমেটিক রীতিতে পৃষ্ঠাগুলি দক্ষিণ দিক থেকে বাম দিকে সাজানো।

২৩। প্রায় সমস্ত কাব্যের প্রথম পংক্তির শেষে দুই দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে তারকা চিহ্ন।

২৪। কোন কোন কাব্যে কবির ভণিতায় বৈষ্ণব সুলভ বিনয় দৃষ্ট হয় যথা ;—

হীন খোদা নেওয়াজ কহে আমি গুনাগার,
না জানি কি পরকালে হইবে আমার।

২৫। কোন কোন কাব্যে সংস্কৃতের প্রভাবজাত রূপ-বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যথা ;—

দু আঁখে কাজল অতি দেখিতে উত্তম,
চলন খঞ্জন পাখি পাইবে শরম। (পীর একদিল কাব্য)

পীর মঙ্গল কাব্যে বাঙালী, বিশেষতঃ মুসলিম বাঙালী—সমগ্র বাংলায় যাঁরা সংখ্যায় গরিষ্ঠতম, তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তথা সমাজ-মানসের প্রতিফলন হয়েছে। অথচ কেউ কেউ ধর্ম মঙ্গল কাব্যকে পশ্চিম বাংলার জাতীয় কাব্য বলে অভিহিত করেছেন।

ধর্ম মঙ্গল কাব্যকে যদি পশ্চিম বঙ্গের জাতীয় কাব্য বল্‌তেই হয়, তবে তাকে হিন্দু-বাঙালীর জাতীয় কাব্য বলা যেতে পারে। মুসলিম বাঙালীর নিকট ধর্মমঙ্গল কাব্য জাতীয় কাব্য বলে স্বীকৃতিলাভ করছে না। বরং বাংলা পীর-কাব্যকে সেই অর্থে বাঙালার জাতীয় কাব্য বলাই শ্রেয়ঃ। কারণ ;—

১। বাংলা পীর কাব্যে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলিমের সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সত্যপীর কাব্য, পীর গোরাচাঁদ কাব্য, পীর একদিল্‌শাহ কাব্য, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

২। বাংলা পীর-কাব্য, হিন্দু ও মুসলিম কবির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাহিত্য সম্ভাররূপে বাঙালী জনসাধারণের কাছে এসেছে। কবি ফয়জুল্লাহ, আরিফ, আশক মহম্মদ প্রমুখ থেকে কবি কৃষ্ণহরি দাস, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রমুখ পর্যন্ত প্রায় একশত কবির সে ঐতিহাসিক সৃষ্টি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৩। পীর কাব্য, হিন্দু-মুসলিমের সংমিশ্রণে উৎপন্ন পীর-সংস্কৃতিভিত্তিক মানসিক ক্ষেত্রের ফসল। হিন্দু ও মুসলিম ভক্তগণ পীরের দরগাহে হাজত-মানত-শিরনি প্রদান করেন।

মনসামঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে মনসার প্রতি কতিপয় মুসলিমের শ্রদ্ধাপ্রদর্শন বিষয়ক যে কথা বলা হত,—মুসলিমদের মধ্যে সে মানসিকতা আজ বিরল। লৌকিক দেবী হিসাবে মনসার 'খানে' হিন্দুগণ কর্তৃক আয়োজিত পূজা-অনুষ্ঠানে বহুকাল পূর্বে কিছু মুসলিম-রমণী পূর্বপুরুষের সংস্কার বশতঃ চাল-পয়সাদি দিতেন কিন্তু তা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে বলা যায়।

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই বলা যায় যে পীরগণ ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সেই পীরগণের জীবনী যে কাব্যে স্থান পেয়েছে, বিশেষভাবে তাকে বাংলার জাতীয় ঐতিহাসিক কাব্য বলা যায় এবং তা বাংলার প্রথম জাতীয় ঐতিহাসিক মঙ্গলকাব্য।

পীর জীবনী গদ্য সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

পীর জীবনী গদ্য সাহিত্যের নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয় ;—

১। ইসলাম ধর্ম প্রচারক পীরগণের মহান্ কীর্তিকলাপ-পূর্ণ কাহিনী।

২। ধর্মীয় সংস্কার বশতঃ কোন কোন গ্রন্থে অধিকমাত্রায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। নর-নারীর প্রণয়-সূচক কোন কাহিনী বা তার অংশ বিশেষ এই সব গ্রন্থে নেই।

৪। কোন কোন গ্রন্থে বঙ্গানুবাদসহ আরবী এবং ফারসী কবিতাংশ পরিবেশিত হয়েছে।

৫। প্রতি পীরের নামের সঙ্গে সম্মান-সূচক শব্দ প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে।

৬। জীবনচরিত কাহিনী, যাতে আনুষঙ্গিক কোন অতিরিক্ত কাহিনী সংযুক্ত হয়নি।

৭। জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকারগণ রস-রচনা সৃষ্টির চেষ্টা করেননি।

৮। পীরগণের অলৌকিক শক্তি পরিচায়ক ক্রিয়া-কলাপে অধিকাংশ স্থান পূর্ণ।

৯। অধিকাংশ গ্রন্থে পীরগণের বংশ পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে।

১০। কোন কোন গ্রন্থে পীর সাহেবের প্রতি 'মোনাজাত' করা হয়েছে। তাদের কোনটি বাংলা ভাষায়, কোনটি বা আরবী-ফারসী ভাষায় লিখিত।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথাও গ্রন্থালোচনা প্রসঙ্গে যথাস্থানে বলা হয়েছে।

পীর-নাট্য সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

পীর নাট্য সাহিত্যের নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয় ;—

১। প্রতি পীর নাটকে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীর চরিত্র স্থান পেয়েছে।

২। পীর-নাটকে আল্লাহ্-মাহাত্ম্য-কথা প্রকাশের কোন উদ্যোগ দৃষ্ট হয় না।

৩। নারী-পুরুষের প্রণয় বা দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব দিয়ে নাট্যরস জমিয়ে তুললেও মূলতঃ পীর বা পীরানীর মাহাত্ম্য-কথাই বিবৃত হয়েছে।

৪। পীর-নাটকের কয়েকখানি গীতিনাট্য, যা যাত্রাগানের আসরে উপস্থাপিত করার উপযোগী।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথাও নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে।

পীর লোকসাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

পীর লোক-সাহিত্যে পীর লোককথা ও পীর প্রবাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয় ;—

ক) পীর লোক-কথা ঃ

১। আল্লার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পীরগণ যে সব অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন গল্পাকারে লোকমুখে প্রচলিত সেই কথাগুলিই পীর-লোক-কথা।

২। ভক্তগণ যদি পীরের নিকট প্রার্থনা ক'রে ইপ্সিত ফল লাভ করেন,—লোকমুখে প্রচলিত সেগুলিও পীর-লোক-কথা।

৩। পীর লোককথাগুলির অধিকাংশ নাতি-দীর্ঘ।

৪। কিছু কিছু পীর লোককথা ভোজরাজার যাদু বিদ্যার অনুরূপ বলে অনুভূত হয়।

৫। পীর লোককথাগুলি প্রণয়-মূলক নয়। কোনটি বীর রসাত্মক, কোনটি ভয় মিশ্রিত, কোনটি বা ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল। তবে সর্বত্র তা পীরের অলৌকিক শক্তি পরিচায়ক।

অনেকের মতে পীরলোককথার অলৌকিকত্বাদের কোন মূল্য ইসলামী আদর্শে স্বীকৃত নয়। অনেকের মতে অলৌকিক কীর্তিকলাপ অস্বীকার্য নয়। পয়গম্বরের পরিচয় প্রসঙ্গে মোহাম্মদ কেরামত আলি লিখেছেন ;—প্রয়োজন বিশেষে পয়গম্বরগণ খোদার তরফ থেকে মো'জেজা বা অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হন।······হজরত মহম্মদ (দঃ) প্রয়োজন বিশেষে খোদার তরফ থেকে মো'জেজা প্রাপ্ত হয়েছিলেন,—যেমন তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শেষ বিন্দু 'সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা' ভ্রমণ। ইসলামী ইতিহাসে এই ঘটনাই 'মে'রাজ' নামে অভিহিত, যা একরাত্রের অল্প অবসরেই সংঘটিত হয়েছিল। ফিরিস্তা কর্তৃক তাঁর সিনাচাক বা বক্ষ বিদারণ, তাঁর অঙ্গুলি সংকেতে আকাশের

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া;—তাঁর বিশ্ববন্দিত পবিত্র কোরানের মত বিস্ময়কর ঐশীগ্রন্থ প্রাপ্তি,—ইত্যাদি। (মিজান: বিশ্বনবী সংখ্যা: ১৯৭৫)।

মোহাম্মদ (দঃ) সত্যিই মে'রাজে গিয়েছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে। তিনি প্রকৃত নবী ছিলেন। কারণ আমরা প্রত্যক্ষদর্শী; তাঁর অঙ্গুলি ইশারায় চাঁদে রয়েছে দুইভাগের জোড়া লাগানো প্রকট দাগ।

(কোরান প্রচার, ২৪ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, মে-১৯৭২)।

পাশ্চাত্যের বিখ্যাত মনীষী **Bos Worth Smith** তাঁর **Life of Mohammad** গ্রন্থে লিখেছেন;—**It is the only miracle claimed by Mohammad, his standing miracle he called it and a miracle indeed it is.**

খ) পীর প্রবাদ:

১। সাধারণভাবে পীরের স্মরণে ব্যবহৃত প্রবাদবাক্য;—

ক) বিলের গরু, বদরের শিরনি।

—অর্থাৎ বেওয়ারিশ। অথবা ব্যক্তিগত নয়, সর্বসাধারণের জিনিস।

খ) মর্‌লো তবু হরি, ঠাকুরবর বল্‌ল না।

—অর্থাৎ হরি হিন্দু ধর্মাবলম্বী—সে, মুসলিম পীর ঠাকুরবর সাহেবের মহত্বের স্বীকৃতি দিল না। সে জিদ করে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ মনে করল।

২। স্পষ্টভাবে পীরগণের মাহাত্ম্য-প্রকাশক প্রবাদবাক্য;—

ক) পীর না পয়গম্বর।

—অর্থাৎ পীরের কার্যাবলী অথবা পয়গম্বরের কার্যাবলী। আবার বিদ্রূপার্থে,—তুমি পীরও নও পয়গম্বরও নও।

খ) তুফানে পড়ে বলে 'পীর বদর বদর।'

—অর্থাৎ বিপদে পড়ে, বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য জলরাশির ওপর প্রভাব বিস্তারকারী পীর বদরকে স্মরণ করা।

গ) বদর বদর গাজী
মুখে সদা বলে মাঝি।
(—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।)

ঘ) পাথরে পূজিলে পাঁচে, সেও পীর হয়ে পড়ে।

(—হুতোম প্যাচার নক্সা।)

—অর্থাৎ পাঁচ জনে পূজিলে পাথর, সেও পীর হয়ে পড়ে। এখানে "দশচক্রে ভগবান ভূত" এই প্রবাদের প্রভাব পড়েছে।

ঙ) গোলী খা ডালেগা।

—শহীদ তিতুমীরের মতন প্রবল মানসিক আবেগপূর্ণ যোদ্ধা যিনি 'গুলী' খেয়ে ফেলার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন।

চ) হিঁদুর নীর, মুসলমানের পীর।

(—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।)

ছ) পীরের কাছে মাম্‌দোবাজি!

জ) পীরের সঙ্গে মুখ বাঁকানো!

ঝ) মরতে বসে পীরের দিকে পা!

ঞ) আরের সঙ্গে যেমন-তেমন
পীরের সঙ্গে মস্করীকরণ!

৩। পরোক্ষভাবে পীরগণের মাহাত্ম্য-প্রকাশক প্রবাদ ;—

(ক) মান্‌লে পীর বরাবর
না মান্‌লে ক্ষীর বরাবর।

- অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি থাকলে ক্ষীর বা শিরনি প্রাপ্তিটি বড় কথা নয় ;—কিন্তু ভণ্ডের কাছে ক্ষীরটাই লক্ষ্য।

(খ) যে শরীরে দয়া নেই সেও কখনো শরীর,
মুস্কিলে যার আসান নেই সেও কখনো পীর।

৪। পীরের অলৌকিক শক্তি পরিচায়ক প্রবাদ বাক্য ;—

(ক) গাজীর কুড়ুল।

(—সাংস্কৃতিকী : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।)

—অর্থাৎ ত্রিশঙ্কুর অবস্থা।

খ) চাঁদ খাঁর মসজিদ্‌।

—অর্থাৎ কোন কাজে হাত দিয়ে এমন পর্যায়ে আসা, যা আর কোন মতেই শেষ করা সম্ভব হয় না।

৫। বিরাটত্ব বা মাত্রাধিক্য বোঝাতে ব্যবহৃত প্রবাদ ;—

(ক) গাজীর পট।

(খ) গাজীর গীত।

—অর্থাৎ এমন গান আরম্ভ করল, তা যেন আর শেষ হতে চায় না।

(গ) হেই বন্‌বন্‌ ঘোরে লাঠি তিতুমীদের হাতে
ফট্‌ ফটাফট্‌ গুলী চলে বাঁশের কেল্লা ফতে।

(—সিরাজ সাঁই : দেবেন নাথ।)

(ঘ) শালা, যেন তিতুমীরের লাঠি।

ঙ) এ্যানাগুলী ব্যানায় যা
যেদিক পারিস, সে দিক যা।
নিলাম নাম একদিল পীর
চল্‌ল গুলী হুমাইপুর॥

—অর্থাৎ 'ডাং-গুলী খেলায়', একদিল পীর কর্তৃক 'ডাং'-এর সাহায্যে 'গুলী'-কে এক গ্রাম থেকে দূরের আর এক গ্রামে নিক্ষেপ করণ।

৬। পীরের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ভাব-প্রকাশক প্রবাদ ;—

(ক) ফিকিরে ধরেছি বগ
পীরকে দেব লাউ এর ডগ।

(খ) বন-মুরগী দিয়ে পীরের ধার শোধ।

(গ) বাজারে আগুন লাগলে পীরের ঘরও মানে না।

(ঘ) তোমার পীর, শিরনি খেয়েছে।

(ঙ) সরষে খেতে পড়্‌
গুলী খেয়ে মর।
মুকি আর আল্লা
বল্‌তি দেলে না॥

(—শহীদ তিতুমীর সম্পর্কে প্রবাদ।

[মুকি = মুখে, বল্‌তি = বল্‌তে, দেলে = দিলে।]

(চ) নিষেধ করি তোরে হরি
যাস্‌নে তুই দরগা বাড়ি।

—অর্থাৎ নিষিদ্ধ স্থানে যাবে না, নিষিদ্ধ কাজ করবে না।

ছ) আজ বেণ্ড়ের হাট
দাড়ি কাস্তে দিয়ে কাট। [বেণ্ড়ে=বাদুড়িয়া]
—শহীদ তিতুমীর সম্পর্কে প্রবাদ।

জ) চেয়ে খেকো পীর।

৭। পীরকে নিয়ে অনৈস্লামিক আচরণের প্রতিবাদ-জ্ঞাপক প্রবাদ :—

ক) পীরের শিরনি হারাম।

অর্থাৎ পীরকে পূজারূপ শিরনি প্রদান করা এবং সে শিরনি গ্রহণ করা মুসলিমের নিকট বে-শরা অর্থাৎ অনৈস্লামিক কাজ বলে গণ্য।

খ) পীর বরাবর নেড়ে
সোনার খুরে এঁড়ে
ঘরের পাশে গেঁড়ে
যে বিশ্বাস করে
সে ভেড়ের ভেড়ে।

—অর্থাৎ পীরের মূল্য তাঁদের কাছে যাঁরা নেড়ে—অর্থাৎ মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধ থেকে মুসলমান হয়েছেন। যাঁরা পীর পূজায় বিশ্বাস করেন তাঁরা মূর্খ,—যেমন এঁড়ে গরুর সোনার খুর হয় বলে বিশ্বাস করা।

অন্য ব্যাখ্যা ;—নীচ শ্রেণীর মুসলমান যদি পীরের নাম নিয়েও শপথ করে, তথাপি তাকে বিশ্বাস নেই ; আর এঁড়ে গরুর খুর যদি সোনা দিয়েও বাঁধানো হয় তথাপি তাকে বিশ্বাস নেই। এদের উভয়ের কাছে যেতে নেই। (সুবল মিত্রের অভিধান ১৯৭১ খৃঃ .।

বলা বাহুল্য, নানা জনে এক একটি প্রবাদের নানা রকম ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং তা অস্বাভাবিকও নয়।

পীরগণের অলৌকিক শক্তি দেখে বা শুনে সাধারণ লোক বিস্ময় বোধ করেছেন এবং সেইগুলিই পরবর্তীকালে সাধারণের মাঝে গল্পের আকারে প্রচারিত হয়েছে। সেই সব গল্পের অধিকাংশ মানব সম্পর্কীয়। অবশ্য পশু-পক্ষী সম্পর্কিত কিছু গল্পও আছে। সে গল্পগুলি মানব সম্পর্কীয় গল্পের ন্যায়

আনন্দদায়ক। লক্ষ্য করলে আরো অনুভব করা যায় যে ;—এই সব অলৌকিক কার্য্যাবলী-সমন্বিত গল্পগুলি মূলতঃ ইসলামের মহত্ত্ব প্রচারে সহায়ক হয়েছে। মতান্তরে এই গল্প-সমষ্টি বা লোককথা কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষকে বাস্তব জগত থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। নিরক্ষর সাধারণ মানুষের কাছে, সচরাচর যা ঘটতে দেখা যায় না, এমন ঘটনা বিস্ময়ের উদ্রেক করবে এটাই সম্ভব। বিস্ময়কর ঘটনা গল্প-প্রবণ মানুষের কাছ থেকে রস পেয়ে আরো বিস্ময়কর হয়ে পঠে। তখন তার মধ্যকার যতটুকু বাস্তবতা ছিল তা কর্পূরের মতন অদৃশ্য হয়ে যায় এবং এক এক জনের মনে এক এক রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অবশ্য একথাও সত্য যে কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী লোক পীরের মহানুভব কর্ম-ক্ষমতার দৃষ্টান্ত নিজেদের সুবিধা মতন ক'রে প্রকাশ করে। পীরের প্রতি ভক্তি আকর্ষণ করার এ একটা মস্ত কৌশল। পীর যথার্থ যা ছিলেন তা যদি রঙের আড়ালে চাপা পড়ে তবে তা সেই পীরের নিকট মৃত্যুর সমতুল। মানুষ তাঁর বাস্তব কর্মধারাকে যতখানি জীবনের সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হবে তত তার স্থায়ী মূল্য বাড়বে ; আর যত তার অবাস্তব বা সাজানো কথা নিয়ে ফানুস উড়ানোর উৎসাহ নেবে, ততই তা দিনে দিনে দ্রুত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

মুখ থেকে মুখান্তরে প্রবাদগুলি ফিরছে একেবারে অবিকৃত অবস্থায় বলা চলে। বাংলাভাষী জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সেই সব প্রবাদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার ক'রে থাকেন—প্রবাদগুলি সেদিক দিয়ে লোককথাগুলি অপেক্ষা ভালো।

———

বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা

প্রথম ভাগ

[ঐতিহাসিক পীর]

প্রথম পরিচ্ছেদ

আদম পীর

১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ ধ্বংসের পর থেকে ভারতে সুফী প্রভাবের স্রোত অবাধগতিতে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। অবশ্য বাগদাদ ধ্বংসের পূর্বেও এ দেশে তার প্রভাব একেবারেই ছিল না তা নয়,—তবে তার গতি ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। যদিও খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীকে ভারতে সুফী-প্রভাবের যুগ বলা হয় তবু বাগদাদ ধ্বংসের পূর্ব যুগে মাত্র কয়েকজন সুফী-সাধক এদেশে প্রবেশ করেছিলেন। আদম পীর তাঁদের মধ্যকার একজন।

আদম পীর ব্যতীত আরো যাঁরা এদেশে এসেছিলেন বলে জানা যায় তাঁদের মধ্যে শাহ্ সুলতান রুমী, খাজা মইনুদ্দীন চিশ্‌তী, মখদুম শেখ জালালুদ্দীন তবরেজী প্রমুখ খুবই প্রসিদ্ধ। এঁদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া আজ সুকঠিন। আদম পীর সম্বন্ধেও তাই সবিশেষ তথ্য তেমন পাওয়া যায় না।

হজরত পীর আদমকে কেহ বলেন আদম পীর, কেহ বলেন বাবা আদম শহীদ। কবে তাঁর জন্ম, কোন নির্দিষ্ট তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন, তাঁর পিতৃকুল বা মাতৃকুলে কারা ছিলেন,—এ সব বিবরণ আজো অজ্ঞাত।

আদম পীর এ দেশে বিশেষতঃ ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। ঢাকা অঞ্চলে আরও বহু সুফী-সাধক ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন পণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ জনের নাম জানা গেছে। উক্ত চল্লিশ জন ধর্ম-প্রচারকের মধ্যে সর্ব প্রাচীন ছিলেন মুন্সীগঞ্জের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানের পীর হজরত আদম শহীদ। এতদ্ অঞ্চলে নিজ জান-মাল কোরবান করে যাঁরা ইসলামের আদর্শ প্রচার করে অবিস্মরণীয় হয়েছেন আদম পীর সম্ভবতঃ তাঁদের শিরোমনি।[৬১]

বলা বাহুল্য, আদম পীর যখন এ দেশে ইসলাম ধর্ম-প্রচার করছিলেন, তখন ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্গের লোক ছিলেন শাসন-দণ্ড নিয়ে। সুতরাং তখন

ইসলামি মিশনের পক্ষে ধর্ম-প্রচার করতে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদীগণের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে হয়েছিল।

তুর্ক বিজয়ের পর এই শাসকগণ গেল শাসিতের পর্য্যায়ে। এতদিন স্থানীয় লৌকিক দেব-দেবী ও তাদের কাহিনী শাসক ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্গের দৃষ্টিতে অবজ্ঞেয় ছিল। [৪৩] বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তাই মনে হয় আদম পীরই সর্বপ্রথম শহীদ এবং এই জন্যেই বুঝি তিনি আদম শহীদ রূপেও প্রসিদ্ধ।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-১১৭৯ খৃঃ) পীর আদম শহীদ সদলবলে ঢাকা জেলার রামপাল নামক স্থানের নিকটবর্তী আবদুল্লাপুর গ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আগমন করেন। কথিত আছে যে, গো-কোরবানীর অপরাধে নির্যাতিত জনৈক মুসলিম হজ্জ যাত্রীর মুখে তার নির্যাতনের কাহিনী শুনে তিনি পাঁচ হাজার অনুচরসহ মক্কা হতে এদেশ অভিমুখে অভিযান করেন এবং বঙ্গে এসে উপস্থিত হন। রাজা বল্লাল সেনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বাবা আদম, শহীদ হন। পরে রাজাও ভাগ্য–বিড়ম্বনায় সপরিবারে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

শহীদ আদম পীরের দরগাহ্-সংলগ্ন প্রাচীন মসজিদটি বাবা আদমের মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদটির গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে জানা যায় যে উক্ত মসজিদ ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুর কর্তৃক নির্মিত হয়। গোপাল ভট্ট কর্তৃক বল্লাল চরিতের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ১১৭৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে শহীদ হন। আনন্দ ভট্ট তাঁর রচনায় আদমের সহিত বল্লালের যুদ্ধ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। (সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ)।[৬১]

বিক্রমপুরের ইতিহাসে বলা হয়েছে যে মক্কার শেখ পীর বাবা আদম বঙ্গে এসে চতুর্দশ শতাব্দীতে ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে বল্লাল সেনের সঙ্গে যুদ্ধে শহীদ হন।[৪৮]

বগুড়া জেলার ওলী দরবেশদের মধ্যে বাবা আদম বিশেষ প্রসিদ্ধ। বল্লাল সেনের রাজত্বকালে তিনি কয়েকজন শিষ্যসহ উত্তরবঙ্গে এসে শান্তাহার থেকে কিছুদূরে একটি আস্তানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ অঞ্চলের পানির অভাব দূর করবার জন্য একটি প্রকাণ্ড পুকুর খননের ব্যবস্থা করেন। তাঁর নাম অনুসারে সেই পুকুরটির নাম হয় 'আদম দীঘি।' কথিত আছে যে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি স্থানীয় হিন্দু রাজ-কর্মচারী

ও সৈন্যদলের দ্বারা উৎপীড়িত হন। তার ফলে অবশেষে তাদের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণে বাধ্য হন। ঢাকা জেলার বিবরণে বর্ণিত খ্যাতনামা পীর বাবা আদম শহীদ ও আদম দীঘির পীর বাবা আদম অভিন্ন কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে সময়ের হিসাবে উভয়ে একই ব্যক্তি হওয়া সম্ভব। (সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ)।৬১

চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত আদম পীরের নামে একটি দরগাহ্ আছে। এতদ্ অঞ্চলে তিনি আদম ফকির বলে সমধিক প্রসিদ্ধ। বহেরা গ্রামের এই আদম ফকির সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। রামপাল বা বগুড়ার পীর আদমের নামে কল্পিত কোন নজরগাহ্ও সম্ভবতঃ এটি নয়। বহেরা গ্রামের আদম ফকিরের দরগাহের বর্তমান (১৯৬৯ খৃঃ) সেবায়েত মহম্মদ ইয়াহিয়া শাহ্জী বলেন,—

শেখ চাঁদ নাম যার
আদম ফরজন্দ তার
বহেরাতে আদমের ঘর
বহেরা গ্রাম আনোয়ারপুর
বহেরা নামেতে বালাই দূর।

অর্থাৎ শেখ চাঁদের পুত্র 'আদম' আনোয়ারপুর পরগণায় বহেরা নামক গ্রামে বসতি করেন। তাঁর নাম স্মরণ করলে 'আপদ-বিপদ' হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাটের অন্তর্গত বাদুড়িয়া থানাধীন আঁধার-মানিক নামক গ্রামে পীর হজরত শাহ্ চাঁদের দরগাহ্ আছে। বহেরা গ্রামের আদম পীরের পিতা শেখ চাঁদ এবং আঁধার মানিকের পীর শাহ্ চাঁদ, শুধু 'চাঁদ' এই নামগত মিল ছাড়া আর কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না যাতে তাঁরা একই ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হতে পারেন।

পীর হজরত আদম রাজীর দরগাহের বর্তমান (১৯৭০ খৃঃ) সেবায়েত মহম্মদ ইয়াহিয়া শাহ্জী (৬০) বলেন যে তিনি শুনে এসেছেন, আদম পীর ছিলেন তাঁদের বংশের বহু পূর্বের এক মহাপুরুষ। তাঁরা বংশ পরম্পরায় এই দরগাহে প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি দিয়ে "জিয়ারৎ' অর্থাৎ পীরের আত্মার শান্তির জন্য আল্লাহ্ তালার নিকট 'মোনাজাত' করে আসছেন।

আদম পীরের ভক্তবৃন্দ তাঁর সমাধির উপর একটি সুদৃশ্য স্মৃতি-চিহ্ন নির্মাণ করেছেন। সেটি প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির মধ্যে অবস্থিত। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় কৃষ্ণচন্দ্র রায় বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ধরণী মোহন রায় বেশ কিছু জমি পীরোত্তর দিয়েছিলেন। (Bengal Settlement Record)[৪৪]। পীরের ভক্তগণ উক্ত দরগাহের পাশে একটি মসজিদও নির্মাণ করেছেন। হিন্দু-মুসলিম ভক্ত জনসাধারণ সেই দরগাহে হাজত-মানত-শিরনি দিয়ে থাকেন। পূর্বে প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে পীরের উরস্ উপলক্ষ্যে চার দিনের মেলা হত। তাতে গড়ে প্রতিদিন প্রায় চার-পাঁচ শত লোকের সমাগম হত।

এতদ্ অঞ্চলে আদম পীরের অলৌকিক কীর্তিকলাপ-সম্পর্কিত নিম্নলিখিত কয়েকটি লোক-কথা প্রচলিত আছে ;—

১। ফণার ছায়া—

গোচারণ ভূমি। নিকটেই এক বিশাল অশ্বত্থ গাছ। গাছের নীচে মানিক পীরের থান। আদম পীর ছিলেন গো-পালক। তিনি গোচারণ-ভূমির মধ্যস্থ এইখানে মাঝে মাঝে বসতেন,—বিশ্রাম নিতেন।

একবার গ্রীষ্মকালে তিনি এই অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে নিতে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হন। দুপুর গড়িয়ে এল বিকেল। গাছের ছায়া সরে গেল পূর্বে। আদম ফকিরের মুখে এসে পড়ল রোদ।

সেই গাছের ডালে ছিল বিশালকায় এক বিষধর সাপ। সে দেখল পীর আদমের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। সাপটি তৎক্ষণাৎ তার বিশাল ফণা বিস্তার করে সূর্যের রোদকে আড়াল করল। পীরের আর ঘুমের ব্যাঘাত হল না। রোদ সম্পূর্ণরূপে পীরের মুখের উপর থেকে সরে গেলে সাপটিও ধীরে ধীরে স্থানান্তরে চলে গেল।

২। ভিটন ডাঙ্গা—

বহেরা গ্রামের একপ্রান্তে কিছু অধিবাসীর একটি পাড়া ছিল। সেখানকার অধিবাসীরা একবার আদম পীরের প্রতি কিছু অবমাননাকর ব্যবহার করেছিল। এ কারণে পীর সাহেব নাকি তাদেরকে সেস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে বলেন। সেই পাড়ার অধিবাসীগণ পীরের সে আদেশ অমান্য

করে। ফলে কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে ব্যাপক মহামারী দেখা দেয়। বহু লোকের তাতে মৃত্যু হয়। অবশিষ্ট লোক ভয়ে সেখান থেকে বাস উঠিয়ে অন্যত্র চলে যায়। বসতি উঠে যাবার জন্য ঐ স্থানটিকে লোকে উটনভাঙ্গা ব'লে অভিহিত করে।

৩। আগুনের নিষ্ক্রিয়তা –

বহেরা গ্রাম ও তৎ-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সূক্ষ্ম-সেলাই কাজের ব্যাপক প্রচলন আছে। একদিন বহেরা গ্রামের কতিপয় সূচী-শিল্পী একত্রে বসে শিল্প কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে দৈবক্রমে একজনের চাদরে আগুন লেগে যায়। সে আগুন নাকি 'কল্কের' আগুন। তাদের পাশে ছিল সেলাই কর্‌বার জন্য কাপড়ের রাশি। আগুন তৎক্ষণাৎ সেই সব কাপড়ে ছড়িয়ে পড়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান সকলে। কেউ কেউ ত্রাসে পীর আদমের নাম স্মরণ কর্‌তে থাকেন এবং সকলে আগুন নিভিয়ে ফেলেন। পরে তাঁরা বিস্মিত হয়ে দেখেন যে পীরের নাম মহিমায় উক্ত ব্যক্তির চাদরের একস্থানে সামান্য পুড়ে গেছে,—কিন্তু সেলাই করার জন্য স্তুপীকৃত মূল্যবান কাপড়গুলির কোন ক্ষতি হয়নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবালসিদ্ধি পীর

পীর হজরত আবালসিদ্ধি রাজী ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজীর নেতৃত্বাধীন কাফেলা বা ধর্ম প্রচারক দলের সঙ্গে বঙ্গে আগমন করেন। (পীর গোরাচাঁদ)।[২২]

আবালসিদ্ধি পীরের জন্ম, মৃত্যু, বংশ পরিচয় বা অন্যকোন বিবরণ জানা যায় না। মৃত্যুর তারিখ পৌষ-সংক্রান্তি বলে নির্ণীত, কারণ ঐ দিনে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে পীর-ভক্ত সেবায়েতগণ কর্তৃক 'উরস' উৎসব পালিত হয়।

চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত হাবড়া থানাধীন মণ্ডলপাড়া নামক গ্রামে আবালসিদ্ধি পীরের 'মাজার' শরীফ আছে।[৪৪] বাংলাদেশের খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমাধীন বৈকারী নামক গ্রামেও তাঁর নামে একটি 'নজরগাহ্' আছে।

মণ্ডল পাড়ায় অবস্থিত দরগাহের বর্তমান (১৯৭০ খ্রীঃ) সেবায়েত আব্দুল ওয়াহাব প্রমুখ। তাঁরা প্রতি সন্ধ্যায় পীরের দরগাহে ধূপ ও বাতি প্রদান করে 'জিয়ারত' করেন। ইতিপূর্বে মহম্মদ মেহের আলি মোল্লা এই দরগাহে নিয়মিত ভাবে 'জিয়ারত' করতেন। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময় 'উরস' উপলক্ষ্যে সেখানে একদিনের 'মেলা' হয়। সেদিনের মেলায় পাঁচ-ছয় শতাধিক লোকের সমাবেশ হয় এবং হিন্দু ও মুসলিম বহু ভক্ত পীর আবালসিদ্ধির দরগাহে হাজাত-মানত-শিরনি দিয়ে থাকেন।

আবালসিদ্ধির দরগাহটি ইটের তৈরী। স্রোতস্বতী বা সুঁটী নদীর (যাকে অনেকে সুবর্ণরেখা নদীও বলেন) তীরে প্রাচীন একটি বটগাছের নীচে মনোরম পল্লী পরিবেশে উক্ত দরগাহটি অবস্থিত। দরগাহ্-গৃহস্থ 'মাজার' স্থানটি একটি ছোট টিপির মতন উঁচু। রাসবিহারী ধর ও অন্যান্য আবালসিদ্ধি পীরের নামে জমি পীরোত্তর দান করেন।[৪৪]

দরগাহের গায়ে জানালার শিক কাঠিতে ঝুলন্ত ইট সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনুসন্ধান করে জানা যায় যে নিঃসন্তানা বধূগণ সন্তান কামনা করে ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ ঐ ইট দড়িতে বেঁধে জানালার গায়ে ঝুলিয়ে রেখেছেন। অনেকে নাকি রোগ নিরাময় প্রার্থনা করে ঐরূপভাবে ইট ঝুলিয়ে গেছেন। তাঁরা ঈপ্সিত ফল পেলে সামর্থ্যানুযায়ী দরগাহে এসে প্রতিশ্রুত হাজত, মানত বা শিরনি প্রদান করার পর সেই ঝুলন্ত ইট খুলে দেন।

বাংলাদেশান্তর্গত সাতক্ষীরার বৈকারী গ্রামের মহম্মদ আছাদুর রহমান সাহেব বলেন,—বাবু অনুকূলচন্দ্র সরদার সেখানকার দরগাহটি (বাবু মহেন্দ্র সরদারের বাড়ীর সীমানার মধ্যে) নির্মাণ করে দেন। সেখানে পূর্বে ধূপ-বাতি দিয়ে জিয়ারত করা হত।

কবি মহম্মদ এবাদোল্লা লিখেছেন,—

ছোন্দলের সহ গোরা চলিতে চলিতে,
একদল পীর সঙ্গে দেখা হল পথে।
ছালাম আলেক করি সকলে তখন,
বসিলেক একসাথে হয়ে হৃষ্ট মন।
গোরাই জিজ্ঞাসা করে সকলের তরে,
কোথায় চলেছ ভাই কহ দেখি মোরে।······
দারাক খাঁ বলে আমি যাইব ত্রিবেণি,
আবাল কহিল আমি থাকিব সির্সিণি।

উপরোক্ত 'সির্সিণি' নামক স্থানটি কোথায় অবস্থিত তা নির্ণয় করা যায় নি। বারাসত মহকুমার আমডাঙ্গা থানাধীন 'শিরাশিনি' নামক একটি গ্রাম আছে। এ গ্রামটি মণ্ডলপাড়া নামক গ্রাম থেকে প্রায় ৩/৪ কিলো-মিটার দূরে অবস্থিত। অনেকের অনুমান যে মণ্ডলপাড়া এককালে শিরাশিনি অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল।

বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী[৪০] গ্রন্থে আছে যে 'শির্ষিণী' নামক গ্রামে হজরত আবদুল্লাহ্ রাজী আস্তানা স্থাপন করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন,—"হজরত আবদুল্লাহ রাজী।

ইহার পবিত্র রওজা 'শির্ষিণী' নামক স্থানে। ইহার সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোন বিশেষ পুঁথি কেতাব আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" (বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী)। ৪০

সিদ্দিকী সাহেবের গ্রন্থে পীর গোরাচাঁদের সাথী যে একুশজন পীর ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে এদেশে এসেছিলেন বলে উল্লেখ আছে,—তাঁদের মধ্যে কারো নাম আবালসিদ্ধি নয়।

আবালসিদ্ধি পীর সম্পর্কিত লোককথা :—

১। অনাচারের ফল—

একবার মণ্ডলপাড়ায় আবালসিদ্ধি পীরের দরগাহে 'উরুস'-এর সময় 'মেলা' উপলক্ষ্যে প্রচুর জন-সমাবেশ হয়েছে। দূর থেকে ভক্তগণ এসেছেন মেলায়। তাঁরা অবশ্য মেলার আগের দিনই এসে হাজির হয়েছেন। কিছু লোক এসেছেন যাঁরা পীরের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে চলাফেরা করছেন। এতে সেখানকার লোকদের ওপর পীরের কোপ-দৃষ্টি পড়ে।

পরদিন দেখা গেল সেখানকার বেশ কিছু লোক কলেরা মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদেরকে নিয়ে অন্য লোকজনেরা সমূহ বিপদ্ গণলেন। আগত যাত্রীগণ তো হায় হায় করতে লাগলেন।

অবিলম্বে কিছু ভক্ত গিয়ে হাজির হলেন পীরের দরগাহে এবং পীরের নিকট আত্মসমর্পণ করে 'ধর্ণা' দিলেন। সকলে সংযতভাবে পবিত্র আচরণ করতে লাগলেন। তাঁরা মানত ও শিরনি দিলেন সেখানে। তারপর থেকে মহামারীর প্রকোপ প্রশমিত হল।

২। অবহেলার প্রতিফল—

মণ্ডল পাড়ারই এক যুবক। তার নাম মহম্মদ নুরুদ্দীন। সে মেলায় এসেছিল বেড়াতে। পীরের প্রতি তার ভক্তির লেশমাত্র নেই। সে তামাশা দেখতেই এসেছিল মাত্র।

দরগাহের সামনে আছে একটি বট গাছ। গাছটি প্রাচীন বটে। বেশ কয়েকটি 'বোয়া' বা 'ঝুরি' ঝুলছে তার ডাল থেকে। নুরুদ্দীন একটা ছুরি

কিনেছিল মেলায়। সে তার ছুরির ধার পরীক্ষা করার জন্য ঐ বটের একটা ছোট ঝুরি কাটতে উদ্যত হল। কে একজন তাকে নিষেধ করল ;—কেটো না কেটো না ঝুরি; ও যে আবাল সিদ্ধি পীরের বটগাছ।

নুরুদ্দীন সে নিষেধের কোন গুরুত্ব দিল না। উচ্ছৃঙ্খলভাবে মেলায় ঘুরতে ঘুরতে সে সেই বটগাছের একটা ঝুরি কেটে দিল। অনেকে শঙ্কিত হলেন এ ঘটনা দেখে।

মেলা শেষ হয়ে গেল। আরো কিছুদিন গেল কেটে। অকস্মাৎ একদিন সেই যুবক এক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হল। সবাই বলল, পীরকে অবমাননা করার এই হল উপযুক্ত ফল। নুরুদ্দীন ভীত হল না। সে গেল নানা প্রকারের চিকিৎসকের কাছে। শেষ পর্যন্ত রোগ আর নিরাময় হয় না। সবাই জানল তার কুকর্মের প্রতিফলের কথা। এবার সে গেল দমে। একজন এসে বললে, বাঁচতে যদি চাও, শীগগীর যাও আবালসিদ্ধি পীরের দরগাহে। পীরের কাছে আত্মসমর্পণ কর, শিরনি দাও।

যুবক নুরুদ্দীন তা-ই করল। তারপর থেকে সে আরোগ্য-লাভ করতে আরম্ভ করল এবং সুস্থ হয়ে উঠল।

পীরের দরগাহের বটগাছের সে ঝুরির কাটা অপর ঝুলন্ত অংশটি আজো (১৯৫০ খৃঃ) দেখতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিল শাহ্

পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজীর পুরা নাম পীর হজরত আহ্মদ উল্লাহ্ রাজী। জনসাধারণ তাঁকে 'একদিল শাহ্' খেতাবে ভূষিত করেছেন।

সাহিব-দিল্ শব্দটি অপভ্রংশে সাহ্-ইব্দিল>সাহ্-এবদিল এবং তা থেকে সাহ্-একদিল শব্দে রূপান্তরিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একদিলের শব্দগত অর্থ এক বা অদ্বিতীয় হৃদয়। অর্থাৎ তিনি শ্রেষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারী। পরবর্তীকালে সাহ্ শব্দটি হয়ত উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে।

"Sahib-dil (clear thoughted stoic) which is often used to mean a Sufi : Lit. master of one's heart or passions" (AKBARNAMA) ১

পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজী এদেশে পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজীর সহিত ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসেন। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার আনোয়ারপুর নামক পরগণায় ধর্ম প্রচারের ভার প্রাপ্ত হন। তাঁর মোর্শেদ তাঁকে 'একদিল শাহ্' এই খেতাব দিয়ে ছিলেন কিনা জানা যায় না।

একদিল শাহের জন্ম কোথায় তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তাঁর জন্ম তারিখ জানা যায় না।

গৌড়ে হাব্শী সুলতানদের রাজত্বের শেষ সময়ে কিংবা সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বের প্রথম দিকে এই দরবেশ ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে বারাসতে গমন করেন বলে অনুমান করা হয়। (পূর্ব্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো)[২০]।

কবি আশক মহম্মদ সাহেব তাঁর 'পীর একদিল শাহ্' নামক পাঁচালী কাব্যে লিখেছেন :

মেরা জন্মস্থান জান সাহানা নগর,
বাপের যে নাম সাহানির সদাগর।

বাপ মেরা সাহানির মাতা আশক নুরি,
আড়াই রোজের হইয়া যাই নিরাঞ্জন পুরি।

একদিল শাহের মৃত্যুর তারিখ পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব-রাত্রি বলে কথিত। তাঁর মৃত্যু কোন্ সালে হয়েছিল তাও অজ্ঞাত।

চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কাজীপাড়ার অধিবাসী ছুটি মণ্ডল ওরফে ছুটি খাঁ সাহেবের বাড়ীতেই তিনি অবস্থান করতেন। তাঁর প্রভাব প্রায় দুই শতাধিক বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে বিস্তৃত।

পীর একদিল শাহ্‌ কাব্যে তাঁর রূপ বর্ণনা এইভাবে দেওয়া আছে ;—

উপনীত হইল পীর রাজ-দরবারে॥
আকাশের চন্দ্র যেন নামিল ভূমেতে *
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনে একদিল বরণ॥
রবির কিরণ নহে তাহার মতন *
কাল মেঘের আড় যেন বিজলীর ছটা॥
কাঁচা সোনা জলে যেন সানিরের বেটা *
দু আঁখে কাজল অতি দেখিতে উত্তম॥
চলন খঞ্জন পাখি পাইবে শরম *
হাতে পদ্ম পায় পদ্ম কপালে রতন জলে॥
পীরকে দেখিয়া প্রজা ধন্য ধন্য করে *

পীর একদিল শাহ্‌ একজন সাধারণ রাখালের বেশে আনোয়ারপুর পরগণাঞ্চলে তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কাজী-পাড়ার ছুটি খাঁ-র নিঃসন্তানা পত্নী 'সম্পত্তি'র নিকট তিনি পুত্রের ন্যায় সযত্নে থাকতেন। তিনি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। বার্ধক্য ও জরাজনিত কারণে ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণ-প্রদীপ নিভে গিয়েছিল।

আরো জানা যায় যে, আনোয়ারপুর পরগণায় কোনও কারণে হিন্দু-ধর্মাবলম্বীর সহিত তাঁর কোন প্রকার সংঘর্ষ হয়নি। তবে শ্রীকৃষ্ণপুরের চাঁদখাঁ নামক এক প্রতিপত্তিশালী মুসলিমের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়েছিল। তাতে চাঁদ খাঁ কর্তৃক আরব্ধ মসজিদ নির্মাণ-কার্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পীর একদিল শাহের প্রতি চাঁদখাঁর এরূপ আচরণকে অনেকে অনৈস্লামিক বলে অভিহিত

করেন। তাঁর অসাধারণ সরলতার সুযোগ নিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী লোক চাঁদ-খাঁর উক্ত মসজিদ নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করেছিল বলে তাঁদের ধারণা।

চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত আনোয়ারপুর পরগণার কাজীপাড়া নামক গ্রামে পীর হজরত একদিল শাহ রাজীর পবিত্র মাজার শরীফ আছে। এখানে প্রতি বছর পৌষসংক্রান্তির পূর্ব রাত্রে উরস উৎসবের সূত্রপাত হয় এবং সাধারণতঃ আট দিন ধরে তা চলে। উরসের সূত্রপাতেই দরগাহের সম্মুখের এক সু-উচ্চ মিনারের শীর্ষভাগে বসে বাদ্যকারগণ নহবৎ বাজাতে থাকেন। প্রভাতকালীন নহবতের সুমধুর ধ্বনি পার্শ্ববর্তী জনসাধারণকে জাগরিত ও সচকিত করে তোলে। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও উরস উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্মব্যস্ত থাকেন। দূর-দূরান্ত হতে ফকির-দরবেশ, মানিক পীরের গায়কদল এসে জমায়েত হতে থাকেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকের বাড়ীতে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন আগমন করেন,—পাড়ায় পাড়ায় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মনে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়।

পীর হজরত একদিল শাহ রাজীর রওজা শরীফ ইটের তৈরী একটি সুদৃশ্য সৌধ। সৌধের গায়ে কারুকার্যখচিত। দরগাহের চারপাশে প্রাচীর। সামনের চত্বরে শালিখ পাখীর কবর ও কটি বকুল গাছ স্থানটিকে রমণীয় করে রেখেছে। দরগাহের পশ্চাৎ-দিক দিয়ে সুবর্ণরেখা অপভ্রংশ সুটী নদীর রুদ্ধ প্রবাহ-রেখা বিদ্যমান।

উরস উৎসব আরম্ভের সময় দরগাহ-সৌধকে সাধারণভাবে সুসজ্জিত করা হয়। দরগাহের বহু পুরাতন সাধারণ লণ্ঠন, ঝাড়লণ্ঠন প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ব্যবহার-উপযোগী করার পর বারান্দায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় তৎপুত্র প্যারীমোহন রায়ের পোষ্যপুত্র ধরণী মোহন রায় স্বয়ং প্রথমেই দরগাহে খুব প্রাতঃকালে এসে শিরনি (দুই হাড়ি বাতাসা ও বিরগুণ্ডী) প্রদান করতেন। তার পরলোক গমনের পর রামমোহন রায়ের সেরেস্তার তরফ থেকে আজো উক্তরূপ শিরনি প্রদান অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। বর্তমানে (১৯৭০ খৃঃ) ৺ক্ষেত্রমোহন তেওয়ারীর পুত্র শ্রীভূদেবচন্দ্র তেওয়ারী (আনুমানিক বয়স ৭০) স্বয়ং শিরনি দেন। পূর্বে শিরনির সংগে সমপরিমাণ 'চেরাগী' অর্থাৎ নজরানা দেওয়া

হত এবং শিরনি-প্রদানকারী তাঁর প্রদত্ত দ্রব্যের অর্ধেক প্রসাদরূপে পেতেন। শ্রীভূদেব তেওয়ারীর বক্তব্যে একথা জানা যায়।

লক্ষণীয় যে দরগাহে প্রথমেই হিন্দুগণ কর্তৃক শিরনি প্রদত্ত হয়। এ বিষয়ে একটি প্রবাদ আছে।

দরগাহের বর্তমান (১৯৫৯ খৃঃ) খাদিমদার আল্‌হাজ ফকির আহ্‌মদ, কাজী আজিজার রহমান প্রমুখ বলেন যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও তাঁর পরবর্তী কোন ব্যক্তি, একদিল শাহের প্রতি ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ নয় শত উনত্রিশ বিঘা পাঁচ কাঠা জমি পীরোত্তর দিয়েছিলেন। রায় সেরেস্তার কর্মী শ্রীভূদেবচন্দ্র তেওয়ারী বলেন যে পীরোত্তর প্রদত্ত হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের সেরেস্তা থেকে। উক্ত খাদিমদারগণ আরো বলেন যে, উল্লিখিত জমির মধ্যে উত্তরহাট মৌজায় একশত দুই বিঘা পনরো কাঠা জমির একস্থানে এই দরগাহ্-গৃহটি অবস্থিত।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজীর উক্ত দরগাহের নির্ধারিত সেবায়েত বা খাদিমদার আগমন করতঃ দরগাহ্-গৃহ ও তৎ-সংলগ্ন প্রাঙ্গন স্বহস্তে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন। প্রাতঃকালে তিনি 'অজু' করার পর পীরের মাজার অর্থাৎ সমাধিতে ধূপ-ধুনা প্রদান করেন এবং সন্ধ্যাকালে ধূপ-ধুনার সাথে বাতিও জ্বেলে দেন। বাতি বল্‌তে মোমবাতি নয়,—তা সরষের তেলের প্রদীপ। এই সব দেবার পর তিনি কোরান শরীফ থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করেন এবং পীরের আত্মার শান্তির জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা জানান।

তিনি দরগাহ্-গৃহ থেকে বাইরে এসে অতিথিশালায় কোন অতিথি আছেন কিনা অনুসন্ধান করেন। যদি কাউকে দেখতে না পান তবে তখনকার মতন তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন হয়। যদি দরগাহ-পাদমূলে অতিথির সন্ধান পাওয়া যায় তবে তিনি সেই অতিথির আহার ও প্রয়োজনে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। পূবে এখানে গড়ে প্রায় শতাধিক অতিথির সৎকার করতে হত, বর্তমানে (১৯৫০ খৃঃ) প্রতিদিন গড়ে দশ-বারো জন অতিথির সৎকার করা হয়ে থাকে। পূর্বে পীরোত্তর স্থানের আয় ও ভক্তদের দেওয়া অর্থাদি থেকে সে ব্যয়-নির্বাহ সহজসাধ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে আর তা সহজসাধ্য নেই।

প্রতি শুক্রবারে বহু হিন্দু-মুসলিম নর নারী পীরের দরগাহে হাজত, মানত বা শিরনি দিতে আসেন। তাতে এমন জনসমাবেশ হয় যাকে ছোট একটি মেলাও বলা যায়।

বাৎসরিক উরসের সময় যে মেলা বসে তা এতদ্ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ মেলা। প্রায় দশ-বারোদিন ধরে এই মেলা চলে। প্রাতঃকাল থেকে হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ ফুল ও তৎসহ নজরানা, হাজত, মানত, শিরনি প্রভৃতি নিয়ে দরগাহে আসেন এবং ভারপ্রাপ্ত খাদিমদারের হাতে তা অর্পণ করেন। ঐ সব প্রদানের পর খাদিমদারের কাছ থেকে তাঁরা পীরের শান্তিবারি ও প্রসাদ পান। ফুলের মালা বা ফুলের গোছা পীরের রওজার ওপর সাজিয়ে দেওয়া হয়। অনেক ভক্ত পীরের লুট দিয়ে থাকেন। 'পীরের লুট' হিন্দুর ঠিক 'হরির লুটের' মতন।

দরগাহের প্রবেশ পথের ধারে ধারে শিরনির ডালা বিক্রেতাগণ বসে থাকেন। এই ডালায় সাধারণতঃ থাকে বাতাসাদি মিষ্ট দ্রব্য ও ফুল। আর থাকে অসংখ্য ফকির, বিভিন্ন পোষাকের, বিভিন্ন বয়সের। ভক্তগণ শিরনি, হাজত বা মানত দেবার পর ফেরার মুখে কিছু কিছু খয়রাত করে যান। খাদিমদার-গণের সংখ্যাও বেশী। পীরোত্তর সম্পত্তির অংশীদারগণের নামের এক বিরাট তালিকা আছে। সেই তালিকা-অনুযায়ী তাঁদেরকে পর পর ঠোঙায় করে প্রসাদ এবং আপন আপন পাত্রে শান্তিবারি দেওয়া হয়। তাঁরা সারিবদ্ধভাবে তা গ্রহণ করেন। দক্ষিণা-প্রাপ্ত অর্থেরও তাঁরা অংশ পেয়ে থাকেন।

দরগাহের সামনের চত্বরে গায়কের পাঁচ-ছয়টি দল ঢোলক, হারমনিয়ম ও জুড়ি সহযোগে পীরমাহাত্ম্য-সূচক গানের মাধ্যমে স্থানটির পরিবেশ জম-জমাট করে তোলেন। তাঁদের এক একটি মূল গায়েন থাকেন। মূল গায়েনের পোষাক ফকিরি পোষাক। তিনি চামর দুলিয়ে সকলকে 'দোয়া' জানিয়ে, বিশেষ করে শিশুগণকে হাতে নিয়ে বিভিন্ন নৃত্য ভঙ্গিমায় গানের মাধ্যমে, তাদের মঙ্গল কামনা করেন। ভক্তগণ তাতেও যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করেন এবং ঐ সব গায়কগণকে পয়সা দান করেন।

মেলায় সার্কাস থেকে ভাজার দোকান, শাক সব্জির দোকান, মনোহারী দোকান প্রভৃতি অসংখ্য বিক্রেতা পশার সাজিয়ে বসেন। এই মেলায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হয়ে থাকে। দূরের যাত্রীগণ স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে গরুর

গাড়িতে করে আসেন এবং মেলার আশ-পাশে সুবিধামতন স্থানে থেকে মেলায় ভ্রমণ করেন। তাঁরা সেখানে চড়ুই ভাতি করে খান।

পীর একদিল শাহের নামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এক মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা, সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতির নামকরণ হয়েছে।

কাজীপাড়ার পীর হজরত একদিল শাহ রাজীর দরগাহগৃহ ব্যতীত নিম্নলিখিত স্থানে তাঁর নামাঙ্কিত নজরগাহ রয়েছে। তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হল;—

১। বারাসত—

কলিকাতা-যশোহর পাকা সড়কের ধারে বারাসত শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে পীর একদিল শাহের নামে একটি নজরগাহ আছে। এটি একটি পাকা গৃহ। প্রচলিত ধারণা এই যে পীর একদিল শাহ্ কাজীপাড়ায় যাওয়ার পথে এখানে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় থেকে এই স্থানটি ভক্তগণের নিকট একটি পবিত্র স্থান হয়ে ওঠে এবং লোকে ধূপ-বাতি দিতে থাকেন।

এই নজরগাহের সেবায়েতের নাম ডাঃ বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। ইনি একজন খ্যাত নামা এলোপ্যাথ চিকিৎসক। তাঁরা নিজেরা বা তাঁদের নিযুক্ত লোক নিয়মিতভাবে প্রতি সন্ধ্যায় পীরের স্থানে ধূপ-বাতি দিয়ে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করেন। অবশ্য এখানে বাৎসরিক উরস্ বা বিশেষ অনুষ্ঠান বা মেলা হয় না। এখানে কোন কোন ভক্ত দুধ, বাতাসা, ফল ইত্যাদি অর্পণ করে থাকেন। ডঃ বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিজের কথায়,—

' জনসাধারণের অনেকে এখানে মানসিক করে যান। কেউ বা অসুখ বিসুখের জন্য সন্ধ্যায় দরগাহে জল রেখে যান এবং পরদিন সকালে নিয়ে গিয়ে রোগীকে দেন। শুনা যায়, তাতে নাকি তাঁদের উপকারও হয়।"

বসন্তবাবু নিজের উৎসাহে এবং ভক্তিতে পীরের নামে উক্ত পাকা নজরগাহ্ গৃহটী নির্মাণ করিয়েছিলেন। বহুকাল পূর্বে কে বা কারা ঐস্থানে ভক্তিঅর্ঘ্য অর্পণ করতেন তা জানা যায় না। তখন ঐস্থানে একটি ছোট মাটির ঢিপি মাত্র ছিল। এই নজরগাহটির আশ-পাশে কোন মুসলমান বসতি নেই। মানত, দুধ, ফল প্রভৃতি প্রধানতঃ হিন্দু ভক্তগণই এখানে দিয়ে থাকেন। নজরগাহটি প্রায় এককাঠা জমির উপর অবস্থিত।

২। ঘোলা-কাজীপাড়া--

বারাসত-বসিরহাট সড়কের ধারে কাজীপাড়া গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত হাটখোলাটি ঘোলার হাট-খোলা নামে খ্যাত। এই হাটখোলায় একস্থানে সুঁটী নদীর তীরে পীর একদিল শাহের একটি নজরগাহ্ আছে। নজরগাহ্‌টি ইটের তৈরী। স্থানীয় জনসাধারণ এখানে ধূপ-বাতি দেন। জমির পরিমাণ কয়েক শতক মাত্র। এক সাধারণ রাখাল বালকের বেশে একদিন দুপুরে পীর একদিল শাহকে নাকি এই স্থানে খেলা কর্‌তে দেখা গিয়েছিল। সেই সূত্রেই এখানে নজরগাহ্ তৈরী হয়। অবশ্য এখানে কোন মেলা হয় না।

৩। কাটারাইট—

বারাসত মহকুমার অন্তর্গত এই স্থানটি বারাসত-বসিরহাট সড়কের ধারে অবস্থিত। সাধারণে ঐ স্থানটিকে দরগাহ্ বাড়ী বলেও অভিহিত করেন। এখানে প্রায় দশ শতক জমির উপর একটি ইটের স্তুপ দেখতে পাওয়া যাবে,—তার ওপর রয়েছে একটা অশ্বত্থ গাছ। এই স্থানটিই পীর হজরত একদিল শাহ্‌রাজীর নজরগাহ্। পূর্বে এনাব আলি এবং জোনাব আলি নামক দুই ব্যক্তি এখানকার সেবায়েত ছিলেন। হাজী আনোয়ার আলী, মোহাম্মদ বদরুদ্দিন প্রমুখ এই নজগাহের মূল তত্ত্বাবধায়ক। বর্তমানে মোহাম্মদ মনসুর আলি সাহেব প্রত্যহ এখানে ধূপ-বাতি দিয়ে থাকেন। প্রতি বৎসর দোসরা ফাল্গুন তারিখের অপরাহ্ণে এখানে প্রায় হাজার লোকের সমাবেশে একটি মেলা বসে। সে সময়ও ভক্তগণ হাজত-মানত-শিরনি দিয়ে পীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মেলা শেষে কোন কোন বছরে যাত্রাগানও হয়ে থাকে।

৪। বাদু—

বারাসত থানার অন্তর্গত বাদু একটি বর্ধিষ্ণুগ্রাম। মধ্যমগ্রাম-খড়িবেড়িয়া সড়কের ধারে প্রায় দুই শতক জমির উপর ইটের তৈরী এই নজরগাহটি প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত। প্রাচীরের মধ্যের স্থানটিতে কিছু ফুলগাছ সাজানো। সর্বসাধারণ এখানে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি প্রদান করেন। বসন্তরঞ্জন মোদক মহাশয় নজরগাহটিকে পাকা করে দিয়েছিলেন। আশী বৎসর বয়সের স্থানীয় বৃদ্ধ শ্রীমাগনচন্দ্র মোদক মহাশয় জানালেন যে, পার্শ্ববর্তী

'কাঠোর' নামক গ্রামের মোহাম্মদ জমায়েত আলি 'কান' নামক এক ব্যক্তি এই নজরগাহের সেবায়েত ছিলেন। তার বংশের এক খোঁড়া ব্যক্তি পীর একদিল শাহের জীবন কথা সুর-সহযোগে গেয়ে গেয়ে বেড়াতেন।

এই নজরগাহে ভক্তগণ হাজত-মানত-শিরনি ছাড়া ফল, ফুল, দুধ প্রভৃতিও দিয়ে থাকেন। এখানে শিবলিঙ্গের ন্যায় একটি বস্তু আছে, আর আছে পোড়ামাটির একটি পুতুল। পুতুলটি ঘোড়ার আকৃতি বিশিষ্ট।

৫। বালিপুর—

বালিপুর-বজবজিয়া হল বারাসত থানার অন্তর্গত একটি মৌজা। পীর একদিল শাহের নামে প্রায় এক বিঘা জমির উপর এই নজরগাহটি অবস্থিত। ইটের গাঁথুনির উপর অশ্বত্থ গাছের দ্বারা স্থানটি চিহ্নিত। এখানে প্রতি বৎসর দোসরা ফাল্গুন তারিখে মেলা বসে। প্রায় হাজার লোকের সমাবেশ হয়। মেলা চলে প্রায় পনরো দিন ধরে। সেবায়েতের নাম মোহাম্মদ হাজের মণ্ডল (৮০)। এঁরা বংশ পরম্পরায় এখানকার সেবায়েত। হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ মোরগ বা খাসি হাজত দেন। তাছাড়া শিরনি ও মানত প্রদত্ত হয়। মেলায় পীরের গান হয়, যাত্রাও হয়। সম্প্রতি কিছু লোক জুয়া খেলা ও টপ্পা-খেউড় গানের আমদানী করে এখানকার পবিত্রতা নষ্ট করছে বলে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হিন্দু-মুসলমান ভক্তগণ পীরের নাম করে নিজেদের মঙ্গল আশায় তেল-পানি গ্রহণ করেন। এখানে ধূপ-বাতিও দেওয়া হয়ে থাকে।

৬। রঘুবীরপুর—

বারাসত থানার অন্তর্গত এই গ্রামে সদর রাস্তার ধারে অবস্থিত নজরগাহটি ইট দিয়ে গাঁথা। এই গ্রামের মাসচটক পরিবার পীরের স্থানটির তত্ত্বাবধায়ক। শ্রীনরেন্দ্রনাথ কর্মকার মহাশয় এখানকার সেবায়েত। তিনি নিয়মিতভাবে নজরগাহে ধূপ-বাতি প্রদান করেন। জমির পরিমাণ প্রায় এক কাঠা। এখানে কোন মেলা বসে না। বট অশ্বথ গাছের নীচে অবস্থিত এই স্থানটি বেশ মনোরম।

৭। জাফরপুর—

বারাসত মহকুমার অন্তর্গত জাফরপুরগ্রামে একটি নজরগাহ আছে। স্থানটির পরিমাণ প্রায় এক বিঘা। এখানে কোন গৃহ বা স্মৃতিস্তম্ভ নেই। অথচ সেই সাদা জমিতে চাষ হয় না; শুধু গরু-বাছুরাদি বিচরণ করতে দেখা যায়। এখানে একটি বিশাল অশ্বত্থ গাছ ছিল। গাছটি বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই অর্থ দ্বারা স্থানীয় মসজিদের সংস্কার সাধন করা হয়েছে। এখানে ধূপ-বাতি দেওয়া হয় না অর্থাৎ দেবার রীতি নেই। ঈদের সময় জনসাধারণ এখানে নামাজ পড়েন। পীর সাহেব কোন এক সময় এখানে উপাসনা করেছিলেন বলে কথিত।

৮। গোপালপুর—

বারাসত মহকুমার অন্তর্গত এই গ্রামে একটি মাটির ঢিপি আছে। ঢিপিটী পীর একদিল শাহের নামে চিহ্নিত। ডাংগুলি ক্রীড়ারত রাখাল বেশী পীর একদিল শাহের হাতের গুলি নাকি এখানে এসে পড়েছিল বলে প্রবাদ আছে। এখানে ধূপ-বাতি দেওয়া হয় না, মেলাও বসে না,—কেহ কেহ মানত দিয়ে থাকেন। জনসাধারণই এখানকার সেবায়েত।

৯। আবদেলপুর—

বারাসত মহকুমার অন্তর্গত এই গ্রামে দুই-তিন কাঠা স্থান জুড়ে একটি মাটির ঢিপি পীর একদিল শাহের নামে চিহ্নিত। এখানেও ক্রীড়ারত রাখাল পীর একদিল শাহের হাতের 'গুলি' এসে পড়েছিল বলে কথিত। এখানে ধূপ-বাত্তি প্রদত্ত হয় না, কোন মেলা বসে না। ঈদ উৎসবের সময় ভক্তগণ আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে ক্ষীর সমর্পণ করেন এবং পরে সকলে মিলে তা বাঁটোয়ারা করে গ্রহণ করেন। উক্ত ঢিপিটী প্রায় আট-দশ হাত উঁচু। জনসাধারণই এই স্থান দেখা-শুনা করেন।

১০। পাটুলী—

বারাসতের অন্তর্গত পাটুলীগ্রামে দুই বিঘা পীরোত্তর জায়গার উপর দশ-বারো হাত উঁচু একটি মাটির ঢিপি আছে। সেখানকার বট ও অশ্বত্থ গাছের ছায়ায়, আম ও বাঁশবাগানে ঘেরা স্থানটি কুহেলিকা-আচ্ছন্ন।

বট-অশ্বত্থ গাছে সহস্র সহস্র বাদুড় ঝুলছে; —তাদের কাকলীতে অঞ্চলটি পূর্ণ সমারোহে আবিষ্ট। এখানে ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয় না। তবে প্রতি বৎসর কাজীপাড়ার দরগাহে অনুষ্ঠিত উৎসবের সময় অর্থাৎ মাঘ মাসে এখানে গ্রামের রাখালগণের মধ্যে বনভোজনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই নজরগাহের সেবায়েতগণের নাম যথাক্রমে শেখ নেসার আলী, বিলায়েত আলি, শ্রীশশীভূষণ ঘোষ ও বাঁকাউল্লা বিশ্বাস। এখানে পীরপুকুর নামে একটি পুকুর আছে। এখানে রাখাল বালকগণের বাৎসরিক বনভোজন উৎসবের সময় প্রায় পাঁচ-ছয় শত লোকের সমাগম হয়। তাতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই অংশ গ্রহণ করেন। তাছাড়া বাৎসরিক উৎসবের সময় 'মিলাত' দেওয়া হয়, কোরান থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করা হয়।

১১। হুমাইপুর—

পীর একদিল শাহের নামে বারাসত মহকুমার হুমাইপুরে একটি স্মৃতি চিহ্ন ছিল বলে শোনা যায়। পাটুলি গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধের নিকট জানা যায় যে হুমাইপুর গ্রামের সাধারণ কবর স্থানের পূর্বদিকে পীর একদিল শাহের নামে একটি স্মৃতিচিহ্ন ছিল। সেটিও ছোট একটি মাটির ঢিপি বিশেষ এবং পীরসাহেবের হাতের ডাং-গুলির একটি গুলি এইখানে এসে পড়েছিল। একথা সকলে ভুলে গেছেন বলে তাঁর অভিমত। সে ঢিপিটীও কালক্রমে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ক্রীড়ারত পীর একদিল শাহের হাতের 'গুলি' এখানে এসে পড়েছিল বলে একটি শ্লোক প্রবাদরূপে আজো ব্যবহৃত হয়।

১২। গোবরা—

বাংলা সরকারের ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের গেজেটে উল্লেখ আছে যে পীর একদিল শাহের নামে এই গ্রামে ছয়দিনের মেলা বসত। মেলাটি হত ফেব্রুয়ারী মাসে, তাতে গড়ে তিনশত লোকের সমাবেশ হত।

১৩। ধলা—

বারাসত মহকুমার অন্তর্গত ধলা গ্রামে পীর একদিল শাহের নামে একটি মেলা হত বলে বাংলা সরকারের ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের গেজেটে লিপিবদ্ধ আছে। তাতে আরো নির্দিষ্ট আছে যে সেখানে প্রতি বৎসর মার্চ মাসে চার দিনের মেলায় তিন শতাধিক লোকের সমাবেশ হত। সরেজমিনে তদন্ত করে জানা যায় যে, উপরোক্ত তথ্য যথার্থ নয়।

পীর একদিল শাহ্ কাব্য

পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজীর নামে এ পর্যন্ত একখানি মাত্র কাব্য-গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। কাব্য খানির নামপৃষ্ঠা না থাকায় "পীর একদিল শাহ্ কাব্য"—এইরূপ নামকরণ করে নিতে হল।

পীর একদিল শাহ্ কাব্যের রচয়িতা কবি আশক মহম্মদ ওরফে হেলু মিয়া। তাঁর বসতি ছিল হরিপুর নামক গ্রামে। ভণিতায় তিনি বলেছেন,—

আশক মোহাম্মদ কহে জোনাবে সবায়॥
হরিপুর গ্রাম বিচে বসত যাহার *

অনেক হরিপুর নামক গ্রামের কোন্ হরিপুরে তাঁর বসতি ছিল তা জানা দুঃসাধ্য। কবির আর কোন পরিচয় বিশেষতঃ বংশ পরিচয়, জন্ম-সাল বা তারিখ প্রভৃতি জানা যায় না। তবে ভণিতায় তাঁর ভক্তি প্রণতঃ কবি হৃদয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, —

আসক মহাম্মদ বলে একদিলের পায়॥
লেহ ভাই আল্লার নাম দেলেতে সদায় * (২।৫)

কিংবা আশক মহাম্মদ কহে একদিলের পায়॥
আল্লা নবী বল সবে দিন বয়ে যায় * (২।৮৪)

পীর হজরত একদিল শাহের জীবনী সম্বলিত এই পাঁচালী কাব্যখানি সুবৃহৎ। কাব্যখানি মুদ্রিত। আকৃতি ৭½"×৪½"। গ্রন্থখানি এখন খুব সম্ভবতঃ একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। আমি বারাসতের কাজীপাড়া গ্রামের জনাব বাহার আলী সাহেবের নিকট থেকে কাজী আজিজার রহমান সাহেবের সহায়তায় উক্ত ছাপা পুথিখানি আবিষ্কার করি। জনাব বাহার আলী সাহেব পুস্তকখানি হস্তান্তরিত করতে রাজী না হওয়ায় আমি তার নকল করিয়ে রেখেছি। তার নাম পৃষ্ঠা নেই, নেই বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা। প্রথম দিকের

তেরো পৃষ্ঠা পর্যন্ত নেই এবং শেষের দিকে একশত ছাব্বিশ পৃষ্ঠার পর খণ্ডিত। হেমেটীক রীতিতে শব্দ সমূহ এবং সেমেটীক রীতিতে পৃষ্ঠাগুলি সজ্জিত। কাব্যখানি নিম্নলিখিত পালায় বিভক্ত ঃ—

১ জন্ম পালা,
২. শিক্ষা লাভ পালা,
৩. ডাকিনীর পালা,
৪. কাঞ্চন নগরের পালা,
৫. মুর্শিদের পালা,
৬ হরিণীর পালা,
৭. ছুটীর পালা,
৮. বড়ুয়ার বিড়ম্বনার পালা,

এর পর খণ্ডিত বলে আরো পালা ছিল কিনা জানা যায় না। এতে কয়েকটি ধূয়া আছে, প্রতি অনুচ্ছেদে আছে শিরোনামা। ভণিতার নমুনা এইরূপ ;—

বিশেষ কাতর হৈল একদিলের সায় ॥
রচে পুথি কবিকার একদিলের পায় * (১।১২)

অথবা,

আল্লা নবীর নাম এবে বল সর্বজন ॥
একদিলের জন্মপালা হৈল সমাপন * (১।১৯)

প্রতি পালার আরম্ভে 'পালা আরম্ভ' এবং শেষে 'পালা শেষ' এইরূপ লিখিত আছে। প্রথম পংক্তির শেষে দুই দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে একটি তারকার চিহ্ন আছে। একই শব্দ দুইবার না লিখে কবি একটি শব্দের পর '২' লিখেছেন। কাব্যটী দ্বিপদী ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত।

প্রতি অনুচ্ছেদের আরম্ভে 'খেদার্থে পয়ার' ও 'করুণার্থে পয়ার' ইত্যাদি লিখিত আছে।

'পীর একদিল শাহ্' পাঁচালী কাব্যখানি বাংলা মুসলমানী ভাষায় লিখিত। এতে ইংরেজী শব্দ দৃষ্ট হয় না। তবে প্রচুর আরবী, ফারসী, হিন্দী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

আরবী, ফারসী ও হিন্দী শব্দের নমুনা,—

আরবী :—খাতেরে, জওাব, তলব প্রভৃতি।

ফারসী :—এয়াদ, রওয়ানা বেহুস প্রভৃতি।

হিন্দী :—ডালিয়া, বিচে, উতারে প্রভৃতি।

সমগ্র কাব্যখানি বারাসত-বসিরহাটের আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত। উক্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত বিশেষ কয়েকটী শব্দ এইরূপ :—

সাতে অর্থাৎ সাথে বা সঙ্গে

আন্তে অর্থ আনতে বা আনিতে

সোগে অর্থ শোকে বা দুঃখে

লিয়া অর্থ নিয়ে বা লইয়া ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, উক্তরূপ শব্দ সমূহ নিরক্ষর সাধারণ গ্রামবাসীই ব্যবহার করে থাকেন ;—এ ধারা এখনও অব্যাহত আছে। এ কাব্যের আরো কয়েকটী ভাষা-বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ;—

১. অনেক স্থলে পদান্তে সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে,

২. বহু স্থানে বর্ণাশুদ্ধি আছে,

৩ প্রধানতঃ সাধুভাষা এবং কিছু কিছু চলতি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে,

৪. পাঁচালী-সুরে একাকী বা সদলে গাইবার উপযোগী,

৫. সাধারণ ভাবে চৌদ্দ অক্ষর-যুক্ত ; কোথাও কোথাও পনেরোটি অক্ষরও ব্যবহৃত হয়েছে।

ভাষার নমুনা এইরূপ :—

……………ছাড়ি যাও মোরে ॥

আল্লার দোহাই লাগে তোমার উপরে *

এমত শুনিয়া খিদা নিবিল উদরে ॥

একিন করিয়া সাধন করিতে লাগিল * (১।১)

সংক্ষিপ্ত কাহিনী—

সাহানা নগরের সওদাগর সাহানীর। তাঁর বিত্তবান সংসার পুত্র-অভাবে বিষাদময়। তদীয় পত্নী আশক হুরি, পুত্র লাভের আশায় আহার নিদ্রা ত্যাগ

করতঃ আল্লাহ্ তালার নামে কঠোর সাধনায় নিযুক্ত। একে একে বার বছর অতিক্রান্ত হল,—তিনি অচেতন হয়ে শয্যাশায়ী হলে খোদার আসন নড়ে উঠ্‌ল। আল্লাহ্ তা'লা তৎক্ষণাৎ জিবরিলকে ডাকিয়ে বৃত্তান্ত জেনে নিলেন এবং এক লাখ আশী হাজার পীরের মধ্য থেকে পীর একদিল শাহ্‌কে মানব জনম নিয়ে আশক নুরির গর্ভে অধিষ্ঠিত হতে নির্দেশ দিলেন। এতে পীর একদিল শাহের আপত্তি ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আড়াই দিন পরে তাকে ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিলে একদিল শাহ্ তাতে সম্মত হলেন।

আল্লার নির্দেশ মত 'দুলাল' নামক ফুলের রূপ ধরে একটি পাত্রের মধ্যে থেকে 'সান নামক নদীর জলে একদিল শাহ্ ভাস্‌তে লাগলেন। রাত্রে স্বপ্নে তিনি আশক নুরিকে দর্শন দিলেন। প্রাতঃকালে সান নদীর ঘাটে এসে আশক নুরি সেই ভাসমান ফুলের পাত্র দেখে আনন্দিত চিত্তে সেটা ধরলেন এবং ফুলের ঘ্রাণ নিলেন। তাতেই তাঁর গর্ভ-সঞ্চার হল। সাহানীর এ সংবাদ শুনে খুবই খুশী হলেন।

গর্ভবতী আশক নুরির দশ মাস দশ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হ'ল। যথা সময়ে তিনি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। সাহানীর মিঞা আনন্দের আতিশয্যে 'দাই'কে দক্ষিণা-স্বরূপ হাজার টাকার থলি দান করলেন। আশক-নুরিও আনন্দে তাকে নিজের গলার হার, মাণিকের ছড়া, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি দান করলেন। সাহানীর ধনভাণ্ডার থেকে লক্ষ টাকা নিয়ে ফকির-বৈষ্ণবকে দিলেন। বিয়াল্লিশ বাজনা বেজে উঠ্‌ল। তিনি লক্ষ টাকার শিরনি দিলেন মসজিদে এবং বল্‌লেন,—

"এবে সে জানিনু মুই পুত্র বড় ধন॥"

সকলে দানে পরিতুষ্ট হয়ে সাহানীরের পুত্র একদিল শাহ্‌কে আন্তরিক আশীর্বাদ করে প্রস্থান করল।

আনন্দ-লহরার মধ্য দিয়ে একে একে আড়াই রোজ পূর্ণ হতে চল্‌ল। প্রতিশ্রুতিমত একদিল শাহ্‌কে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ্ তালা এবার খওয়াজ অর্থাৎ তাঁর দূতকে আদেশ দিলেন।

খওয়াজের গায়ে বিচিত্র পোষাক। তাঁর পায়ে খড়ম, হাতে সোনার 'আশাবাড়ি'। ফকির বেশে তিনি সাহানীরের বাড়ী এসে একদিল শাহ্‌কে

দেখ্‌তে চাইলেন। আড়াই দিনের শিশুকে ঘরের বাইরে আনতে সাহানীর স্বীকৃত নন। তাতে খওয়াজ রাগান্বিত হয়ে সাহানীরকে নানারূপ ভীতি প্রদর্শন করতে শেষ পর্যন্ত সাহানীর তাঁর পুত্রকে ফকির সাহেবের নিকট আনয়ন করলেন।

সকলের অলক্ষ্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বিষয়ে খওয়াজ ও একদিল শাহের মধ্যে কথোপকথন হল। খওয়াজ, সাহানীরের সঙ্গে ছলনা করে পীর-সহ অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং একদিল শাহ্‌কে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করলেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁকে বল্‌লেন : - একদিলকে মোল্লা আতার বাড়ীতে নিয়ে যাও। সেখানে একদিল শাহ্‌ কোরান পাঠ নিক্‌। খওয়াজ তৎক্ষণাৎ পীরকে সঙ্গে নিয়ে মোল্লা আতার নিকট গেলেন এবং আল্লাহর ফরমানের কথা আতা সাহেবকে জানালেন। আতা সাহেব ও তদীয় পত্নী, পুলকিত হৃদয়ে পীরকে অভ্যর্থনা জানালেন।

আতা সাহেবের নিঃসন্তানা পত্নীর বক্ষে দুগ্ধ সঞ্চারিত হল। দুগ্ধ পোষ্য একদিল সেই দুধ পান করে বর্ধিত হতে লাগলেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত সেখানে তিনি কোরান পাঠ নিলেন।

এদিকে ফকির-রূপী খওয়াজকে অকস্মাৎ অদৃশ্য হতে দেখে সাহানীরের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। তিনি চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌লেন। দুঃসংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে সকলে হাহাকার কর্‌তে লাগ্‌ল। আশক সুরি পাগলিনীর ন্যায় বাড়ীর মধ্যে তুমুল কাণ্ড আরম্ভ করলেন। সাহানীর মাটিতে মাথা কুট্‌লেন, চাদর ছিঁড়ে কৌপিন পর্‌লেন, দুর্গন্ধ কাঁথা ছিঁড়ে গলায় বাঁধ্‌লেন, সারা অঙ্গে চুন-কালি মেখে হাড়ের পুটুলি ও কালো হাঁড়ি হাতে নিয়ে পুত্রের সন্ধানে পথে পথে এগিয়ে চল্‌লেন। তিনি বহু স্থান ঘুরে অবশেষে এলেন সমৃদ্ধশালী কাঞ্চনা-নগরে।

কাঞ্চনা নগরের রাজা ছত্রজিতের একমাত্র কন্যা ডাকিনী হলেন সেই রাজ্যের পরিচালিকা। তিনি পরমা সুন্দরী। তিনি একাগ্রমনে কোরান পাঠ করেন। তাঁর রাজ্যের রাজকর্ম কেবল নারী কর্মী দ্বারা সম্পাদিত হয়। সেই স্থানকে তাই লোকে বলে 'স্ত্রীমা পাটন'।

ডাকিনী ইতিপূর্বে সাহানীরকে স্বপ্নে দেখে তাঁর প্রতি অনুরক্তা হয়েছিলেন। তিনি মনে মনে নিজেকে সাহানীরের প্রতি সমর্পণ করে বিবাহের আকাঙ্ক্ষায়

প্রতীক্ষা করছিলেন। সাহানীরের আগমন-বার্তা শুনে তিনি খুশী হয়ে 'নৰ্জুম' অর্থাৎ গণৎকারকে ডেকে পাঠালেন।

গণৎকার গণনা করে জানালেন যে ইনিই ডাকিনীর ইপ্সিত সেই সাহানীর। ডাকিনী জিজ্ঞাসা করলেন,—সাহানীর তো পুত্রশোকে পাগল প্রায়, তাঁকে করায়ত্ত করার কৌশল কি! গণৎকার ডাকিনীকে সখিগণ-পরিবৃতা এবং রত্নাভরণে বিভূষিতা হয়ে সাহানীরকে ভুলাতে পরামর্শ দিলেন। ডাকিনী সেই পরামর্শ অনুযায়ী একাগ্র প্রচেষ্টায় সফলকাম হলেন। সাহানীরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল। সাহানীর কাঞ্চনানগরের রাজা বলে বিঘোষিত হলেন। রাজদম্পতির মহাসুখে দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল।

এদিকে পুত্রহারা জননী আশক নুরির দুঃখে তদীয় সখিদ্বয় রূপি ও জিরা এবং সমগ্র প্রকৃতি যেন কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। বিবির ক্রন্দন শুনে গাভীর গর্ভের বাছুর নড়ে উঠ্‌ল, বৃক্ষের পাতা ঝর্‌ল, পাষাণ গলে গেল, বৃক্ষ-লতা এমনকি পশু-পাখী কাঁদ্‌ল। আশক নুরি বল্‌লেন,—

"মরিব মরিব জিরা মরিব নিশ্চয়।"

তিনি আত্মহত্যার জন্য খরস্রোতা "সান" নদীতে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু সে নদীর পানি শুকিয়ে গেল। এগিয়ে গেলেন বিষধর সাপের মুখে, কিন্তু সাপ তাঁকে দংশন না করে চলে গেল। গভীর জঙ্গলের দাবাগ্নিতে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু আগুন নিভে 'পানি' হয়ে গেল। হিংস্র বাঘের মুখে এগিয়ে গেলেন তিনি, কিন্তু বাঘ বরং এসে তাঁকে 'সালাম' জানিয়ে প্রস্থান করল। অনাহার, অনিদ্রা ও অত্যধিক ভ্রমণে যখন তাঁর মৃত্যুদশা উপস্থিত হল তখন খোদার আসন আবার টল্‌ল। আল্লাহ্ তা'লা ঘটনা জান্‌তে পেরে খওয়াজকে ডাকিয়ে আনালেন। তিনি পীর একদিলকে অবিলম্বে সাহানা নগরে ফিরিয়ে আন্‌তে খওয়াজকে আদেশ দিলেন। খওয়াজ সেই আদেশ অনুযায়ী মোল্লা আতার ঘর থেকে একদিলকে এনে তাঁর মাতা আশক নুরির নিকট হাজির কর্‌লেন।

আশক নুরি প্রথমে পুত্র একদিলকে চিন্‌তে পার্‌লেন না। পরে পরিচয় পেয়ে তিনি ক্ষোভে, অভিমানে ব্যথিত হয়ে বল্‌লেন,—

একধার দুধ মায়ের শুধা নাহি যায়॥
শত শত মসজিদ দিলে সমান না হয় * (১৮৭)

পীর একদিল মনে ব্যথা পেয়ে গলবস্ত্র হয়ে মায়ের কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগ্‌লেন। মা এবার পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন; চারিদিকে নেমে এল আনন্দের জোয়ার! আশক নুরি আপনার হাতে 'খানা' তৈরী করে পুত্রকে খাওয়ালেন এবং পরে মাতা-পুত্র একত্রে শয়ন কর্‌লেন। একদিল শাহ্‌ পরম আদরে মাতার গলা জড়িয়ে ধরে গভীর সুখে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন।

প্রভাতে কোকিলের ডাকে পীরের ঘুম ভেঙে গেল। রাত্রে স্বপ্নে পিতাকে দেখা অবধি তাঁর মন বিষন্ন হয়ে আছে। মাতার নিকট তিনি পিতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌তে আশক নুরি আনুপূর্বিক সমস্ত বেদনাপূর্ণ ঘটনার কথা বিবৃত কর্‌লেন। পীর তৎক্ষণাৎ ধ্যানে বসে পিতার বর্তমান অবস্থান ও অবস্থা জেনে নিলেন এবং তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লেন।

একদিল বল্‌লেনঃ—আমি পিতাকে ফিরিয়ে আন্‌তে যাব। মাতা প্রথমে পুত্রকে কাছ-ছাড়া কর্‌তে রাজী হন নি কিন্তু পরে অনুমতি দিলেন।

পীর একদিল গঙ্গাতীরে এসে গগন মণ্ডল, গঙ্গাদাস এবং আরো অনেককে ডেকে নৌকা আন্‌তে বল্‌লেন। তাঁর আদেশ অনুসারে মধুকর, চন্দ্রসেন প্রভৃতি সাতখানি নৌকা যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হল। মাতার আশীর্বাদ নিয়ে তিনি একজন ফকিরের বেশে যাত্রা কর্‌লেন। অশক নুরি অনেক দুঃখে অনেক বেদনায় পুত্রকে বিদায় দিলেন।

নৌবহর ভেসে চল্‌ল, —লসমানপুরি, কাকুরাই, টুঙ্গিপুর প্রভৃতি কত নগর কত জনপদ পার হয়ে এসে উপস্থিত হল কাঞ্চনা নগরে। মাঝি-মাল্লারা ডাঙ্গায় নেমে রন্ধন-উপচার সংগ্রহে ব্যাপৃত হল। তাঁদের আগমনে কাঞ্চনা নগরের চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। দলে দলে লোক এসে হাজির হল তাঁদেরকে দেখবার জন্য। সকলে দেখ্‌ল,—

> পূর্ণিমার চন্দ্র জিনে একদিল বরণ ॥
> রবির কিরণ নহে তাহার সমান *

একদিল গলে বস্ত্র দিয়ে জোড় হাতে পিতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সাহানার প্রথমে পুত্রকে চিনতে পারলেন না। পরে সমস্ত বিবরণ শুনে তিনি দ্রবীভূত হলেন এবং আনন্দাতিশয্যে কেঁদে ফেল্‌লেন। পিতা-পুত্রের মিলন হল।

পিতা-পুত্রে একাসনে আহারে বস্‌লেন। একদিল অনুরোধ জানালেন পিতাকে দেশে ফিরে যাবার জন্য। পিতা তাতে সম্মত হলেন এবং পুত্রকে সঙ্গে করে ডাকিনীর নিকট গেলেন।

ডাকিনী ছিলেন রাজদরবারে। তিনি একদিলের পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হলেন এবং তাঁদের প্রস্তাব শুনে বল্‌লেন,—

তুমি তো জান না স্বামী নারীর গোঁসাই ॥
স্বামী বিনা নারীদের কোন লক্ষ্য নাই *

অবশেষে ডাকিনী পীতাম্বরী শাড়ী পরে, অন্যান্য অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে স্বামী ও সতিন পুত্রের অনুগামিনী হলেন। সতিন সম্পর্কে উৎকণ্ঠা ছিল ডাকিনীর। একদিল তার নিরসন করলেন। ডাকিনী নৌকায় আরোহণ করে পুত্রকে কোলে নিয়ে বসলেন। নৌবহর রত্নানদী, গোরা নদী, বেলপুর, সণ্টিরাজ প্রভৃতি পশ্চাতে ফেলে এসে উপস্থিত হল গন্তব্যস্থলে।

আশক নুরি অধীর আগ্রহে একদিলের প্রত্যাগমনের পথ পানে চেয়ে রোদন করছিলেন। দূর থেকে একদিলকে আস্‌তে দেখে তাঁর দেহে যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। পীর এবার মাতার নিকট এসে পিতা ও সতিন ডাকিনীর আগমন বার্তা জানালেন। সতিনকে আন্‌বার জন্য যদি অভিযোগ করেন তাই পূর্বেই তিনি মাতাকে জানালেন,—

গুণাগার হব তবে আল্লার দরবারে *

আশক নুরি জানালেন, তুমি ফিরেছ তা-ই আমার যথেষ্ঠ। তোমার পিতাকে যিনি সযত্নে রেখেছিলেন তিনি আমার ভগিনী, তিনিও আমার প্রাণাধিক।

আশক নুরি ও ডাকিনী দুই ভাগিনীর ন্যায় পরস্পর পরস্পরের নিকট আদান-প্রদান করলেন।

পুত্রের আবেদনে মাতা আশক নুরি বিনা আগুনে খানা প্রস্তুত করলেন। আশক নুরি,—

কোলে করি ডাকিনীর ধোওয়াইল হাত ॥
দুই বহিন একাস্তরে বসে খায় ভাত *

তারপর তাঁরা সকলে নিজ নিজ কক্ষে নিদ্রার উদ্দেশ্যে গমন করলেন।

রাত্রে স্বপ্নে আল্লাহ্ তালার নির্দেশ হল পীর একদিল চট্টগ্রামে গিয়ে মুর্শিদের সেবায় নিযুক্ত হোক। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হলে একদিল চট্টগ্রামে যাবার উদ্যোগ কর্‌লেন। এ-খবর রটে গেল দ্রুত গতিতে। চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে এল। আশক মুরি পরের রাত্রিতে একদিলকে পাহারা দিয়ে আটকে রাখতে চাইলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ায় পীর গৃহত্যাগ করে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা কর্‌লেন।

চট্টগ্রামে এসে পীর একদিল শাহ্ দেখেন যে বদর পীর, রাখাল বালক রূপে অন্যান্য রাখালদের সঙ্গে খেলা করছেন। রাখাল বালক বলে তাঁকে একদিল শাহ্ উপহাস করায় বদরপীর অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একদিল শাহ্ অনেক অনুসন্ধান করেও বদরপীরকে দেখ্‌তে পেলেন না। তিনি সরুয়া নামক এক ব্যক্তির বাড়ীর নিকট কবর নিয়েছেন বলে জানতে পারলেন। সাথে সাথে একদিল গেলেন সরুয়ার বাড়ী এবং সরুয়াকে সঙ্গে নিয়ে বদর পীরের সেই কবরে গেলেন। সেখানে বদর পীরের সাক্ষাত পাওয়ার জন্য অনেক রোদন কর্‌লেন কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না। কবর খুঁড়ে দেখেন পীরের দেহ গলিত শবে পরিণত হয়েছে। সিন্ধুকে সেই গলিত দেহকে ভরে নিয়ে মাথায় করে পীর একদিল ভ্রমণ কর্‌তে লাগলেন। অনাহারে অনিদ্রায় একদিল মরণোন্মুখ হলেন। অবশেষে তিনি মরবার জন্য আগুনে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু হায়! আগুন ফুল হয়ে গেল।

এবার বদরপীর সদয় হলেন। তিনি একদিলকে দর্শন দিলেন। সমস্ত বিবরণ শুনে তিনি একদিল শাহ্‌কে মুরিদ করে নিলেন এবং দীক্ষা দিলেন ;—

ফকিরের যত হদ বদর কাছে ছিল॥
সকলি একদিল তরে সা বদর দিল * (১।১৪৪)

গুরু শিষ্যে একত্রে ছয়মাস থাকার পর একদিল শাহ্ গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে বিদায় হলেন।

পীর একদিল শাহ্ চলার পথে এসে হাজির হলেন এক গভীর অরণ্যে। সেখানে এক হরিণী তার আড়াই দিবসের দুটি শিশু সন্তানকে নিয়ে বাস করছিল। পিপাসার্ত হয়ে হরিণী জল পান করতে কালিন্দী নদীতে গেলে,

রাজা নছিরাম সেখানে শিকারে এসে সুযোগমতন হরিণীকে বন্দী করেছিলেন। হরিণীর শিশুদ্বয় মাকে দীর্ঘক্ষণ না দেখে কেঁদে আকুল হল। এমন সময় তারা দেখ্‌তে পেল পীর একদিল শাহ্‌কে। তারা কেঁদে গিয়ে পড়ল পীরের পায়ে। পীর তাদের মাকে উদ্ধার করে দেবার কথা দিলেন। সেজন্যে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজবাটী-অভিমুখে রওনা হলেন।

ব্রাহ্মণ রাজা নছিরাম অতি দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক। তিনি মুসলমানের মুখ দর্শন করেন না। একদিল শাহ্ রাজবাটীতে এসে জিগীর ছাড়তে নছিরাম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌লেন। পীর.ক বন্দী করার জন্য তিনি কোটালকে আদেশ দিলেন। বল্‌লেন, পরদিন কাছারীতে এনে তাঁকে হত্যা করা হবে।

কোটাল গিয়ে পীরকে বন্দী করে আন্‌ল এবং তাঁকে হাতে কড়া, পায়ে বেড়ী, গলায় জিঞ্জির ও বুকে পাষাণ চাপা দিয়ে বন্দীশালায় সেই হরিণীর ঘরে আবদ্ধ করে রাখল। কিন্তু পীর একদিল আল্লার কৃপায় বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজ দেহ-জ্যোতিতে কারাগার আলোকিত করে অবস্থান কর্‌তে লাগলেন।

পরদিন যথাসময়ে রাজসভা বস্‌ল। রাজার আদেশে ফকিরকে আন্‌তে কারাগারে গিয়ে কোটাল, পীরের সে অপরূপ রূপ দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। সংবাদ শুনে রাজা নিজে গেলেন কারাগারে। রাজাও সে দৃশ্য দেখে তো অবাক্। তিনি ত্রাসে জোড় হস্তে বল্‌লেন ;—

ক্ষমা কর অপরাধ করিয়াছি ভারি *

পীর সদয় হলেন এবং রাজাকে অনেক বিষয়ে উপদেশ দিয়ে হরিণীর মুক্তি চাইলেন। রাজা প্রথমে তাতে স্বীকৃত হলেন না। পরে হরিণীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতিতে রাজা তাকে মুক্ত করে দিলেন। নির্দিষ্ট সময় পার হতে না হতে দেখা গেল, হরিণী তার শিশু সন্তানগণকে দুধ খাইয়ে যথাসময়ে ফিরে এসেছে। রাজা তখন গভীর ভাবে পীর একদিল শাহের মহত্ত্বের পরিচয় পেলেন। তিনি কেঁদে এসে পড়লেন পীরের পায়ের ওপর। পীর তখন নছিরামকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। নছিরামের মুসলমানী নাম হল দিন মামুদ।

দিন মামুদ লক্ষ টাকা খরচ করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে দিলেন, আঠারোটি খাসি কোরবানি করে পীরের নামে শিরনি দিলেন, এবং শিরনি

আহারের পর পীর শয়ন করলে রাজা নিজ হাতে তাঁকে চামরের সাহায্যে বাতাস দিতে লাগলেন।

রাত্রি প্রভাত হল। পীর গাত্রোত্থান করলেন। নামাজ সমাপ্ত করে রাজা তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। এবার পীর একদিল, রাজার কাছে বিদায় চাইলেন। রাজা বললেন ;—এ রাজ্য আপনার,—আপনি এখানে থাকুন। রাজার অনুরোধ রক্ষা না করে তিনি বললেন,

……তেরা রাজ্যে নাহি প্রয়োজন ॥
পৃথিবী জুড়িয়া রাজ্য দিছে নিরাঞ্জন *

রাজা দিন মামুদের রাজত্ব থেকে বিদায় নিয়ে সাদা মাছির রূপ ধরে একদিল পীর উড়ে এসে উপস্থিত হলেন আনেয়ারপুর পরগণায়।

আনোয়ারপুর পরগণায় এসে পীর একদিল শাহ্ এক বালক-ফকিরের রূপ ধারণ করলেন। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁকে মুগ্ধ করল। আনওয়ার-পুরের অধিকর্তার নাম 'মন্দির' রায়। ধনধান্যে পূর্ণ তাঁর রাজত্বে সুখ বিনা কেউ দুঃখ জানে না। ভিক্ষুক দেখলে তাকে কেউ ভিক্ষা দেয় না পরন্তু লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে দেয়। পীর একদিল শাহ্ ভিক্ষার ছলে লোক চরিত্র জানতে চাইলেন। কোথাও তিনি ভিক্ষা না পেয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পথি-মধ্যে রাখাল-গণকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'বল এথা আছে কি মোমিন মুসলমান *

রাখাল বালকগণ তাঁকে সেখানকার ছুটি মণ্ডলের বাড়ীতে যাবার পরামর্শ দিল। তারা ছুটি মণ্ডলের গুণবতী পত্নী 'সম্পতি' নাম্নী মহিলার অতিথি-পরায়ণতার ও ধর্মপ্রাণতার কথাও বলল।

বেলা তখন দুই প্রহর, ছুটী মণ্ডল গেছেন রাজদরবারে। এমন সময় পীর একদিল, ছুটি মণ্ডলের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে 'সম্পতি'র নিকট নিজের ক্ষুধার কথা জানালেন। নিঃসন্তানা সম্পতির নারীহৃদয় বেদনায় ব্যাকুল হল। সম্পতি জানতে চাইলেন সেই রাখাল বালকের পরিচয়। বালক জানালেন যে তাঁর কেউ নেই। কোন মুসলমান তাঁকে রাখালরূপে রাখলে তিনি সেখানে থাকবেন। পুনরায় তিনি তাঁর ক্ষুধার কথা জানাতে সম্পতি সহানুভূতিতে মনে মনে কেঁদে

ফেললেন। সম্পতি তৎক্ষণাৎ তাঁকে 'অজু' করার 'পানি' দিলেন এবং বিশ্রাম করতে বলে খানা প্রস্তুত করতে গেলেন।

পীর একদিল সেখানে অবস্থান না করে অন্যদিকে এগিয়ে চললেন। তিনি পথি-মধ্যকার এক শুষ্ক কদমতলায় এসে থামলেন এবং সেখানে বসে আল্লাহতালার প্রতি প্রার্থনা করতে লাগলেন।

'সম্পতি' ক্ষীর প্রস্তুত করে ফকির বালকের সন্ধানে এসে দেখেন যে বালক সেখানে নেই। অনেক অনুসন্ধানেও তাঁকে পাওয়া গেল না। এমন সময় ছুটি মণ্ডল রাজ-দরবার থেকে এলেন ফিরে। তিনিও বিষয়টি অবগত হলেন। শুনেই তিনি ব্যথিত হলেন। সে রাতে ছুটি মণ্ডল কিছু অতিথি সংকার করলেন এবং আপনার শয্যা ত্যাগ করে ভূমাসনে রাত্রি যাপন করলেন। সম্পতিও অভুক্ত অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে আঁচল বিছিয়ে মাটিতে শয়ন করলেন।

সে রাতে স্বপ্নে পীর ও সম্পতির মধ্যে একবার সাক্ষাতকার হল।

পরদিন দেখা গেল রাজ-দরবারে হিসাবের খাতায় ছুটি খাঁর নামে বাইশ হাজার টাকা বকেয়া রয়েছে। তা দেখে ছুটি খাঁর প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ জনৈক ব্রাহ্মণ দেওয়ান, সেরেস্তার কাগজ-পত্র লুকিয়ে ফেল্‌লেন। এদিকে পীর একদিল শাহের ইচ্ছায় ছুটি খাঁর বিরুদ্ধে প্রজাগণের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিল। প্রজাগণ এসে ছুটি খাঁর বিরুদ্ধে রাজদরবারে নালিশ করে গেল। তাঁর অপরাধ এই যে তাঁরই বড় ভাই বড় মণ্ডল নাকি তাদেরকে খুব অত্যাচার করেছে।

রাজা, ছুটি খাঁর সমস্ত কাজে খুব সন্তুষ্ট। তা ছাড়া তিনি নানা কারণে ছুটি খাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। তাই তিনি নিরপরাধ ছুটি খাঁর উপর কঠোর হতে পারছেন না। তাতে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হয়ে দরবার ত্যাগ করল। রাজা অগত্যা প্রজাগণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ছুটি খাঁকে বেঁধে আনতে কালু কোটালকে আদেশ দিলেন। কালু কোটাল সে আদেশ পালন করতে ছুটি খাঁর বাড়ী গেল। তাকে দেখে সকলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। পূর্ব দিনে বাইশ হাজার টাকা জমা লিখে দেওয়ার পরে কি ভাবে বকেয়া পড়তে পারে তা ছুটি খাঁ ভেবেই পেলেন না।

কালু কোটালের সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় ছুটি খাঁ চলেছেন রাজ দরবারে। গ্রামবাসীগণ বলতে লাগল;—আনোয়ারপুরে তো ছুটি খাঁর কোন শত্রু

নেই,—তবে তাঁর আজ এ দশা কেন? গ্রামের রমণীগণ বড়ু খাঁর অসদাচরণ স্মরণ করে বলল ;—বড়ুয়ার যদি এমন দশা হত তবে বড়ই ভাল হত।

রাজ দরবারে বন্দী অবস্থায় যাওয়ার পথে ছুটি খাঁ একটি শুষ্ক কদম্ব বৃক্ষের তলে এক রাখাল বালককে দেখতে পেলেন। পিতৃ-সুলভ বাৎসল্যে ছুটি খাঁ তার কাছে গেলেন এবং তার পরিচয় নিয়ে জানতে পারলেন যে সে বালক কোনও মুসলমান পরিবারে মেহনত প্রদানের পরিবর্তে থাকতে চায়। ছুটি খাঁ তৎক্ষণাৎ সেই বালককে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন।

বালক এবার ছুটি খাঁর বন্ধন দশার কথা জানতে চাইলো। ছুটি খাঁ তাঁর বন্ধন দশার আনুপূর্বিক ঘটনা বালককে বললেন। সব শুনে বালক জানালো যে তিনি যদি পীর একদিল শাহের নামে শিরনি দিতে প্রতিশ্রুত হন তবে অবশ্যই তাঁর মুস্কিল আসান হবে। ছুটি খাঁ তা করতে প্রতিশ্রুত হয়ে রাজ দরবারে গেলেন।

পীরের অলৌকিক ক্ষমতায় রাজ-দরবারের খাতায় লেখা বকেয়া উশুল হয়ে গেল। খাতার বকেয়া উশুল দেখে রাজা তো অবাক! লজ্জায় তিনি মাথা হেঁট করলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজের মাথার পাগড়ী খুলে ছুটি খাঁর মাথায় পরিয়ে আলিঙ্গন করলেন।

ছুটি খাঁ হৃষ্ট মনে রাজ দরবার থেকে ফিরে এলেন সেই বালক যেখানে ছিল সেখানে। কিন্তু কি আশ্চর্য! সে শুষ্ক কদম্ব বৃক্ষ গেল কোথায়! তার পরিবর্তে সেখানে সতেজ ডালপালায় সুশোভিত কদম্ব বৃক্ষ এলো কি করে! সাত বৎসরের বালকই বা এই মুহূর্তে কিরূপে বারো বছরের কিশোর হলো! তিনি আকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন।

দয়ালু পীর এবার নিজেকে ধরা দিলেন এবং পুনরায় সাত বৎসরের বালকের রূপ ধরে ছুটি খাঁর বাড়ী গেলেন। এর পরও পীর নানারূপ পরীক্ষার দ্বারা ছুটি খাঁর ভক্তির বিশুদ্ধতা যাঁচাই করতে চাইলেন।

ছুটি খাঁর ভাই বড়ু খাঁর বড় আশা,—নিঃসন্তানা ছুটি দম্পতির মৃত্যুর পর সমস্ত ধন-সম্পদ সে একাই ভোগ করবে। পোষ্যপুত্র রাখাল বালকের উপস্থিতে সেই আশা-ভঙ্গের আশঙ্কায় বড়ু খাঁ হিংস্র হয়ে উঠল। তাই সে গরু চরাবার অজুহাতে বনের মধ্যে লাঠির ঘায়ে অথবা অন্ধকূপে নিক্ষেপ ক'রে বালক পীরকে হত্যা করতে মনস্থ করল।

অন্তর্যামী পীর এ সবই জানতে পারলেন। তিনি পরদিন গো-পাল নিয়ে মাঠে চরাবার জন্য চলেছেন। পথে অনেক রাখাল বালকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তাদের সঙ্গে তিনি উখড়া নামক বনে এলেন। সেখানে গো-পাল ছেড়ে তিনি রাখাল বালকগণের সাথে ক্রীড়ায় রত হলেন। সকলে একদিল শাহের নিকট বার বার পরাজিত হল। মনে মনে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সাথে আর খেলতে রাজী হল না। একজন রাখাল বিদ্রূপের সুরে মন্তব্য করল : একদিলের নিশ্চয় ভোজ রাজার যাদু-বিদ্যা জানা আছে। বিদ্রূপের জবাব দিতে একদিল শাহ্ অনেক বিচিত্র বাঘের সমাবেশ করলেন। সেইসব বাঘের নাম ;—খালদৌড়া, হালিয়া, নিহালা প্রভৃতি। রাখালগণ ভয়ে এবার পীরের কাছে আত্ম-সমর্পণ করল। পীর তাদেরকে কয়েকটি বাঘ-তামাশাও দেখালেন।

এইসব ঘটনার কথা বড়ু খাঁর কানে গেল। সে ক্রুদ্ধ হলো এবং পীরের সাথে কিছু অসদ্ আচরণ করল। পীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বরং তিনি নানা প্রকারে ছুটি খাঁ ও তদীয় পত্নী সম্পত্তির বিশুদ্ধ ভক্তির পরীক্ষা করে খুসী হলেন।

পীর একবার গো-পাল নিয়ে গেলেন কদমতলির বনে। সেখানে তাদের চরাতে চরাতে দেখতে পেলেন ফসলে পরিপূর্ণ এক ধান-খেত। ধান-খেতের মালিকের নাম কুঙর শাহ্। তিনি দক্ষিণ আনোয়ারপুরে বাস করেন। সেই জমির মালিক কুঙর শাহ্কে দেখবার জন্য তিনি এক কৌশল অবলম্বন করলেন। পীর সেই ধানগাছ গরু দিয়ে খাওয়ালেন।

ফসল ক্ষতির সংবাদ গেল কুঙর শাহের কাছে। কুঙর শাহ্ নিজে এসে একদিল শাহকে তিরস্কার করলেন। একদিল শাহ্ বিনীতভাবে জানালেন যে তাঁর অন্যায় হয়েছে, তাঁকে ক্ষমা করা হোক। কুঙর শাহ্ বড়ুয়ার বিড়ম্বনার কথা স্মরণ করে একদিলকে লাঠি দ্বারা মারতে গেলেন। একদিল দৃঢ়তায় তারও প্রতিবাদ করলেন। তখন কুঙর শাহ্ লাঙল কাঁধে নিয়ে রাজ দরবারে অভিযোগ পেশ করলেন।

রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে একদিলের পালক ছুটি খাঁ-কে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। ছুটি খাঁ বুঝলেন,—এটি পীরেরই লীলা।

পীর একদিল এসব ধ্যানযোগে জেনে অদৃশ্যভাবে চলে গেলেন লক্ষ্মী দেবীর নিকট। লক্ষ্মী দেবী তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর আগমনের কারণ জান্‌তে চাইলেন। ধান খেতের ঘটনাটি বলে এ ব্যাপারে পীর চাইলেন লক্ষ্মীর সাহায্য। লক্ষ্মী সানন্দে তাঁকে সাহায্য করতে চাইলেন। বিলম্ব না করে রথ-যোগে উভয়ে গেলেন ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্র তাঁদের অভীপ্সা জানতে পেরে সেই জমিতে বারি বর্ষণ করলেন।

পীরের দোয়ায় আর লক্ষ্মীর বরেতে॥
যেমন আছিল ধান হইল সেই মতে *

পরদিন রাজ দরবারে বাদী-বিবাদী উপস্থিত হল। পীর একদিল শাহ্‌ও উপস্থিত হলেন। ফসলের ক্ষতি হয়নি বলে একদিল শাহ্‌ দৃঢ় অভিমত প্রকাশ কর্‌লে রাজা তা সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য চাঁদ খাঁ, মনোহর খাঁ, শুকদেব ও নরহরি নামক চার ব্যক্তিকে পাঠালেন।

তদন্তকারীগণ এসে দেখলেন যে শস্যের কোন ক্ষতি হয় নি। রাজদরবারে ফিরে তাঁরা যথাযথ বিবরণ দিলেন। সকলে তো হতবাক্‌। রাজা তখন একদিল শাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং ছুটি খাঁর পায়ের বেড়ী কুঙর শাহের পায়ে পরাতে আদেশ দিলেন। ছুটি খাঁ, একদিল শাহ্‌কে কোলে নিয়ে, রাজ-প্রদত্ত ঘোড়ায় চড়ে গৃহে ফিরে এলেন। পথিমধ্যে বড়ু তাঁকে কটু কথা বল্‌লে ছুটি খাঁ বড়ুকে জুতা দিয়ে প্রহার করলেন।

জুতার প্রহার পেয়ে ক্রোধে বড়ু চলে গেল শ্বশুর বাড়ী। পরদিন সে গেল রাজদরবারে ছুটি খাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করতে। রাজা পূর্বেই বড়ুর কুকীর্ত্তির কথা শুনেছিলেন। রাজা তখন মহাপাত্রকে ডাকিয়ে বড়ু ও ছুটির সম্পত্তির ভাগাভাগির ব্যবস্থা করে দিলেন। ভাগ বাঁটোয়ারার জন্য সমস্ত মাল-পত্র ঘরের বাইরে আনা হল। (পুঁথি এখানেই খণ্ডিত হয়েছে)।

পীর হজরত একদিল শাহ রাজীর চরিত্রকেন্দ্রিক এই সুবৃহৎ পাঁচালী কাব্যের আরম্ভে বিশেষতঃ জন্মপালায় আল্লাহ্‌-মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। শিক্ষালাভ পালাও আল্লাহ্‌ মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক। ডাকিনীর পালায় রাজকন্যা ডাকিনীর কথা, কাঞ্চন নগরের পালায় সাহানীর ও ডাকিনীর প্রণয় কথা,

মুরশিদের পালায় বদর পীরের মাহাত্ম্য-কথা, হরিণীর পালায় ও ছুটি'র পালায় ইসলাম এবং একদিল শাহের মাহাত্ম্য-কথা লিখিত হয়েছে। এ সবের ওপরে রস বিচারে কাব্যখানি বাৎসল্য রসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জন্মপালায় পুত্রের জন্য আল্লাহ তালার নিকট আশক মুরির যে আকুল প্রার্থনা তা প্রত্যেক সন্তানকামী মাতার মর্মকথা। পুত্র-বিহনে তাঁর জীবনই বৃথা ;—পুত্র বিহনে ধনবান সাহানীর সদাগরের সংসার নিদারুণ বিষাদাচ্ছন্ন। পুত্রহারা ও স্বামীহারা আশক মুরির বার বছরের সাধনায় যে দশা হয়েছিল তার বিবরণ কৃষ্ণ-বিরহিনী শ্রীরাধার দশ দশার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই পালায় চণ্ডীমঙ্গল বা ধর্মমঙ্গল কাব্যাদর্শে দেব-শিশুর মর্তে আগমনের ন্যায় আল্লাহ্‌ তা'লার নির্দেশে পীর একদিল শাহের মর্তে জন্ম গ্রহণ বৃত্তান্ত রয়েছে। এই পালা আরো স্মরণ করিয়ে দেয় গর্ভবতী নারীর দশমাসের দশ অবস্থার কথা। নারীগণের পরিধেয় যে সব গহনার বিবরণ এই কাহিনীতে দেওয়া হয়েছে সেগুলি উল্লেখযোগ্য। যথা,—গলার হার, সুবর্ণের মালা, কানের জন্য সুবর্ণের কলি, সুবর্ণের চাদর, মাণিকের ছড়া, ঝুমকা, তোড়া, হাসলি, মাদলি, বাজুবন্ধ, পাসলী, অঙ্গুরীয়, কোমরের বহুলতা, সুবর্ণের কঙ্কন, সিতাপাটি, শাড়ী, সিন্দুর, কাজল প্রভৃতি। এই অংশে অলঙ্কার-বহুল দুটি পংক্তি এইরূপ ;—

চন্দনের বিন্দু দিল সিন্দুরের কোলে ॥
চন্দ্রমা উদয় যেন গগন মণ্ডলে * (১।১৭)

শিক্ষালাভ পালায় দেখা যায় আল্লাহ্‌ তা'লা আপন-মাহাত্ম্য বিবৃত করছেন ;—

এলাহি বলেন খোওাজ শোন মেরা ঠাই ॥
ত্রিভুবনের লক্ষ্য আমি আমার লক্ষ্য নাই *
কে বুঝিতে পারে খোওাজ আমার চরিত্র ॥
মনুষ্য মরে মনুষ্য কান্দে সে হয় পবিত্র *
দয়া মায়া থাকিত যদি মেরা শরীরেতে ॥
দুনিয়ার কারবার পারি কি বানাতে *
দয়া হইতে যদি আমি ফিরাই নয়ান ॥
খান খান হইয়া পড়ে জমিন আছমান * (১।২০, ২১)

মাতা-পিতার সঙ্গে পুত্রের বিচ্ছেদের দরুণ যে মর্মবিদারক অবস্থা সৃষ্টি হয় সেই করুণ চিত্র এখানে প্রকৃষ্টরূপে অঙ্কিত হয়েছে। পীরের সে কি হৃদয় বিদারী বেদনা তাঁর মাতা-পিতার জন্য। তাঁর দুঃখে বাঘ ও বাঘিনী পর্যন্ত কাঁদল। পিতা সাহানীরের অবস্থা বস্তুতঃ পাগলের প্রায়। তিনি চোখ বন্ধ করে কাঁদছেন,—চোখ দিয়ে অবিরল ঝরছে অশ্রুধারা। চাদর ছিঁড়ে তিনি কৌপিন পরেছেন, গলায় বেঁধেছেন ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাঁথা, সারা অঙ্গে চূণ-কালি, হাতে হাড়ের গাটুরী আর ভাঙা কালো হাঁড়ি। কবির এই চিত্রাঙ্কন বাস্তবতাসম্মত।

ডাকিনীর পালায় কেবলমাত্র নারী পরিচালিত রাজত্বের বর্ণনা প্রদান কবির বিশেষ কল্পনা শক্তির পরিচায়ক। এই পর্বে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় ঘটনা এই যে—উক্ত রাজ্যের হিন্দু নামধারী রাজা ছত্রজিতের কন্যা ডাকিনীর

কোরাণ-কেতাব বিনে অন্যে নাহি মন॥
পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে খোদার কারণ * (১১৪৮)

অথচ ডাকিনী ব্রাহ্মণের গণনায় বিশ্বাসী। আরো আশ্চর্য ঘটনা এই যে তিনি পূর্বাহ্লেই মুসলমান ধর্মীয় এক ব্যক্তিকে আপনার পতিরূপে গ্রহণ করেছেন। কোন ধর্মীয় সংস্কার তাঁর মনকে এই অভীপ্সা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। সাহানীরের স্ত্রী-পুত্র আছে একথা জেনেও তিনি বিচলিত হলেন না। বরং সাহানীরকে রাজ-সিংহাসনে বসালেন এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। গ্রন্থখানি বাৎসল্য রসের ভিত্তিতে রচিত হিন্দু-মুসলমানের তৎকালীন ঐক্যবদ্ধ জীবনের কাব্য। কবি হয়ত সে সময় যেমন ছিল তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই দেখিয়েছেন। হিন্দুর সহিত মুসলমানের বিবাহ এবং হিন্দুর ধর্মান্তর গ্রহণের ঘটনা—যেন যা ঘটেছে তা ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটেছে। সে জন্য সামাজিক বিরোধিতার কোন স্থান সেখানে ছিল না। যে সকল সংস্কার আজ-কালকার দিনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে থাকে তার কোন দৃষ্টান্ত এই কাহিনীতে পাওয়া যায় না। কারণ বোধ করি, কবির ইচ্ছা—বিরোধ অপেক্ষা মিলনকে বড় করে দেখানো। অথবা আজকার মত সামান্য কারণে সেকালে বিরোধ হত না। এই কাব্য তার অন্যতম প্রমাণ বলে মনে হয়।

একদিল শাহের মাতা বিবি আশক নুরি পুত্রশোকে বিহ্বল, অচেতন। পুত্রের বিরহে আশক নুরি যখন মরণোন্মুখ তখন আল্লার আসন কম্পিত হল। আল্লাহ্‌ তা'লা ডেকে পাঠালেন খওয়াজকে। তাঁর নির্দেশ একদিলকে ফিরিয়ে দাও তার মায়ের কোলে।

একদিল শাহ্‌ এতদিনে মোল্লা আতার ঘরে সন্তানবৎ শিক্ষা-লাভে ব্যাপৃত ছিলেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশে খওয়াজ তৎক্ষণাৎ গেলেন আতার কাছে এবং সেখান থেকে একদিলকে ফিরিয়ে এনে পৌছে দিলেন আশক নুরির নিকট। আশক নুরি অব্যর্থ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

পীর একদিল শাহ্‌ কাব্যের কাঞ্চনা নগরের পালায় মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল বা রায় মঙ্গল কাব্যের ন্যায় সমুদ্র যাত্রা এবং বিভিন্ন নামের জল-যানের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। আরো প্রদত্ত হয়েছে জল যানের নাম। যথা ;—মধুকর, চন্দ্রসেন, খাসিয়া প্রভৃতি। প্রদত্ত হয়েছে গ্রামের নাম। যথা ;—লসমানপুরি, কাকুড়াই, টুঙ্গিপুর, গাজিপুর, ঝাউডাঙ্গা ইত্যাদি।

মাতা-পুত্রের সম্পর্ক বিশেষতঃ সৎমা ডাকিনী এবং সতিন পুত্র একদিলের মধ্যকার সুমধুর ব্যবহার যেন যশোদার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক ও ব্যবহারের সমতুল। এখানে দুই সতিনের যে মিলন-চিত্র তাও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মনসা মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত বেহুলা কর্তৃক লোহার কড়াই সিদ্ধ করার অনুরূপ চিত্রও কাহিনীতে আছে। একস্থানে আছে ;—

বিছমিল্লা বলিয়া বিবি চুলা ফুকে দিল।
বেগর অগনিতে খানা তৈয়ার হইল॥ (১।১৩০)

মুরশিদের পালার ঘটনার সঙ্গে পীর গোরাচাঁদ কাব্যে বর্ণিত ঘটনার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। মোর্শেদ পীর শাহ্‌ জালালের নিকট কঠিন পরীক্ষা দিবার পর পীর গোরাচাঁদ যেমন আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, গুরু-ভক্তির কঠোরতর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তবেই পীর একদিল শাহ্‌ তাঁর গুরু পীর বদরের নিকট দীক্ষা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

এই কাব্যে পীর বদরের উক্তিতে কিছু তত্ত্ব কথা এবং মানুষের জন্ম-রহস্যের কথা সংক্ষেপে স্থান পেয়েছে।

হরিণীর পালায় কবি প্রধানতঃ ইসলাম মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। ইসলামের ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মণ রাজা নছিরাম (লক্ষীরাম ?) বিমুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়েছেন। হরিণী ও তার শাবকদ্বয়কে নিয়ে যে কাহিনী গড়ে উঠেছে তাতেও বাৎসল্য-রসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মাতৃ বিচ্ছেদ হেতু পীর একদিল শাহের জীবনে যে করুণ ঘটনার অবতারণা হয়েছে, এখানেও ঠিক তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এই পালায় পীরের এক বিশেষ অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যে বনের পশুও তাঁর আদেশ পালন করছে।

পীর একদিল শাহ কাব্যে ছুটির পালা সম্ভবতঃ এই কাব্যের বৃহত্তম পালা। এই পালায় যে কাহিনী পীর একদিলকে নিয়ে গড়ে উঠেছে তাতেও রয়েছে বাৎসল্যরসের ফল্গুধারা। এই পালাটি নানা কারণে বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত। কারণগুলির কয়েকটি এইরূপ ;—

১। পীর একদিল শাহের চরিত্র রাখাল-বেশী শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের সঙ্গে মিলে। শ্রীকৃষ্ণের মত তিনিও রাখাল বালকগণের সঙ্গে মাঠে মাঠে গো-পালন করেছিলেন।

২। কালীয় দমন ও গিরি গোবর্ধন ধারণের ন্যায় অলৌকিক কীর্তির সঙ্গে একদিল শাহ্ কর্তৃক ব্যাঘ্র দমন, গো-পাল কর্তৃক তছরূপ করা ধান-জমিতে ফসলের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং অনুরূপ আরো ঘটনা তুলনীয়।

৩। যশোদার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সম্পর্ক ছিল, সম্পতি নাম্নী রমণীর সহিত পীর একদিল শাহের অনুরূপ মাতৃ সম্পর্ক ছিল।

৪। শ্রীকৃষ্ণ যে ভূমিকা নিয়ে রাজা কংসের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন, প্রায় তদনুরূপ ভূমিকা নিয়ে একদিল শাহ্ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন বড়ু মণ্ডলের সঙ্গে।

৫। নিঃসন্তানা যশোদা এবং নিঃসন্তানা সম্পতিও। যশোদার ন্যায় মাতৃ স্বরূপা 'সম্পতি' তাঁর পোষ্যপুত্র একদিল শাহ্‌কে কৃষ্ণের ন্যায় সন্তান-বাৎসাল্যে পালন করেছেন।

৬। পীর একদিল শাহ্ যে ভূমিকা নিয়ে আনোয়ারপুরে নিজেকে জাহির করেছেন তা উল্লেখযোগ্য জনহিতকর কাজের সংগে তেমন যুক্ত নয়। কয়েকটি মাত্র বুজরগীর গল্প যা নিরক্ষর এবং অনুন্নত জনসাধারণের আলাপের বিষয় বস্তু হতে পারে মাত্র।

৭। কাহিনী এমন ভাবে কল্পিত হয়েছে যাতে একদিল শাহ্‌ যেন লক্ষ্মী-দেবী বা দেবরাজ ইন্দ্র সদৃশ দেবতায় পর্যবসিত হয়েছেন। আল্লাহ্‌ তালার সঙ্গে পীরের যে সম্পর্ক তার সত্যতাকে বিকৃত করা হয়েছে। এসব ইসলামী আদর্শের ঘোরতর বিরোধী।

৮। রাজা মন্দির (মহেন্দ্র?) রায়ের দরবারে হিন্দু মুসলমান সকল দেওয়ান আপন আপন কর্তব্য পালনে নিয়োজিত। সেখানে কোনদিন কোন ধর্মীয় বিরোধ হয়েছে এমন উদাহরণ এ কাব্যে নেই। সুবিচারক হিসাবে ও গুণীর সমঝদার হিসাবে রাজা মহেন্দ্র হিন্দু মুসলমান সকলের নিকট প্রশংসা পেয়েছেন।

৯। ছুটি মণ্ডলের ন্যায় মধ্যবিত্ত পরিবারের এমন নিখুঁত চিত্র বিরল। বিশেষতঃ মুসলমান পরিবারের চিত্র বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম একথা বলা অনুচিত হবে না। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে যে বিরোধ সমাজ ব্যবস্থায় আছে তাও এই অংশে বিবৃত হয়েছে।

১০। রাজ-দরবারের বিবরণে পাওয়া যায় রাজকার্য পরিচালনার তৎকালীন চিত্র। রাজা তাঁর দেওয়ানদিগকে যথাযোগ্য সমীহ করতেন। তিনি এতখানি উদার ছিলেন যে রাজমুকুট বিশেষ কারণে সামান্য দেওয়ানের মস্তকে পরিয়ে দিতেও ইতঃস্তত করতেন না। তিনি দুষ্টের দমন করতেন ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে।

১১। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে এই কাব্যের ভাবগত ছাড়া কাব্যগত কিছু কিছু মিলও সুস্পষ্ট। পদাবলীতে আছে,—

আমার শপতি লাগে, না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমনি,

পীর একদিল শাহ্‌ কাব্যে আছে,—

আজ বাছা দূর বনে যেও নারে॥
নিকটে নিকটে রহ আমার অলিরে * (ধূয়াঃ ২।৮৪)

আর একটি ধূয়া লক্ষণীয় ;—

আজি ছুটীর ভাগ্যে ছুটী মিলাবে রে॥
আরে কালা আরে কালা চাঁদ রে * (২।১১৬)

১২। রায়মঙ্গল কাব্যের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় বিভিন্ন বাঘের নামের বর্ণনায়। কালু-গাজী ও চম্পাবতী কাহিনীতেও অনুরূপ বাঘের নাম ও তাদের বিচিত্র চরিত্রের পরিচয় দৃষ্ট হয়। কয়েকটি বাঘের নাম ;—

খালদোড়া, হালিয়া, নিহালা, ভউড়িয়া, কালামুখা, কুকুরমুখা, চউরিয়া, বিদুবাঘ, কালুকা' ভাড়ুকা, নাগেশ্বরি প্রভৃতি। এই সমস্ত বাঘের চরিত্র বর্ণনার নমুনা এইরূপ ;—

আর এক বাঘ এল কপালে তার চিত ॥
কেড়ে খায় কোলের ছেলে বসে গায় গীত * (২।৬৮)
তার পাছে আসে বাঘ খেতের আলে শোয় ॥
এছা কিল মারে যেন বোরে ধান্য রোয় * (২।৬৮)

সব বাঘের প্রধান হল খালদোড়া। খালদোড়া নামটি হয়ত মুদ্রন প্রমাদে খানদোড়ার স্থান অধিকার করেছে। রায়ঙ্গমল এবং কালু-গাজী ও চম্পাবতী কাব্যেও 'খালদোড়ার" নাম পাওয়া যায়।

১৩। শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধেনু চরাবার কালে কদম্বতলে বাঁশী বাজাতে শুনি কিন্তু পীর একদিল শাহকে দেখি তিনি কদম্বের তলায় অন্যান্য রাখাল বালকগণের সঙ্গে ডাং-গুলী খেলা করছেন।

১৪। ইসলাম ধর্মমাহাত্ম্য প্রচারের কোন প্রচেষ্টা এই অংশে পীর একদিল শাহ করেছেন এমন নিদর্শন নেই। কোন হিন্দুর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ নেই। এখানে সংঘর্ষ দেখা গেছে অসদাচরণকারীর সঙ্গে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বা সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান এই কাব্যে নেই।

কবি বাহ্য প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কিছু কিছু বর্ণনা অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে। একটি ঘটনার ছেদের পর আর একটি ঘটনার আরম্ভে দেখা যায় সেই ঘটনার সময় নির্দেশক নিম্নলিখিত পংক্তিটি বেশ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে ;—

রাত্রি পোহাইয়া গেল কুকিলে করে রাও ॥ (২।১৭, ২।৭৭, ২।৬৩, ২।৮৪, ২।৯১, ২।১২৩)

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী বধূর নারীসুলভ ব্যবহার ও জননীর স্নেহময়ী রূপ সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে এই কাব্যে,—

সাড়ির আঁচলে বিবি মোছাইল গাও ॥
সোনা মুখে চুম্ব দিয়া কোলে নিল মাও ।
পীর কোলে লিয়া বিবি বসিলেন দ্বারে ॥
মায়েরে কান্দিতে দেখে পুছিলেন তারে * (২।১০৪)

ডাকিনীর পালার মধ্যে একস্থানে আছে ;—

কোলে বসি একদিল ধুয়ে নিল হাত ॥
মায়ে পুত্রে একস্তরে বসি খায় ভাত * (১।৮৯)

বা, দু হস্তে মায়ের গলা একদিল ধরিয়া ॥
সুখে নিদ্রা যায় পীর রূপের বিনদিয়া * (১।৮৯)

কবি আশক মোহাম্মদ কাহিনী পরিবেশনে যতখানি ব্যগ্র, কাব্যরস বা বর্ণনায় কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে ততখানি সচেষ্ট নন। তবু দুই একটি স্থানে বর্ণনার চমৎকারিত্বকে অস্বীকার করা যায় না ;—

উপনীত হইল পীর রাজ দরবারেতে ॥
আকাশের চন্দ্র যেন নামিল ভূমেতে *
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনে একদিল বরণ ॥
রবির কিরণ নহে তাহার মতন *
কাল মেঘের আড় যেন বিজলির ছটা ॥
কাঁচা সোনা জলে যেন সা-নিরের বেটা *

এই অংশে সংস্কৃত প্রভাবজাত রূপ বর্ণনা লক্ষণীয়। যথা :—

দু আঁখে কাজল অতি দেখিতে উত্তম ॥
চলন খঞ্জন পাখি পাইবে শরম *
হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম কপালে রতন জ্বলে ॥
পীরকে দেখিয়া প্রজা ধন্য ধন্য বলে * (১।১০৯)

সমগ্র কাহিনী ব্যতীত কয়েকস্থলে বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে পদ এবং শব্দগত মিল পরিলক্ষিত হয় ;—

বৈষ্ণব পদাবলীর যেমন—

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব,
কানু হেন গুণ নিধি কারে দিয়ে যাব।

তেমনি,—মরিব মরিব জিরা মরিব নিশ্চয় ॥
কেমনে রহিব ঘরে মোর ঘর নয় * (১।৬২)

আর একস্থানে বিদ্যাপতির পদের স্পষ্ট ছায়া দৃষ্ট হয়,—
তুমি তো জাননা স্বামী নারীর গোসাই ॥
স্বামী বিনে নারীদের কোন লক্ষ্য নাই *
শীতের ওড়ন স্বামী গিরিষের বাও ॥
অসমের কাণ্ডারী স্বামী সোতারের নাও * (১।১১৮)

একদিল পীরের অলৌকিক শক্তিতে প্রভাবান্বিত প্রকৃতির স্বাধীন জীব হরিণী। সেই হরিণী যেমন উক্ত পীরের অনুগত, অনুরূপ আনুগত্যের ঘটনা হলায়ুধ লিখিত (সংস্কৃত হরফে) 'সেক শুভোদয়া' কাব্যে পাওয়া যায়। সেখানে আছে যে সেকের আদেশে সারস তার আহার্য একটি গচি মাছকে মুখ থেকে ত্যাগ করেছে।

রস বিচারে কাব্যখানিকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ গর্ভধারিণী আশক নুরির জীবনপণ সাধনার ধন পীর একদিল শাহ্ শেষবারের মতন যে বিদায় নিয়েছেন সেখানে কাব্যখানি বিয়োগান্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে মাতা "সম্পতি"র সঙ্গে যে গভীর স্নেহ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা শেষ পর্যন্ত অটুট রয়েছে,—কোন কারণে সেখানে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেনি, সুতরাং কাহিনী এখানে মিলনান্ত।

আনওয়ারপুরে পীর একদিল শাহের যে লীলার বিবরণ এই কাব্যে লিখিত হয়েছে তার সঙ্গে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকারের গেজেটে এল্. এস্. এস্. ওমালী কর্তৃক লিখিত বিবরণের কাহিনীর সঙ্গে মূলতঃ কিছু কিছু মিল আছে বটে কিন্তু ডাকিনীর পালা, কাঞ্চন নগরের পালা, মোর্শেদের পালা ও হরিণীর পালার মতন কোন গল্পাংশ সেখানে নেই। বলা বাহুল্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মিহির পত্রিকার (মার্চ সংখ্যায়) পুরাতত্ত্ব বিভাগে লিখিত গল্পের সঙ্গে উপরোক্তরূপ মিল বা গরমিল আছে।

পীর একদিল শাহ্ কাব্যে তিন শ্রেণীর চরিত্র দৃষ্ট হয়। যথা,—দেব চরিত্র মানব চরিত্র ও পশু চরিত্র।

এই কাব্যে দেখা যায় হিন্দুর দেব-দেবী যথাক্রমে ইন্দ্র ও লক্ষ্মী, পীর একদিল শাহের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন। একদিল শাহ্ কেন যে আল্লাহ্ তালার

নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেননি তা বুঝা দুষ্কর। এটি কবির সবলতা না দুর্বলতা তা বিচার্য। সবলতা এই জন্য যে, আল্লাহ্ তালার ফরমানে পীর একদিল শাহ্ লীলা প্রকাশ করতে এসেছেন অথচ সাহায্যের প্রয়োজনে আল্লাহ্ তালাকে বিস্মৃত হয়েছেন। দুর্বলতা এই জন্যই যে, সাহায্য গ্রহণ হিন্দু মুসলমান বিচারের অপেক্ষা রাখে না! যে সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এই কাব্য রচনা তাতে ইন্দ্র ও লক্ষ্মীর নিকট সাহায্য চাওয়ার মধ্যে সমগ্র পীর কাব্য রচনার মূল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

বাঘের মুখে কথা, হরিণীর সঙ্গে পীর একদিল শাহের কথোপকথন এই কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাঘদের দলপতি খালদৌড়ার উত্তরে —

কেন্দু বলে ছোট দেখে তুচ্ছ কর নাই ॥
ভেড়া ছাগল বিনা আমি অন্য নাহি খাই *
বাছুর কুকুর আমি খাই একচিতে ॥
ছেলে খেতে পারি পোয়াতির কোল হইতে *
আমা চাইয়া চোর নাহি খাল দৌড়া ভাই ॥
দশ-বিশের মধ্যে গিয়া ভেলকি লাগাই * (২।৭০)
কার বাপের শক্তি নাই মোকে বন্দি করে ॥
সন্ধ্যাকাল হইলে আমি ফিরি ঘরে ঘরে। *
কার্য্য ধর্ম্মে বুঝিব কাহার কত বল ॥
শুনিয়া হাসিয়া উঠে বাঘ যে সকল * (২।৭১)

এক এক পালায় এক একটি কাহিনী গড়ে ওঠার দৃষ্টান্ত কৃষ্ণহরি দাস বিরচিত বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথি কাব্যে পাওয়া যায়। কৃষ্ণহরি দাস বর্ণিত সত্যপীরের ন্যায় একদিল শাহ্ও মর্তে কর্ম সম্পাদনে আগমন করেছেন।

পীর হজরত একদিল শাহ রাজীর নামে রচিত এই কাব্যখানি বর্তমানে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। বারাসতের কাজীপাড়ার বাহার আলী সাহেবের নিকট যে কাব্যখানি আছে তার অবস্থা খণ্ডিত। তার মধ্যে কাব্যের রচনাকাল বা কবির কার্যকাল বা আর কোন কালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং কাব্যের রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। কারো মতে এই কাব্যের রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ বা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। ২৩

লক্ষণীয় যে আবদুল করিম সাহেব তাঁর পুথি পরিচিতি গ্রন্থে 'একদিন' (একদিল নয়) বলে উল্লেখ করেছেন। এটি তাঁর ত্রুটি, নাকি মুদ্রাকরের ত্রুটি, নাকি আদৌ ত্রুটি নয় তা অনুমান সাপেক্ষ মাত্র। খুব সম্ভবতঃ এটি মুদ্রকরের প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী, শহীদ তিতুমীর প্রভৃতি তথ্যবহুল গ্রন্থের প্রণেতা আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে, একদিল শাহ্ কাব্য নামে একখানি কাব্য ১২৪১ সালে রংপুর জেলার শিতল গাড়ী নিবাসী আশক মোহাম্মদ রচনা করেন। [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।][২৩] অতএব আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্যে এই কাব্যের রচনাকাল ১৮৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দ। এই কালকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেওয়া যায় না। কারণ কবি আশক মোহাম্মদের বসতি অন্ততঃ এই কাব্যের রচয়িতা শিতলগড়ী গ্রামে ছিল না। কবি নিজে তাঁর কাব্যের ভণিতায় লিখেছেন,—

আশক মহাম্মদ কহে জোনাবে সবায় ॥
হরিপুর গ্রাম বিচে বসত যাহার * (১।১৩২)

এখন হরিপুর বল্‌তে যে কোন্ হরিপুর বুঝায় তার হদিশ পাওয়া যায় না; কারণ একাধিক হরিপুর আছে বলে জানা যায়। তবে বারাসত মহকুমার অন্তর্গত বারাসত থানাধীন হরিপুরকে আমাদের বিতর্কিত হরিপুর বলে মনে হয়। কারণ ;—

১। রায় মঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যের প্রভাব আশক মোহাম্মদের পীর একদিল শাহ কাব্যে সুস্পষ্ট। রায় মঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কৃষ্ণরাম দাসের বাড়ী ছিল নিমতা গ্রামে এবং মনসা বিজয় কাব্যের রচয়িতা বিপ্রদাস পিপলাই-এর বাস ছিল ছোট জাগুলিয়া গ্রামে। এই হরিপুর গ্রাম উক্ত নিমতা ও ছোট জাগুলিয়া গ্রামদ্বয়ের মধ্যস্থলে অতি সন্নিকটে অবস্থিত।

২। হরিপুর গ্রামের আদি বাসিন্দা বিনোদ মণ্ডল। বহুদিন আগে যশোহর থেকে তিনি এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বংশের বর্তমান বয়োঃজ্যেষ্ঠ মোহাম্মদ আজিজার রহমান সাহেব জানালেন যে বহুদিন পূর্বে তাঁদের পরিবারে মধুমিঞা নামে একজন গুণী ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবতঃ মধু মিঞা আমাদের আলোচ্য আশক মহাম্মদ

ওরফে হেলু মিঞা একই ব্যক্তি। কারণ, 'হালু ফারসী শব্দের অর্থ ধ্বংস; আবার হালু অন্য অর্থে মিষ্ট দ্রব্য বিশেষ। মধু ও হালু এই জন্যে সমার্থক। মধু মিঞা সম্ভবতঃ তাঁর ডাক নাম ছিল। ঐ ডাক নামের পরিবর্তে তিনি 'হেলু' এই নাম গ্রহণ করে থাকতে পারেন। হয়ত তাঁর মুসলমানী মূল নাম ছিল আশক মহাম্মদ। বলা বাহুল্য, কবি একস্থানে লিখেছেন ;—

রচে আশক মহাম্মদ একদিলের পায় ॥
ওরফেতে হেলু মিয়া জানিবে সবায় *(১১১৯)

৩। হরিপুর গ্রামের সমগ্র অধিবাসী মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত বিনোদ মণ্ডলের বংশধর। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে এক হিন্দু পরিবার এখানে এসে বাস করতে আরম্ভ করেন। যা হোক্, মধু মিঞা হিন্দু বংশ সম্ভূত পরিবারের সন্তান বলে তিনি হিন্দু সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেননি,—যার ফলে তাঁর কাব্যে প্রধানতঃ কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য মনসা-মাহাত্ম্য ও চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রভাবিত মনোভাবের খুব স্পষ্ট ছায়াপাত হয়েছে।

৪। কাব্যের ভাষা বারাসত অঞ্চলের এবং এই কাব্যে ব্যবহৃত বহু শব্দ এতদ্ স্থানের আঞ্চলিক শব্দ।

"বড়খাঁ গাজী" নামক আর একখানি পুথির রচয়িতার নাম সৈয়দ হালু মিয়া বলে জানা যায়। তাঁর উক্ত পুথির রচনা কাল অষ্টাদশ শতাব্দী। [পুথি পরিচিতি।][২৩] পীর একদিল শাহ কাব্য রচয়িতা আশক মহম্মদ ওরফে হেলু মিয়া এবং বড় খাঁ গাজী গ্রন্থ রচয়িতা হালু মিয়া যদি একই ব্যক্তি হন তবে এই কাব্যের রচনা কাল অষ্টাদশ শতাব্দী হতে পারে।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরীর "কথোপকথন" সর্ব প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক। অতএব উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলা ভাষায় ইংরেজী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। আশক মোহাম্মদ বিরচিত পীর একদিল শাহ্ কাব্যে ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। তাছাড়া অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী আধিপত্য প্রসারের মুখে আরবী, ফারসী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার কমে আসতে থাকে। এই কাব্যে আরবী, ফারসী শব্দের সুপ্রচুর ব্যবহার দেখে মনে হয় কাব্যখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হয়েছিল।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে 'মিহির' নামক পত্রিকায় পুরাতত্ত্ব বিভাগে একদিল শাহের যে কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল, [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

পাঠাগারে পত্রিকাখানি প্রাপ্তব্য] তার সঙ্গে পীর একদিল শাহ্ কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর মূলগত মিল থাকলেও কিছু বিশেষ বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয় যে দুইটি কাহিনীর ভাষার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের ভাষার সাথে নিম্নলিখিত ভাষার তুলনা লক্ষণীয় ;—

ক) এক সময়ে সাহ নিল নামক এক রাজা বাস করিতেন ; তিনি আশেক নুরি নামক একজন স্ত্রীলোকের পানি গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহারা অপুত্রক ছিলেন। (মিহির পত্রিকা)।[৫১]

খ) আলার দোহাই লাগে তোমার উপরে,
এমত শুনিয়া খিদা নিবিল উদরে।
একিন করিয়া সাধন করিতে লাগিল,
রুপি-জিরে ডাকি বাত করিতে লাগিল।

(পীর একদিল শাহ্ কাব্য ঃ আশক মহম্মদ)।

আরবী-ফারসী প্রভৃতি শব্দ ধর্মীয় সংস্কারের প্রেরণায় ব্যবহৃত হয়েছে। এই কাব্য কবি কর্তৃক যথারীতি লিখিত। গাজী সাহেবের গীতের ন্যায় গায়কের মুখের গান শুনে উহা লিখিত নয়। তা ছাড়া ভাষার যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি তা থেকে অনুমান করা সঙ্গত যে, এই কাব্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্বে রচিত।

অতএব আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে এই কাব্য রচিত হয়েছিল বলা হয়েছে তা যুক্তি নির্ভর নয়। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য ;—

১। 'বড় খাঁ গাজী' নামক গ্রন্থ প্রণেতা হালু মিয়া ও 'পীর একদিল শাহ্ কাব্য' রচয়িতা হেলু মিয়া যে পৃথক ব্যক্তি বা একই ব্যক্তি নন এমন কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং উক্ত দুই নামধারী কবি যদি একই ব্যক্তি হন তবে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী আশক মহম্মদ ওরফে হেলু মিয়া রচিত এই কাব্যের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

২। এই কাব্যে যখন কোন ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হয়নি এবং অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহারের যথেষ্ট প্রবণতা ছিল তখন আরবী-ফারসী শব্দ বহুল এই কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে মনে করা স্বাভাবিক।

৩। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে খৃষ্টান মিশনারীগণ খৃষ্ট-ধর্ম প্রসারের জন্য যে ব্যাপক প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেছিল তাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য ইসলামি কঠোর রীতি-নীতির ক্ষেত্রে কিছু উদারতা এনে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সাহায্যকারী ভাবধারায় আল্লাহ্-মাহাত্ম্য ও শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ লীলার ন্যায় লীলাবহুল কাহিনীর অবতারণা করা কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

সুতরাং উপরোক্ত কারণ ত্রয়ের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এই কাব্যখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই লিখিত হয়েছিল কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রসারের অভাবের দরুণ বিলম্বে সম্ভবতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়ে থকাবে।

পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজী যে কোন সময়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বা কোন সময়ে দেহত্যাগ করেছিলেন বা কোন সময়ে আনোয়ারপুর পরগণায় অবস্থিতি করেছিলেন তার প্রমাণযোগ্য কোন নথিপত্র পাওয়া যায় না। আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব তাঁর 'বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে পীর একদিল শাহ্ রাজী এতদ্-অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজীর সঙ্গে আগমন করেছিলেন। পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজীর কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ বা শেষার্ধ পর্যন্ত বলে অনুমান করা হয়েছে। সেই সূত্রে পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজীর কাল আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত। আনওয়ারপুরে তাঁর অবস্থিতি কাল চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে বলেই অনুমান করা সমীচীন।

পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজীর অলৌকিক কীর্তিকলাপ বিষয়ক অনেক লোককথা প্রচলিত আছে। এইসব লোককথাকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হল। যথা,—পুস্তকে মুদ্রিত লোককথা, আর সংকলিত (যার কিছু কিছু অত্র প্রকাশিত) লোক কথা। পুস্তক আকারে

প্রকাশিত লোককথাগুলির অধিকাংশই আবদুল আজীজ আল্ আমীন সাহেব রচিত "ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী" নামক পুস্তকে আছে। তাদের সংখ্যা ও শিরোনামা নিম্নরূপ ;—

১। ছোট মিঞার আলয়ে
২। রাখাল বেশে
৩। শস্যহীন জমিতে শস্যের সমাবেশ
৪। ডোবে জাহাজ ওড়ে শালিখ
৫। আম্র হতে রক্তধারা
৬। রামমোহন রায়ের বংশধর
৭। বাইশ শত বাহান্ন বিঘা জমি
৮। অবিশ্বাসী চোরের অভিনব সাজা
৯। পবিত্র পুষ্করিণী
১০। অন্ধ পেল চোখের আলো
১১। বসন্তবাবুর বদান্যতা
১২। রওজাপাকের তত্ত্বাবধানে।

আমার নিজস্ব সংকলিত কয়েকটি লোককথা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা হল—তার মারফৎ পীরের অলৌকিক কীর্তিকলাপ আজো জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচারিত।

১। ছড়ির সাহায্যে গঙ্গা পার

পীর হজরত একদিল শাহ্ সর্বক্ষণের জন্য ফকির একটি ছোট ছড়ি ব্যবহার করতেন। এটিকে বলা হত তাঁর 'আশাবাড়ি।' এই ছড়ি বা আশাবাড়ির সাহায্যে তিনি অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতেন। তিনি আনোয়ারপুর পরগণায় আসবার পথে গঙ্গানদী পার হওয়ার সময় এই ছড়ির সাহায্য নিয়েছিলেন। তিনি নাকি তাঁর হাতের ছড়ি বা আশা-বাড়িটি গঙ্গানদীর উপর আড়াআড়ি ফেলে দেন। ঐ আশাবাড়িটি নৌকার কাজ করে,—অর্থাৎ সেই ছড়ির উপর চ'ড়ে নাকি তিনি অনায়াসে গঙ্গা নদী পার হয়ে আসেন।

২। বেড়ু বাঁশের ঝাড়

পীর হজরত একদিল শাহ্ হাতে যে বাঁশের ছড়ি ব্যবহার করতেন সেটা ছিল বেড়ু নামক এক বিশেষ জাতের বাঁশের ছড়ি। জায়গীরপ্রাপ্ত আনওয়ার-পুর পরগণা অভিমুখে তিনি এই ছড়ি হাতে নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। অবশেষে তিনি আনোয়ারপুর পরগণায় এসে উপস্থিত হন। তিনি তাঁর নির্দেশিত দেশে এসেছেন জেনে তাকে চিহ্নিত করার জন্য হস্তস্থিত সেই বেড়ু বাঁশের কঞ্চির ছড়িটি মাটিতে দৃঢ় ভাবে পুঁতে দেন। সেই ছড়ি থেকে বংশ বিস্তৃত হয়, এবং ঘন বাঁশবনে পরিণত হয়। পীরের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ সেই বেড়ু বাঁশের ঝাড়ের বাঁশ কেউ কাটত না। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছু সৈনিক ঐ বাঁশঝাড়ের কাছে তাবু ফেলেছিল। তারা অবহেলায় বাঁশ ঝাড়টির প্রভূত ক্ষতি সাধন করে এবং পীরের কথা প্রসঙ্গে তারা তাঁর প্রতি অশোভন উক্তি করে। যে সৈনিক বাঁশঝাড়ের ক্ষতি করেছিল তাকে বিষাক্ত সর্পে দংশন করে যাতে অবিলম্বে তার মৃত্যু হয়। বলা বাহুল্য, বারাসত মহকুমা শাসকের বাংলোর পশ্চাদ্দেশে যশোহর রোডের ধারে সে বেড়ু বাঁশের বংশ-অবশেষটুকু এখনও (১৯৫০ খৃঃ) দৃষ্ট হয়।

৩। চাঁদ খাঁর মসজিদ্

বারাসত থানার অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণপুর মৌজায় বাস করতেন আনওয়ারপুরের সুপ্রসিদ্ধ শাসক চাঁদ খাঁ। পীর একদিল শাহ্ একদিন যুবকের বেশে চাঁদ খাঁর বাড়ীতে গিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কিছু আহার্য ভিক্ষা করলেন। চাঁদ খাঁর ভ্রাতা নূর খাঁ, তাঁকে সবলকায় যুবক দেখে ভিক্ষা দিতে অস্বীকৃত হন। নূর খাঁ বললেন "তুমি তো যথেষ্ট সামর্থ্যবান যুবক। শ্রমের বদলে অর্থোপার্জ্জন করে তুমি অভাব মোচন কর না কেন?"

একদিল শাহ্ নিরুত্তর রইলেন। নূর খাঁ পুনরায় বললেন, "আমাদের মসজিদ তৈরী হচ্ছে তুমি ওখানে গিয়ে কাজ কর, নিশ্চয়ই তুমি পারিশ্রমিক পাবে, তখন তোমাকে আর ভিক্ষা করতে হবে না।"

পীর সাহেব তাতে অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি মসজিদের কাছে যোগদান করলেন; কিন্তু তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতে সংকল্প নিলেন। তিনি একখানি বিশাল এবং ভারী পাথর মসজিদের উপর এমন কৌশলে স্থাপন করলেন যে তার উপর আর একখানি ইটও স্থাপন করা

যায় নি। অর্থাৎ মসজিদের কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। তাই কখন কোন অসম্পূর্ণ কাজের তুলনা দিতে হলে লোকে বলেন, "চাঁদ খাঁর মসজিদ্।"

৪। বাঘ ও বক কথা

পীর একদিল শাহ্ কাজীপাড়ায় থাকা কালে ছুটি খাঁ ও তদীয় পত্নী সম্পতির পীরভক্তি পরীক্ষা করার জন্য একদিল এক কৌশল অবলম্বন করলেন।

গরুর পাল নিয়ে তিনি মাঠে চরাতে গিয়েছিলেন। ঐ পালে ছিল সাত শত গরু। তিনি জিগীর ছেড়ে সেই সাত শত গরুকে সাতশত বকে রূপান্তরিত করে শূন্যে উড়িয়ে দিলেন। বকগুলি গিয়ে বস্‌ল বড়ু মণ্ডলের বাড়ীর আশ-পাশের গাছে।

পীর ধূলাবালি মেখে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে এলেন। রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন সম্পত্তি। পীর জানালেন যে খেলা কর্‌তে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়্‌লে গরুগুলি কোথায় চলে গেছে, তিনি আর তাদের খুঁজে পাচ্ছেন না। রাজদরবার থেকে ছুটি খাঁও এসে সে বিবরণ শুন্‌লেন। তার উত্তরে একদিল শাহ্‌কে ভক্তিভরে স্বামী-স্ত্রী বল্‌লেন, –

ঘর দ্বার গরু যাক্ তার নাহি দায় ॥
আমরা বিকিয়েছি তোমারই যে পায় *

কিন্তু বড়ু মণ্ডল অন্ধ হয়ে ছুটি খাঁকেও তিরস্কার কর্‌তে লাগ্‌ল। ছুটি তীব্রভাবে বড়ুকে ভর্ৎসনা করে বিদায় দিলেন।

রাত্রি গভীর হতে লাগল। সকলে আহার সেরে নিদ্রামগ্ন হল। রাত্রি আরো গভীর হলে পীর ঘরের বাইরে এসে কদম্বতলায় দাঁড়াতে সেই সমস্ত বক মাটিতে নেমে এল। এবার পীর হুঙ্কার ছাড়লেন,—বকগুলি তখন বাঘে রূপান্তরিত হল এবং একে একে গোয়ালে প্রবেশ কর্‌ল। পরদিন পীরের এই বুজরগী দেখে বাড়ীর সকলে বিস্ময়ে হতবাক হলেন।

৫। মাড়োয়ারী ভদ্রলোকদ্বয়ের বাদুড় শিকার

বারাসত থানার অন্তর্গত পাটুলী নামক গ্রামে পীর একদিল শাহের নামে একটি স্মৃতিস্থান আছে। সেখানকার বটগাছে এবং বাঁশঝাড়ে অসংখ্য বাদুড় বাস করে। একদিল শাহের প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ সে বাদুড় কেউ হত্যা করে না।

একবার এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের জনৈক সন্তান কি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। কোন ডাক্তার বা কবিরাজ তাকে নিরাময় করতে সক্ষম হননি। ভদ্রলোক আকুল হয়ে কোন ভরসা না পেয়ে হতাশায় ভেঙে পড়লেন। এমত অবস্থায় একরাত্রে তিনি স্বপ্নযোগে একটি ওষুধ পান। সেই ওষুধের অনুপান হল বাদুড়ের মাংস। তবে সে বাদুড় যে-কোন স্থানের বাদুড় হলে চল্‌বে না,—পাটুলীর বটগাছের বাদুড়ই হওয়া চাই। তবেই তাঁর সন্তানের জীবন রক্ষা হতে পারে।

ভদ্রলোক একদিন পাটুলী গ্রামে বন্দুক হাতে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন বাদুড় শিকারের জন্য। এই স্থানের বাদুড় শিকার স্থানীয় লোকের সংস্কার বিরোধী কাজ। এ হেন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য স্থানীয় লোক এগিয়ে এসে তাঁকে নিষেধ করলেন। মহারাষ্ট্রীয় সেই ভদ্রলোক অনেক ভেবে-চিন্তে অবশেষে পীর একদিল শাহের প্রতি প্রণতি জানিয়ে তাঁদেরকে বল্‌লেন ;—"আমার পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য আমি স্বপ্নে এই আদেশ পেয়েছি। সুতরাং এতে কোন অপরাধ নেই।"

তিনি পুনরায় পীর একদিল শাহের প্রতি অসীম ভক্তি প্রকাশ করলেন। পরে বাদুড় শিকারের উদ্যোগ করতে জনসাধারণ তাঁকে পুনরায় বল্‌লেন,—"এ বাদুড় মারলে আপনার সমূহ ক্ষতি হবে।"

ভদ্রলোক তাতেও বিচলিত হলেন না। বার বার পীর একদিল শাহ্‌কে শ্রদ্ধা জানিয়ে বন্দুক চালনা করে দুটি বাদুড় শিকার করলেন। অবশ্য বাদুড় শিকারের পর মিষ্টান্ন সংগ্রহ করে তিনি পীরের নামে লুট দিলেন এবং স্বগৃহে ফিরে গেলেন।

পরে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, ভদ্রলোকের কোন ক্ষতি হয়নি, বরং বাদুড়ের মাংস অনুপান হিসাবে ব্যবহার করায় তাঁর সন্তান সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছিল।

অনেকে মনে করেন যে, এতে কিছু অলৌকিকত্ব নেই। কারণ প্রাণী বা উদ্ভিদাদির সাহায্যে রোগ প্রতিষেধক ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। বাদুড়ও কোন কোন রোগমুক্তির জন্য ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৬। ভূতের কবলে ভূতের ওঝা

উপরোক্ত পাটুলী গ্রামের মধ্যে অবস্থিত পীর একদিল শাহের স্মৃতি-স্থানের পাশে এক বিশাল জলাভূমি আছে। সেই জলাশয় এবং তার ওপারে নাকি

রয়েছে ভূত প্রেতের এক ঘাঁটি। রাত্রে তো দূরে থাক্, নির্জন দুপুরেও কেউ বড় একটা সেখানে যায় না।

এতদ্ অঞ্চলের বিখ্যাত ওঝার নাম কসিমুদ্দিন। ভূত-প্রেত নাকি তাঁর হুকুমে ওঠে-বসে—তাঁর বান্দা! গভীর রাত্রে নাকি তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করেন। প্রেতেরা তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করে, কথাও বলে।

একবার মাছের মরশুমে তিনি সেই জলাভূমিতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। রাত তখন সুগভীর;—সাথী তাঁর পুত্র আজগার। অবশ্য আজগার খুবই সাহসী এবং বলবানও।

জাল ফেল্ছে তো ফেল্ছে, একটিও মাছ পড়্ছে না তাতে। কসিমুদ্দিন বুঝেছে যে মেছোভূত তাঁকে বিরক্ত করছে। তিনি ধমক দিলেন সেই মেছো ভূতকে,—কিন্তু কোন ফল হল না। পুত্র অজগার ক্ষিপ্ত হয়ে জালের মধ্যকার একটি মাছকে তীব্রগতিতে লাঠির আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে সেই মৎস্যাকৃতি ভূত বেদনায় এক বিকট আওয়াজ করে এবং সে সেস্থান ত্যাগ করে জলাশয়ের ওপারে চলে যায়। সেখান থেকে তার সাথী অসংখ্য ভূত-প্রেতকে সঙ্গে নিয়ে আলেয়ার মতন হয়ে রণংদেহি ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে এগিয়ে আস্তে থাকে।

সে রাত্রে কি যেন এক অব্যক্ত দূর্বলতা কসিমুদ্দিন সাহেবের সমস্ত দেহ-মন অসাড় করে দেয়। তিনি ভয় পেয়ে যান এবং পুত্র আজগারকে বলেন,—"আজ ভাব খুবই খারাপ। চল আমরা একদিল শাহের দরগাহে আশ্রয় নিই।"

তাঁরা আর বিলম্ব না করে দ্রুত পীরের উক্ত পবিত্র স্মৃতিস্থানে এসে আশ্রয় নেন এবং একদিল শাহের নাম স্মরণ করতে থাকেন।

সেই ভূতের দল তাঁদেরকে নাকি তাড়া করে এগিয়ে এসেছিল বটে কিন্তু পীরের স্থানে প্রবেশ করতে পারেনি। দূর থেকে খোনা খোনা সুরে নাকি বলেছিল,—"দরগায় না উঠ্লে তোদের আজকে কাদায় পুতে রাখ্তাম।"

ভোর হয়ে গেলে বাপ-বেটা বাড়ীতে ফিরে সকলকে এই ঘটনার কথা বলে।

অনেকে মনে করেন যে, মাঠের ওপারের অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক ও কসিমুদ্দীন প্রমুখের মাছ ধরার স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব হওয়াটা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে এক পক্ষ পশ্চাদাপসরণ করে আশ্রয় নিল পীর একদিল শাহের নজরগাহে। পীর সাহেব তাঁর কাজের দ্বারা হিন্দু মুসলিমের নিকট এতখানি শ্রদ্ধেয়

হয়েছিলেন যে বিপক্ষীয় ব্যক্তিগণ চড়াও হয়ে পীরের নজরগাহে প্রবেশ এবং আক্রমণ করেনি।

৭। পীরের নামে রাখাল-ভোজ

উক্ত পাটুলিগ্রামের রাখাল বালকেরা প্রতি বছর কাজীপাড়ার মেলার প্রথম দিনে পাটুলীগ্রামের উক্ত পীর-স্মৃতিস্থানে চড়ুইভাতি করে থাকে। প্রবাদ যে, রাখাল-রূপে পীর একদিল শাহ্‌ পীর-স্মৃতিস্থানে নাকি অন্যান্য রাখাল-বালকদের সঙ্গে চড়ুইভাতি করতেন।

উক্ত গ্রামের রাখাল বালকগণ দলবদ্ধভাবে বাড়ী বাড়ী ঘুরে চড়ুইভাতির উপকরণ সংগ্রহ করত। একবার দেশে খুবই অভাব-অনটন দেখা দিলে গ্রামবাসীগণ তাদেরকে কোন প্রকারে সহায়তা করেনি। পীরের স্মৃতি রক্ষার প্রচলিত প্রথা রহিত হওয়ার আশঙ্কায় দুঃখে তারা দিশাহারা হয়ে দলবদ্ধভাবে বারাসত মহকুমা শাসকের আদালত-সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং শ্লোগান দিয়ে শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শাসক মহোদয়, (কথিত যে তাঁকে সকলে অমৃত লাল বাবু বলে জানতেন) তাদের কথা অবধান করেন এবং অবিলম্বে সেই গ্রামের মাতব্বর-স্থানীয় কয়েকজন অধিবাসীকে ডেকে পাঠান। শাসক মহোদয় তাঁদেরকে বুঝিয়ে বলেন যে জীবন রক্ষার জন্য যতটুকু আহার্য তাঁরা গ্রহণ করেন তা পীরের নামে উৎসর্গ করতঃ যদি চড়ুইভাতি করা হয় তবে তাতে এদের পদগৌরব বৃদ্ধি পাবে এবং সুকুমারমতি বালকগণও পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হবে। অতএব তাঁরা যেন চিরাচরিত প্রথার লঙ্ঘন না করেন।

এরপর থেকে এই গ্রামে রাখাল ভোজপ্রথা আজিও (১৯৭১) প্রচলিত আছে।

৮। মহিম রায়ের রাখাল

বারাসতের মহিম রায়, তাঁর গরুর পাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন রাখাল রেখেছেন। এই রাখালই যে ছদ্মবেশী পীর একদিল শাহ্‌ তা কারো জানা ছিল না।

গরুগুলির বসবাসের উপযুক্ত গোয়ালঘর না নির্মাণ করে দেওয়ায় বা নানাভাবে তাদের অযত্ন করায় রাখাল পীর একদিল শাহ্‌ অসন্তুষ্ট হয়ে প্রতিবাদ

করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে বচসার সূত্রপাত হয়। বচসার শেষ পরিণতিতে মহিম রায় পীর সাহেবকে প্রহার করতে উদ্যত হন। মহিম রায় তাঁকে নাগালের মধ্যে পান নি;—কারণ পীর নাকি সামনের সাঁতরাদের পুকুরের জলের উপর দিয়ে খড়ম পায়ে দ্রুত পার হয়ে যান।

পরে রাত্রে পীর একদিল শাহ্‌ স্বপ্নে মহিম রায়ের নিকট আপনার পরিচয় দান করেন।

এই ঘটনা প্রচারিত হওয়ার পর রায়-ষ্টেটের লোকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কালে রাজা রাম মোহন রায়ের ষ্টেট্‌ থেকে পীরের স্মরণে বহু পীরোত্তর জমি প্রদত্ত হয়েছিল।

৯। পাথর ভাসে পুকুর জলে

শ্রীকৃষ্ণপুরের জমিদার চাঁদ খাঁর অসম্পূর্ণ মসজিদে স্থাপিত বিশাল এবং নিদারুণ ভারী পাথর কালক্রমে ভেঙে পড়ে মাটিতে এবং পাশের পুকুরে গড়িয়ে আসে। পীর একদিল শাহ্‌ কর্তৃক স্পৃষ্ট এই পাথরটি নাকি সচল ছিল। পাথরটি নাকি পুকুরের জলে ভেসে বেড়াত। সাধারণ মানুষ তাকে কখনো এ ঘাটে কখনও ওঘাটে দেখতে পেত। অথচ কোন লোক সে পাথরকে ধরতে পারত না। কোন রমণীর অশৌচ আচরণে পাথরটির চলা ফেরা করার সেই অলৌকিক শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। কালক্রমে সে পাথর দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি সেই পাথরকে নাকি তাঁর কটিদেশের উপরে উত্তোলন করতে পারেন নি। পুকুরের জল অনেকখানি শুকিয়ে গেলে, চৈত্র-বৈশাখ মাসে একখানি পাথর আজিও পুকুরের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

১০। আশ্চর্য বাঁশের খুঁটি

পীর একদিল শাহের যে রওজা সৌধ এখন রয়েছে প্রথম অবস্থায় তা ছিল একটি খড়ো ঘর মাত্র। পীর সাহেব এই ঘরেই অবস্থান করতেন। এটিই তাঁর সমাধিস্থান। সেই খড়ো ঘরখানি মাঝে মাঝে অন্ততঃ প্রতি বৎসরে একবার করে মেরামত করতে হত। একবার ঘরখানির চালের রো এবং খুঁটি বদল করার সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল।

ঘরের মিস্ত্রি অর্থাৎ ঘরামি মাপসহ রো বা খুঁটি কেটে নিলেন। অন্যান্য কাজ সেরে পরে সেই মাপ ঠিক আছে কিনা যাচাই করতে গিয়ে তিনি দেখতে-

পেলেন যে সেই বাঁশখণ্ড নির্দিষ্ট মাপ অপেক্ষা বড় কিংবা ছোট হয়ে গেছে। তিনি বিস্ময়ে বিভ্রান্ত হয়ে পীর একদিল শাহের শরণ নিলেন। পরে তিনি সেই বাঁশখণ্ড চালে লাগাতে গিয়ে দেখলেন যে তা ঠিক মাপসই হয়েছে। এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন তিনটি খুঁটি বহুদিন যাবত উক্ত দরগাহ স্থানে নাকি জীবিত অবস্থায় অর্থাৎ কাঁচা ছিল। সাধারণ লোকে তা বহুদিন প্রত্যক্ষ করেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে জনৈক বিকৃত মস্তিক ব্যক্তি অশৌচ অবস্থায় ছুঁয়ে ফেলায় বাঁশ খণ্ড তিনটি শুকিয়ে যেতে থাকে। বর্তমানে (১৯৭১) বাঁশ তিনটির মাত্র দুটি আছে এবং তা দরগাহের সেবায়েতগণ পীরের অলৌকিক কীর্তির নিদর্শন স্বরূপ একপাশে সযত্নে রেখেছেন।

১১। বসন্ত বাবুর বদান্যতা

বারাসতের অন্যতম স্বনামধন্য এলোপ্যাথ চিকিৎসক ডাঃ বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি আনুমানিক ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে একদিল শাহের নজরগাহের একপাশে তাঁর বসতবাটী নির্মাণ করাচ্ছিলেন। রাজমিস্ত্রিদের যিনি প্রধান ছিলেন, তাঁর নাম উজির আলি। মিস্ত্রি সেদিন উক্ত বাড়ীর ছাদ ঢালাই করছিলেন। সে রাত্রিতে প্রায় বারোটা-একটা পর্যন্ত দারুণ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কাজ চল্‌তে থাকে। ফলে পীর একদিল শাহের নজর-গাহে প্রতিদিনকার মত ধূপ-বাতি দিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিস্মৃত হয়ে যান।

জ্যোৎস্না-প্লাবিত গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ। উজির আলী পেটে ঈষৎ বেদনা অনুভব কর্‌লেন। তিনি আর ঘুমাতে পারলেন না। উঠে বসে কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁকে পায়খানায় যেতে হল। দূর থেকে তিনি দেখলেন, সাদা আলখাল্লা পরিহিত দীর্ঘকায় এক ফকির নজরগাহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। কৌতুহলী হয়ে তিনি আরো নজর করে দেখলেন,—সেই ফকিরের গায়ের রং ফর্‌সা, মুখভরা সাদা গোঁফ-দাড়ি। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ স্বরে বল্‌ছেন,—"এখানে আজ এরা ধূপ-বাতি দিতে নিশ্চয়ই ভুলে গেছে। বোধহয় কাজে খুবই ব্যস্ত ছিল।"

কিছু থেমে তিনি আরো বল্‌লেন—"যাক্‌, তাতে আর কি হয়েছে!"

এর পরই তিনি মাথা নীচু করে সেই এক-দরজার নজরগাহের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন। উজির আলি যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তিনি সেই

দরবেশকে দেখবার জন্য দ্রুত সেখানে গেলেন এবং ঘরের মধ্যে তাঁকে অনুসন্ধান করলেন; কিন্তু তিনি দেখলেন ঘরটি জনমানব শূন্য। তিনি তৎক্ষণাৎ বাইরে এদিক-সেদিক অনুন্ধান করলেন, কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

মিস্ত্রী উজির আলী অবিলম্বে সাথী মিস্ত্রিদের ডেকে তুললেন। তাদের প্রত্যেককে প্রশ্ন করে জানলেন যে সেদিন কেউই সেই নজরগাহে ধূপ-বাতি দেয়নি। উজির আলী সাহেব তখনই সেখানে ধূপ-বাতি দেবার ব্যবস্থা করেন।

পরদিন সকালে উজির আলী সাহেব ঘটনাটি সকলের নিকট বিবৃত করেন। ডাঃ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ও তা অবগত হন। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বসতবাটী নির্মাণের সাথে সাথে কাঁচা গৃহটি পাকা গৃহে রূপান্তরিত করেন। তিনি সেই সাথে উক্ত নজরগাহে নিয়মিত ভাবে ধূপ-বাতি দিবার বন্দোবস্ত করেন। সে রীতি আজো (১৯৫১) প্রচলিত আছে।

১২। কে এই দরবেশ

উপরোক্ত ডাঃ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান কনককুমার চট্টোপাধ্যায় একদিন সন্ধ্যায় দোতলার ঘরে বসে পাঠ অভ্যাস করছিলেন। কখন তাঁর তন্দ্রাভাব এসেছিল তা তিনি জানেন না। হঠাৎ তন্দ্রা টুটে গেলে সামনে দেখতে পান নজরগাহের ছাদের উপর বসে আছেন সাদা আলখাল্লা পরা দীর্ঘকায় এক ফকির। তিনি ভয় পেয়ে চীৎকার করে ওঠেন। চীৎকার শুনে সেখানে ছুটে আসেন তাঁর মা অর্থাৎ ডাঃ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী। ঘটনাটি তিনি মাতার কাছে বলেন। ততক্ষণে সে মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে যায়। শ্রীমান কনকের মা শুধু বললেন,—"এই ফকির বেশধারী দরবেশই হলেন পীর একদিল শাহ্।"

১৩। একদিল শাহের আঁইট

পীর একদিল শাহ্ রাখাল বেশে আনোয়ারপুর পরগণায় বিভিন্ন মাঠে গরু চরাতেন। বর্ষার দিনে গরু নিয়ে তিনি খুব দূরবর্তী মাঠে যেতেন না। কাজীপাড়ার দক্ষিণ প্রান্তে বর্তমান বারাসত সদর হাসপাতালের নিকটের মাঠে বর্ষার দিনগুলি কাটাতেন। তিনি গরুগুলি মাঠে ছেড়ে দিয়ে জমির আইলের উপরে উঁচু করা ঢিপির উপর বসে থাকতেন। এখানে বসতেন,

কারণ মাঠভরা থাকৃত প্যাচপেচে কাদা। সঙ্গী রাখাল বালকগণ এই সব উঁচু স্থানকে পীর একদিল শাহের স্মরণে যথেষ্ট সমীহ করৃত। এই উঁচু ঢিপিগুলি স্থানীয় পরিভাষায় 'আঁইট' বলে পরিচিত। উক্ত মাঠে এখনও যেসব ঢিপি পরিলক্ষিত হয় তা কালক্রমে "একদিল শাহের আঁইট" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। শুনা যায়, কোন কোন ভক্ত নাকি এই আঁইটে মানত বা শিরনি দিয়ে থাকেন।

১৪। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী একদিল শাহ

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের যে দাঙ্গা বেধেছিল তা বারাসতের কিছু কিছু অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি দুর্বৃত্তরা সেই বিষাক্ত হওয়া কাজীপাড়াতেও প্রসারিত করৃতে নাকি চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সে আশা ফলবতী হয়নি।

কাজীপাড়াও তৎসংলগ্ন গ্রাম সিতি, বড়া প্রভৃতি গ্রামের হিন্দু-মুসলমানগণ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা এমত বিপদের সময় কি করবেন তা যেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। হিন্দুরা মনে মনে বল্‌লেন,—"পীর বাবা একদিল শাহ্‌ আছেন, আমাদের ভয় কিসের!" মুসলমানেরা কেহ কেহ বল্‌লেন - "পীর একদিল শাহে্‌র দোয়ায় আমাদের এখানে কোন দুর্বৃত্ত কিছুই করতে পারবে না।" হিন্দু-মুসলমান সকলে মিলে আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত হলেন।

সেই রাত্রি ছিল খুবই আশঙ্কাপূর্ণ। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে দুর্বৃত্তরা নাকি মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে কাজীপাড়ার ভিতরে প্রবেশের উদ্যোগ করেছিল। তারা হাসপাতালের উত্তর-পূর্ব দিকের মাঠের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। কাজীপাড়ার সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে তারা অনুভব করে, যেন বহুলোক কাজীপাড়ার সীমারেখা বরাবর বীরদর্পে ঘোরা ফেরা করছে। কিয়ৎপরে তারা দেখতে পেল সাদা আলখাল্লা পরিহিত দীর্ঘকায় যোদ্ধপুরুষের এক বিরাট বাহিনী সদর্পে মার্চ করে ঘোরা ফেরা করছে। তারা আরো শুনতে পায় রাইফেলের গুলীর কয়েকটি আওয়াজ। এই পরিস্থিতিতে তারা ভয় পেয়ে সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করে।

পরে কাজীপাড়ার হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ উপরোক্ত ঘটনার কথা লোক মুখে জেনে বুঝতে পারেন যে এটি পীর একদিল শাহের অলৌকিক শক্তিরই পরিচয় মাত্র।

১৫। পীরের পায়রা হত্যার জের

পীর একদিল শাহের দরগাহে বহু পায়রা বাস করে। অনেক ভক্ত প্রতিদিন, বহু অভাব-অনটন সত্ত্বেও পায়রাদের আহারের জন্য ধান বা গম দিয়ে থাকেন। পায়রাগুলি একদিল শাহের পায়রা বলে খ্যাত। পীরের পায়রা বলে কেউ তাদেরকে হত্যা করে না।

একবার এক পায়রা-লোভী এবং অহঙ্কারী, পীরের দরগাহ থেকে একটি পায়রা ধরে এবং সে সেটিকে হত্যা করে রান্না করার জন্য প্রস্তুত হয়। প্রথমে সে উনানের কড়ায় তেলের পাক মেরে নেয়। পরে সেই তেলে উক্ত পায়রার মাংস অর্পণ করা মাত্র কড়ায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। সে আগুন আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়ে আশ-পাশের সমস্ত খড়ের চালের ঘরগুলি জ্বলে ওঠে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত ঘর ছাই হয়ে মাটীতে মিশে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পীরের খড়ের চালের দরগাহ গৃহটিই এদের মধ্যে থেকেও রক্ষা পায়।

১৬। পীরের দ্রব্য গ্রহণের ফল

(ক) বারাসত মহকুমার জাফরপুর গ্রামে অবস্থিত পীর একদিল শাহের নজরগাহের জমিতে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ ছিল। একবার চৈত্রের ঝড়ে ঐ গাছ থেকে বহু শুক্নো ডাল ভেঙ্গে পড়ে মাটীতে। একজন মজুর সেই কাঠ সংগ্রহ করে বাড়ীতে নিয়ে যায়। রাত্রে সে উক্ত কাঠের অর্ধেক পরিমাণ কাঠ জ্বালিয়ে খানা প্রস্তুত করে। আহারাদি সম্পন্ন করে রাত্রে নিদ্রাকালে ঐ ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে যে যেন কে একজন বাগ্‌দীর মেয়ে তাকে বলছে,—"পীরের অশ্বথ গাছের ডাল জ্বালিয়ে তুমি মহা অপরাধ করেছ। বাকী কাঠ ফিরিয়ে না দিলে তোমার ভীষণ ক্ষতি হবে।"

এই কথা শোনা মাত্র তার নিদ্রাভঙ্গ হল। কোন প্রকারে অনিদ্রায় রাত্রি প্রভাত হলে উক্ত ব্যক্তি বাকী কাঠের বোঝাটি সেই অশ্বত্থতলায় ফিরিয়ে রেখে এসেছিল।

খ) জাফরপুর গ্রামের পাশের গ্রামের নাম কিলিশপুর। উক্ত গ্রামের অধিবাসী মোহাম্মদ মকবুল হোসেন একবার অনুরূপ একটি গর্হিত কাজ করেছিলেন। পীরের ঐ কাঠ নিলে ক্ষতি হতে পারে একথা তিনি বিশ্বাস

করতেন না। তিনি একবার গর্বভরে ঐ গাছের শুক্‌নো কাঠ নিয়ে বাড়ী যান ;—ইচ্ছা ঐ কাঠ তিনি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করবেন। কয়েক ব্যক্তি ঐ কাঠ নিয়ে যেতে মকবুল সাহেবকে নিষেধ করেছিলেন ; কিন্তু তিনি কারো কথা গ্রাহ্য করেন নি।

মকবুল সাহেব যেদিন বিকেলে সেই কাঠ নিয়ে গিয়েছিলেন। তার পরদিন ভোরে দেখা গেল কাঠের বোঝাটি পীরের সেই অশ্বত্থ গাছের নীচে পড়ে আছে। লোকে তাকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি ! মকবুল সাহেব নাকি বলেছিলেন যে কে যেন সারা রাত্রি ধরে তাঁকে ভয় দেখিয়েছিল। তাই তিনি সেই রাত্রেই কাঠ যথাস্থানে ফেরৎ দিয়ে তবেই নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয় হন।

গ) পঞ্চাশ বছরও অতিক্রান্ত হয় নি.—গোলাম রব্‌বানি নামক স্থানীয় এক ব্যক্তি পীরের নামে পতিত কয়েক কাঠা জমিতে চাষ করতে মনস্থ করে। পাশের লোকে তাকে নিষেধ করেছিল,—কিন্তু সে কারো বাধা মানে নি। সে সকলকে অগ্রাহ্য করে কয়েকটি নারকেলের চারা রোপণ করেছিল। এর কিছুদিনের মধ্যে সে ক্ষয়-কাশ রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়। ভয় পেয়ে সে ঐ জমি থেকে নারকেল চারাগুলি তুলে ফেলে। তবুও সে রোগমুক্ত হতে পারেনি। সেই ক্ষয়-কাশ রোগেই তার জীবনবায়ু বহির্গত হয়েছিল।

ঘ) জাফরপুরের ঐ নজরগাহ স্থানে একটি বহু পুরাতন বাব্‌লা গাছ ছিল। দূর থেকে গাছটিকে একটা মোটা কালো লোহার পাকানো স্প্রিং-এর মতন দেখাতো। কালক্রমে গাছটি শুকিয়ে মরে যায়। এক ব্যক্তি ঐ বাবলা গাছের গোড়ায় এক ভাঁড় রূপার টাকা পায়। সে গোপনে ঐ সমস্ত টাকা পেয়ে ধনী লোক হয়ে ওঠে। হঠাৎ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ায় সাধারণে কিছু বিস্ময় বোধ করল ; কিন্তু সে রহস্য বেশীদিন গোপন রইল না।

সে ব্যক্তি অল্পদিনের মধ্যেই কি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় এবং নিজের অপরাধের কথা বুঝতে পেরে পীরের শরণাপন্ন হয় ; কিন্তু পীর তাকে মৃত্যুর মাধ্যমে মুক্তি দিয়ে ক্ষমা করেছিলেন।

১৭। ডাংগুলি-এ্যানা মারা

রাখাল বেশধারী পীর একদিল শাহ্ তাঁর সঙ্গী রাখাল বালকগণের স'ংগে ডাং-গুলি খেলতেন। "ডাং" হল ক্রিকেট খেলায় ব্যবহৃত ব্যাটের ন্যায় ব্যবহার্য এক থেকে দেড় হাত লম্বা লাঠি বিশেষ। "গুলি" হল ক্রিকেটের ব্যাটের সঙ্গে খেলবার উপযোগী বলের সদৃশ মাত্র চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা শক্ত দণ্ড বিশেষ। পীর একদিল শাহ্ ডাং-গুলি খেলার সময় তাঁর ডাং-এর সাহায্যে ঐ 'গুলি'-কে আঘাত করে বহু দূরে নিক্ষেপ করতেন। কখন কখন তিনি সেই 'গুলি' পাঁচ-ছয় মাইল দূর পর্যন্ত নিক্ষেপ করতে পারতেন। প্রবাদ, পীর একবার জাফরপুর অঞ্চলে খেলা করবার সময় তিনটি গুলি এমন জোরে নিক্ষেপ করেছিলেন যে সেই তিনটি গুলি যথাক্রমে আবদেলপুর, পাটুলী ও হুমাইপুর গ্রামে এসে পড়েছিল। বলা বাহুল্য, উক্ত তিন গ্রামের যে যে স্থানে 'গুলি' পড়েছিল সেই সেই স্থানে স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ উঁচু মাটীর ঢিপি রয়েছে। কেবল হুমাইপুর গ্রামের মাটির ঢিপিটি নাকি কয়েক বৎসর পূর্বে কে বা কারা বিনষ্ট করে ফেলেছে। ডাংগুলি খেলার সময়ে ডাং-এর সাহায্যে 'গুলি'কে আঘাত করে সজোরে দূরে নিক্ষেপ করাকে স্থানীয় পরিভাষায় বলে 'এ্যানা-মারা'। এই এ্যানা মারাকে লক্ষ্য করে এই অঞ্চলে যে প্রবাদ আছে সেটি এইরূপ ;—

এ্যানাগুলি ব্যানায় যা
যেদিক পারিস সেদিক যা,
নিলাম নাম একদিল পীর
চল্ল গুলি হুমাইপুর।

পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত আর একখানি গ্রন্থ ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকের রচয়িতা কাজীপাড়া নিবাসী কাজী সাদেক উল্লাহ্। তিনি তাঁর পুস্তিকায় ভূমিকা ও কিছু নিজ বক্তব্যের সাথে নিম্নলিখিত শিরোনামাঙ্কিত গল্প স্থান দিয়েছেন ;—

১। রাখাল গিরি
২। চাষীর বিস্ময়
৩। জাহাজ ডুবি
৪। বারাসাতের বুকে

৫। জীবিত বাঁশের কাহিনী

৬। পবিত্র পুকুরের কাহিনী

৭। চোরের সাজা

৮। রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক জমিদান

৯। প্রাণ পেল ধড়ে

১০। সজাগ দৃষ্টি

তাঁর পুস্তিকার কয়েকটি গল্প আব্দুল আজীজ আল্ আমীন সাহেবের "ধন্য জীবনের পুন্য কাহিনী" নামক পুস্তকে বিবৃত গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত বলে মনে হয়। "বারাসতের বুকে" শীর্ষক গল্পে তিনি যা পরিবেশন করেছেন তার সঙ্গে এবং 'ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী' পুস্তকে পরিবেশিত "বসন্ত বাবুর বদান্যতা" শীর্ষক গল্পের সঙ্গে বসন্ত বাবু একমত নন বলে তিনি নিজে যে কাহিনী আমাকে শুনিয়েছিলেন তা স্থানীয় কিছু কিছু লোকের কাছ থেকে মিলিয়ে নিয়ে আমি এই পুস্তকের পূর্বেই পবিশন করেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কান্ত দেওয়ান

পীর কান্ত দেওয়ান রাজী বারাসত মহকুমার আমডাঙ্গা থানাধীন আদহাটা নামক গ্রামের জাগ্রত পীর। এতদ্ অঞ্চলে তিনি দেওয়ানজী নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি কোথাকার লোক তা জানা যায় না। আদহাটা গ্রামের পরলোকগত বেচু কর্মকারের বাড়ীতে তিনি একজন সাধারণ ফকিরের বেশে আগমন করেন। বংশ পরম্পরায় উক্ত কর্মকারের সন্তান-সন্ততিগণ শুনে আসছেন যে ফকির বেশে দেওয়ানজী যখন আদহাটা গ্রামে আসেন তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। বেচু কর্মকার উক্ত ফকিরকে বাড়ীর দহলিজে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। বেচু কর্মকারের কোন সন্তান-সন্ততি না থাকায় মনের দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন জেনে দেওয়ানজী তাঁকে সন্তান লাভের আশ্বাস দেন। কয়েক বছরের মধ্যে বেচু কর্মকারের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। বেচু কর্মকারের কন্যা, দেওয়ানজীর খুবই স্নেহের পাত্রী ছিল। দেওয়ানজী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরতেন সেই কন্যাটিকে নিয়ে। তিনি গ্রামের সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীর রোগ-পীড়ায় ওষুধ-পত্র দিতেন।

হিন্দুর বাড়ীতে মুসলমান পীর থাকায় গ্রামের জনৈক ব্যক্তি বেচু কর্মকারকে আপত্তিকর কথা বলেন। তাতে তাঁর নাকি শাস্তি পেতে হয়েছিল। ফলে দেওয়ানজী পরে গ্রামের এক মুসলিমের বাড়ীতে গিয়ে থাকতেন। পাশের গ্রাম উলুডাঙ্গাতেও তাঁর আস্তানা ছিল।

পীর কান্ত দেওয়ান, ভক্ত বেচু কর্মকারের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তেলপড়ার জন্য দুর্লভ এক মন্ত্র দান করেছিলেন। সেই মন্ত্রপূত তেল কেউ ভক্তি-ভরে গ্রহণ করলে তার নানাবিধ রোগ নিরাময় হয় বলে লোকের বিশ্বাস। বিশেষতঃ বিবিধ প্রকার ক্ষত এই মন্ত্রপূত তেলের ব্যবহারে আরোগ্য হয় বলে শোনা যায়।

দেওয়ানজী এতদ্ অঞ্চলে আনুমানিক দেড়শত বৎসর পূর্বে আগমন করেছিলেন। পরলোকগত বেচু কর্মকারের নিম্নলিখিত বংশ তালিকা থেকে এইরূপ অনুমান করা যায়।
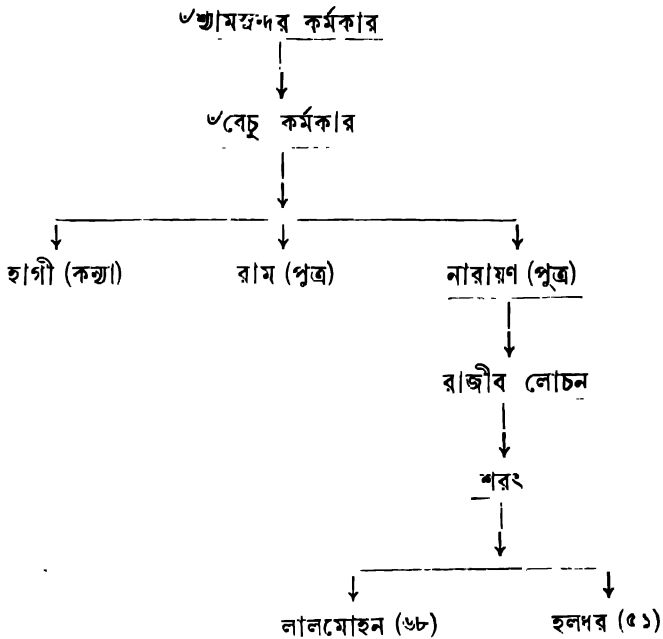
দেওয়ানজী আদহাটা গ্রামের মুন্‌শী বদরুদ্দীন সাহেবের পূর্বতন কোন্ এক পুরুষের সময়ে দেহত্যাগ করেন। মুন্‌শী সাহেবের বাড়ীর পাশেই দেওয়ানজীকে সমাধিস্থ করা হয়। সে দরগাহ গৃহটি আজো বিদ্যমান।

পীর কান্ত দেওয়ানের রওজার উপর তাঁর ভক্তগণ একটি পাকা দরগাহ-গৃহ নির্মাণ করেছেন। মুন্‌শী বদরুদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তি দেওয়ানজীর দরগাহের সেবায়েত। প্রতিদিন রওজা শরীফে ধূপ-বাতি দিয়ে তাঁরা জিয়ারত করেন। জনসাধারণ পীরের নামে দরগাহে শিরনি, হাজত ও মানত প্রদান করেন। প্রতি বৎসর এগারোই মাঘ তারিখে পীরের নামে বিশেষ উরস অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। তিনদিন ধরে উরস চলে। এ উপলক্ষ্যে মেলা বসে। তাঁর নামে প্রদত্ত পীরোত্তর জমির পরিমাণ প্রায় দুই বিঘা। কর্মকার পরিবারের তরফ থেকে বিশেষ শিরনি বা পূজার সামগ্রী উরসের সময় পীরের দরগাহে

প্রেরিত হয়। হিন্দু-মুসলিম সকল ভক্ত তাঁকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করেন। তাঁরা হাজত, মানত এবং শিরনি দিয়ে থাকেন।

পীর হজরত কান্তু দেওয়ান রাজীর আলৌকিক কীর্তি-কলাপ সম্পর্কিত কিছু লোক-কথা এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাদের দু'একটি এখানে উল্লেখ করা গেল।

১। দেওয়ানজীর উদারতা

জনৈক ব্যক্তি একদিন বেচু কর্মকারকে বলল ;—"হিন্দু হয়ে নিজের বাড়ীতে মুসলমান রেখেছে এমন অন্যায় বরদাস্ত করা যাবে না। তোমাকে একঘরে করা হবে।"

কিছুদিন যেতে না যেতে সেই ব্যক্তির কি একটা রোগে অকস্মাৎ মৃত্যু হল।

মৃত দেহের উপর সাদা কাপড় বিছিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে ; শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ হচ্ছে। এমন সময় দেওয়ানজী কাঁচা কঞ্চির একটা ছড়ি হাতে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি সেই ঘটনাটি জানলেন। বললেন,—"ও বাঁচবে।"

এই বলে তিনি হাতের ছড়ি দিয়ে কাফনের উপর স্পর্শ করলেন। পরে তিনি স্থানীয় কোন ব্যক্তিকে বেশ কিছু তেঁতুল-গোলা খাওয়াতে বল্‌লেন। তাঁর নির্দেশ অনুয়ায়ী যথারীতি ব্যবস্থা নেওয়া হলে দেখা গেল কিছুক্ষণের মধ্যে সেই ব্যক্তির জীবন সঞ্চার হয়েছে। এই ভাবে সে ব্যক্তি ধীরে ধীরে জীবন ফিরে পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠল।

২। সার গাদায় গঙ্গা দর্শন

বেচুকর্মকারের স্ত্রীর একবার খুব ইচ্ছা হল যে তিনি গঙ্গা দর্শনে যাবেন। সেবার ছিল চূড়ামণির যোগ। রাত্রি প্রভাত হলেই সে যোগ লাগবে। অথচ গঙ্গা এ-গ্রাম থেকে বেশ দূরে প্রবাহিতা। সব গোছ গাছ করে এত অল্পক্ষণে গঙ্গা দর্শনে যাওয়া সম্ভব নয়। বেচু কর্মকারের স্ত্রী খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

প্রাতে দহলিজে বসে দেওয়ানজী সে মানসিক ব্যথার কথা শুনলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বেচু কর্মকারের স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। গঙ্গা দর্শনেচ্ছু

সেই মহিলা এলেন বাড়ীর বাইরে। দেওয়ানজী উঠানের পাশের সার ফেলা গর্তের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন,—"ওই দেখো গঙ্গা।"

সত্য সত্যই সেদিকে তাকিয়ে বেচু কর্মকারের স্ত্রী দেখতে পেলেন প্রবাহিতা গঙ্গা; দেখতে পেলেন গঙ্গাদেবীর মূর্তি। আরো দেখতে পেলেন বহু পুণ্যার্থীর অবগাহন-দৃশ্য। তিনি বললেন, "আমার জীবন সার্থক হয়েছে।"

৬। কবরের লোক রাণাঘাটের পথে পথে

আদহাটা গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম খড়ুর। এই গ্রামের বাসিন্দা ভদ্রলোকটির কাজ-কারবার রাণাঘাটে! প্রতিদিন তিনি খড়ুর থেকে রওনা হয়ে আদাহাটা গ্রামের মুন্শী সাহেবের বাড়ীর পাশ দিয়ে রাণাঘাটে যাতায়াত করেন। ফকির দেওয়ানজীর সাথে মাঝে মাঝে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হত।

বেশ কিছুদিন বাড়ীতে থাকার পর সেদিন তিনি কার্যব্যপদেশে এসেছেন রাণাঘাটে। হঠাৎ দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা। দেওয়ানজী একটি ছোট ছেলের হাত ধরে রাস্তা দিয়ে চলেছেন। তিনি ফকির সাহেবের কুশাল জিজ্ঞাসা করলেন। ফকির দেওয়ান দুঃখের সঙ্গে বলবেন,—"ওরা আমায় বিদায় দিয়েছে।"

ভদ্রলোক কিছু ব্যথিত হয়ে রাণাঘাট থেকে ফিরলেন সেদিন।

পথিমধ্যে আদহাটা গ্রামে এসে মুন্শী সাহেবের বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে তিনি ফকির দেওয়ানজীর সাথে সাক্ষাত হওয়া ও তাঁর দুঃখের কথা বললেন প্রতিবেশী কয়েক জনের কাছে। প্রতিবেশীরা বললেন—"সে কি কথা! দেওয়ানজী তো বেশ কিছুদিন হ'ল 'এন্তেকাল' করেছেন। শুধু তাই নয়,—কিছুদিন হল মুন্শী-বাড়ীর একটা ছোট্ট ছেলে জলে ডুবে মারা গেছে।"

ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে বললেন,—"হ্যাঁ ঠিক! আমি তো দেওয়ানজী আর এই বাড়ীর সেই চেনা ছেলেটিকেই দেখলাম।"

উপস্থিত প্রতিবেশীগণ বলাবলি করতে লাগলেন,—"এ কি করে সম্ভব!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কালু পীর

কালু নামক একব্যক্তি পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর সহচর ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত কালুতলা গ্রামের নজরগাহ স্থানের সেবায়েতগণের নিকট কালু দেওয়ান নামেই পরিচিত।

তিনি কালুগাজী। তিনি বড়খাঁ গাজীর সহোদর ভাই নন। বড়খাঁ গাজীর সঙ্গে তাঁর সঠিক বংশগত সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর জন্ম, মৃত্যুর তারিখও কিছু পাওয়া যায় না। কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বা কোথায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল তাও অজ্ঞাত।

কালু দেওয়ানের ভক্তগণ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উক্ত কালুতলা গ্রামে প্রায় একবিঘা জমি পতিত রেখেছেন। সেখানে মাটির ছোট একটা ঢিপির পাশে বহু পুরাতন কয়েকটি বাব্‌লা গাছ আছে। ভক্তগণ সেখানে ধূপ বাতি প্রদান করেন। উক্ত নজরগাহ-স্থানের বর্তমান (১৯৭০) সেবায়েত মহম্মদ হাজের গাজী। উক্ত গ্রামের শ্রীঅমূল্যচরণ দাস প্রমুখ বাৎসরিক মেলার তত্ত্বাবধান করেন। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে একদিনের বিশেষ উৎসব পালিত হয়। এই উৎসব বা মেলায় দূরদূরান্ত থেকে হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ আগমন করেন। সেই মেলায় জমায়েত জনসংখ্যা প্রায় দু'হাজার। ভক্তগণ সেখানে হাজত, মানত ও শিরনি দিয়ে থাকেন। কোন কোন অঞ্চলের লোক কালু দেওয়ানের মূর্তি নির্মাণ করে তাতে ভক্তি অর্ঘ অর্পণ করেন। তাঁর 'থানে' দুধ, বাতাসা, ফল প্রভৃতি ও প্রদত্ত হয়।

কালু দেওয়ানকে কেন্দ্র করে কোন সাহিত্য রচিত হয়েছে বলে শোনা যায় না। কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটকে কালু নামটি প্রথমেই লিখিত হলেও তাতে গাজীর চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করেছে। সে আলোচনা গাজী সাহেবের আলোচনার মধ্যে করা হয়েছে। কালু-গাজী মঙ্গলে বড়খাঁ দোস্ত,

রায় মঙ্গলে তিনি দক্ষিণ রায়ের মিত্র, কুমীর দেবতা, গাজী মঙ্গলে তা না হলেও জলের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য নয়।

পীর মোবারক বড়খাঁ গাজী একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে সম্পর্কেই হোক কালু যে তাঁর জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন এটিও স্বাভাবিক। তবুও কালু নামক লোকটির সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

আঠারো ভাটির অধিপতি দক্ষিণ রায়ের বন্ধু হিসাবে দেখা যায় কালু নামক এক ব্যক্তিকে। দক্ষিণ রায়ের নিকট তিনি কালু রায়। একদিকে কালুগাজী যেমন বড়খাঁ গাজীর ভাই বলে কথিত, অন্যদিকে কালুরায় আবার দক্ষিণ রায়ের ভাই বলেও কথিত। অর্থাৎ অনুমান করা চলে যে 'কালু' নাম ধারী যে কোন এক ব্যক্তি ঐতিহাসিক নায়কের পরামর্শদাতা, সহচর, বন্ধু বা জ্যেষ্ঠ সহোদরের ভূমিকা নিয়ে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করতেন।

সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে দুই তরফের দুই সহচর বা দুই কালু, কোথাও মিশ্রভাবে, কোথাও বা এককভাবে জনগণের সম্মুখে প্রতিভাত হন। তাই মূর্ত্তির বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায় ;—

"কালুরায়ের মূর্ত্তি অতি সুন্দর ও বীরোচিত। মাথায় পাগড়ী বা উষ্ণীষ, বাবরী চুল, রং ফর্সা বা হলুদে, কানে কুণ্ডল, কপালে তিলক, চোখ দুটি বড় বড়, নাক টিকলো, গোঁফ জোড়া কান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও চওড়া, দাড়ি নেই। পোষাক পৌরাণিক সমর দেবতার মত দুই হাতে টাঙ্গি ও ঢাল, কোমরবন্ধে নানা রকম অস্ত্র-শস্ত্র ঝুলানো. পিঠে তীর ধনুক। বাহন ঘোটক, কোন কোন ক্ষেত্রে বাঘ বা কুমীর। আবার অন্য ক্ষেত্রে ভিন্ন মূর্ত্তিতেও দেখা যায়। অবশ্য তা উক্ত দুই জেলার (চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর) মুসলমান প্রধান অঞ্চলেই। ঐরূপ স্থানে কালু রায়, বড়খাঁ গাজীর ভাই বা সহচর রূপে হাজত সেলাম আদায় করেন। তখন তাঁর রং হয় কালো, গালে নুর দাড়ি দেখা যায়, নামও বদলে রায়, কালু রায় হন মগর পীর "কালু গাজী।"

"আবার কোন কোন জেলায় কালু রায়কে ধর্ম ঠাকুরের সাথে মিশ্রিত হতেও দেখা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তিনি আদি যুগের বাঘকে ত্যাগ করেন না।"[৩৮]

কালু সম্পর্কে আরো কয়েকটি বক্তব্য লক্ষণীয় ;—

১। দক্ষিণ রায়ের ভাই বা বন্ধু ছিলেন কালু রায়। এই কালু রায়ের সঙ্গে গাজীর সহচর কালুর কোন সম্পর্ক নেই।[৫৩]

২। কেউ বলেছেন দক্ষিণ রায় ও কালু রায় অভিন্ন ব্যক্তি। [ঢাকা রিভ্যু, ভলিয়ু-৩, নং-৩, পৃষ্ঠা ১৪৮]

৩। রায় মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ রায় নিজে কালু রায় কর্তৃক হিজলীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। [বিশ্বকোষ, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৯]

অতএব বুঝা যায় যে কালুগাজী এবং কালু রায় একই ব্যক্তি নন। আবার কালুগাজী ও কালু দেওয়ানের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানা যায় না। কালুতলা গ্রামাঞ্চলের কারো কারো ধারণা যে—কালু, বড়খাঁ গাজী ও চম্পাবতী যখন সাতক্ষীরার লাব্‌সা গ্রামাঞ্চলে আসেন তার অতি অল্প-কাল মধ্যে চম্পাবতী হতে কালু ও গাজী বিচ্ছিন্ন হন। সাধক ফকিরের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বড়খাঁ গাজী, চম্পাবতী-প্রেমে নিমগ্ন হওয়ায় কালু কিছুদিন তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন। সেই সময়ের কোনো একদিন কালু এই গ্রামের উক্ত স্থানে এসে অবস্থান করেছিলেন বলে অনেকের অভিমত।

কালু দেওয়ান সম্পর্কিত একটি মাত্র লোক-কথা কালুতলা অঞ্চলে প্রচলিত আছে। লোক কথাটি এইরূপ ;—

১। বাঘ ও সাপের শ্রদ্ধা নিবেদন

কালুতলা গ্রামের নজরগাহ বা দরগাহ স্থানে যে ঢিপি আছে সেখানে গভীর রাত্রে এক অলৌকিক ঘটনা নাকি অনেকে ঘটতে দেখেছেন। শুনা যায়, কালু দেওয়ানের নিজস্ব একটি বাঘ ও একটি সাপ ছিল। বাঘটি বিরাট কায়। সে মাঝে মাঝে রাত্রে এই দরগাহে এসে সেলাম জানাত এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে যেত। আর সাপটিও ছিল বিশাল কায়। তার মাথায় ছিল বেশ বড় একটি মানিক। কোন কোন দিন সেই বাঘ বা সাপ পথ চল্‌তি লোকের সামনে পড়েছে বটে, কিন্তু সে নাকি কোন দিন কারো ক্ষতি করেনি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী

পীর হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর জন্মস্থান শিসস্থান সীমান্তের অন্তর্গত চিশ্‌ত নামক অঞ্চলের সনঞ্জর গ্রামে। তিনি আরবের সুবিখ্যাত কোরেশ বংশ-সম্ভূত হজরত আলী রাজীর বংশধর। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হজরত খাজা গিয়াস্‌উদ্দীন আহম্মদ সনঞ্জরী এবং মাতার নাম সৈয়েদা উম্মল্‌ ওয়ারা। তাঁর জন্ম ৫৩৭ হিজরী (১১৪৩ খৃষ্টাব্দ) মতান্তরে ৫৩০ হিজরীর ১৪ই রজব সোমবার।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী ছিলেন হাসেন ও হোসেন বংশের তাপস চূড়ামণি। অনেকের মতে তিনি চিশ্‌তিয়া তরিকার সুফী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। ভারত-ভূমিতে তিনি ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। আজীবন তিনি এদেশেই থাকেন এবং আজমীর নামক সহরে ৬৩২ হিজরী, (মতান্তরে ৬৯৭ হিজরীর) ৬ই রজব তারিখে দেহত্যাগ করেন। আবার প্রবাদ যে ৭২৭ হিজরীর ৭ই রজব তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর জীবনীর বিস্তৃত বিবরণ দুষ্প্রাপ্য।

শুধু আজমীরে নয়, দেশের সর্বত্র খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর প্রতি ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়। তাঁর নামে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয়েছে, রচিত হয়েছে কিছু গ্রন্থ। ভক্ত সাধারণ উক্ত সব কর্মকে পবিত্র কর্ম বলে মনে করেন। তাঁর নামে নজরগাহ্‌ সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না।

খাজা সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে কোন কোন ক্ষেত্রে অনৈশ্লামিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বলে অনেকে মনে করেন। মিজান নামক পত্রিকা ১ সেপ্টম্বর ১৯৫৩ সালে লিখেছেন,—"এখন খাজা সাহেবের নামে একদল লোক গ্রামে-গঞ্জে হাঁড়ি পূজার প্রচলন করেছে। একটা হাঁড়ির গায়ে মালা ইত্যাদি দিয়ে তাকে খাজা সাহেবের হাঁড়ি

হিসাবে হাজির করা হয়। সেই হাঁড়িতে পয়সা দিলে তাকে খাজা সাহেবের বাক্সে দেওয়ার কথা বলা হয়। এ-সব সরাসরি বেদাত কাজ, পুণ্যের নয় পাপের কাজ, নেকীর নয় গোনার কাজ।"

১। খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তর জীবনী

উক্ত গ্রন্থের লেখক মৌলভী আজহার আলী সাহেবের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর পুস্তকের নিবেদনাংশে যে ঠিকানা লিখেছেন তা এইরূপ—সাকিন-খলিসানি, পোঃ—বাণীবন, হাওড়া।

মৌলভী আজহার আলী রচিত পুস্তকখানি মুদ্রিত এবং সাধারণ ভাবে বাঁধানো। মোট পৃষ্ঠা একশত চুয়াল্লিশ। নাম পৃষ্ঠা, সূচীপত্র আছে । উৎসর্গ, নিবেদন ও আভাষ শিরোনামায় সংস্করণ সম্পর্কীয় বক্তব্য রেখেছেন। জীবনী অংশে পনেরোটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। সর্ব্ব মোট বিয়াল্লিশটি শিরোনামায় খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর জীবনী লিখিত হয়েছে। পুস্তকের শেষাংশে সম্বর্দ্ধনা শিরোনামায় পীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন জ্ঞাপক কবিতা সন্নিবেশিত আছে।

প্রাঞ্জল সাধু ভাষায় লিখিত এই পুস্তক সহজ-বোধ্য এবং আরবী, ফরাসী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার বাহুল্য বর্জিত। অন্য পুস্তকে সাধারণতঃ ধর্মীয় ভাব-প্রবণ শব্দ প্রয়োগের প্রবণতা অধিক দেখা যায় যা এই পুস্তকে অপেক্ষাকৃত কম। গল্প-ছলে বলার মতন করে লিখিত হওয়ায় পুস্তকখানি সুখ-পাঠ্য। সম্মানীয় ব্যক্তির নামের শেষে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সম্মান-সূচক শব্দ লিখিত থাকায় কাহিনী পাঠে কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। কাহিনীকে আকর্ষণীয় করার জন্য লেখক কোন কোন স্থানে কথোপকথনের ভঙ্গিমায় বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে ক্ষুদ্র চিত্র প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য চিত্রগুলি অরুচি-সম্মত বা কোন মূর্ত্তির চিত্র নয়। তা ছাড়া দুই-তিনটি নসব-নামা বা বংশ ধারার পরিচয় আছে।

এই গ্রন্থে বর্নিত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা এইরূপ ;—

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী বাল্যকালে শান্ত-শিষ্ট ছিলেন। তাঁর পিতার তেমন কোন বিষয়-সম্পত্তি ছিল না। বাল্যকালেই তিনি ধর্মে এবং কর্মে যত্নবান হয়েছিলেন। কিশোর বয়সে তাঁর পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। অতি অল্প

সময়ের ব্যবধানের মধ্যেই তাঁর মাতৃ বিয়োগও ঘটে। পৈত্রিক সূত্রে তিনি পেয়েছিলেন আঙ্গুরের ক্ষুদ্র একটি বাগান এবং ময়দা পিষবার একটি চাকী। কিশোর খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী মাতা-পিতৃহীন হয়ে অসীম দুঃখ-সাগরে পতিত হন।

মারফতী বিদ্যায় পারদর্শী ইব্রাহিম কুন্দজী ছদ্মবেশে পাগলের রূপ ধরে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন সাধু কুন্দজীকে দেখে আনন্দিত চিত্তে তিনি বাগান থেকে আঙ্গুর সংগ্রহ করে এনে তাঁকে আহার করতে দিলেন। বালকের অতিথি পরায়ণ সরল হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে কুন্দজীও তাঁকে একটি ফল চিবিয়ে আহার করতে দিলেন। ভক্তি ভাবে সেই ফল ভক্ষণ করার পর তাঁর হৃদয়ে বৈরাগ্যভাব জাগরিত হল। তিনি দুনিয়ার কুহকজাল ছিন্ন করে সমরকন্দ হয়ে বোখারায় যান এবং হজরত হেসামুদ্দীন বোখারীর নিকট ধর্ম-শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে জ্ঞানৈশ্বর্য্যের অধিকারী হন। হজরত সাহেব ৫৬০ হিজরীতে নেশাপুরের অন্তর্গত হারুন নামক গ্রামে হজরত খাজা ওসমান হারুনীর নিকট মুরিদ হন বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতঃ জ্ঞানৈশ্বর্য্য আরো বৃদ্ধি করেন এবং মারফতী বিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। পরিভ্রমণকালে তিনি যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হজরত খাজা নিজাম উদ্দীন কিব্‌রিয়া, হজরত আব্দুল কাদের জিলানী অর্থাৎ হজরত বড় পীর সাহেব প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি হজ করতে গিয়েছিলেন হজরত ওসমান হারুণীর সঙ্গে। তারপর তিনি পীর ওসমান হারুণীর সঙ্গে মদিনায় গেলেন। তিনি আরো গেলেন উশ নগরে। সেখানে খাজা কুতবুদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী তাঁর নিকট মুরিদ হন। হজরত কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীই তাঁর প্রথম মুরিদ। তিনি বলেন,— 'আমার বা আমার খলিফার হাতে যাঁরা মুরিদ হবেন, তাঁরা বেহেস্তে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমি বেহেস্তের দ্বারে পা রাখব না।

মদিনা থেকে খাজা সাহেব হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম প্রচার করা। তিনি সব্জা সহর থেকে গজনি এবং পরে লাহোরে আসেন। সেখান থেকে চল্লিশ জন দরবেশ সমভিব্যাহারে দিল্লীতে উপনীত হন।

দিল্লীর সিংহাসনে তখন আসীন ছিলেন পৃথ্বী রায়। তিনি মুসলমান বিদ্বেষী। খাজা সাহেবের আগমন বার্তা অবগত হয়ে পৃথ্বী রায় এক গুপ্ত-ঘাতককে পাঠালেন খাজা সাহেবকে হত্যা করতে। ঘাতক দিল্লীতে এল। তার দুরভিসন্ধি দিব্য চক্ষুতে জানতে পেরে খাজা সাহেব তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। ভীত হয়ে ঘাতকটি ক্ষমা প্রার্থনা করল। খাজা সাহেব তাকে ক্ষমা করলেন। সে তখন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল। খাজা সাহেব এবার নিজে ৫৬১ হিজরীর সাতই মহরম তারিখে আজমীরে উপনীত হলেন।

খাজা সাহেব আজমীরের আনা-সাগরের তীরে একটি আশ্রম নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। আনা-সাগরের তীরবর্তী মন্দির সমূহের ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণ সেই মুসলিম ফকিরগণের "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি শুনে বিক্ষুব্ধ হয়ে রাজা পৃথ্বী রায়ের নিকট অভিযোগ করেন।

ফকিরগণকে বিতাড়িত করতে পৃথ্বীরায় পাঠালেন সৈন্য। সৈন্যগণ আক্রমণ করতে উদ্যত হলে খাজা সাহেব মন্ত্রপূতঃ ধূলি নিক্ষেপ করে তাদেরকে বিপর্যস্ত করলেন। রাজা এ সংবাদ অবগত হয়ে প্রসিদ্ধ মোহান্ত রামদেওকে তাঁর যোগবল এবং তন্ত্র-মন্ত্র শক্তির দ্বারা ফকিরগণকে বিতাড়িত করতে বললেন। রামদেও তৎক্ষণাৎ গেলেন খাজা সাহেবের নিকট কিন্তু তিনি খাজা সাহেবের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে স্থির থাকতে পারলেন না। দিব্যজ্ঞান লাভ করে তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেন এবং মোহাম্মদ সাদী নামে পরিচিত হলেন। এ-সংবাদ জেনে রাজা পৃথ্বীরায় বড়ই দুশ্চিন্তায় পতিত হলেন।

একদিন এক ফকির এক পুকুরের পানিতে ওজু করতে গেলেন। স্থানীয় হিন্দুগণ কিছুতেই সেখানে ওজু করতে দিলেন না। ঘটনা অবগত হয়ে খাজা সাহেব আপনার অলৌকিক শক্তি বলে আনা-সাগরসহ সমস্ত জলাশয়ের জল একটি ক্ষুদ্র পাত্রে এনে বন্দী করলেন। নগরবাসীগণ জলাভাবে মরণাপন্ন হয়ে খাজা সাহেবের শরণ নিল। দয়া পরবশ হয়ে তিনি পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়ে আনলেন। আজমীরের অধিবাসীগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। মন্দিরের স্থলে গড়ে উঠল মসজিদ।

পৃথ্বীরায় সমস্ত অবগত হয়ে পরামর্শ সভার আয়োজন করলেন। স্থির হল ঐন্দ্রজালিক খাজা সাহেবের মোকাবিলা ঐন্দ্রজালিক অজয় পালের দ্বারা করতে হবে। তৎপূর্বে রাজা নিজে যুদ্ধ করে পরিস্থিতি বুঝবেন। রাজা

সাত বার যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হতে গিয়ে সাত বারই অন্ধ হয়ে গেলেন। অগত্যা অজয় পালকে পাঠানো হল। অজয় পাল বিষধর সাপ এবং পরে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করে খাজা সাহেবকে পর্যুদস্ত করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে পলায়ন করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু অজয় পাল পলায়ন করতে পারলেন না, খাজা সাহেব কর্তৃক ধৃত ও প্রহৃত হলেন। শেষ পর্য্যন্ত নানাভাবে খাজা সাহেবের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তিনিও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। তখন তাঁর নাম হল আবদুল্লা বিয়াবানী।

পঁচিশ বছর পর খাজা সাহেব আহ্বান জানালেন পৃথ্বীরায়কে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য। পৃথ্বীরায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। খাজা সাহেব এর প্রতিবিধান এবং হিন্দুস্তানে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। তিনি রাজ-নিধনের অভিশাপ দিলেন।

আফগানিস্তানের ঘোর প্রদেশের সুলতান গিয়াসুদ্দিন ঘোরীর ভ্রাতা সাহাবুদ্দিন ঘোরী হিন্দুস্তান জয়ের আশায় ৫৮৭ হিজরীতে এদেশে আগমন করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে সাহাবুদ্দিন ঘোরী আহত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অল্প কিছুকাল পরে সাহাবুদ্দিন ঘোরী পুনরায় অধিকতর সমর সম্ভারে সুসজ্জিত হয়ে হিন্দুস্তান আক্রমণ করলেন। এবারের ঘোরতর যুদ্ধে খাজা সাহেবের অভিশাপ অনুযায়ী পৃথ্বীরায় পরাজিত ও নিহত হলেন। দিল্লী ও আজমীরে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। আজমীরে গিয়ে সাহাবুদ্দিন ঘোরী সাক্ষাৎ করলেন খাজা সাহেবের সঙ্গে।

[এখানে খাজা সাহেবের নয়টি আশ্চার্য্য কেরামত প্রদর্শনের গল্প সন্নিবেশিত আছে। সেগুলির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ : —]

১। একদল অগ্নিপূজক খাজা সাহেবের অলৌকিক শক্তিতে বিমুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন।

২। অর্থলোলুপ জনৈক ব্যক্তি খাজা সাহেবের আশ্চয্য কেরামতে শাস্তি প্রাপ্ত হয়।

৩। আক্রমণকারী একদল দস্যু খাজা সাহেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াতে না পেরে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে।

৪। খাজা সাহেবের নির্দেশে গরুর বাছুর দুধ দান করে।

৫। খাজা সাহেবকে আজমীরে রেখে বহুলোক মক্কায় হজ করতে গিয়ে সেখানে তাঁকে দেখে সকলে বিস্মিত হয়ে যান।

৬। জনৈক কুলটা রমণীর অসদুদ্দেশ্য খাজা সাহেবের আশ্চর্য কেরামতের কারণে সফল হতে পারেনি।

৭। বাগদাদের এক বদমায়েস ব্যক্তি খাজা সাহেবের সন্নিধানে অবস্থান করে সৎ পথে আসেন।

৮। অসদুদ্দেশ্যে আগত জনৈক হিন্দু, খাজা সাহেবের নিকট এসে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যান।

৯। এক ব্যক্তি মুসলমানের ছদ্মবেশে খাজা সাহেবকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় এবং পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

খাজা সাহেব সময় সময় ভাবোন্মত্ত হয়ে 'ছামৌ' অর্থাৎ আরবী ভাষায় রচিত খোদাতায়ালার প্রশংসা-সূচক সঙ্গীত পাঠ করতেন। একবার 'ছামৌ' পাঠ শুনে পৃথিবী আনন্দে নেচে উঠবার উপক্রম হলে হজরত বড় পীর সাহেব তাঁর হাতের ছোট একটি লাঠির প্রান্ত দ্বারা মাটি চেপে ধরে রাখেন। অন্যথায় নাকি পৃথিবীতে মহাপ্রলয় কাণ্ড ঘটত।

হিন্দুস্থানের প্রায় সর্বত্র ইসলামের আদর্শ প্রচারিত হল। এমন সময় খাজা সাহেবকে আহ্বান জানালেন তাঁর মোর্শেদ পীর হজরত ওসমান হারুণী। খোরাসান সীমান্তে গুরু-শিষ্যের সাক্ষাতকার হল। পীর হারুণী শিষ্যকে আপনার মছাল্লা, আশা, খেরকা, জুতা ও পাগড়ী দিয়ে খেলাফতি প্রদান করতঃ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেই ৬০৭ হিজরীতে দেহত্যাগ করেন।

একবার জনৈক নিঃস্ব কৃষকের কাতর অনুরোধে খাজা সাহেব দিল্লীতে উপনীত হন এবং সুলতান আল্‌তামাসকে বলে উক্ত কৃষকের জমি নিষ্কর করে দেন।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীর বিবাহ না করা অন্যায়। খাজা সাহেব একথা বুঝতে পেরে নব্বই বছর বয়সে দ্বারগড়ের রাজকন্যাকে এবং পরে শিষ্য সৈয়দ হোসেন মসাহাদীর কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নী উম্মেতুল্লার গর্ভজাত দুই পুত্র ও এক কন্যা এবং দ্বিতীয়া পত্নী সৈয়েদা আছমাহ্‌ বিবির গর্ভজাত তিন

পুত্র। খাজা সাহেব স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মাত্র সাত বছর সংসার-ধর্ম পালন করেছিলেন।

খাজা সাহেব, হজরত কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীকে ডেকে খেলাফতি দান করেন। পরে সাতানব্বই বৎসর বয়সে ৬৩২ হিজরীর ৬ই রজব তারিখে তিনি মানব লীলা সংবরণ করেন।

পবিত্র আজমীর শরীফে খাজা সাহেবের নির্দেশিত স্থানে সমাধিগৃহ নির্মিত হয়। সম্রাট আকবরও আগ্রা থেকে আজমীর পর্য্যন্ত পদব্রজে যেতেন এবং খাজা সাহেবের মাজার শরীফে জিয়ারত করতেন। সেখানে প্রতি বৎসর ৬ই থেকে ১১ই রজব পর্য্যন্ত খাজা সাহেবের উরুস হয়। তাতে বহু দেশের লোক এসে যোগদান করেন।

মৌলভী আজহার আলীসাহেব প্রণীত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (জীবনী) গ্রন্থের অনেক স্থানে যে যে গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার উল্লেখ আছে। যথা—(১) আনিছেল আরওয়াহ, (২) খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) "সওয়া নিয়ে" উমরী, (৩) তওয়ারীখ ফেরেস্তা, (৪) ছানায়েল (৫) শারে্‌াল আউলিয়া (ইতিহাস), (৬) কাওয়াদল সালেকিন, (৭) আক্‌সির নাম (ইতিহাস), (৮) দলিলুল আরকিন প্রভৃতি। লেখক সমগ্র কাহিনীটিকে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রতি পরিচ্ছদ আবার দুই-তিনটি শিরোনামায় বিভক্ত করে এক-একটি বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন। গ্রন্থের একস্থানে দশটি উপদেশ বাক্য লিখিত আছে। কয়েক স্থানে বয়েত প্রদত্ত হয়েছে। কোথাও কোথাও কি কি আচরণ ধর্মবিরুদ্ধ তার আলোচনা রয়েছে।

গ্রন্থকার 'হিন্দুস্তান' নামকরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি হিন্দুস্তানের আদিম রাজন্যবর্গের যে বিবরণ দিয়েছেন তা ঐতিহাসিকের মতে নিখুঁত বলে তিনি তেয়ারিখ ফেরেস্তা নামক প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। সেই দিক হতে এই গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীর হয়ত কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী জীবনী গ্রন্থের রচনাকাল নির্দ্দিষ্ট করে কোথাও লিখিত নেই। একাদশ সংস্করণের তারিখ লিখিত নেই, শুধু সাল লিখিত আছে—সন ১৩৬৭ সাল (বাংলা)। গ্রন্থকার গ্রন্থখানিকে পীর মোর্শেদ হজরত

মোহাম্মদ আবু বকর সাহেবের নামে উৎসর্গ করেছেন। "বঙ্গের গৌরব কেতু" বলে উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় ইনি ফুরফুরা শরীফের হজরত দাদাপীর। গ্রন্থকার "নিবেদন"-অংশে লিখেছেন যে পুস্তকখানি মৌলভী মোহাম্মদ কোরবান আলি সাহেব 'আন্তপান্ত' সংস্কার করেছেন। এই অংশে এই গ্রন্থের প্রকাশ কাল সন ১৩২৯ সাল বলে উল্লেখ আছে। তা থেকে বুঝা যায় যে গ্রন্থখানি ইংরেজী ১৯২২ সালের পুর্বেই রচিত হয়েছিল। এতগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় অনুমান করা যায় যে গ্রন্থখানি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে।

২। খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তি

মওলানা অবদুল ওয়াহীদ 'আল কাসেমী' সাহেব "খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তি" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

গ্রন্থখানির রচনাকাল ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ। এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারের ঠিকানা: গ্রাম—কাঁখুড়িয়া, পো:—বড় আলুন্দা, জেলা বীরভূম। ১২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থে খাজা সাহেবের জীবনীসহ কিছু অতিরিক্ত অংশ তিনি প্রদান করেছেন। এই অতিরিক্ত অংশের "তাবিজাত" অংশটি উল্লেখযোগ্য। বিপদ মুক্ত হওয়ার জন্য, অভাব মুক্ত হওয়ার জন্য, আহারের স্বচ্ছলতার জন্য, নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান পাওয়ার জন্য, বিদ্যার প্রাচুর্যের জন্য প্রভৃতি শিরোনামায় ৩৪টি তাবিজাত আরবী হরফে লিখিত হয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি পত্রও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থকার অন্য গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্যে জানা যায় খাজা সাহেবের জন্মকাল ৫৩৭ হিজরী নহে, ৫৩০ হিজরী এবং মৃত্যুকাল ৬৩২ হিজরী নহে, ৭২৭ হিজরী। দ্বিতীয়া পত্নীর নাম আছমাহ নয়, বিবি ইসমাতুল্লাহ। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র নয়, মাত্র এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত পুত্রের নাম জিয়াউদ্দীন আবুল খায়ের নহে, সে নাম জিয়াউদ্দীন আবু সায়ীদ। খাজা সাহেব প্রদত্ত ৪১টি উপদেশ বাণী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া এক স্থানে গ্রন্থকার কেরামত বা অলৌকিক শক্তির অবাস্তবতার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, "ইহা তাঁহার কেরামত নয়, অপবাদ।"

এইরূপ আরো মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার উক্ত সমস্ত তথ্য :— ১। মাসালেকুস সালেকীন, ২। সেয়ারুল আকতাব, ৩। সেয়ারুল আরেফিন, ৪। তারজামা ফেরেস্তা প্রভৃতি প্রমাণ্য গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করে আপন বক্তব্যের যাথার্থতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

আবদুল আজিজ আল্ আমীন সাহেব তাঁর "ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী" নামক গ্রন্থে খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর আশ্চর্য কেরামতির আঠারোটি গল্প সন্নিবেশিত করেছেন। এই পুস্তকের প্রকাশকাল বাংলা ১৩৬২ সালের ১লা পৌষ।

আমীন সাহেবের গল্পগুলি বেশ সুখপাঠ্য। উক্ত সমস্ত পুস্তক সমূহে বাংলা লোকসাহিত্য সম্ভারের উজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ অনেক কাহিনী লিখিত আছে।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী ঐতিহাসিক ব্যক্তি বটে, কিন্তু তাঁর জন্মকাল ও মৃত্যুকাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাছাড়া চিশ্‌তিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা যে খাজা সাহেব সে বিষয়েও নানা মত দেখা যায়। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটির উল্লেখ করা হল।

মৌলভী আজহার আলি লিখেছেন খাজা সাহেবের জন্ম তারিখ ৫৩৭ হিজরীর ১৪ই রজব সোমবার। (সেয়ারুল আকতাব, ১০১ পৃঃ)।

মৌলানা আবদুল ওয়াহীদ আল কাসেমী লিখেছেন, খাজা সাহেবের জন্ম তারিখ ৫৩০ হিজরীর ১৪ই রজব সোমবার। (খাজিনাতুন আফসিয়া, প্রথম খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)।

ডঃ আব্দুল করিম সাহেব ১১৪২ খৃষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। (সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, পৃষ্ঠা-৩৬)।[৩০]

শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ লিখেছেন, ১১৫৮ খৃষ্টাব্দ। (গৌড় কাহিনী, পৃষ্ঠা—৩৪৭)।[২৪]

খাজা সাহেবের মৃত্যু তারিখ ৬৩২ হিজরীর ৬ই রজব, কারো মতে, ৭২৭ হিজরীর ৬ই রজব! (মাসালেকুস সালেকীন, ২য় খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা)। কারো মতে, ১২৩৬ খৃষ্টাব্দ। (সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ ডঃ আব্দুল করীম)[৬১]

মৌলভী আজহার আলীর মতে চিশ্‌তিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা খাজা মঈবদ্দীনচিশ্‌তী।

মওলানা অবদুল ওয়াহীদ লিখেছেন যে আবু ইসহাক্ চিশ্‌তী এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। (সেয়ারুল আকতাব-১)।

কারো মতে বন্দা নওয়াজ, কারো মতে চিশ্‌তের খাজা আহাম্মদ আবদাল। (সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ : ডঃ আব্দুল করিম),৬১ . চিশ্‌তিয়া তরিকায় সুফী মতবাদের প্রবর্ত্তক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খাষ বিবি

পীরানী হজরত ফাতেয়াল যাদা জনসাধারণের নিকট খাষ বিবি নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিকীর অন্যতম বংশধর। চেঙ্গিস খাঁর ভারত আক্রমণ-কালে তাঁর বংশের কেউ ভারতে আগমন করেন এবং এদেশে বসতি স্থাপন করেন। খাষবিবির জন্ম হয় দিল্লীতে, তখন সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল।

যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে দমনের জন্য সেনাপতি মানসিংহ প্রেরিত হন। মানসিংহের সহিত খাষবিবি বঙ্গে আগমন করেন এবং বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার খাসপুর গ্রামে অবস্থিতি করেন। উক্ত খাষপুর নিবাসী সাহিত্যিক ও গবেষক আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব মনসুর আলি সিদ্দিকী সাহেবের এন্টালী বাগান লেনের (কলিকাতা, শিয়ালদহ) বা.সাং, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বাদুড়িয়া সাব্ রেজিষ্টারী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় দলিলের অনুলিপি বলে কথিত কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে এই তথ্য আমি দেখতে পাই। উক্ত অনুলিপির মধ্যে লিখিত নম্বর ২৪৯ এবং ক্রমিক নম্বর ১৫৫২। উক্ত অনুলিপিতে যা লিখিত আছে তার কিয়দংশ এইরূপ : --

"খাষপুর গ্রামের একমাত্র জাগ্রত পীর প্রাতঃস্মরণীয়া আবেদা ফাতেয়াল যাদা ওরফে আবেদা খাষবিবি পীর সাহেবানী হইতেছেন, কাগজ পত্রাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত পীর সাহেবানী আমার (আব্দুল গফুর সিদ্দিকী) ও আপনার উত্তরাদি বর্গের এখানকার প্রথম পুরুষ...হজরৎ সাহ্ সুফী আজ্জাম সেখ সাদাদাতুলা মরহুম মাসকুর কেবলার সহোদরা জ্যেষ্ঠ ভগিনী স্থানীয়া ও তাহারা উভয়ে শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত আখেরজ্জমান মোহাম্মদ মোস্তাফা মান্নে আ.মর প্রথম উত্তরাধিকারী ও প্রথম খলিফা মহাত্মা হজরত আবদুল্লা দিন আমিন আবু বকর সিদ্দিকী রাজী আল্লাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র

অন্যান্য…মহাত্মা হজরত আবদুর রহমান সিদ্দিকী রাজী আলায়হের বংশধর ছিলেন।…সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে পীর খাষবিবির নামে লাখেরাজ পাওয়া যায়।"

খাষবিবি এখানেই দেহত্যাগ করেন। যেখানে তাঁকে সমাহিত করা হয় সেখানে পাকা-দরগাহ-গৃহ নির্মিত হয়েছে। তাঁর দরগাহের সেবায়েত হিসাবে তাঁরই বংশধারা উক্ত গ্রামে আজো বর্তমান।

পীরানী খাষবিবির দরগাহে সেবায়েতগণ কর্তৃক 'নিয়মিতভাবে ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয়। ভক্ত জনসাধারণ সেখানে হাজত মানত শিরনি দেন। পীরোত্তর হিসাবে প্রায় দুই বিঘা জমি পতিত আছে। তাঁর নাম মহিমার জন্য গ্রামের নাম হয়েছিল খাষপুর। স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম সকল ভক্তই তাঁর প্রতি সমধিক ভক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি ইসলাম মাহাত্ম্য প্রচারের সহায়ক মানবদরদী ক্রিয়াকলাপের জন্য আজো স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি যে সুফী মতাবলম্বী ছিলেন এবং সেই মতবাদ প্রচার করেছিলেন এমন কোন প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গোরাচাঁদ পীর

পীর হজরত শাহ্ সৈয়দ আব্বাস আলী রাজী ওরফে হজরত পীর গোরাচাঁদ রাজী আরবের মক্কা নগরীতে ৬৯৩ হিজরীর ২১শে রমজান তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। মতান্তরে হিঃ ৬৬৪, খৃঃ ১২৬৫।[২৮] তাঁর পিতার নাম হজরত করিম্ উল্লাহ্ এবং মাতার নাম বিবি মায়মুনা সিদ্দিকা। পিতার দিক থেকে হজরত আলী এবং মাতার দিক থেকে হজরত আবু বকর সিদ্দিকীর রক্ত তাঁর দেহে ছিল। তাঁর দীক্ষা গুরুর নাম পীর হজরত শাহ্জালাল এয়মনি। তিনি পীর শাহ্জালালের নিকট কাদেরিয়া তরীকার সুফী মতে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

পীর শাহজালাল, হজরত শাহ্ সৈয়দ কবীর রাজীর আদেশে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসেন। হজরত পীর গোরাচাঁদও সেই সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি পীর শাহ্জালাল এয়মনির অনুমতি ক্রমে বঙ্গদেশের চব্বিশ পরগণা জেলার হাড়োয়া থানার অধীন বালাণ্ডা পরগণা অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। পীর গোরাচাঁদ আরো একুশ জন পীর ভ্রাতা সঙ্গে নিয়ে আনুমানিক ১৩০২-১৩২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের সময়ে বালাণ্ডা পরগণায় আগমন করেছিলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন।[৪০]

পীর গোরাচাঁদ রাজী, দেউলা বা দেবালয়ের স্বাধীন হিন্দু রাজা চন্দ্রকেতুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হননি। তবে স্থানীয় বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। রাজা চন্দ্রকেতু অভিশপ্ত হয়ে সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি অগ্রসর হন। অবশেষে হাতিয়াগড় পরগণায় ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি অকানন্দ ও বকানন্দের সহিত যুদ্ধে পীর গোরাচাঁদ গুরুতর রূপে আহত হন এবং ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফাল্গুন তারিখে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আশী বৎসর।[৪০]

কেহ বলেন কচিৎ হিন্দুর ঠাকুর সম্পূর্ণরূপে মুসলমান পীর হয়ে গেছেন কিন্তু নাম বদলাননি। যেমন বর্দ্ধমান ও চব্বিশ পরগণা জেলার পীর গোরাচাঁদ।[২] আবার কেহ বলেন যে ভাসলিয়া গ্রামের গোরাচাঁদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পীর গোরাচাঁদ নামে পরিচিত হন। (বেতার জগৎ: ১৬-২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩)। কেহ বলেন "পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈয়দ হুশেন শাহ গৌড়ের বাদশাহ হইলেন। গেরোগাজি বা পীর গোরাচাঁদ, হিজলীর মুসলমান সেনাপতির পুত্র এই সময়ে বাইশ জন আউলিয়া অর্থাৎ দৈব-শক্তি সম্পন্ন ফকির, হিন্দু রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করিয়া সত্যধর্ম প্রচারার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন।"[৫] মুনসী খোদা নেওয়াজের কাব্যে আছে—"ঘর তার দিল্লীর সহরে।" কবি মোহম্মদ এবাদোল্লার সহিত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের অভিমতের মিল আছে।

"গোরাচাঁদের মূর্ত্তিও আছে, কিন্তু বিরল। গোরাচাঁদের যোদ্ধা মূর্তিই দেখা যায়, অকৃতি বেশ সুন্দর ও বীরোচিত। পরিধানে চোগা-চাপকান, মাথায় পাগড়ী, হাতে তলোয়ার বাহন ঘোড়া। ব্যাঘ্র-বাহন গোরাচাঁদের মূর্ত্তি বর্তমানে অতি বিরল। পূজা বা হাজোতের কর্ত্তা সব ক্ষেত্রেই মুসলমান ফকির।[৩৮]

চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বালাণ্ডা পরগণার হাড়োয়া নামক গ্রামে হজরত পীর গোরাচাঁদ সমাধিস্থ হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর পবিত্র মাজার শরীফ বা দরগাহ, স্থানে প্রতি বৎসর ১১ই ফাল্গুন হতে ১৩ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত ওরস উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ নর নারী সমবেত হয়ে জিয়ারতাদি করে থাকেন। বহু আলেম, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, কবি, ভক্ত-সাধক সমবেত হয়ে বিভিন্ন ভাষায় ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওয়াজ, আউলিয়া রাজীর জীবনী সংক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতা আবৃত্তি করেন। সাধারণ শ্রোতারা তা শ্রবণ করে, জ্ঞান লাভ করে ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে থাকেন। এবিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। পীর গোরাচাঁদের শেষ খাদিমদার বা সেবায়েত ছিলেন মহাত্মা সেখ দারা মালিক। খাদিমদারের বংশধরগণ আজও (১৯৫৩) বিদ্যমান, কিন্তু উক্ত দরগাহের সেবা-ভার এখন জনসাধারণে ন্যস্ত হয়েছে।

পীর গোরাচাঁদের দরগাহে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ধূপ-বাতি দিয়ে জিয়ারত করা হয়। প্রায় প্রতিদিন কেহ না কেহ শিরনি, হাজত বা মানত দান করেন। মানতের মধ্যে দুধ, বাতাসা-জাতীয় মিষ্ট দ্রব্য, ফল প্রভৃতি প্রধান। প্রতি বৎসর ১২ই ফাল্গুন তারিখের ওরস উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে। সেই মেলায় নানারূপ বাজনা বাজে; কাওয়ালি, তারানা ও মানিক পীরের গান হয়; সার্কাস ও যাদু বসে; যাত্রা হয়। পীরের নামে এক হাজার পাঁচশত বিঘা জমি পীরোত্তর দান আছে। হাড়োয়ায় তাঁর সমাধির উপর এক সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্মিত আছে। গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন শাহ্ পীর গোরাচাঁদের মাজারের উপর এক সমাধি সৌধ নির্মাণ করে দেন।[২৪] অট্টালিকার পাশে আছে ফুলের বাগান। পাশেই বিদ্যাধরী নদী প্রবহমানা। স্থানটি অতি মনোরম। পীরের নামে প্রদত্ত 'দুধ ও পানি' ভক্ত জনসাধারণ পরম পবিত্রজ্ঞানে পুনরায় শান্তিবারি রূপে গ্রহণ করেন।

ওরস ও মেলার সময় 'সোন্দল' বা শোভাযাত্রা বাহির হয়। সোন্দল শব্দের অর্থ এইরূপ : —"শোভাযাত্রা সহকারে ভক্তগণ পীরের উদ্দেশ্যে দেয় উপহারাদি নিয়ে দরগাহে উপস্থিত হন। সেই উপহারাদি সমাধির উপরে খাদিমদারগণ কর্তৃক সুসজ্জিত করা হয়। উক্ত উপহারগুলি পবিত্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত করার পর উহাতে গোলাপ জল, আতর প্রভৃতি নিক্ষেপ করা হয়। যে শোভাযাত্রা এই পবিত্র কর্ম সম্পাদন করে তাকে সোন্দল বলে।" এই সোন্দলে বা শোভাযাত্রায় নানাবিধ বাজনা বাজে এবং বাংলা ভাষায় ভক্তিমূলক তারানা গীতও গাওয়া হয়। বারগোপপুরের কিনু ঘোষ ও কানাই ঘোষদিগের সময় থেকে প্রতিবেশী গ্রামের গোপনন্দন এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা ভারে ভারে গো-দুগ্ধ এনে দরগাহে সমবেত হন। সেই দুগ্ধই প্রথমে মাক্‌বারা বা সমাধির উপর ঢেলে দেওয়া হয়।

হজরত পীর গোরাচাঁদের স্মৃতির সম্মানে ভক্তগণ কোনও রাস্তার নামকরণ করেছেন কিনা জানা যায় না।
তাছাড়া হাড়োয়ার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাঁর নামেই আছে গোরাচাঁদ পাঠাগার, গোরাচাঁদ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, গোরাচাঁদ চিকিৎসালয় ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠান। হাড়োয়ার হাটে ভক্তগণ পীরেব প্রতি প্রণতি জানিয়ে বেচা-কেনায় ব্যাপৃত হন। প্রায়শঃই দেখা যায়,

ক্রেতা বা বিক্রেতা নিজ নিজ কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য বলেন "গোরাচাঁদের দিব্বি।" অনেকে দূর যাত্রার পূর্বে তাঁর নাম স্মরণ করেন।

"কিছুকাল আগে পনের কুড়ি বছর পূর্বেও কলকাতার কোন কোন পল্লীতে সন্ধ্যার সময় এক শ্রেণীর ফকিরদের দেখা যেত। তাদের পরিধানে থাকতো কালো রঙের আলখাল্লা, পায়জামা, মাথায় টুপী, গলায় ছোট বড় পুঁথির মালা। এক হাতে আশাদণ্ড বা ময়ূরপুচ্ছের চামর, অপর হাতে ধূমায়িত ধূনাচি। তারা হিন্দু মুসলমান সকলের বাড়ীতে দরজার সামনে এসে আবৃত্তি করত, "পীর গোরাচাঁদ মুস্কিল আসান।"৩৮

"ফকিররা অনেকে সময় সময় গোরাচাঁদের গানও গাইত। পল্লীর গায়েনরা সর্বপীর বন্দনায় অনুরূপ গান গেয়ে থাকেন।

গোরাচাঁদ একদিল রহিল অনেক দূর।
গোরা গেল বালাণ্ডায় একদিল আনারপুর॥
হেতেগড়ে যেতে গোরার মা দিয়েছে বাধা।
হেতেঘরে যায় না গোরা আছে হারামজাদা॥
মায়ের বাধা গোরাচাঁদ না শুনিল কানে।
আকনের সঙ্গে যুদ্ধ হইল হেনকালে॥
আকানন্দ বাকানন্দ রাবনের শালা।
তার সঙ্গে যুদ্ধ হল আড়াই পক্ষ বেলা॥
কি জানি আল্লার মর্জি নসিরের ফের।
চেকোবানে গোরাচাঁদের কাটা গেল ছের॥"৩৮

হাড়োয়া ব্যতীত বারাসত-বসিরহাটের যেসব স্থানে তাঁর নামে নজরগাহ বা স্মৃতিচিহ্ন আছে তাদের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হল;—

১। এয়াজপুর

এই গ্রামটি বারাসত মহকুমার দেগঙ্গা থানার অধীন। প্রায় ছয় বিঘা জমির মধ্যে পুকুর এবং একটি ইটের তৈরী নজরগাহ্ আছে। বিশাল বটগাছে আচ্ছাদিত স্থানটি বেশ মনোরম। নজরগাহের গায়ের ফলকে লিখিত আছে—

"পীর গোরাচাঁদ সাহেবের ভূমাসন
শাহ সুফী সৈয়দ আব্বাছ আলি
ওরপে পীর গোরাচাঁদ সাহেব
প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্বে
পদ্মা নদী পার হইয়া এইস্থানে
বসেন, এখানে তাঁহার মাজার নহে।

এয়াজপুর — ইতি—
১লা কার্ত্তিক ১৩৬১ — শেখ বদিয়াজ্জমা।"

এয়াজপুরের নজরগাহের বর্তমান (১৯৫৩) খাদিমদারগণের অন্যতম শেখ আব্দুল ওদুদ (৫৩) জানালেন যে এই নজরগাহের মোট নিষ্কর জমি ছিল ১১০ বিঘা। কোন এক সময়ে ঐ জমির খাজনা ধার্য হয় এবং কালক্রমে বাকী খাজনায় নিলাম হলে তা ডেকে নেন বসিরহাটের জসীমদ্দিন কারিগর। সাতক্ষীরা পলাশপোলের খাঁ চৌধুরীরা পরে ঐ জমি জসীমদ্দিনের কাছ থেকে কিনে নেন। খাঁ-চৌধুরীরাই পরবর্তীকালে ৬ বিঘা জমি পীরের নামে নিষ্কর দান করেন। এই নজরগাহে বিশেষ কোন কোন সময়ে ধূপ বাতি প্রদত্ত হয়। প্রতি বছর ১২ই ফাল্গুন তারিখে এখানে মিলাদ হয়। অতিথি ও ফকিরগণকে সেবা করা হয়। এখানে নামাজ করা হয় না। মহরমের সময় নজরগাহের সামনের ময়দানে মেলা বসে। আব্দুল ওদুদ সাহেবের ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ মহম্মদ শুকুর উল্লাহ সাহেব বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত আঁধারমানিক নামক গ্রাম থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং তদবধি তাঁরা বংশ পরম্পরায় এই নজরগাহের খাদিমদার নিযুক্ত আছেন। কিভাবে মোহম্মদ শুকুর আলি সাহেব এখানে খাদিমদার নিযুক্ত হয়েছিলেন তা জানা যায় না।

২। ভাসলিয়া

বারাসত মহকুমার দেগঙ্গা থানার অধীন ভাসলিয়া গ্রামে প্রায় ২৫ বিঘা জমির একস্থানে একটি নজরগাহ আছে। তার বর্তমান (১৯৫৩) সেবায়েত মোহাম্মদ আবদুস্ সুকুর (৮৫) প্রমুখ বলে জানা গেল। প্রতি বৎসর ১২ই ফাল্গুন তারিখে ওরস এবং একদিনের মেলা হয়। মেলায় প্রায় ৫।৬ শত

ভক্তের সমাগম হয়। কেহ উল্লেখ করেছেন যে ভাসলিয়ার গোরাচাঁদ বন্দ্যো-পাধ্যায় মুসলমান হয়ে পীর গোরাচাঁদ হয়েছিলেন। তার কোন সমর্থন এখানকার কোন সূত্র থেকে পাওয়া যায় না। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি দিয়ে জিয়ারত করা হয়। ওরসের সময় কলিযুগা গ্রামের ভক্ত গোপগণ ন্যূনপক্ষে একপোয়া দুধ এই নজরগাহে দেন বলে শোনা যায়। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে আবদুস স্কুর সাহেব একটি টিনের ফলকে নিম্নলিখিত রূপ লিখে এই নজরগাহ-স্থানে রেখে দিয়েছেন,—

"হে মুসলমানবৃন্দ প্রত্যেক গোরস্থানে পড়হো—

১। আচ্ছালামো আলায়কোম ফি আহালেল কবুর ১ বার

২। বিছমিল্লাহের রাহমানের রাহিম ১০ বার"

মীর সইফুর রহমান আরো জানালেন যে মীর আতিয়ার রহমান (পিতা মরহুম গোলাম রহমান) প্রায় ৩২ বৎসর পূর্বে নজরগাহটি পাকা করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি গোপগণের সহায়তা লাভ করতে স্বপ্নে আদেশ পান, কিন্তু গোপগণ তেমন কোন সহায়তা না করায় নজরগাহ পাকা করার কাজ অর্ধসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হন।

বহু ভক্ত এখানে শিরনি, হাজত ও মানত দিয়ে থাকেন।

৩। হাসিয়া

এই স্থানটি দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত এবং ভাসলিয়া গ্রামের পাশেই তেঁতুলিয়া নামক গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। এখানকার পীরোত্তর জমির পরিমাণ প্রায় বিশ বিঘা। এখানে ১২ই ফাল্গুনে ওরস ও একদিনের মেলা বসে ও প্রায় ৪০০ লোকের সমাবেশ ঘটে। মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন প্রমুখ ব্যক্তি ইহার সেবায়েত। এখানে ভক্তগণ ধূপ-বাতি দেন, শিরনি, হাজত ও মানত প্রদান করেন।

৪। গাংধুলোট

দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত এই গ্রামের প্রান্তে প্রবাহিত বিদ্যাধরী নদীর তীরবর্তী সুবৃহৎ তেঁতুল গাছের নীচে একটি নজরগাহ অবস্থিত। পুরানো দিনের পাতলা ইটের গাঁথনি। এখানে পীরোত্তর জমি ছিল প্রায় ৩২ বিঘা।

বর্তমানে (১৯৫৫) তার পরিমাণ প্রায় ১২ বিঘা। এখানে শিরনি, হাজত ও মানত প্রদত্ত হয়। এখানকার সেবায়েত মোহাম্মদ হাজের শাহজী (৭০) প্রমুখ ব্যক্তি। এঁদের পূর্ব উপাধি ছিল 'সরদার'। এখানে ১২ই এর পবিরর্তে ১৩ই ফাল্গুন তারিখে ওরস এবং একদিনের মেলা হয়। মেলায় প্রায় ৫০০ লোকের সমাবেশ হয়। অতিথি সেবার ব্যবস্থা এখানে আছে।

৫। সাত হাতিয়া

দেগঙ্গা থানাধীন এই গ্রামের নজরগাহটি প্রায় ১২ বিঘা জমির একস্থানে অবস্থিত। পীর পুকুর নামে একটি পুকুর উক্ত স্থানটির অনেকখানি অংশ জুড়ে রেখেছে। একপাশে কবরস্থান। নজরগাহটি কামিনী ফুলের গাছ দ্বারা সজ্জিত। মোসাম্মেৎ সালেহা খাতুন (৫৫) এখানকার সেবায়েতগণের অন্যতমা। প্রায় প্রতি শুক্রবার ও শনিবারে তাঁর ওপর পীরের 'ভর' হয়। 'ভর' অর্থাৎ ব্যহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে তিনি অলক্ষিত নির্দেশ অনুযায়ী কথা বলেন ও কাজ করেন। মোসাম্মেৎ সালেহা খাতুন ঐরূপ 'ভর' হওয়ার পর পীরের নিকট থেকে ঔষধ-পত্র পান বলে অনেকের বিশ্বাস। ভক্তগণ সেই ঔষধ-পত্র ব্যবহার করে আরোগ্য লাভ করেন বলে শোনা গেল। এতদঞ্চলের লোক জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এখানে মানত করেন, শিরনি এবং হাজত দিয়ে থাকেন। এখানে কোন মেলা হয় না।

৬। গোসাইপুর

দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত গোসাইপুর গ্রাম। এই গ্রামে একটি নজরগাহ্ আছে। খাদিমদার বংশের জমিদার মুন্সী আমীর আলি সাহেব তাঁর সময় থেকে এই নজরগাহে ধূপ-বাতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বর্তমান খাদিমদার হলেন দীন মহম্মদ তরফদার। বর্তমানে (১৯৫৫) এখানে ধূপ-বাতি জিয়ারৎ করেন মোহাম্মদ বেলায়েৎ হোসেন (৮৫) প্রমুখ। তবে বিশেষ অনুষ্ঠান বা মেলা হয় না। একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে এক কাঠা পরিমাণ জমির উপর ইটের গাঁথুনি আছে। একখানি ইটের পরিমাণ এইরূপ :—১১" × ৫$\frac{3}{8}$" × ২$\frac{1}{2}$"।

৭। গাঙ্গুলিয়া

এই গ্রামটি দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত। মাটির দেওয়াল ও টালীর ছাউনি সমন্বিত (এই নজরগাহের) কল্পিত কবর স্থানটি একটি লাল কাপড়ে ঢাকা। ছাউনির উপরিস্থিত টিনের পাতে লেখা আছে :—"বিছমিল্লা হে রহমান লায়ে লাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদে রসুলুল্লাহ্। পীর গোরাচাঁদ ছাহেবের নজরগাহ। সন ১৩২৩ সাল ১লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।" টালীর ছাউনির উপরে টিনের ময়ূর মূর্তি আছে। পীরের নামে প্রদত্ত জমির পরিমাণ প্রায় আট বিঘা। এরই সীমানার মধ্যে সাধারণের কবরস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রতি বৎসর ১৬ই ফাল্গুন তারিখে ওরস হয় এবং পরে দুই দিনের মেলা বসে। গড় জমায়েত হয় প্রায় এক হাজার জনের। ভক্তগণ যথারীতি হাজত, মানত ও শিরনি প্রদান করেন। প্রতিদিন ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয়। খাদিমদার মুন্সী ফকিরের বংশধরগণের কাছ থেকে কাজী জয়নদ্দীন স্থানটি ক্রয় করেন। তাঁর বংশের কাজী ওমর আলির মৃত্যুর পর আব্দুল আজিজ সেবক নিযুক্ত হয়েছেন। মেলার দিনে বাজনা বাজে, সোন্দল বা শোভাযাত্রা বাহির হয়।

৮। সুহাই

গ্রামটি দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত। বিশাল অশ্বত্থ গাছের নীচে ইটের গাঁথুনি চিহ্নিত এই নজরগাহ প্রায় তিন বিঘা জমির মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে এই জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪।৫ বিঘা। পূর্ব সেবায়েতের নাম ছিল হরি মণ্ডল। সুহাই নিবাসী মোহাম্মদ সোলেমান দফাদার (৭০) জানালেন যে বর্তমানে (১৯৭০) জনসাধারণের পক্ষে মোহাম্মদ মোকসেদ আলি মণ্ডল (৩৫) নজরগাহে ধূপ-বাতি দেন। প্রতি বছর ১৬ই মাঘ তারিখে ওরস ও একদিনের মেলায় বহু লোক-সমাগম হয়। কিছুকাল আগে মেলায় জুয়াখেলা নিয়ে গোলমালের ফলে পুলিশী হস্তক্ষেপ ঘটে এবং মেলা অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, যার জন্য জনসমাগম কমে গেছে।

৯। নারায়ণপুর

দেগঙ্গা থানাধীন এই গ্রামে পীর গোরাচাঁদের নামে এপ্রিল মাসে গড়ে হাজার লোকের সমাবেশে চার দিনের মেলা হত বলে বেঙ্গল গেজেট ১৯৫৩ গ্রন্থে লিখিত আছে। বর্তমানে তার কোন নিদর্শন দৃষ্ট হয় না।

১০। দোগাছিয়া

দেগঙ্গা থানাধীন এই গ্রামে পীর গোরাচাঁদের নামে এপ্রিল মাসে গড়ে ১৫০ জন লোকের সমাবেশে ৪ দিনের মেলা হত বলে ১৯৫৩ ও ১৯৫৫ সালের বেঙ্গল গেজেটে (মেলা ও উৎসব বিবরণী) লিখিত আছে। বর্তমানে (১৯৫৫) তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

১১। জয়গ্রাম

১৯৫৩ সালের বেঙ্গল গেজেট অনুসারে বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত এই গ্রামে পীর গোরাচাঁদের নামে মে মাসে গড়ে ২০০ লোকের সমাবেশে পাঁচ দিনের মেলা হত বলে প্রকাশ। ১৯৩১ সালের সেটেলমেণ্ট রেকর্ড অনুযায়ী বাদুড়িয়া থানায় ঐ নামের কোন গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১২। সেরপুর

১৯৩১ সালের সেটেলমেণ্ট রেকর্ড অনুযায়ী হাবড়া থানার অন্তর্গত এই গ্রামের নামের উল্লেখ আছে। বর্তমানে অশোক নগরের প্রায় প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি বিশাল পুকুরের ধারে অবস্থিত একটি উঁচু টিলার ওপর পীর গোরাচাঁদের নামে যে নজরগাহটি আছে ঐটিই সেরপুরের 'দরগা' নামে খ্যাত। পীর বাবার পুর্ব্ব ... এখানকার পীরোত্তর জমির পরিমাণ প্রায় চল্লিশ বিঘা। প্রতি শুক্রবারে আবাল-সিদ্ধি গ্রামাঞ্চল থেকে এক মুসলমান মহিলা এখানে এসে ধূপ-বাতি দিয়ে জিয়ারৎ করে যান। বস্তুতঃ জনসাধারণই এখানকার সেবায়েত।

১৩। চন্দনহাটি

বারাসত থানার অন্তর্গত এই গ্রামের নজরগাহটি বর্তমানে (১৯৫৫) প্রায় ৪ কাঠা জমির উপর এবং বহু পুরাতন এক তেঁতুল গাছের নীচে অবস্থিত। এর ইটের দেওয়াল এবং টিনের চাল আছে। পূর্বে এখানে একদিনের মেলা হত এবং তাতে প্রায় ৫০০ লোকের আগমন ঘটত। বর্তমানে সেবায়েত মোহাম্মদ রোয়াব মণ্ডল (৩৫) প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি দিয়ে

জিয়ারত করেন। এই স্থান সম্পর্কীয় লোককথা পরবর্তী অধ্যায়ে লিখিত হয়েছে।

১৪। কামদেবপুর

আমডাঙ্গা থানার অন্তর্গত এখানকার নজরগাহটি এতদ্ অঞ্চলে খুবই প্রসিদ্ধ। পাকা নজরগাহ্ ১৭ কাঠা জমির উপর অবস্থিত। সেবায়েত শ্রীসূর্য্যকান্ত মাইতি (৫৪) বলেন যে, পূর্বে এখানে পীরের নামে প্রায় ৮ শতক জমি পতিত ছিল। জমির পরিমাণ বাড়িয়েছেন সেবায়েত নিজে। তিনি এই নজরগাহকে মন্দির নামে অভিহিত করেন। এই কারণেই এখানে শিরনি ও মানত প্রদত্ত হয় কিন্তু হাজত দিবার নিয়ম নেই। প্রতি বৎসর ১৫ই ফাল্গুন তারিখে বিশেষ অনুষ্ঠান এবং ঐ সাথে সাত দিনের মেলা বসে। বহু দূর দূরান্তের ভক্ত যাত্রীগণ এখানে সমবেত হন। তাঁদের জামায়েতের গড় সংখ্যা দৈনিক প্রায় তিন হাজার। সাধারণ গান-বাজনা ছাড়া বিভিন্ন স্থানের ফকিরগণ এসে মানিক পীরের গান করেন। নানাবিধ ব্যাধি থেকে নিরাময় লাভ করা যায় বলে খ্যাত হওয়ায় প্রতিদিন বিশেষতঃ ছুটির দিন রবিবারে যাত্রীর ভীড় বেশী হয়। এখানে ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয়, বাতাসা লুট দেবার নিয়ম আছে। অসংখ্য অতিথির সৎকার করা হয়। ভক্ত রোগীগণকে ঔষধ দেবার আগের মুহূর্তের এক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় বলে কথিত আছে। ঘটনার বিবরণের মূল কথা এইরূপ ;—

শ্রীসূর্য্যকান্ত মাইতি মহাশয় পবিত্রভাবে মন্দিরের মধ্যে আসনে আরাধনায় নিমগ্ন হলে তাঁর ওপর পীর গোরাচাঁদের 'ভর' হয়। তখন ভক্তগণ তাঁর মুখ থেকে প্রশ্ন মাধ্যমে জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নেন। ভক্ত রোগীর সেই সাথে নামমাত্র মূল্য দিয়ে ঔষধ গ্রহণ করেন। এই নজরগাহের ঔষধ ব্যবহার করে মস্তিষ্ক বিকৃতি থেকে আরোগ্য লাভ করে জনৈক ব্যক্তি যে প্রশস্তি পত্র রচনা করেছেন তা নিম্নরূপ (প্রশস্তি পত্রটি দেওয়াল চিত্র হিসাবে মন্দিরে শোভা পাচ্ছে)—

৺গোরাচাঁদ পীর মাহাত্ম্য-কথা।

মহাতীর্থ বারাসত কামদেবপুর।
তাহাতে বসতি নিত্য করেন ঠাকুর॥

আধি-ব্যাধি লয়ে সবে ছুটে যায় যবে।
ঠাকুর বলেন তাহা কিসে ভাল হবে॥
জর্জ্জরিত অস্থিসার ক্ষীণকায় দেহ।
মুহূর্ত্তে সজীব হয় পেয়ে তাঁর স্নেহ॥
হতবুদ্ধি উন্মাদের ফিরে আসে জ্ঞান।
সবে তাই করে নিত্য ঠাকুরের ধ্যান॥
মহাশক্তি কালিকার করো মানসিক।
ঠাকুর বলেন সবই হয়ে যাবে ঠিক॥
ভক্তি ভরে পূজ সবে কর গো প্রার্থনা।
আপনি পূরিবে জেনো সকল কামনা॥
শ্রদ্ধাভরে দেবতায় যদি ডাকে সবে।
অমনি শুনিবে কিসে ব্যাধিমুক্ত হবে॥
ত্রিতাপে তাপিত যারা এস নতশির।
এখানে আছেন প্রভু গোরাচাঁদ পীর॥
সেবাইত নিত্য তার বাবাজী ফকির।
সদা হাস্যমুখ আর অতি নম্রধীর॥
সকলি যেন তার আপন সন্তান।
বরাভয় দেন তিনি দিয়ে মন-প্রাণ॥
যার যা অব্যর্থ সেই মহা মহৌষধ।
অকাতরে দেন তিনি ঘুচাতে আপদ॥
পার্ষদ তাঁহার যারা তারাও অতুল।
সবাই মিলায় যেন অকূলের কূল॥
এসো তবে মুক্ত করে বলি সবে ভাই।
চরণে তোমার পীর দাও মোর ঠাঁই॥
জীবন কল্যাণে তুমি হয়ে আবির্ভূত।
করেছ আপন দুঃখ নিত্য তিরোহিত॥
ঈশ্বর আল্লার তুমি পূণ্য অবতার।
বহিছ আপন শিরে মহাগুরুভার॥

অভীষ্ট পূরাও তুমি ওগো শক্তিমান।
সমূহ বিপদ হতে করো পরিত্রাণ॥
কৃপা করে সংশয়ের ঘুচাও সংশয়।
ধিকৃত জীবনে পুনঃ কর মধুময়॥
তোমার মাহাত্ম্য রচি হেন সাধ্য নাই।
চরণে তোমার শুধু দাও মোর ঠাঁই॥
বাণীতে তোমার দাও অমৃতের স্বাদ।
ক্ষুদ্রমতি আমাদের ঘুচাও প্রমাদ॥
আশীর্ব্বাদ কর যেন ভক্তি আসে প্রাণে।
চিত্ত হয় মুখরিত তব জয়গানে॥

কৃপাপ্রার্থী
১৫ই ফাল্গুন ১৩৭০ সাল। সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এই নজরগাহ উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপ :— বন-জঙ্গলে আকীর্ণ এই স্থানে পীর গোরাচাঁদের একটি 'থান' ছিল। এই 'থানে' ঈশ্বরভক্ত সূর্য্যকান্ত মাইতি মহাশয় প্রত্যহ 'দুধ' দিতেন। তখন তাঁর দুধের ব্যবসায় ছিল। মূলতঃ তিনি খুব গো-ভক্তও ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি এইস্থানে এসে ভক্তিতে তন্ময় হয়ে একাকী বসে থাকতেন। বাংলা ১৩৫৫।৫৬ সালে তিনি স্বপ্নাদেশ পান সেই স্থানে ভক্তি অর্ঘ নিবেদন করার। সেই সময় থেকে তিনি ধূপ-বাতিসহ মিষ্টান্ন, দুধ, ফল ইত্যাদি দিতে আরম্ভ করেন। ১৩৫৭ সালে তিনি এই স্থান ইঁট দিয়ে গেঁথে দেন। তারপরে সেখানে সুরম্য অট্টালিকা-মন্দির গড়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীগণও এখানে আসেন।

শ্রীসূর্য্যকান্ত মাইতি মহাশয় জানালেন যে এই 'থানে' ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ থেকে ভক্তগণ রোগ নিরাময়ের জন্য আসেন। বাঙ্গালার খ্যাতনামা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ও একবার জাপানী কয়েকজন প্রতিনিধিকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। এই স্থানাঞ্চলে পীর গোরাচাঁদ সম্বন্ধীয় লোককথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে, 'ভর'-প্রাপ্ত হলে

শ্রীনাইতি মহাশয় যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে ইংরেজী, হিন্দী, জার্মান প্রভৃতি যথোপযুক্ত ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন।

১৫। দেউলা

দেউলা বা দেবালয় বা দেউলিয়া গ্রামটি দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত। এটি বালাণ্ডা পরগণার রাজা চন্দ্রকেতুর মন্দির-শোভিত গ্রাম। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এখান থেকেই গুপ্তযুগের নানা রকম নিদর্শন পাওয়া গেছে। রাজবাটী থেকে মন্দিরের দূরত্ব মাত্র এক কিলোমিটার হতে পারে। মন্দিরের গায়েই পীর গোরাচাঁদের একটি নজরগাহ আছে। নজরগাহটির পাকা ঘর-সংলগ্ন জমির পরিমাণ প্রায় ছয় কাঠা। তার সেবায়েত মোহাম্মদ কসিমুদ্দীন শাহজী প্রমুখ। নজরগাহটি প্রথম দর্শনে হিন্দু মন্দির বলে ভ্রম হতে পারে। সেবায়েতগণ এখানে প্রত্যহ ধূপ-বাতি দিয়ে জিয়ারত করেন।

১৬। সিংহ দরজা

বেড়াচাঁপার রাজা চন্দ্রকেতুর রাজবাটীর যে ধ্বংসাবশেষ আছে তার দক্ষিণাংশে রাজপ্রাসাদের প্রাচীর সংলগ্ন উঁচু জায়গায় গোলাকৃতি একটি নজরগাহ আছে। এইখানে রাজার সংগে পীর গোরাচাঁদ আলোচনায় বসেছিলেন বলে প্রচলিত প্রবাদ। জমির পরিমাণ তিন কাঠা। জনসাধারণই এখানকার সেবায়েত।

১৭। বেড়ু বাঁশতলা

বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত লতারবাগান নামক গ্রামে এই স্থানটি অবস্থিত। এই স্থানে বেড়ুবাঁশের দুইটি বহু পুরাতন ঝাড় থাকায় ঐরূপ নামকরণ হয়েছে। জনসাধারণই এই নজরগাহের সেবায়েত। বাঁশী ফকির নামক এক ব্যক্তি পূর্বে এইখানে অবস্থান করতেন এবং নিয়মিত ধূপ-বাতি দিতেন। এখনও ভক্তগণ সেখানে মানতাদি দিয়ে থাকেন। এরই একপাশে অনতি দূরে বিখ্যাত লাল বা রাঙা মসজিদ এবং অপর দিকে পীর গোরাচাঁদের মূল দরগাহ অবস্থিত। স্থানটির জমির পরিমাণ প্রায় এক বিঘা।

১৮। ঘোড়ারাশ

বসিরহাট থানাধীন ঘোড়ারাশ নামক স্থানে আনুমানিক দুই বিঘা জমির মধ্যে পীর গোরাচাঁদের নামে একটি নজরগাহ্ আছে। সেখানে একটি ফলক দৃষ্ট হয়। জনসাধারণ এই নজরগাহের সেবায়েত।

১৯। খড়ুর

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত এই গ্রামে প্রায় ১৫।১৬ বিঘা জমি পরিব্যাপ্ত এক বিশাল বট গাছের নীচে পীর গোরাচাঁদের একটি নজরগাহ অবস্থিত। ইটের গাঁথনিযুক্ত এই নজরগাহটি। এটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন মোহাম্মদ পঞ্চু সরদার। বর্তমান (১৯৭০) সেবায়েতের নাম মোহাম্মদ সরুৎউল্লাহ্ (৫০)। এখানে ভক্তগণ ধূপ-বাতি দেন, শিরনি, হাজত ও মানত দিয়ে থাকেন। উরসের দিন ১২ই ফাল্গুন। অধুনা সেখানে বিশেষ অনুষ্ঠান হয় না।

২০। নেহালপুর

বসিরহাট থানার অন্তর্গত নেহালপুর গ্রামে পীর গোরাচাঁদের নামে একটি নজরগাহ আছে। প্রতি বৎসর ১২ই ফাল্গুন তারিখে উরস্ উপলক্ষ্যে এই গ্রামের মহিষপুকুরের পাড়ে একদিনের মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। এই মেলায় প্রায় পাঁচ শতাধিক জনসমাবেশ হয়ে থাকে। ভক্তগণ এখানে ধূপ-বাতি, শিরনি ও হাজত-মানতাদি দিয়ে থাকেন। জনসাধারণ এই নাজরগাহের সেবায়েত।

২১। বামনপুকুরিয়া

বামন পুকুরিয়া গ্রামটি মীনার্খা থানার অন্তর্গত। এখানকার নজরগাহ স্থানে প্রতি বছর চৈত্র মাসে পীর গোরাচাঁদের তিরোধান উপলক্ষ্যে দুই দিনের মেলা বসে। প্রায় ৫০০।৬০০ জন লোকের সমাবেশ হয়। মেলাটি দুই দিন স্থায়ী হয়। এই গ্রামে মাত্র একঘর মুসলমান পরিবার বাস করেন। শোনা যায় জনৈক হিন্দু কর্তৃক এই নজরগাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চৈত্র মাসে পীরের

উরস উপলক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী কুশাংরা নামক গ্রামের মুসলমানগণ ঐ গ্রামে এসে স্থানীয় হিন্দুগণের সহযোগিতায় উৎসবের আয়োজন ও উৎসব পরিচালনা করেন। অপরাহ্নে উৎসবে যোগদানকারী মুসলমানগণ পীরের নজরগাহে জমায়েত হন এবং নানা বাদ্যভাণ্ডসহ একটি শোভাযাত্রা করে গ্রাম পরিক্রমা করেন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে জনৈক ফকির রঙীন কাপড়ে ঢাকা ক্ষীরের গামলা বহন করেন। এইভাবে গ্রাম-পরিক্রমা শেষে শোভাযাত্রাকারীরা দরগাহে ফিরে এলে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদরূপে উক্ত ক্ষীর বিতরণ করা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই গোরাচাঁদ পীরের নিকট নৈবেদ্য, ডালা ও অর্ঘ্যাদি মানত দিয়ে থাকেন। [পশ্চিম বঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (৩য় খণ্ড) ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ]

বাংলা ১৯৫৩ সালের ১২ই ফাল্গুন তারিখে শালিপুর গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ নরিম মোল্লা যে প্রার্থনা কবিতা রচনা করেছিলেন তা এইরূপ ;—

হজরত পীর সৈয়দ গোরাচাঁদ সাহেবের উরস শরীফ। শুভ ছোন্দল।

আবার এসেছে রে চির বসন্ত
বারই ফাল্গুন গোরাচাঁদ বাবার
সমাধি মাঝার শরীফের ডাক॥
এস প্রেম বুলবুল করো নাকো ভুল
আব্বাস আলি ওরফে "গোরাচাঁদ" বলে
কণ্ঠ ফাটিয়ে ডাক॥
এস এস ইংরাজ এস খৃষ্টান
এস হিন্দু মুসলমান॥
একই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আমরা ;
পাক পবিত্র হয় সমান॥
আজই এই দিনে বেহেস্ত স্বর্গ হতে
আসবে নেমে হাওয়ায়
মহান বীর গোরাচাঁদ পীর।

তব আশীর্বাদের ধারা সুন্দর করে মন,
আজই এই বার্গবপুরের বন।
অতি মনোরম নীল গগনের তারা,
তব সমাধি মন্দির ধরে আমরা পাপী অনুতাপি,
যাব সে ত'রে কোকিলের কুহু কুহু স্বরে।
তব গোলাপ চাঁপা জবা বকুল মুকুল ঝরে।
তোমার দরশন আসে রওজা মোবারক পাশে,
এত তব সুন্দর রাতি॥
গোলাম সেখ কালু আসি জ্বালায় ধূপ-ধুনা
আর মোমের বাতি।
ভক্তগণ যত তোমার প্রেম ভক্তিতে রত,
তোমার চরণ-ধূলি লইব অঙ্গে তুলি,
যোগী, ঋষি, মুনি শোনাবে প্রতিধ্বনি
পৃথিবীর বুকে ছড়িযে থাক,
সমাধি মাঝার শরীফের ডাক॥
হাড়োয়া শরীফ॥

হজরত পীর সৈয়দ গোরাচাঁদ সাহেবের উরস্ মোবারক শুভ ছোন্দল।

শীতের কঠোরতা ভুলে বসন্তের মহুয়া তুলে
ফুলে ফুলে গাহিছে ভ্রমর গুণ গুণ,
এলোরে বসন্ত প্রেম ডালি হাতে নিয়ে
পুষ্প ভরা বারুই ফাল্গুন।
কুঞ্জ মাঝারে থাকি গাহিছে বুল বুল
পাখী করো নাকো ভুল,

আব্বাস আলি শুধু গোরাচাঁদ নয়
ওযে আসমানী এক ফুল।
শুনিয়া মধুর তান লইয়া ক্ষুদ্র প্রাণ
আনিয়াছে অর্ঘ ডালি.
প্রেম পুষ্পে গাঁথিয়াছি মালা
নাহি মম চামেলি শেফালী।
রাজা মহাজন আর সাধারণ
অর্থকে চেনে প্রাণ হতে বড় করে,
দরবেশ বাদশা আর অলি আল্লা
বাস করে নির্লোভ অন্তরে।
বুঝি তাহা আজ ওগো মহারাজ
আনিয়াছি ক্ষুদ্র অর্ঘ,
তোমারি ডাকে আজ ভুলি শত কাজ
হুর পীর ছাড়ে স্বর্গ।
তুমি যে মহান তাহারই সমান
হয়না কিছুরই তুল্য,
জপে তপে সাজ সকলেরি মাঝ
প্রেম তাই দুরমূল্য।
বন্ধু যে যত সাক্ষাতে শত
ভুলোনা পীরের ডাক,
এই মাধুরী ভরা বসন্তে চির অনন্তে
বাজিছে পীরের ঢাক।
ধরার মাঝে ধরিতে গিয়া
অধরাতে পেলাম আলো,
শুধু চাঁদ-তারা নয় আলোকে সেথায়
তাইতো বেসেছি ভালো।
শত সুখ দুখ ভুলে হৃদয় দুয়ার খুলে
গাহিলাম ছন্দ বিহীন গুন,

কহিলাম ভাষাতে অতুল আশাতে
তুমি যে সাগরসম করুণ।

(মাজমপুর পীর সেবায়েত সংঘ। মোহাম্মদ মুজিবর রহমানের মজলিস হইতে। প্রধান পরিচালক মোঃ দরবেশ আলি।)

১২ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় বারাসত চাঁপাডালির মোড়ে এক সমাবেশে 'শাসন' গ্রাম নিবাসী ফকির তৈয়েব আলি (৪০) নিজেকে পীর গোরাচাঁদের ফকির বলে পরিচয় দিলেন। তাঁর হাতের একটি ব্যাগে লেখা ছিল "পীর গোরাচাঁদ সেবা সমিতি"। তিনি নিম্নলিখিত গানটি গাইলেন,—

মরুতে এলেন মোহাম্মদ মথুরাতে এলেন শ্যাম।
ইমান খেলা খেলেন রসুল লীলা খেলেন ঘনশ্যাম॥
মা খোদেজা পাগল হল নবীর প্রেমে মদিনায়।
বাঁশীর সুরে পাগল হয়ে রাধা চলে যমুনায়॥
দুই রাখালে মজিয়ে মন গরু আর ভেড়ী চরায়॥
আয়রে তোরা দেখে যারে হিন্দু আর মোছলমান।
মদিনা আর মথুরা, হয় যে সেথা যুগল মিলন॥
বলরাম আর বসুধাম, রঘুরাম আর বলরাম।
ইমান খেলা খেলেন রসুল লীলা খেলেন ঘনশ্যাম॥
একই মায়ের ছেলে মোরা একই স্তন্য করি পান।
একই মায়ের দুগ্ধ পিয়ে মোরা হিন্দু-মুসলমান॥
ভুলে গিয়ে রেষারেষি হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান।
ভুলে গিয়ে রেষারেষি পড় কুরান আর সে পুরান॥
মরুতে এলেন মোহাম্মদ মথুরাতে এলেন শ্যাম।
ইমান খেলা খেলেন রসুল লীলা খেলেন ঘনশ্যাম॥

'এইরূপ ছোট ছোট গীতসমষ্টি' অনেক ভ্রাম্যমান ফকির গেয়ে বেড়ান বলে শোনা যায়। তাছাড়া পীর গোরাচাঁদের নামে রচিত নিম্নলিখিত স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে ;—

১। পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী : মহম্মদ এবাদোল্লা

২। পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী : মুনশী খোদা নেওয়াজ
৩। বাংলার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী : আব্দুল গফুর সিদ্দিকী,
৪। গোরাচাঁদ ও চন্দ্রকেতু : মোহাম্মদ হরমুজ আলী।

উপরোক্ত গ্রন্থ সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হল।

১। পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী কাব্য

পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী কাব্যের রচয়িতা কবি মোহাম্মদ এবাদোল্লা। কবির জন্মভূমি বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত পিয়ারা নামক গ্রাম। পীর গোরাচাঁদের শেষ খাদিমদার শেখ দারা মালিকের মধ্যম পুত্র শেখ লাল, কবি এবাদোল্লার পূর্ব পুরুষ। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব তাঁর অনুজ। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানা যায়নি। তবে তাঁর কাব্যরচনার তারিখ অনুযায়ী জানা যায় তিনি খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকালের শেষ দিক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

তাঁর পুস্তকখানি মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০। আকৃতি ১০"×৬"। পাঁচালী কাব্যখানি যথাক্রমে হাম্‌দো, নায়াত ও গল্প এই তিনটি অংশে বিভক্ত। হাম্‌দো ও নায়াতের মূল বক্তব্য হল আল্লাহ্-বন্দনা। এতে উৎসর্গপত্র ও ভূমিকা (গদ্যে লিখিত) আছে। সমগ্র কাব্যখানি হেমেটিক রীতিতে দ্বিপদী ও ত্রিপদী পয়ারে লিখিত। এই কাব্যের ভণিতার নমনা এইরূপ,—

ভাগ্যমন্দ হয় যার, বুদ্ধি লোপ হয় তার
নাহি আসে গোরায় মিলিতে।
হীন এবাদোল্লা কয়, ভরসা করি খোদায়
মরিবে শেষে গোরার হাতে॥

কিংবা,

ভেঙ্গে পড়ে কোটাঘর, ভাগে লোক পেয়ে ডর
ফাঁক পেয়ে চুরি করে চোরে।
গোরার চরণ তলে, হীন এবাদোল্লা বলে
ঘটে ইহা গোরার জেকেরে।

এই পাঁচালী কাব্যের প্রতি পংক্তিতে আছে ষোল অক্ষর। প্রথম পংক্তির শেষে এক দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে দুই দাঁড়ি। কয়েকটি চরণের মাঝে মাঝে বড় হরফের দু'একটি করে শব্দ আছে। কবি একই শব্দ দু'বার না লিখে একটির পরিবর্তে '২' ব্যবহার করেছেন।

কবি মোহাম্মদ এবাদোল্লা সাহেবের 'পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী কাব্য' চব্বিশ পরগণার চলতি মুসলমানী বাংলা ভাষায় রচিত। ভাষা বেশ প্রাঞ্জল এবং তাতে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা কম। শব্দ যোজনায় দুর্বলতা বা বর্ণাশুদ্ধি তেমন নেই। তাঁর কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর চুম্বক এইরূপ ;—

মক্কার করিমোল্লার পুত্র আব্বাস আলি, আল্লাহ্ তা'লার সাধন-ভজনে মগ্ন। একদিন তিনি হিন্দুস্তানের অন্তর্গত বালাণ্ডা পরগণায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করবার জন্য আল্লাহ-নির্দেশ প্রাপ্ত হন। তিনি হিন্দুস্তানে এসে গাজীপুর হয়ে সিলেটে আসেন এবং সেখানে পীর শাহ্জালালের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দীক্ষান্তে ফিরে যান মক্কায় এবং সেখানে মাতা-পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে করিমোল্লার পালক-পুত্র ছোন্দলকে সহচররূপে নিয়ে বালাণ্ডা পরগণায় এসে উপস্থিত হন। পথিমধ্যে তাঁদের সঙ্গে আরও সুফী ফকিরের সাক্ষাৎ হয়।

বালাণ্ডা পরগণার এয়াজপুর নামক গ্রামে এসে পীর গোরাচাঁদ, সেখানকার রাজা চন্দ্রকেতুর কাছ থেকে নজরানা আদায়ের নির্দেশ পাঠালে তাঁদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। কয়েকটি অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েও তিনি রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেন না। ফলে উপস্থিত হয় বিবাদ এবং সেই বিবাদের পরিণতিতে রাজা ও তাঁর পরিবারবর্গ দহ-ডুবিতে ধ্বংস প্রাপ্ত হন। পীর গোরাচাঁদ সেই রাজার অনুচর ও সহযোগী যোদ্ধা হামা-দামা এবং আরো কয়েকজন দৈত্যকে নিধন করেন। তাঁর সঙ্গে শেষ যুদ্ধ হয় হাতিয়াগড়ের রাক্ষস-রাজ আকানন্দ ও বাকানন্দের সঙ্গে। এই যুদ্ধে আকানন্দ-বাকানন্দ নিহত এবং তিনি গুরুতররূপে আহত হন। অবশ্য অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তিনিও দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের পূর্বে তাঁরই নির্দেশমতন স্থানীয় বাসিন্দা কিনু ঘোষ ও কালু ঘোষ তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করেন।

কবি মোহাম্মদ এবাদোল্লা প্রত্যক্ষভাবে পীর গোরাচাঁদের মাহাত্ম্যকথা এবং পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য কথা প্রকাশ করেছেন।

গন্থগ্রন্থনে কবির নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়। কবির ভণিতা থেকে জানা যায় অন্তরতঃ তিনি ছিলেন একজন ভক্ত। "হীন এবাদোল্লা কয়" উক্তি থেকে আরো বোঝা যায় যে তাঁর মন ছিল বৈষ্ণবসুলভ ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ। এই কাব্যে বর্ণিত অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ 'সেক শুভোদয়া'-গ্রন্থে বর্ণিত অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপের কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজা লক্ষ্মণ সেন বিস্মিত হয়েছিলেন শেখ সাহেবের অলৌকিক কার্য্যাবলী দেখে, আর রাজা চন্দ্রকেতুও বিস্মিত হয়েছিলেন পীর গোরাচাঁদ কর্তৃক প্রদর্শিত অলৌকিক কার্য্যাবলী দেখে।

২। পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী কাব্য

পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী কাব্যের অন্যতম রচয়িতা কবি মুন্শী খোদা নেওয়াজ। তিনি তাঁর আত্ম পরিচয়ে লিখেছেন ;—

জেলা বর্দ্ধমানের বাহাদুরপুরে ঘর *
ওরফে খেজুরহাটি সবারে জানাই ॥
পরগণা খণ্ডঘোষ জাহের আছে ভাই *

কবির পিতার নাম একরামদ্দিন। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি মধ্যম।

বত্রিশ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাঁর পাঁচালী কাব্যখানি হামদো-নায়াত এবং কেচ্ছা এই দুইভাগে বিভক্ত। আকৃতি ১০"×৬½" ইঞ্চি বিশিষ্ট। এতে দুটি গান আছে। একটির রাগিনী বেহাগ, তাল আড়া। অন্য গানটি একটি ধুয়া। প্রতি অনুচ্ছেদের আরম্ভে পয়ার বা ত্রিপদী বলে উল্লেখ আছে। প্রথম পংক্তির শেষে দুই দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে তারকা চিহ্ন। কোথাও বা 'কমা'র ব্যবহার আছে।

পাচাঁলীখানি বাঙ্গালা-মুসলমানি ভাষায় রচিত, কিন্তু সে ভাষা তেমন প্রাঞ্জল নয়। এতে আরবী, ফারসী, হিন্দি প্রভৃতির সাথে কিছু ইংরেজী শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দ যোজনায় দুর্বলতা আছে, আছে প্রচুর বর্ণাশুদ্ধি। বর্ধমানের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবও এতে পড়েছে। পংক্তির শেষে মিল ঘটানোর জন্য কোথাও কোথাও কবি অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন।

তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত ভণিতার নমুনা এইরূপ ঃ -

হীন খোদা নেওয়াজ কহে আমি গুনাগার॥
না জানি কি পরকালে হইবে আমার *

মুন্সী খোদা নেওয়াজ সাহেব-লিখিত পাঁচালি কাব্যের কাহিনীর চুম্বক এইরূপ ;—

আল্লার ফরমান পেয়ে দিল্লীর পীর গোরাচাঁদ বালাণ্ডা পরগণায় এলেন। বালাণ্ডার রাজা চন্দ্রকেতুকে পীর বশ্যতা স্বীকার করতে বললেন। রাজা বশ্যতা স্বীকার করলেন না। ফলে রাজা পীর কর্তৃক অভিশপ্ত হলেন এবং সপরিবারে ধ্বংস হয়ে গেলেন। রাজার অনুগত হামা ও দামা নামক বীর ভ্রাতৃদ্বয়ও গোরাচাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাস্ত হল। দক্ষিণ অঞ্চলের অধিপতি দক্ষিণ রায় অবস্থা বুঝে নিয়ে, তাঁর রাজ্যের অর্ধেক পীর গোরাচাঁদের জন্য ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু হাতিয়াগড়ের অধিপতি রাক্ষস-রাজ আকানন্দ এবং তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাকানন্দের সঙ্গে পীর গোরাচাঁদের তুমুল সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে আকানন্দ ও বাকানন্দ নিহত হন আর পীর গোরাচাঁদ গুরুতরভাবে আহত হন। অবশ্য কয়েক দিন পরে তিনিও দেহত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে স্থানীয় অধিবাসী ভক্ত কিনু ঘোষ ও কালু ঘোষ, পীর গোরাচাঁদের দেহ বালাণ্ডাতে সমাধিস্থ করেন।

পীর গোরাচাঁদের প্রস্তেকালের বহুদিন পর একবার বালাণ্ডা পরগণায় বাঘের নিদারুণ উপদ্রব দেখা দেয়। প্রজাগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে ব্যথিত পীর গোরাচাঁদ অন্তরীক্ষ থেকে বাদশাহ দ্বারা পেয়ার শাহকে বালাণ্ডা পরগণায় শাসনকর্তা নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। পেয়ারশাহ্ খুব প্রজা হিতৈষী ছিলেন। তিনি সেখানকার অনেক স্থানের বন কাটিয়ে সকলের বসবাস-উপযোগী করে দেন। প্রজাগণ সুখে বাস করতে থাকেন। কালক্রমে দুষ্ট্ লোকের প্রভাবে সেখানে দেখা দেয় দারুণ অশান্তি। পেয়ার শাহ্ শান্তি ফিরিয়ে আন্তে যথাসর্বস্ব পণ করেন। প্রজা-হিতৈষী পেয়ার শাহ্ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য এক বিশাল দীঘি খনন করান। কিন্তু অবস্থা এমনি দাঁড়ায় যাতে সেই দীঘির জলে ডুবে তাঁকেই আত্মহত্যা করতে হয়। এর পর সেখানে আবার অরাজকতা নেমে আসে।

পীর গোরাচাঁদ পুনরায় মীরখাঁ নামক স্থানীয় এক সাধু ব্যক্তির সহায়তা নিয়ে সেখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আন্‌তে সচেষ্ট হন। মীর খাঁ দরিদ্র হয়েও পীর গোরাচাঁদের প্রতি আন্তরিক আস্থাবান ছিলেন। তাঁকে সাথে নিয়ে পীর সাহেব অলৌকিক শক্তির প্রভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। সেই সময় থেকে তাঁর সমাধিস্থানে হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণের দ্বারা জিয়ারত অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের সূত্রপাত হয়।

পীর গোরাচাঁদের কাহিনীতে দেখা যায় প্রত্যক্ষভাবে তাঁর এবং পরোক্ষ-ভাবে আল্লাহ্‌ তা'লার মাহাত্ম্য-কথা প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যের প্রারম্ভে কবি গেয়েছেন,—

পহেলা আরম্ভ করি নামেতে আল্লার॥
চৌদ্দভুবন বিচে যার অধিকার * ইত্যাদি।
কবি ভণিতায় যা বলেছেন তা এইরূপ;—
কবি খোদা নেওয়াজ কয়, ভাব রে মন খোদাতালায়,
জনম মোর গেল যে বিফলে॥
থাকিতে এ জেন্দেগী, করিবে যে বন্দেগী,
তোরে যাবে পরকালে *

কাব্যখানি পাঠকালে পীর গোরাচাঁদের অলৌকিক শক্তির পরিচয় বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। তাঁর বীরযোদ্ধা রূপ সকলকে সহজে আকৃষ্ট করে। বীরত্ব কথা শুনবার স্বভাবসিদ্ধ আগ্রহ অনেক মানুষের। এ কাহিনী তার পরিতৃপ্তি দান করে। একে পীর গোরাচাঁদ চরিত বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। এই কাহিনী পাঠ করতে করতে তাঁর প্রতি একটা সমীহভাব জাগে। মূল চরিত্র পীর গোরাচাঁদের মৃত্যুতে করুণ রসাভাসের উদ্রেক হয়। এই কাহিনীতে দেখা যায় যে, তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর ক্রিয়াকলাপের অবসান হয়নি। নানা রূপ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর অলৌকিক কীর্ত্তি সমগ্র কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে রাখতে সমর্থ হয়েছে। রসবিচারে কাব্যখানি মিলনান্ত পর্যায়ে পড়ে। কাহিনীতে ঘটনার অবতারণার সাথে অঙ্কিত অন্যান্য চিত্রে কবির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। গল্প গ্রন্থনেও কবির নৈপুণ্যে যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। মানব

চরিত্রের পাশে আছে রাক্ষস-রূপী মানবের চরিত্র, আর আছে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের চরিত্র। দু'একটি চরিত্রে বৈষয়িক সূক্ষ্ম-বুদ্ধির পরিচয় বর্ণনা লক্ষণীয়। হাতীগড় নামক স্থানে একটি ঘটনায় মানুষের প্রতি মানুষের মন কতখানি সন্দিহান হয়েছিল তার নমুনা এইরূপ ;—

মোমিন বলে দেওয়ান সকল আমি জানি॥
পরের দায় পরে মজে কোথাও না শুনি *
আমার তলব চিঠি তুমি কেন যাবে॥
বুঝিবা ফকির করে খানা.পানি খাবে *

খোদা নেওয়াজের এই কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর যে অলৌকিক ঘটনার বিবরণ আছে তা "সেক শুভোদয়ায়" শেখ কর্তৃক প্রদর্শিত অলৌকিক ঘটনার বিবরণের সঙ্গে তুলনীয়। একটি কাহিনীর তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ ;—

চন্দ্রখেতু নামে রাজায়, কত সাজা দিল তায়,
গোরাই পীর মকবুল খোদার *
তবু রাজা করে হেলা, পাকাইল লোহার কলা,
বেড়ায় ফুল ফুটিল চাঁপার॥

"সেক শুভোদয়াতে" দৃষ্ট হয়, রাজা লক্ষ্মণ সেন, শেখ সাহেবের অলৌকিক শক্তিতে প্রথমে সন্দেহ করেছিলেন। পরে তিনি দেখলেন 'গচি'-মাছ মুখে একটি সারস পাখীকে। শেখ সাহেব, রাজাকে বিস্মিত করে এমন অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিলেন যাতে তাঁর আদেশে উক্ত সারস পাখীটি নিজের আহার্য্য মাছটি মুখ থেকে ফেলে উড়ে চলে যায়।

অনুরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক কাহিনী আর যে সব কাব্যে পাওয়া যায় তাদের কয়েকখানির নাম নিম্নে প্রদত্ত হল,—

১। পীর গোরাচাঁদ : মহম্মদ এবাদোল্লা
২। মানিক পীর : মোহম্মদ পিজিরদ্দিন
৩। বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি : কৃষ্ণহরি দাস
৪। পীর একদিল শাহ্ : আশক মহাম্মদ

৫। গাজী-কালু ও চম্পাবতী : আবদুর রহিম

৬। রায় মঙ্গল কাব্য : কৃষ্ণরাম দাস

৭। গাজী সাহেবের গান : নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সংকলিত প্রভৃতি।

বিষয়টি তুলনামূলকভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে অনুরূপ ধরনের গল্পাংশ রামায়ণ, মহাভারত, শেক্‌সপীয়রের টেম্পেষ্ট, খৃষ্টীয় কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থ, কাব্য প্রভৃতিতে লিখিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, মধ্যযুগীয় সমস্ত দেব-দেবী বা তদ্‌স্থানীয় চরিত্র-ভিত্তিক প্রায় সমস্ত কাব্যে এই বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়।

৩। বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী

এই গ্রন্থের রচয়িতা আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১লা কার্তিক তারিখে বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানাধীন খাসপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম যদুরহাটি গ্রামের পাশে অবস্থিত। তাঁর পিতার নাম মুনশী গোলাম মাওলা সিদ্দিকী। অব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে গেছেন। তাঁকে কেউ কেউ অনুসন্ধান-বিশারদ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এককালে আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব শিয়ালদহ অঞ্চলে চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন, যাতে তিনি ডাক্তার বলে পরিচিত হন।

"মোহাম্মদী, মোছলেম হিতৈষী, The Musalman প্রভৃতি পত্রিকার সংস্পর্শে এসে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহশীল হন। বঙ্গবাসী, সঞ্জিবনী, হিতবাদী, দৈনিক বসুমতী, দৈনিক নায়ক, দৈনিক সোলতান প্রভৃতি পত্রিকার সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। পরবর্ত্তীকালে তিনি পুথি সাহিত্যের সংগ্রহ ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হন এবং কতিপয় পুথির সম্পাদনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাঁহার দীর্ঘকালের সম্পর্ক ছিল এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।"

"তাঁহার পিতা মুনশী গোলাম মাওলা সিদ্দিকী কলিকাতায় কোর-আন শরীফ ও পুথি প্রকাশনা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। খাষপুরে শৈশব অতিবাহিত করিয়া ডাঃ সিদ্দিকী কলিকাতায় গমন করেন। তথায় স্কুলের শিক্ষা সমাপ্তির পর চিকিৎসা-শাস্ত্রে শিক্ষা গ্রহণ করেন। দুই বৎসর চিকিৎসাশাস্ত্রে

শিক্ষা গ্রহণের পর কলিকাতার শিয়ালদহ-অঞ্চলে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। অতঃপর ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি ও মরহুম আব্দুর রসুলের নেতৃত্বে রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং তেজস্বী বক্তারূপে খ্যাতিলাভ করেন।"

[আজাদ পত্রিকা]

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে বাইশ পুরুষের ভিটা ত্যাগ করতঃ পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্ত্তমান বাংলা দেশে সপরিবারে গমন করেন। সেখানে খুলনা জেলার অন্তর্গত দামোদর নামক গ্রামে তিনি বসতি স্থাপন করেন। উক্ত গ্রামেই তিনি ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁর সাহিত্য-কীর্ত্তির মধ্যে 'বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী' ছাড়া শহীদ তিতুমীর, লায়লা মজনু প্রভৃতি গ্রন্থ এবং সাহিত্য পরিষদ ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ খুবই মূল্যবান। তিনি নামের সঙ্গে যে ডক্টর অর্থাৎ ডি. লিট্. খেতাব ব্যবহার করতেন তা তিনি কোথায় কিভাবে পেয়েছিলেন তা জানা যায় না। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্ফর আহমদ সাহেব, যিনি যৌবনে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন, তিনি এটিকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি নয় বলে আমার কাছে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

"বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী" নামক মুদ্রিত পুস্তকখানি ৮৬ পৃষ্ঠা সমন্বিত। পুস্তকের আকৃতি ৭"×৫" বিশিষ্ট। গ্রন্থখানিকে উপক্রমণিকা, জীবনী ও উপসংহার এই তিনটি প্রধান অঙ্গে বিভক্ত বলে ধরা যায়। জীবনী অংশে অনেক শিরোনামা দিয়ে তিনি পীর গোরাচাঁদের অলৌকিক কার্য্যকলাপপূর্ণ কাহিনী বিবৃত করেছেন। এই কাহিনীগুলিকে লোককথা পর্য্যায়ে নেওয়া যাবে না। কারণ সিদ্দিকী সাহেব এ গ্রন্থকে অনেকগুলি প্রামাণ্য তথ্যপঞ্জীর ভিত্তিতে লিখিত বলে উক্ত গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থখানি আধুনিক সাধু-বাঙ্গালা ভাষায় প্রাঞ্জল গদ্যে রচিত। গল্প বলার ভঙ্গিতে পীর গোরাচাঁদের জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সংঘটিত কাহিনী এই

গ্রন্থে পরিবেশন করা হয়েছে। কথোপকথনের অনুসৃতিতে কাহিনীটি বেশ সুখপাঠ্য এবং চিরাচরিত পাঁচালীকারগণের ন্যায় ধর্মভাব জাগরণের প্রবল প্রবণতা না থাকায় ইসলামী কাহিনীতে একটি নতুন স্বাদ অনুভব করা যায়। সরস ভঙ্গিমায় লিখিত গ্রন্থখানি বিশিষ্ট সাহিত্য গুণ সমন্বিত হয়ে উঠেছে।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব যে কাহিনী পরিবেশন করেছেন তা সংক্ষেপে এইরূপ ;—

হিজরাব্দের ৬৯৩ সালে ২১শে রমজান তারিখের প্রাতঃকালে শিশু আব্বাস আলী আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আব্বাস আলীই পরবর্ত্তীকালে পীর গোরাচাঁদ নামে পরিচিত হন। তাঁর পিতা হজরত করিম উল্লাহ্ ছিলেন শহীদ হজরত হোসায়েন রাজীর অধঃস্তন বংশধর এবং তাঁর গর্ভধারিণী হজরত মায়মুনা সিদ্দিকা জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজরত সিদ্দিক আবুবকরের অধঃস্তন বংশে। আব্বাস আলীই তাঁর পিতা মাতার প্রথম সন্তান।

৬৯৭ হিজরাব্দে মাত্র চার বছর বয়সে তিনি শিক্ষারম্ভ করেন এবং ৭০৬ হিজরাব্দে মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁর শিক্ষালাভ সমাপ্ত হয়। কোরান হাদিছ শরীফের উপর তাঁর দখল আসে, ব্যাকরণ ও অঙ্ক শাস্ত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন এবং ফেকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান জন্মে।

৭০৭ হিজরাব্দে তাঁর সংসার বৈরাগ্য পরিলক্ষিত হয়। নামাজ, রোজা, কোরান-মজিদ এবং তসওফ শাস্ত্রের আলোচনায় তিনি মগ্ন থাকতে ভালবাসতেন। হজরত করিম উল্লাহ্ ও তদীয় পত্নী, পুত্রের ভাবান্তর দেখে উদ্বিগ্ন হলেন। পুত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও ৭০৮ হিজরাব্দের এক রাত্রে নিদ্রিত মাতা-পিতাকে রেখে আব্বাস আলী গৃহত্যাগ করেন।

কিশোর আব্বাস আলী বিরামহীন ভাবে পথ চল্‌তে চল্‌তে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বিশ্রামের জন্য একস্থানে অবস্থানকালে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে এক দরবেশকে দর্শন এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভ করলেন। নিদ্রাভঙ্গে তিনি নিজেকে এক পর্ণকুটিরে শায়িত দেখলেন। এটি একটি আশ্রম। আশ্রমের দরবেশ বিখ্যাত হজরত সৈয়দ শাহ্ জালাল রাজী এয়মনি। সেই দরবেশের নিকট তিনি ৭০৮ থেকে ৭২০ হিজরাব্দের মধ্যে কাদেরিয়া তরিকা মতে শিক্ষালাভ করে আধ্যাত্মিক জীবনে চরম উন্নতি লাভ করেন।

এদিকে আব্বাস আলীর গৃহত্যাগের পর রাত্রি প্রভাতে পুত্রকে দেখতে না পেয়ে সৈয়দ করিম উল্লাহ্ বুঝলেন যে খাঁচায় আবদ্ধ পাখী শিকল কেটেছে। হজরত শাহ্ জালাল রাজী নিজে মক্কায় এসে সৈয়দ করিম উল্লাহ্কে আব্বাস আলীর শিক্ষালাভ করার কথা প্রকাশ করেন। পরে তিনি সৈয়দ করিম উল্লাহ্কে আরো তিনটি পুত্র ও একটি কন্যালাভের আশীর্বাদ করে যান।

হজরত শাহ জালাল রাজী তদীয় খুল্লতাত হজরত শাহ্ সৈয়দ কবীর রাজীর আদেশক্রমে হিন্দুস্তানে ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে গমনের জন্য উদ্যোগ করলেন। তৎপূর্বে হজরত আব্বাস আলী মক্কায় এসে মাতা-পিতা ও ভাই ভগিনীগণের সহিত সাক্ষাত করলেন। পুত্রকে দেখে মাতা-পিতা আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই আব্বাস আলী বিদায় গ্রহণ করে রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। হজরত করিম উল্লাহের পালক পুত্র আবদুল্লাহ্, হজরত আব্বাস আলীর সংগে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পুত্রের মঙ্গল ভেবে হজরত করিম উল্লাহ্ ও হজরত মায়মুনা সিদ্দিকা, আবদুল্লাহ্ ওর্ফে সোন্দলের প্রস্তাবে রাজী হলেন। অতঃপর হজরত আব্বাস আলী, মাতা-পিতা, ভ্রাতা সৈয়দ শাহাদত আলী, সৈয়দ হাসান আলী, সৈয়দ মোহসেন আলী, ভগিনী সৈয়েদা জয়নাব খাতুনের নিকট বিদায় নিয়ে মোর্শেদের আশ্রম অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং শীঘ্র হজরত শাহ জালালের নিকট উপস্থিত হলেন।

৭২১ হিজরাব্দের ৭ই রবিওল আউয়াল তারিখে হজরত শাহ জালাল রাজী, স্বয়ং হজরত শাহ্ সৈয়দ কবীর রাজীর উপস্থিতিতে হজরত সৈয়দ আব্বাস আলী প্রমুখ তিনশত একজন মুজাহিদের একটি কাফেলা নিয়ে হিন্দুস্তান অভিমুখে যাত্রা করেন। এই কাফেলায় আরো মুজাহিদ পথিমধ্যে মিলিত হন। তাঁদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিনশত দশ। এ সময়ে দিল্লীর শাহী তখ্‌তে আসীন ছিলেন সম্রাট আলাউদ্দিন খিলযায়ী। তাঁদের দিল্লীতে উপস্থিতির তারিখ ৭২২ হিজরাব্দের ২২শে জেলহেজ্জা।

মোর্শেদের নির্দেশক্রমে হজরত আব্বাস আলী দিল্লীতে হজরত আবদুল্লাহকে দীক্ষা দান করেন। এই সময়ে হজরত শাহ জালাল রাজী হজরত

আব্বাস আলী রাজীকে সামসুল আরেফীন ও কোতবুল আরেফীন এই উভয়বিধ দরবেশী খেতাবে ভূষিত করেন।

দিল্লীতে অবস্থান কালে সিলহট-রাজ গোবিন্দের সহিত সম্রাট বাহিনীর সংঘর্ষের বিষয় অবগত হয়ে হজরত শাহ্ জালাল সদলবলে সিলহট অভিমুখে অগ্রসর হন। সংঘর্ষের মূল কারণ ছিল সেখানকার মোসলেম আলি বোরহানুদ্দিনের উপর রাজা গোবিন্দের অত্যাচার। এসময়ে সেই কাফেলায় আউলিয়ার সর্বমোট সংখ্যা ছিল তিনশত একষট্টি জন। সে যুদ্ধে রাজা গোবিন্দের পতন ঘটে। হজরত শাহ্ জালাল সিলহটেই থেকে যান।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হজরত শাহ জালাল, হজরত আব্বাস আলীর নেতৃত্বে দ্বাবিংশজন আউলিয়ার একটি দলকে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে প্রেরণ করেন। সেই দ্বাবিংশজন আউলিয়ায় নাম:—

১,	হজরত	সেয়দ আব্বাস আলা	রাজা—	হাড়োয়া
২,	,,	মোহম্মদ শাহ সুফী সুলতান	,,	পাণ্ডুয়া-হুগলী
৩,	,,	দারাব খাঁ	রাজী—	ত্রিবেণী
৪,	,,	আবদুল্লাহ্	,,	শির্ষিনী
৫,	,.	আহমদুল্লাহ	,	আনওয়ারপুর
৬,	,,	দাউদ আকবর	,,	সোহাই
৭,	,,	সাফীকুল আলম	,,	কেমিয়া-খামারপাড়া
৮,	,,	সইদ	,,	শালতিয়া-নৈহাটি
৯.	,,	হামেদুদ্দীন	,,	মোগলকোর্ট
১০,	,,	কোরবান আলী	,,	আরামবাগ
১১,	,,	মোমেনুদ্দিন	,,	বনডালা-বর্দ্ধমান
১২,	,,	ইলিয়াস	,,	আঁধারমানিক
১৩,	,,	সৈয়দ আব্দুল কাদের	,,	বঙ্গোপসাগরের নিকট
১৪,	,,	আবদুন নঈম	,,	কোন্নগর
১৫,	,,	আব্দুল অহেদ	,	রায়গ্রাম
১৬,	,,	হোসায়েন হায়দর	,,	পূর্ণিয়া
১৭,	,,	মোহাম্মদ ফাজিল	,,	হিঙ্গলগঞ্জ

১৮,	হজরত আবুল ফজল	রাজী—সরওয়ার নগর	
১৯,	,, আব্দুল্লাহ্ আউয়াল	,,	বীরভূম
২০,	,, মোহাম্মদ হাসান	,,	হাসনাবাদ
২১,	,, আব্দুল লতিফ	,,	সোনারপুর
২২,	,, মোহাম্মদ দায়েম	,,	ডায়মণ্ড হারবার

হজরত আব্বাস আলী রাজী প্রথমে চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার রায়কোলা নামক গ্রামের একপ্রান্তে এসে অবস্থান করেন। রায়কোলা গ্রামের সম্পূর্ণ অংশের পূর্ব নাম ছিল দেবদাসপুর। তাঁদের অবস্থিতির স্থানটি আজিও বাইশ আউলিয়ার স্থান নামে প্রসিদ্ধ। এখানে তাঁরা কিছু বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন। বহু ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ তাঁর নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। সেখান থেকে তিনি আয়াজপুরে আসেন এবং অবিলম্বে দেউলিয়ার রাজা চন্দ্রকেতুর সহিত ধর্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। সেই আলোচনা-সভায় চন্দ্রকেতুর মহিষী কমলা দেবী উপস্থিত ছিলেন। মহিষী, হজরত আব্বাস আলীর রং, রূপ, বাক্যবিন্যাসাদিতে মুগ্ধ হয়ে 'গোরাচাঁদ' নামে সম্বোধন করেন। আলোচনান্তে রাজা মন্তব্য করেন যে তার রাজ্য-রক্ষাকারী ভাটীগড়ের রাজা দক্ষিণরায়, সাতহাতীগড়ের রাজা আকানন্দ ও বাকানন্দ এবং গঙ্গাতীরে সাধনারত জনৈক যোগীবরকে যদি হজরত আব্বাস আলি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে পারেন তবে তিনিও ধর্মান্তরিত হবেন।

হজরত আব্বাস আলি আল্লাহ্ তালার কৃপায় প্রথমে এক অসাধারণ কেরামত প্রদর্শন করে যোগীবরের ইপ্সিত দেবী গঙ্গাকে দর্শন করান। তবু অঙ্গীকারমত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করায় আল্লাপ্রদত্ত শাস্তি স্বরূপ যোগীবর জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে প্রোথিত হন। প্রোথিত উক্ত স্থানটি আজিও যেগীপোতা নামে খ্যাত।

আশী বছর বয়সে হজরত আব্বাস আলী রাজী ওরফে পীর গোরাচাঁদ রাজী সাতহাতীগড়ে উপস্থিত হয়ে জনৈক আদিবাসীর বাড়ীতে নর-নারীর ক্রন্দন ধ্বনি শুন্‌তে পান। তাদের ক্রন্দনের কারণ অনুসন্ধান করে তিনি জান্‌তে পারেন যে রাজা আকানন্দ-বাকানন্দ প্রতি বছর কালী পূজার সময় মূর্তির সম্মুখে তিনজন নর অর্থাৎ মানুষকে বলি দিয়ে থাকেন। সেই আদিবাসীর

পরিবারের তিনজন এ বছরের পালার বলি হতে চলেছে। তাই সেই সময়টি তাদের জীবনের চরম দিন। পীর গোরাচাঁদ তাদের এবং অন্যান্য লোকের নিকট ইসলাম ধর্মের মর্ম্মকথা ব্যাখ্যা করলেন এবং উক্ত তিনজনের জীবন রক্ষার্থে সহানুভূতি প্রকাশ করে কয়েকজনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন।

পীর গোরাচাঁদ, সাথী আবদুল্লাহ ও নও-মোসলেম উক্ত আদিবাসী মোহাম্মদ আবেদ আলীকে সঙ্গে নিয়ে রাজা আকানন্দ-বাকানন্দের নিকট গেলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু সরোষ কথোপকথনের পর আরম্ভ হল যুদ্ধ। যুদ্ধে আকানন্দ ও বাকানন্দ উভয়েই পরাজিত ও নিহত হল এবং পীর গোরাচাঁদ নিজে গুরুতররূপে আহত হলেন। এই দুর্ঘটনার তারিখ হল ৭৭৩ হিজরাব্দের ৭ই ফাল্গুন। সেই অবস্থায় তিনি হজরত আবদুল্লাহ, নও-মোসলেমগণ এবং বারগোপপুরের কিনু ও কানাই প্রমুখ ঘোষ নন্দনগণকে অনেক উপদেশ প্রদান করেন এবং ৭৭৩ হিজরাব্দের ১২ই ফাল্গুন তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব প্রদত্ত কাহিনীতে প্রত্যক্ষভাবে পীর গোরাচাঁদ রাজীর এবং পরোক্ষভাবে আল্লাহ্-মাহাত্ম্য তথা ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য বিবৃত হয়েছে। চরিত্রাবলীতে দেব-দেবীর কোন ভূমিকা দৃষ্ট হয় না; পীরের অলৌকিক শক্তির পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। এককালীন নরবলি প্রথার যে কদর্য্য রূপ স্থানীয় সমাজ-জীবনকে দুর্বিষহ করেছিল তা এই কাহিনীতে পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি মানব নামধারী রাক্ষস চরিত্রও চিত্রিত করেছেন। সাল তারিখ এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের নাম ধাম ও কার্য্যাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় অনেক ঐতিহাসিক তথ্য এতে পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর পুস্তকের উপসংহারে পীর গোরাচাঁদের পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস এবং কিছু অলৌকিক কাহিনী লিখিত হয়েছে। সিদ্দিকী সাহেব সেখানে পেয়ার শাহ্ প্রসঙ্গ এনেছেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে "মিহির" নামক পত্রিকায় পেয়ার শাহের সপরিবারে আত্মহত্যা সম্বন্ধীয় যে সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আবদুল গফর সিদ্দিকী সাহেব উক্ত পত্রিকায় বিবৃত বক্তব্যকে সম্পূর্ণ অসত্য বলে অভিহিত করেছেন। তিনি উপসংহারে লিখেছেন, "হজরত পেয়ার শাহ ছিলেন ধার্ম্মিক ব্যক্তি। তিনি ধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া দুনিয়ার জন্য এমন কিছু করেন নাই যাহা দ্বারা তাঁহার আত্মহত্যার কথা বিশ্বাস করিতে পারি।"

"বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী" নামক পুস্তকের উপসংহারে যা বর্নিত হয়েছে তা প্রধাণতঃ পেয়ার শাহ চরিত কথা। মহম্মদ এবাদোল্লা রচিত "পীর গোরাচাঁদ" কাব্যে পেয়ার শাহ প্রসঙ্গ নেই। খোদা নেওয়াজ সাহেব তাঁর 'পীর গোরাচাঁদ' কাব্যে লিখেছেন,—

এই সব বাত পেয়ার বাদশাকে কহিয়া॥
দেখিতে ২ যায় গায়েব হইয়া *
পরিবার সমেত কিস্তি গায়েব হইল॥
দেখিয়া আলাউদ্দিন শাহ তাজ্জবে রহিল *

এখানেও বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। কারণ, এই প্রসঙ্গে আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব, পেয়ার শাহ্‌কে অকৃতদার চিরকুমার আবেদ বলে উল্লেখ করেছেন।

৪। 'চন্দ্রকেতু ও গোরাচাঁদ' নাটক

"চন্দ্রকেতু ও গোরাচাঁদ" নাটকের রচয়িতা মোহম্মদ হরমুজ আলি। বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গতশ ঙ্করপুর গ্রামে মোহাম্মদ হরমুজ আলি সাহেবের জন্ম। তিনি স্থানীয় গোরাইনগর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি একজন হোমিও সুচিকিৎসক এবং সুদক্ষ রেডিও মেকানিক। হাড়োয়া অঞ্চলে তাঁর খুব জনপ্রিয়তা আছে। পীর গোরাচাঁদ বিষয়ে আখ্যান—রচয়িতৃগণের মধ্যে আজ (১৯৭৫ খৃঃ ফেব্রুয়ারী) তিনিই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি।

মোহাম্মদ হরমুজ আলি কর্তৃক লিখিত নাটকের নাম 'চন্দ্রকেতু ও গোরাচাঁদ। হাতে লেখা এই নাটকের আকৃতি ৭" × ৬" ইঞ্চি বিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৫। এটি ষষ্ঠ অঙ্কে বিভক্ত। দৃশ্যাবলীর বিভাগ নিম্নরূপ :

প্রথম অঙ্কে	চারটি দৃশ্য
দ্বিতীয় ,	ছ'টি ,
তৃতীয় ,,	আটটি ;,
চতুর্থ ,,	ন'টি ,,
পঞ্চম ,,	চারটি ,,
ষষ্ঠ ,,	তিনটি ,,

এই নাটকে ১৭ খানি গান সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি তিন-চার প্রকারের রঙের কালিতে লেখা। ভুলক্রমে দ্বিতীয় অঙ্ক দু'বার শিরোনামা দিয়ে লেখার ফলে পঞ্চম অঙ্কের স্থলে নাটকখানি ষষ্ঠ অঙ্কে পর্য্যবসিত হয়েছে।

নাটক রচনার আরম্ভে কোন ভূমিকা, কোন কুশীলব-পরিচয় লিখিত নেই। কেবল মাত্র, এই নাটক দ্বিতীয়বার লিখবার একটা কৈফিয়ৎ লিখিত হয়েছে।

নাটকের সংলাপ বেশ সাবলীল। রাজা বা তদ্‌স্থানীয় ব্যক্তির মুখের ভাষা মার্জ্জিত এবং সাধারণ লোকের মুখের ভাষা স্থানীয় চলতি ভাষা। ভাষার নমুনা এইরূপ ;—

রাজা—এবার স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের যত দেব দেবী আছে সকলেরই এ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করা হবে.........

অন্য একটি চরিত্র "হামা" বল্‌ছে—তাই তো, মা বোধ করি আগ্‌ভাত কারুর খাতি দেছে। তা নলি আমাদের এরকম হবে কেন। মোদের বল কুমে গেল কেন!

এ নাটকের সংলাপের কোন কোন স্থানে অর্থ সমন্বয়ের অভাব এবং কিছু বর্ণাশুদ্ধি দৃষ্ট হয়। গানগুলি কোথাও দেহতত্ত্ব বিষয়ক, কোথাও বা লঘু হাস্য-রস মিশ্রিত। এক তোত্‌লা সৈনিকের ভাষায় কৌতুক-সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়েছে। স্বগতোক্তি সংস্থাপন নাটকটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চন্দ্রকেতু ও গোরাচাঁদ নাটকের সংক্ষিপ্ত কাহিনী :—

রাজা চন্দ্রকেতু সাড়ম্বরে চণ্ডীর পূজার আয়োজন করেছেন। জামাতা বরাহ ও কন্যা খনা গণনা করে তাঁর অমঙ্গলের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা নিরসনের জন্যই এই পূজার বিশেষ প্রয়োজন। দেশের সাধারণ মানুষও অদূরবর্ত্তী সেই বিপদের আশঙ্কায় বিষাদ-মগ্ন।

পীর গোরাচাঁদ যে এতদ্ অঞ্চলে এসে অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছেন তা রটনা হয়ে গিয়েছে। রাজা চন্দ্রকেতুর বীর সেনানী হামা ও দামার শারীরিক বল তিনি কৌশলে হরণ করলেন তাও প্রচারিত হয়েছে। রাজা উদ্বিগ্ন হয়ে নিজে গোরাচাঁদের অলৌকিক শক্তির পরিচয় নিতে চাইলেন। উভয়ের সাক্ষাতকার ও কথোপকথন হল। রাজা তাঁর শক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ ও উপহাস করলেন।

গঙ্গাতীরে সাধনারত এক যোগীবরের সহিত পীরের সাক্ষাৎ হল। উভয়ের মধ্যে আরম্ভ হল বাগ্‌যুদ্ধ। অবশেষে যোগীবর পরাজয় স্বীকার করলেন।

পরবর্ত্তী ঘটনায় পীর গৌরাচাঁদ তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে রাজ-প্রাসাদের লোহার প্রাচীরে চাঁপা ফুল ফুটিয়ে দিলেন। তবু রাজা গোরাচাঁদের নিকট নম্র হলেন না। উপরন্তু প্রহরী দ্বারা তাঁকে বেঁধে তিনি রাজসভায় আনাবার ব্যবস্থা করলেন। প্রহরী তাঁর আদেশ পালন করতে সমর্থ হল না। রাজা তখন ডেকে পাঠালেন হামা-দামা নামক তাঁর বিখ্যাত বীর সেনানীদ্বয়কে। হামা-দামা পূর্বেই বলহীন হয়ে পড়ায় তারাও রাজ-আদেশ পালনে সক্ষম হল না।

রাজা চন্দ্রকেতু ও পীর গোরাচাঁদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। পীরের অলৌকিক শক্তিতে রাজার আনীত পায়রা তাঁর কাছ থেকে মুক্ত হয়ে উড়ে চলে গেল রাজপ্রাসাদে। সেই পায়রা দেখে পরিবারের সকলে চিন্তা করল যে রাজা বিপদাপন্ন হয়েছেন। অতএব তাঁরা পূর্ব সংকেত মতন পার্শ্ববর্ত্তী কালীদহে ডুবে আত্মহত্যা করলেন। রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে এসে দেখেন প্রাসাদ জন-মানব-শূন্য। কেবল পূজারিনী এক বৃদ্ধা জীবিত আছেন। সেই করুণ দৃশ্য দেখে রাজা পুনরায় গোরাচাঁদকে আক্রমণ করতে ছুটে এলেন। কিন্তু ততক্ষণে পীর গোরাচাঁদ অদৃশ্য হয়ে গেছেন। রাজা দুঃখে অভিমানে সেই কালীদহে ডুবে নিজেও আত্মহত্যা করলেন।

পীর গোরাচাঁদ এবার কালু, কিনু ও আরো কিছু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে দক্ষিণ দেশের দিকে অগ্রসর হলেন।

মোহাম্মদ হরমুজ আলি সাহেব রচিত নাট্য-কাহিনীতে প্রত্যক্ষভাবে পীর গোরাচাঁদ চরিত্র মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তথা ইসলাম ধর্ম-মাহাত্ম্য কথা বর্ণিত হয়েছে। এতে ছোট অনেক চরিত্র এবং অনেক কাহিনী পরিবেশিত দেখা যায়। এতে পাশাপাশি কয়েকটি অলৌকিক কীর্ত্তিকথা এবং বেশ কয়েকটি বাস্তব ঘটনার বিবরণ আছে। দরিদ্র মধ্যবিত্ত সংসার জীবনের চিত্র এই নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঘন ঘন গান পরিবেশিত হওয়ায় বুঝা যায় গ্রামে প্রচলিত যাত্রা ঢঙে নাটকখানি লিখিত। উপকাহিনীতে ভারাক্রান্ত হলেও মূল কাহিনী লক্ষ্যচ্যুত হয়ে রস ভঙ্গ করেছে এমন মনে হয় না। উপযুক্ত ব্যক্তির মুখে উপযুক্ত ভাষা প্রদত্ত হওয়ায় চরিত্রগুলি যেমন পরিস্ফুট হয়েছে, সমাজ চিত্রও তেমন সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

শেখ আব্দুর রহিমের সম্পাদনায় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে প্রকাশিত 'মিহির' নামক পত্রিকায় পুরাতত্ব বিভাগে 'হাড়োয়া' শীর্ষক রচনাংশে প্রকাশিত কাহিনীটি এইরূপ ;—

চব্বিশ পরগণা জেলায় অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার এলাকাধীন একটি গ্রাম হাড়োয়া ; ইহা বালাণ্ডা পরগণার মধ্যে অবস্থিত। এখানে প্রতি বছর পীর গোরাচাঁদ সাহেবের সম্মানার্থে ১২ই ফাল্গুন থেকে ১০।১২ দিন স্থায়ী একটি সুবৃহৎ মেলা হয়ে থাকে। প্রায় ৬০০ বছর পূর্বে ইসলাম ধর্মপ্রচারক পীর গোরাচাঁদ সাহেব এই স্থানে এসে উপনীত হন। জনশ্রুতি আছে যে, এই পবিত্রাত্মা মহাপুরুষ একটি মাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে পদ্মাতীরবর্ত্তী বালাণ্ডা পরগণায় এসে রাজা উপাধিধারী চন্দ্রকেতু নামক সমৃদ্ধিশালী একজন গোঁড়া হিন্দু-জমিদারের বাড়ীর সন্নিকটে উপনীত হন। পীর গোরাচাঁদ, চন্দ্রকেতু রাজাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করতে লাগলেন। এজন্য তিনি রাজার সম্মুখে কতকগুলি অলৌকিক কার্য্যও সম্পাদন করলেন। যেমন লৌহনির্মিত কলাকে পাকা-কলায় পরিণত করণ ও লৌহনির্মিত বেড়ায় চম্পক পুষ্প প্রস্ফুটিত করন। এতদভিন্ন তিনি বিরজা নাম্নী রাক্ষসীর দ্বারা হত একটি ব্রাহ্মণের জীবন দান করেছিলেন। যা হোক, ঐ সকল অলৌকিক ঘটনাতেও চন্দ্রকেতুর অন্তর থেকে হিন্দুধর্মের সত্যতার ভাব কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি।

এর পর পীর সাহেব হাতিয়াগড় পরগণায় গমন করেন। সে স্থান রাজা মহিদানন্দের পুত্র আকানন্দ ও বাকানন্দ শাসন করতেন। সেই রাজা প্রতি-বছর তাঁর একজন প্রজাকে নরবলি দিতেন। পীর সাহেব যে বছর সেখান উপনীত হন সেই বছর রাজার একমাত্র মুসলমান প্রজা মোমিনের 'বলি' হওয়ার পালা পড়েছিল। পীর সাহেব তা শুনে স্বধর্মাবলম্বীর আসন্ন বিপদ দেখে নিজেই তার পরিবর্ত্তে রাজ-সকাশে উপনীত হলেন। রাজার অভিপ্রায়-অনুযায়ী কার্য্যকরনে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হন। সেই যুদ্ধে বাকানন্দ নিহত হন। আকানন্দ ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে পীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে বহির্গত হলেন। সেই যুদ্ধে পীর সাহেব আকানন্দের হাতে ভয়ানকরূপে আহত হলেন। কিন্তু সেই আহতস্থান আরোগ্যার্থে তিনি তাঁর ভৃত্যকে কয়েকটি পান আনতে বললেন। সে ভৃত্য কোথাও পানের সন্ধান পেল না। কথিত আছে যে, হাতিয়াগড়

পরগণায় পান কখনও জন্মে না এবং আরো লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, ঐ স্থানে আজ পর্য্যন্ত কেউ পানের চাষ করে না। তখন পীর সাহেব নিরুপায় হয়ে হাড়োয়া থেকে দু'ক্রোশ দূরে কুলটিবিহারী নামক স্থানে গমন করেন। তাঁর শত্রু সেখানে তাঁকে একাকী রেখে চলে গেল। কথিত আছে, নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসী কিনু এবং কালু ঘোষের একটি দুগ্ধবতী গাভী প্রত্যহ তথায় এসে পীর সাহেবকে দুগ্ধ পান করিয়ে যেত। যদি ঐ গাভীটি অলক্ষিতভাবে ক্রমান্বয়ে ৬দিন তাঁকে দুধ পান করাতে পারত, তাহলে তাঁর বাঁচবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ৪দিন পর্য্যন্ত গাভীদোহন কালে দুধ না পাওয়ায় কিনু ও কালু ঘোষের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় অনুসন্ধানে তারা জানতে পারল যে গাভীটী পীর সাহেবকে দুধ পান করিয়ে থাকে। পীর সাহেব তা জানতে পেরে নিশ্চিত হলেন যে, তাঁর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়েছে। তখন তিনি গোয়ালাদ্বয়কে অনুরোধ করলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর যেন তারা মুসলমান রীতি অনুসারে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে। যা হোক, অচিরে তাঁর জীবন বায়ু বহির্গত হল এবং ১২ই ফাল্গুন উক্ত গোয়ালাদ্বয় তাকে হাড়োয়ায় সমাধিস্থ করল। একব্যক্তি গোয়ালাদ্বয়ের ঐসব কাজ লক্ষ্য করে তাদেরকে উপহাস করত ও জাতিচ্যুত করার ভয় দেখাত। একদিন তারা সেই ব্যক্তির উপহাসে অধৈর্য্য হয়ে ক্রোধবশতঃ তাকে হত্যা করল। এজন্য তারা গৌড়ের সুবাদার আলাউদ্দিনের নিকট বিচারার্থে প্রেরিত হল। এদিকে কিনু ও কালুর স্ত্রীদ্বয় পীর সাহেবের সমাধিস্থানে গিয়ে নিজেদের বিপদের কথা বর্ণনা করলে পীরসাহেব হঠাৎ সমাধি থেকে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ গৌড়ে গমন করে উক্ত ভ্রাতাদ্বয়কে বিপদ হতে মুক্ত করলেন এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। পীর সাহেব এ পর্য্যন্ত রাজা চন্দ্রকেতুকে শাসন করার বিষয় বিস্মৃত হননি। তিনি দ্বিতীয়বার গৌড়ে গমন করতঃ পীর শাহ নামক এক ব্যক্তিকে বালাণ্ডার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করে পাঠান। এই নব-শাসনকর্ত্তা বালাণ্ডায় উপনীত হয়েই চন্দ্রকেতুকে ডেকে পাঠালেন। চন্দ্রকেতু সে আদেশ শিরোধার্য করে পীর সাহের কাছে যেতে মনস্থ করলেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় তিনি একজোড়া সারস পাখী সঙ্গে নিলেন। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বলে গেলেন যে, যদি তাঁর ভাগ্য মন্দ হয়, তবে তিনি সারস পাখী দুটিকে ছেড়ে দেবেন। পাখী দুটি ঘরে ফিরে এলে বুঝবে যে

তাঁর সমূহ বিপদ উপস্থিত এবং তৎক্ষণাৎ আপনা-আপনি ধ্বংস প্রাপ্ত হবার চেষ্টা করবে।

পীর শাহ, চন্দ্রকেতুকে এরূপ কষ্ট দিয়েছিলেন যে তিনি হতাশাস হয়ে পাখী দুটিকে ছেড়ে দেন। পাখী দুটি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা মাত্র তাঁর পরিবারস্থ সকলে জলমগ্ন হলেন। পরিশেষে রাজা চন্দ্রকেতু মুক্তি লাভ করে গৃহে ফি.ব আসেন এবং দুঃখে শোকে অভিভূত হয়ে তিনিও তাঁর আত্মীয়-স্বজনেব অনুসরণ কবে আত্মহত্যা কবেন।

পীর গোবা চাঁদের সমাধি-স্থানের নাম হয়েছে হাড়োয়া। এই স্থানে তাঁর হাড় সমাধিস্থ বযেছে বলে এইরূপ নামকবণ হযেছে। এইখানে ফাল্গুন মাসে ১২।১৪ দিন স্থায়ী একটি সুবৃহৎ মেলা হয। অনেকদিন পর্য্যন্ত কালু ও কিনু ঘোষের বংশধবগণ ঐ মেলাব উপসত্ব ভোগ করেছিল। অবশেষে যখন তাদের বংশ লুপ্ত হযে গেল, তখন থেকে সমাধি মন্দিবেব ভাব মুসলমানদিগের হাতে অর্পিত হযেছে। সুবাদার আলাউদ্দিন ঐ সমাধিমন্দিবের ব্যয় নির্বাহার্থ ৫০০ একব ভূমি নিষ্কব দান কবেন কিন্তু এখন কেবল ঐ ভূমি নামেমাত্র সমাধি মন্দিবের ব্যব নির্বাহার্থ বযেছে।

প্রায এক শতাব্দী কাল ধবে পীব গোরাচাঁদ মাহাত্ম্য সম্বলিত সাহিত্য রচিত হয়েছে। খোদা নেওবাজ সাহেবের কাব্যের রচনাকাল ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ কেহ বলেন এই কাব্যেব বচনাকাল আনুমানিক উনবিংশ শতাব্দীব শেষার্ধ বা বিংশ শতাব্দীব পূর্বার্ধ।[২৩] কবি মোহাম্মদ এবাদোল্লা সাহেবের কাব্যের রচনাকাল ১৯১১ খৃষ্টাব্দেব ২৩ শে ফাল্গুন। মূলতঃ এই কাব্য-কাহিনী পার্শী ভাষায লিখিত ছিল বলে তিনি ভূমিকায উল্লেখ কবেছেন। তিনি আবো লিখেছেন যে, তাঁব পূর্বপুরুষ মুনশী বাসারত হোসেন এই পুস্তকের বহুল-প্রচাবের জন্য শেখ লাল ও শেখ জয়নদ্দি সাহেব কর্তৃক বাঙ্গালা মুসলমানি ভাষায় পাঁচালী ছন্দে অনুবাদ কবান। পবে কবি মোহাম্মদ এবাদোল্লা সাহেব নিজে সেই অনুবাদেব নকল পুস্তক থেকে চব্বিশ পবগণাব চলিত বাঙ্গালা ভাষায় এই পুস্তকখানি বচনা করেন।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব রচিত গ্রন্থের বচনাকাল উক্ত গ্রন্থে লিখিত নেই। পুস্তকের ভূমিকা থেকে জানা যায যে তা ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টের পরবর্ত্তীকালে রচিত। তবে এই কাল ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিলের

গ্রন্থ নয়। কারণ প্রথমতঃ গ্রন্থখানি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং দ্বিতীয়তঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার অন্তর্গত দামোদর নামক গ্রামে যান ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে।

মোহাম্মদ হরমুজ আলী সাহেব লিখিত 'চন্দ্রকেতু ও গোরাচাঁদ' নামক অমুদ্রিত নাটকের রচনাকাল মূলতঃ ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে মূল বইখানি অভিনীত হওয়ার পর হারিয়ে যাওয়ায় কিছু লোকের উৎসাহে তিনি নতুন করে ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফাল্গুন তারিখে লিখতে আরম্ভ করেন। শেষ করার তারিখ তাঁর স্মরণ নেই; তবে তিনি বলেন যে নাটকখানি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই লিখেছিলেন।

নিম্নলিখিত পত্রিকা বা পুস্তকে পীর গোরাচাঁদ সম্বন্ধীয় কাহিনী বা আলোচনা লিপিবদ্ধ রয়েছে;—

১, মিহির পত্রিকা: মার্চ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ
২, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা গেজেটে এল্ এস্ এস্ ওমালী সাহেব লিখিত বিবরণ
৩, যশোহর ও খুলনার ইতিহাস: সতীশচন্দ্র মিত্র
৪, সত্যপ্রকাশ (বারাসত থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা) ১৯৬৯ ডিসেম্বর,
৫, কুশদহ পত্রিকা: আশ্বিন ১৩১৮ বঙ্গাব্দ,
৬, কুশদহের ইতিহাস: হাসিরাশি দেবী,
৭, বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড): ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব নিম্নলিখিত পুথিগুলির তথ্যকে ভিত্তি করে তাঁর "বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী" নামক গ্রন্থ লিখিত বলে উল্লেখ করেছেন;—

১, সিরাতে হজরত অহেদী: আব্দুল অহেদ: হিজরী ৮ম শতাব্দীতে রচিত
২, " মুলতাহুল আউলিয়া: শাহ সুফীসুলতান: হি: ৮ম শতাব্দীতে রচিত

৩, শহীদ হজরত আব্বাস আলী : আহম্মদ শাহ : ৮৫৪ বঙ্গাব্দে রচিত
৪, পীর গোরাচাঁদ : সুফী শাহ ইমাম উদ্দিন : ১০ম বাংলা শতাব্দে „
৫, „ : অজ্ঞাত : ১১শ „ „ „
৬, „ : „ : ২০শ „ „ „
৭, শহীদ হজরত গোরাচাঁদ : নেয়ামতুল্লাহ্ : ৯ম „ „ „
৮, বাইশ আউলিয়ার পুথি : সামসুল হক (হিন্দুনাম বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়) : ৯ম বাংলা শতাব্দে রচিত
৯, আদমখোর আকানন্দ-বাকানন্দ : অব্দুল লতিফ : ৯ম বঙ্গাব্দে „
১০, সিরাতে হজরত আবদুল্লাহ : হজরত আবদুল্লাহ : ৮ম হিজরী অব্দে রচিত
১১, হজরত শাহ্ সোন্দলের পুঁথি : মুনশী কাশিম উদ্দিন : ১০ম বাংলা শতাব্দে রচিত
১২, তরিকায়ে কাদেরীয়া ও পীর গোরাচাঁদের পুঁথি : ওমর আলি (হিন্দুনাম রামলোচন ঘোষ) : ৯ম বাংলা শতাব্দে রচিত
১৩, বাদশাহ আলাউদ্দিন ও পেয়ার শাহের পুঁথি : মোহাম্মদ আবদুল বারি : ১০ম বাংলা শতাব্দে রচিত

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত তেরোখানি পুঁথির সন্ধান আজো পাওয়া যায় নি। শেখ লাল ও শেখ জয়নদ্দি-অনুদিত পুঁথিও আর প্রাপ্তব্য নয়। অবশ্য তার অংশ বিশেষ ও তার কিছু আলোচনা ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব রচিত বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে পাওয়া যায় মাত্র।

পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী কোন সময়ে এদেশে এসেছিলেন এবং এতদ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন তার সঠিক কাল নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। শামসুর রহমান চৌধুরী লিখেছেন ;—"ভারত সম্রাট গিয়াসুদ্দীন তোগলকের রাজত্বকালে (১৩২০-২৪খৃঃ) ১৩২১ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বীয় পীর শাহ্ হাসানসহ দিল্লীতে আগমন করেন। অতঃপর বিদ্রোহ দমনার্থ সম্রাট গিয়াসুদ্দীন যখন বঙ্গদেশে অভিযান করেন (১৩২৩ খৃঃ) দরবেশ আব্বাস আলি মক্কীও সে সময়ে সম্রাটের অভিযাত্রী বাহিনীর সঙ্গে এখানে আগমন করেন।"[২৪]

আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী পীর শাহ জালালের সঙ্গে পীর গোরাচাঁদের দিল্লীশহরে আগমন-কাল ৭২২ হিজরীর ২২শে

জেলহজ্জা। তাঁর মতে তখন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী। এবিষয়ে মতভেদ আছে। কারণ, স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকাল ৬৯৫ থেকে ৭১৫ হিজরী পর্যন্ত।[৩৯] আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব আরো লিখেছেন যে আলাউদ্দিন খিলজীর আদেশে পীর শাহজালাল সিলহট-রাজ গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সিলহট অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁরা সম্মিলিতভাবে রাজা গোবিন্দকে পরাজিত ও নিহত করেন। পীর শাহজালালের দলের সহিত পীর গোরাচাঁদও ছিলেন। আলাউদ্দিন খিলজীর মৃত্যুর তারিখ ১৩১৬ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী।[৪০] সুতরাং ৭২২ হিজরী হিজরী (আনুমানিক ১৩২২ খৃষ্টাব্দ) বা তার পরবর্তী কালে নিশ্চয়ই মৃত আলাউদ্দিন আদেশ দিতে পারেন না। এবিষয়ে আচার্য স্যার যদুনাথ সরকারের বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য ;—

"Perhaps the greatest event of the reign of Sultan Shamsuddin Firuz (Dehlavi) was the expansion of the Muslim power into modern Mynensingh district and thence acoross the Brahmaputra into the Sylhet district of Assam.

... ..The legendary account of the Muslim conquest of Sylhet is available in a later compilation, Nasiruddin Haidar's Suhail-i-yaman. There are also Hindu legends regarding the defeat of the Valiant Rajah Gour Govinda of Sylhet, by an army led by pirs and ghayis, and reinforced by the troops of the Sultan of Bengal, Sultan Shamsuddin in the last quarter of the fourteenth centry. Suhail-i-yaman is not a very trustworthy compilation, and with the Hindu legends the difficulty is that no sultan with the title of Shamsuddin reigned in Bengal in the last quarter of the fourteenth century. Mr. Stapleton is right in fixing the date of the first invasion of Sylhet by Muslim armies in 703 A. H.

on the authority of the Dacca Museum inscription of one Rukn Khan dated 918 A. H."[৬০]

যশোহর-খুলনার ইতিহাস লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখেছেন যে, ১২৩০—৩৩ খৃষ্টাব্দে ইজুল মুলুক আলাউদ্দিন জানী নামক জনৈক মুসলমান শাসক এতদ্ অঞ্চলের শাসন ভার পরিচালনা করতেন। তাঁর সময়েই বর্তমান বারাসত মহকুমার অধীন দেউলিয়া গ্রামে রাজা চন্দ্রকেতু বাস করতেন।

ডঃ আব্দুল করিম লিখেছেন "৯১৮ হিজরী/১৫১২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এবং সিলেটে প্রাপ্ত সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের সময়ের আর একখানি শিলালিপিতে শাহ্‌জালাল সম্পর্কে আরো তথ্য পাওয়া যায়। শিলালিপিখানি মোহাম্মদের পুত্র শয়খ-উল-মশায়েখ মখদুম শয়খ জালাল মোজাররদের সম্মানে উৎসর্গ করা হয়েছে এবং এতে আরো জানা যায় যে, ৭০৩ হিজরী/ ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান শমস্ উদ্দীন ফিরুজ শাহের সময় সিকান্দর খান গাজীর হাতে সিলেট ইসলামের (মুসলমানদের) অধিকারে আসে।[৬১]

অতএব দেখা যাচ্ছে, পীর শাহ্‌জালাল্ সিলেটে গমন করেছিলেন ৭০৩ হিজরীর পর। এই সময়ে যে দিল্লীতে সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজী অধিষ্ঠিত ছিলেন তা ঐতিহাসিক সত্য। ৭১৫ হিজরী বা ১৩১৬ খৃষ্টাব্দের পর আলাউদ্দীন খিলজী জীবিত ছিলেন না তাও ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী একথা স্বীকৃত নয় যে পীর শাহজলাল ও তাঁর অন্যতম সাথী পীর গোরাচাঁদ রাজা ৭২২ হিজরীতে দিল্লীতে আগমন করেছিলেন। সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী যদি পীর গোরাচাঁদ এদেশে পীর শাহ্‌জালালের সঙ্গে এসে থাকেন তবে তা ৭০৩ হিজরীর সমসাময়িক কাল বলে ধরা যায়।

কুশদহ পত্রিকা ১৩১৮-এর ৬ষ্ঠ সংখ্যায় আছে,—"পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈযদ হুসেন শাহ্ গৌড়ের বাদশাহ হইলেন।...গোরাগাজি বা পীর গোরাচাঁদ হিজলীর মুসলমান সেনাপতির পুত্র।"

এ বক্তব্যের পক্ষে কোন দিক থেকে সমর্থন পাওয়া যায় না।

পীর শাহ জালালের অনুমতি-সূত্রে পীর গোরাচাঁদ দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে বাইশ আউলিয়ার অন্যতম এক ইসলাম ধর্ম প্রচারক হিসাবে আগমন

করেছিলেন বলে ধরলে তাঁর বঙ্গে আগমন কাল খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বা শেষার্ধে বলে অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক।

১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'নেদায়ে ইসলাম' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পীর শাহ জালালের জন্মসাল ১৩২২ খৃষ্টাব্দ লিখিত আছে।

"সুন্দরবনের ইতিহাস"-লেখক আবুল ফজল মহম্মদ আব্দুল্লও, পীর শাহ জালালের জন্ম তারিখ ১২৫৫-'৯৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩৪৬-'৪৭ খৃষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন।

সেক শুভোদয়া গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন,—"This Jalaluddin was apparently a Hindustani Mohmedan ..."[৬০]

ডঃ আবদুল করিম লিখেছেন,—"চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে (১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে) মরক্কো দেশীয় মুসলমান পরিব্রাজক ইবন্ বতুতা বাংলাদেশ সফর করেন এবং কামরূপের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে (অর্থাৎ সিলেটে) এক দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি শয়খ্ জালাল তবরেজীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এভাবে তিনিই সর্বপ্রথম শয়খ্ জালাল-উদ্দীন তবরেজী এবং শাহ জালালের অভিন্নতা সম্পর্কে বিতর্কের সূচনা করেন। ইবন্ বতুতাকে অবলম্বন করে কোন কোন আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন যে শয়খ জালাল উদ্দীন তবরেজী ও শাহ জালাল এক ও অভিন্ন। কিন্তু আমরা মনে করি যে, শয়খ জলাল-উদ্দীন তবরেজী ও শাহ জলাল উদ্দীন ভিন্ন ব্যক্তি এবং তাঁদের জীবৎকাল প্রায় একশত বৎসরের ব্যবধান।[৬১]

অধ্যক্ষ শইখ শরফুদ্দীন লিখেছেন,—"সুহর্‌বর্দীয়া সম্প্রদায়ের মখদুম শয়খ জালাল মুজর্রদ ইবন্ মুহম্মদ কুন্ইয়া'ঈ তুর্কীস্থানজাত বাঙ্গালী ছিলেন বলে কথিত। তিনি বর্তমান তুরস্কের কুন্ইয়া শহর থেকে ইসলাম প্রচার ও জিহাদে অংশ গ্রহণ উদ্দেশ্যে পাক-ভারতে আগমন করেন এবং ৩১৩ জন দরবেশসহ সিলেট অভিযানে যাত্রা করেন। তিনি ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে সিলেট জয় করেন। মতান্তরে তিনি ইয়মন দেশের অধিবাসী ছিলেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে পীর শাহজালাল, পীর গোরাচাঁদ প্রমুখের এদেশে যে ধর্মপ্রচার কাহিনী ঐতিহাসিক মর্য্যাদায় উন্নীত, তা স্যার যদুনাথ সরকারের ভাষায় "The legendary account of the Muslim conquest in the last quarter of the fourteenth century."[৬২]

পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজীর নামে দুইপ্রকার লোককথা আছে। যথা,— ১। লিপিবদ্ধ লোককথা ও ২। প্রচলিত লোককথা যার কয়েকটি এখানে সংকলিত হল।

লিপিবদ্ধ লোককথা প্রধানতঃ বিভিন্ন কাব্যে বা জীবনী পুস্তকে লিখিত রয়েছে। প্রচলিত লোককথার ভিন্ন ব্যাখ্যা কারো কারো মুখে শোনা যায়। বলা বাহুল্য যে, এইসব লোককথার বাস্তবিকতা ও যৌক্তিকতা নির্ধারণ করা অসম্ভব এবং আমাদের আলোচ্যবিষয় বহির্ভূত। সে সব লোককথার কয়েকটি এইরূপ ;—

১। মায়ী-জোল -কোঁক-জোল

মায়ী শব্দের অর্থ মা, জোল শব্দের অর্থ জলা জায়গা এবং কোঁক শব্দের অর্থ কোমর। এই শব্দগুলি বারাসত-বসিরহাট অঞ্চলের প্রধানতঃ কৃষক মহলে ব্যবহৃত হয়।

হামা ও দামা নামে দুই সহোদর অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিল। অনেকে বলেন—ওদের ভাল নাম ছিল হামু মুখোপাধ্যায় ও দামু মুখোপাধ্যায়। তারা রাজা চন্দ্রকেতুর প্রজা ও যোদ্ধা। রাজা চন্দ্রকেতু ও পীর গোরাচাঁদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে মত বিরোধ দেখা দিল এবং এই বিরোধ থেকে উৎপন্ন হল দৈহিক যুদ্ধ। গোরাচাঁদ দেখলেন,—চন্দ্রকেতুকে পরাস্ত করতে হলে প্রথমে রাজার প্রাসাদের নিকটতম স্থানের প্রহরী যোদ্ধা হামা-দামাকে পরাস্ত করা দরকার। গোরাচাঁদ সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর না হয়ে হামা-দামাকে পরাভূত করার রহস্য কৌশলে জেনে নিয়েছিলেন। রহস্যটা এই যে হামা-দামার আহার্য্য 'আগ-ভাত' যদি কেউ সংগ্রহ করে শ্বেত কাককে খাওয়াতে পারে তবেই তারা শক্তিহীন হয়ে পড়বে। গোরাচাঁদ তাঁর সাথী সোন্দলের সহায়তায় হামা-দামার বৃদ্ধা মাতার কাছ থেকে কৌশলে সেই 'আগ-ভাত' সংগ্রহ করে এনে তার যথোপযুক্ত ব্যবহার করলেন। ফলে কর্মরত হামা-দামা অকস্মাৎ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তারা তাদের মাকে সাবধান করে রেখেছিল, তবু এরূপ শক্তিহীন হয়ে পড়ায় তারা বুঝতে পারল যে তাদের মা নিশ্চয় কোন দুশমনকে 'আগ-ভাত' দিয়ে ফেলেছে। তারা

মায়ের প্রতি রাগে অন্ধ হয়ে বাড়ীতে ফিরে বৃদ্ধাকে বেদম প্রহার করে। যার ফলে বৃদ্ধার মৃত্যু ঘটে।

বীর হামা-দামার জননীও ছিল বীরাঙ্গনা। বিশালকায়া সেই বৃদ্ধাকে, ক্রুদ্ধ হামা-দামা, চুলের মুঠি ধরে হেঁচড়া-টানা করে নিয়ে যাবার সময় সেই বীরাঙ্গনার দেহভারে যে গভীর খাত মাটিতে সৃষ্টি হয়েছিল আজো তা মায়ী জোল নামে খ্যাত। সেই বিশাল দেহ টেনে নিয়ে যাবার সময় পথে এক স্থানে তারা বিশ্রাম করেছিল। বিশ্রামের সময়ে বৃদ্ধার কোমরের হাড়ের চাপে একটি গভীর খাদের সৃষ্টি হয়। কোমর বা কোঁকের চাপে সৃষ্ট খাদ বা জোলকে আজিও লোকে বলে কোঁক-জোল।

২। সাক্ষী তেঁতুল গাছ

বারাসত শহরের অনতিদূরে চন্দনহাটি মৌজায় একটি বহু পুরাতন তেঁতুল গাছ তার জরাজীর্ণ চেহারা নিয়ে আজো দণ্ডায়মান আছে। এখানে এককালে এক বিশাল পুকুর ছিল। পুকুরটি এখন প্রায় মজে এসেছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। স্থানটি পীর একদিল শাহের আস্তানা থেকে মোটেই দূরে নয়। পীর গোরাচাঁদ তাঁর ঘোড়ায় চেপে এসে পীর একদিল শাহের সঙ্গে 'মোলাকাৎ' করতেন। এই তেঁতুল গাছের তলায় বসে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ নানাবিষয়ে আলোচনা হত। পীর গোরাচাঁদ তাঁর ঘোড়াটি বেঁধে রাখতেন ঐ তেঁতুল গাছে। সেই বলবান ঘোড়ার বন্ধন-রশি টানাটানির ফলে তেঁতুল গাছের গায়ে গভীর দাগ সৃষ্টি হয়েছিল। পীর গোরাচাঁদ যতবার এসে ঐ গাছে ঘোড়াটি বেঁধে রাখতেন ততবার গাছের গায়ে রশির দাগ আরো গভীর হত। সে দাগের চিহ্ন আজিও (১৯৭২) নষ্ট হয়নি।

৩। বেড়ু বাঁশতলা

হাড়োয়া থানার অন্তর্গত লতার বাগান মৌজা-সংলগ্ন বিদ্যধরী নদীর তীরের দৃশ্য অপরূপ। তৎকালে গভীর জঙ্গলে আকীর্ণ এই স্থানটি সম্ভবতঃ সাধন-ভজনের উপযুক্ত নির্জন স্থান ছিল। পীর গোরাচাঁদ একসময়ে এখানে এসে কিয়ৎক্ষণের জন্য অবস্থান করেছিলেন। তাঁর হাতে থাকৃত বেড়ু বাঁশের

একটি 'আশা-বাড়ি'। ভুলে হোক্ বা অন্য কোন কারণে হোক তিনি এখানে তাঁর আশাবাড়ি বা লাঠিটা রেখে যান। কারো মত এই যে, সেই স্থানটি চিহ্নিত করে তিনি লাঠিটি সেখানে পুঁতে রেখে গিয়েছিলেন। পরবর্ত্তীকালে বেড়ু বাঁশের সেই লাঠিটা শুকিয়ে না গিয়ে তা থেকে নতুন বাঁশ ঝাড়ের উৎপত্তি হয়। পীর গোরাচাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে তাঁর অবস্থিতি স্থানটি একটি নজরগাহরূপে এখনও পরিচিত এবং সেই বেড়ু বাঁশের ঝাড় আজিও সদর্পে বংশ বিস্তার করে সুপ্রতিষ্ঠিত। সে ঝাড়ের বাঁশ পরিবারিক প্রয়োজনে কেউ ব্যবহার করেন না।

৪। সিংহদরজায় নজরগাহ

বেড়াচাঁপার অতি সন্নিকটে রাজা চন্দ্রকেতুর প্রাসাদ ও গড়। এয়াজপুর নামক স্থানের আস্তানা থেকে এসে পীর গোরাচাঁদ তাঁর সাথে প্রথমে সাক্ষাত করতে প্রয়াসী হন। রাজা চন্দ্রকেতু সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়ে তাঁর গড়ের প্রবেশ দ্বারের মুখে অবস্থিত যে কক্ষে পীর গোরাচাঁদের সঙ্গে কথোপকথনে নিযুক্ত হয়েছিলেন পীর গোরাচাঁদের ভক্তবৃন্দ পরবর্ত্তীকালে ঐ ঐতিহাসিক সাক্ষাতস্থলটিতে একটি নজরগাহ নির্মাণ করে সেখানে ভক্তি-অর্ঘ স্বরূপ হাজত-মানত শিরনি দিতে আরম্ভ করে। প্রবেশদ্বার বা সিংহদরজার মুখে গোলাকৃতি বিশালকায় বহু প্রাচীন সেই নজরগাহটি আজিও দৃষ্ট হয়।

৫। বাঘ-বন্দী

বাবাসতের আমডাঙ্গা থানান্তর্গত কামদেবপুরের যে স্থানে পীর গোরাচাঁদের নামে এক সুদৃশ্য নজরগাহ আছে, কয়েক বছর আগেও সেখানে এমনটি ছিল না। তবে একটা থান ছিল, যেখানে কেউ কেউ দুধ, ফল ইত্যাদি দিত। সে সময় প্রায়ই গভীর রাত্রে সেখানে বাঘ এসে নজরগাহে 'সালাম' জানিয়ে যেত।

কোন এক রাত্রে একটি বাঘ ঐস্থানে এসে 'সালাম' না জানিয়ে অবস্থান করছিল। পীরগোরাচাঁদ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে সেখান থেকে চলে যেতে আদেশ করেন। সেই দুর্বিনীত বাঘ তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করলে গোরাচাঁদ তাকে নিকটবর্ত্তী একটি আমগাছে বেঁধে রেখে দেন। বাঘটি বন্ধন মুক্ত হতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে আত্মসমর্পন করে। পীর সাহেব অবশ্য

একঘণ্টা পরে তাকে মুক্ত করে দেন। একঘণ্টা বন্দী থাকা কালে বলবান্ এবং দুর্বিনীত সেই বাঘের টানাটানিতে রশির ঘর্ষণে আমগাছের গায়ে গভীর দাগ হয়ে যায়।

৬। পান-সুরকী প্রসঙ্গে

হাতিয়াগড় নামকস্থানে 'পীর গোরাচাঁদের সঙ্গে সেখানকার অধিপতি রাক্ষসরাজ আকানন্দের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে প্রথমে আকানন্দের ভাই বাকানন্দ নিহত হয় এবং পরে আকানন্দ নিজেও নিহত হয়। আকানন্দ নিহত হওয়ার আগে চক্রবাণের সাহায্যে পীর গোরাচাঁদের গর্দানে গুরুতরভাবে আঘাত করে। এই আঘাত নিরাময় করার ওষুধ পীর সাহেবের জানা ছিল। ক্ষত সারাতে অনুপান হিসাবে প্রয়োজন হয়েছিল পান ও সুরকীর। গোরাচাঁদ তৎক্ষণাৎ পান-সুরকী সংগ্রহ করে আনবার জন্য তাঁর সাথী সোন্দলকে বলেন। সোন্দল, বালাণ্ডা পরগণায় পান-সুরকীর বহু অনুসন্ধান করেও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। ঘটনাটি জেনে পীর গোরাচাঁদ বিষণ্ণ হয়ে বলেছিলেন যে বালাণ্ডা পরগণায় কেউ যেন পানের চাষ না করে এবং সুরকী দিয়ে ঘরের ছাদ নির্মাণ না করে। তাঁর এই আদেশ এখনও তাঁর ভক্তগণ মেনে চলেন।

৭। বেড়ু বাঁশতলায় সাপ

হাড়োয়া থানার নিকটবর্ত্তী লতারবাগান মৌজায় পীর গোরাচাঁদের যে নজরগাহটি আছে সেখানে বেড়ু বাঁশ ঝাড়ের পাশেই একটি অশ্বত্থ গাছ আছে। সেই অশ্বত্থ গাছে বাস করত এক বিশালকায় সাপ। সাপটি এত বিরাট যে, মুরগী-হাস, ছাগল বা অনুরূপ ছোট ছোট গৃহপালিত জীবকে সে অনায়াসে গিলে খেত। সেই সাপের উৎপাতে গ্রামের অধিবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। স্থানীয় আধিবাসী চন্দ্রকান্ত হাইত ক্ষিপ্ত হয়ে বন্দুকের গুলীর সাহায্যে সাপটিকে হত্যা করেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরই হাইত মহাশয় কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। সেই রোগেই তিনি পরে মারা যান। লোকের ধারণা যে পীরের নজরগাহ স্থানে জীবহত্যা করায় হাইত মহাশয়ের পাপের পরিণতিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল'।

৮। পীর গোরাচাঁদের মাজার শরীফ

ঘোরতর যুদ্ধে রাক্ষসাধিপতি আকানন্দ-বাকানন্দ নিহত এবং পীর গোরাচাঁদ গর্দানে গুরুতররূপে আহত হয়েছেন। আহত অবস্থায় তিনি গভীর জঙ্গলে অবস্থান করছেন। তাঁকে দুধ দিয়ে সেবা করছে একটি গাভী। গাভীর মালিকের নাম কালু ঘোষ। গাভীটি সকলের অজ্ঞাতে পীরকে সেবা করে। কালু সেই গাভীর দুধ কম হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হল। সে তৎক্ষণাৎ আটক করল তার গাভীকে। ফলে পীর সাহেবের জীবন আরো সংকটাপন্ন হয়ে উঠল। পীর তখন কালুকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে অনুরোধ জানালেন,—"কালু! মৃত্যুর পর তুমি আমার শবকে বালাণ্ডা পরগণার বিদ্যাধরী নদীর তীরে সমাধিস্থ করবে।"

কালু সে আদেশ মান্য করে যথাস্থানে মাজার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

৯। বেড়াচাঁপা

দেউলার রাজা চন্দ্রকেতু। তিনি হিন্দুরাজা। প্রবল প্রতাপ তাঁর। হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তিনি অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহক। পীর গোরাচাঁদ এতদ্ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার কবতে এসে বুঝতে পারলেন যে চন্দ্রকেতুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে পারলে তাঁর কাজ অনেক সহজসাধ্য হবে। তাই প্রথমেই তিনি সাক্ষাত করলেন রাজার সঙ্গে। আলোচনান্তে পীর গোরাচাঁদ তাঁকে ইসলাম ধর্মগ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। রাজা নানা অজুহাতে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেন। রাজা বললেন,—"শুনলাম আপনি অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। আপনি কি অলৌকিক শক্তির সাহায্যে আমার ঘরে রক্ষিত লৌহকদলী পাকা কদলীতে পরিণত করতে পারেন?"

পীর গোরাচাঁদ সম্মত হলেন। রাজার আদেশে লৌহকদলী গোরাচাঁদের সম্মুখে আনীত হল। পীর গোরাচাঁদ মনে মনে আল্লাহ্ তালার নিকট মোনাজাত করার পর দেখা গেল সেই কাঁচা কদলী পাকা কদলীতে পরিণত হয়েছে। রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন—"আমার বিশ্বাস হয় না যে আপনি আমার প্রাসাদ-বেষ্টিত লোহার বেড়ায় কমনীয় চাঁপাফুল ফোটাতে পারবেন।"

পীর গোরাচাঁদ বললেন,—"আল্লার দোয়ায় তাও সম্ভব হতে পারে।"

এই বলে তিনি পুনরায় আল্লার নিকট মোনাজাত করলেন। তৎক্ষণাৎ দেখা গেল লোহার বেড়ায় অসংখ্য চাঁপাফুল ফুটে উঠেছে। সেই অসম্ভব ঘটনা দেখে সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। রাজা তবু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি কিন্তু বেড়ায় চাঁপা ফুল ফোটানোর অলৌকিক ঘটনা লোককথায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। উক্তস্থানের "বেড়াচাঁপা" নামকরণের মধ্যদিয়ে সে লোককথা ঐতিহাসিক বাস্তবতার রূপ নিয়েছে।

১০। অসম্পূর্ণ লাল মসজিদ

হাড়োয়া থানার অন্তর্গত লতারবাগানে লাল মসজিদের নিদর্শন আছে। মসজিদটি নির্মাণ কাজে হাত দিয়েছিলেন পুরাতন খাসবালাণ্ডা নামক স্থানের মীরখাঁ নামক এক মুসলমান। প্রথম জীবনে তিনি পীর গোরাচাঁদের পরম ভক্ত ছিলেন। পীরের অনুগ্রহে তাঁর দরিদ্র অবস্থা দূর হয়ে যায়। অবস্থার উন্নতি হওয়ার পর তাঁর এতই অহঙ্কার জন্মে যে তিনি মসজিদ নির্মাণ করে এক কীর্ত্তিস্থাপনে প্রয়াসী হন। মসজিদ নির্মাণের জন্য সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত। তিনি বহুসংখ্যক রাজমিস্ত্রি সংগ্রহ করে আনেন এবং একরাত্রের মধ্যে মসজিদ নির্মাণ অবশ্যই সমাপ্ত করবেন বলে সদর্পে প্রতিজ্ঞা করেন।

মীর খাঁর এই অহঙ্কারে অসন্তুষ্ট হয়ে পীর গোরাচাঁদ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই প্রভাত হয়েছে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন। গাছে গাছে ডেকে ওঠে কোকিল, বাড়ী বাড়ী ডেকে ওঠে মোরগ। রাজমিস্ত্রিগণও কথা দিয়েছিল যে তারা এক রাত্রির মধ্যেই মসজিদ নির্মাণ কাজ শেষ করে দেবে। কিন্তু পাখীর কূজন শুনে তারা নিরাশ হয় এবং মসজিদের কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই স্থানত্যাগ করে। অসম্পূর্ণ সে লাল মসজিদ আজো (১৯৭২) বিদ্যমান।

১১। নলপুকুর-চড়কপুকুর

লাল মসজিদের দুপাশে দুটি বড় পুকুর আছে। একটির নাম নলপুকুর, অন্যটির নাম চড়কপুকুর। চড়কপুকুর-নলপুকুরের ধারে প্রতি বছর চড়কের মেলা হয়। ঐ পুকুরের জলে নাকি প্রচুর থালা এবং বাসন পত্রাদি আছে।

গ্রামের হিন্দু বা মুসলমান যে কেউ এককালে তার বাড়ীর বিশেষ উৎসবে ঐ পুকুরের বাসনপত্রাদি ব্যবহার করতেন। ঐ বাসনপত্রাদি পেতে হলে গৃহস্থকে রাত্রে পুকুর-ধারে গিয়ে পবিত্র পোষাকে পবিত্র মনে পুকুরের অধিষ্ঠাতাকে আপনার প্রয়োজনের কথা জানিয়ে নিমন্ত্রণ করতে হত। নিমন্ত্রণ গৃহীত হলে পরদিন প্রাতঃকালে পুকুরের পাড়ের কাছে অল্প জলের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত বাসনপত্রাদি পাওয়া যেত। নিয়ম ছিল কাজ সমাধা হলে উপযুক্ত ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সেগুলি যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে যেত হত।

১২। অর্থলোভী নরিম মণ্ডলের বংশধর

লতারবাগান নামক গ্রামে বেড়ু বাঁশতলায় পীর গোরাচাঁদের নামে যে নজরগাহটি আছে তার অন্যতম সেবায়েত ছিলেন মোহাম্মদ নরিম মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। তাঁর বংশধরের মধ্যকার এক ব্যক্তি ছিল নিদারুণ অর্থলোভী। লোভের জন্য সে স্বাভাবিকভাবে উক্ত নজরগাহের সেবায়েত থাকার অধিকার ফেলল হারিয়ে। কিন্তু অধিকার সে ছাড়ল না। অল্পদিনের মধ্যেই সে ব্যক্তি বাকশক্তি হারিয়ে ফেল্‌ল। প্রথম দিকে সাধারণ লোক অকস্মাৎ তার বোবা হওয়ার কারণ বুঝতে পারল না। পরে লোকটি এক অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং ইঙ্গিতে তার স্বপ্নকথা প্রকাশ করলে তার ঐরূপ বোবা হওয়ার কারণ বোঝা গেল। স্বপ্নটি এইরূপ :—

এক রাত্রে সে স্বপ্নে শুনতে পেল কে যেন গম্ভীর আওয়াজে বল্‌ছেন,—"টাকা, বড়ই টাকার লোভ তোর! টাকার বড় দরকার, তাই না! বেশ, তুই নলপুকুরের ধারে যাস গভীর রাত্রে,—টাকা পাবি, অনেক টাকা পাবি। কিন্তু একটি সর্ত —টাকার জন্য তোকে দুটো ডাব দিতে হবে।"

ডাব দানের অর্থ হল ছেলে দান। ঐ ব্যক্তি তার দুই ছেলেকে বিসর্জন দিতে হবে এই গুপ্ত অর্থ বুঝতে পেরে অর্থলোভের ন্যায় ঘৃন্য অপরাধের কথা সাধারণের মধ্যে যখন প্রকাশ করছিল তখন নাকি তার দুই গণ্ড বেয়ে অবিরল অশ্রু ঝরে পড়ছিল।

পীর গোরাচাঁদ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ লোককথা কিছু কিছু আছে। সেই লিখিত লোককথাগুলির একটি এইরূপ ;—

রামজয় হড়। হড় ঠাকুরের নামে নাকি ভাঙা হাড়ি জোড়া লাগে। তাই আজো এ অঞ্চলের লোক শুভযাত্রার প্রাক্কালে মহাপুণ্যবাণ হড় ঠাকুরের নাম করে। মেয়েরা মাটির হাড়ি উনানে চাপাবার আগে 'জয় রামজয় হড়' বলে তাঁর স্মরণ করে পাছে হাড়ি ভাঙে সেই ভয়ে। শোনা যায় একদিন রাত দুপুরে পীর গোরাচাঁদ অতিথি হলেন গোপালপুরে (ভৈরব-গোপালপুর : বসিরহাট) রামজয় হড়ের বাড়ীতে। প্রতাপশালী মুসলমান পীরকে সাদর আতিথেয়তা জানালেন হড় মশায়। পীর বললেন, "রামজয়, আমি বড় ক্ষুধার্ত।"

অতিথিপরায়ণ ব্রাহ্মণ সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি দিয়ে আপনি সেবা ইচ্ছা করেন ?"

পীর, ব্রাহ্মণের আতিথেতার পরীক্ষা করতে বল্‌লেন—"ইলিশ মাছ দিয়ে ভোজ্য দাও।"

হড় ঠাকুর তো ভয়ে কাঠ। রাত দুপুরে ইলিশ মাছ পান কোথায়! চিন্তিত ঠাকুর মশায় পীরের কাছে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতেই পীর বল্‌লেন,—"পুকুরে জাল ফেল্‌লে ইলিশ উঠবে।"

হলও তাই। পুকুরেই ইলিশ মাছ পাওয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

গোরা সঈদ

পীর হজরত দায়ুদ আকবর রাজী বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পীর হজরত সৈয়দ আব্বাস আলি রাজী ওরফে পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত বাইশ জনের এক কাফেলার সহিত আগমন করেছিলেন। তিনি "গোরা সইদ্" নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। বারাসত মহকুমার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত সোহাই নামক গ্রামেই তিনি অধিষ্ঠিত হন। সেখান থেকে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। পীর গোরাচাঁদের স্থান বালাণ্ডা পরগণার হাড়োয়া অঞ্চল সোহাই গ্রামের যথেষ্ঠ সন্নিকটে অবস্থিত।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গোরা সঈদ, পীর গোরাচাঁদকে সহযোগিতা করতেন। সোহাই গ্রামে থেকেই তিনি আল্লাহ-মাহাত্ম্য প্রচার করেন এবং তাতে আপনার জাহির হয়। তাঁর জন্মস্থান, জন্ম-তারিখ বা মৃত্যুর কাল কিছুই জানা যায় না। তবে সোহাই গ্রামেই তিনি এন্তেকাল বা মৃত্যুবরণ করেন। এইখানেই তাঁর পবিত্র মাজার শরীফ আছে।

পীর হজরত গোরা সইদ্ রাজীর পবিত্র মরদেহ যেখানে কবরস্থ করা হয়েছিল, সেই স্থানে তাঁর ভক্তগণ ইট দিয়ে একটি দরগাহ নির্মাণ করে দিয়েছেন। শুনা যায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বহু বিঘা জমি পীরোত্তর হিসাবে উক্ত পীরের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। বর্তমানে দেখা যায় প্রায় চার কাঠা পরিমাণ জায়গার উপর পীরের দরগাহটি অবস্থিত।

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা (৫০) প্রমুখ সেবায়েত পীর গোরা সইদের দরগাহের তত্বাবধান করেন। তাঁদের পক্ষে মোহাম্মদ মোকসেদ আলি বর্তমানে (১৯৫০) দরগাহে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে ধূপ-বাতি প্রদান করেন।

প্রতি বৎসর পঁচিশে ফাল্গুন তারিখে দরগাহে পীরের নামে ওরস হয়। সে সময়ে এখানে একদিনের মেলা বসে। এই মেলায় পাঁচ-ছয় হাজার লোকের

সমাবেশ হয়। সেখানে ভক্তগণ পীরের উদ্দেশ্যে হাজত, মানত ও শিরনি প্রদান করেন। অনেক ভক্ত সেখানে লুট দেন। তাছাড়া প্রতি শুক্লপক্ষের একাদশ দিবসে বিশেষ অনুষ্ঠান হয় এবং সে সময় ঐ স্থানে উপস্থিত ফকিরগণকে ভোজন করানো হয়। অনেক ভক্ত অন্যান্য দিনেও দরগাহে দুধ, ফল, বাতাসা প্রভৃতিও দান করেন।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব তাঁর "বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী" নামক পুস্তকে গোরা সইদের খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। পীর গোরাচাঁদ পাচাঁলী কাব্যে, কবি মহাম্মদ এবাদোল্লা সাহেব লিখেছেন,—

গোরা ছয়িদ কহিল সুহাই নগর।
জাইগীর দিছে আল্লা গুণের সাগর॥
মোছলমান করিব জাইগীরে গিয়া।
তালজঙ্গ রাজে আমি জোরেতে ধরিয়া॥ (পৃ. ৮)

ভাবিতে ভাবিতে দেহে চলিতে লাগিল।
গোরাচাঁদসহ ছইদ সুহাই আসিল॥
ছইদ গোরায় কয় শুন বলি কথা।
তুমি যাও বালাণ্ডায় আমি থাকি হেথা॥
কখন তোমার পবে কেহ করে জোর।
ছোন্দল আসিয়া যেন করেন খবর॥
সত্বর করিয়া আমি যাইয়া তথায়।
মুহুর্ত্তেকে যুদ্ধ করে মারিব তাহায়॥
দুই পীর এক সঙ্গে মিলি গলে গলে।
বিদায় হইল গোরা লইয়া ছোন্দলে॥ (পৃ. ৮)

মহাম্মদ এবাদোল্লা রচিত 'পীর গোরাচাঁদ পাচাঁলী' কাব্যের একস্থানে বর্ণিত পীর গোরা সইদের বীরত্বগাথা সংক্ষেপে এইরূপ ;—

হেতেগড়ের রাক্ষসাধিপতি আকানন্দ ও বাকানন্দ নামক দুই ভাই-এর সঙ্গে পীর গোরাচাঁদ তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। প্রথমে এল বাকানন্দ। পীর গোরাচাঁদ যুদ্ধে তাকে হত্যা করলেন। আকানন্দ তার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদে উন্মত্ত হয়ে পীর গোরাচাঁদকে ধ্বংস করতে এগিয়ে এল। তার সঙ্গে আছে

চক্রবাণ। এই চক্রবাণের সাহায্যে এমন আঘাত হান্‌ল যাতে পীরের স্কন্ধের অর্ধেক কেটে গেল। এবার পীরের জীবন সংশয়। তবে পীর জানতেন যে পান সহযোগে ওষুধ ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করতে পারলে তাঁর জীবন রক্ষা হতে পারে। কিন্তু তিনি আপন সহচর ছোন্দলের সাহায্যে অনেক চেষ্টা করেও পান সংগ্রহ করতে পারেন নি। পীর গোরাচাঁদ তখন হতাশ্বাস হয়ে সুহাই গ্রামে গিয়ে পীর গোরা সইদকে সংবাদ দিবার জন্য ছোন্দলকে আদেশ করলেন।

ছোন্দল তখনই সুহাই গ্রামে এসে পীর গোরা সইদকে সমস্ত বিবরণ জানালেন। সব শুনে 'সইদ' দুঃখে বিচলিত হয়ে কেঁদে ফেল্‌লেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হেতেগড়ের যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং ঢাল, তরবারি, খুন্তি, ধনুক-বাণ প্রভৃতি নিয়ে যাত্রা করলেন।

পীর গোরা সইদ ঘোড়ায় চড়ে এলেন হেতেগড়ে। অনুসন্ধান করে সাক্ষাত করলেন পীর গোরাচাঁদের সঙ্গে। উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধু-সুলভ কথাবার্তা হল। গোরাচাঁদের পরামর্শক্রমে রাক্ষসবংশ ধ্বংস করতে অগ্রসর হলেন গোরা সইদ। তুমুল যুদ্ধে তিনি আকানন্দকে নিহত করতে সমর্থ হলেন। অতঃপর তিনি ফিরে এলেন সুহাই গ্রামে।

পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজার সমসাময়িক বলে অনুমিত হয় যে পীর গোরা সইদ চতুর্দশ শতাব্দীর ধর্মপ্রচারক। পীর গোরাচাঁদের মৃত্যুর পরেও তিনি কিছুদিন জীবিত ছিলেন তা প্রচলিত কাহিনী বা কাব্য থেকে জানা যায়।

পীর গোরা সঈদের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক একটি লোককথা সুহাই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। লোক-কথাটি এইরূপ :—

পীরের দোয়া :

সুহাই গ্রামে একদিন এক ব্যক্তি রোগে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে এসে হাজির। তাঁর নাম মোহাম্মদ মোকসেদ আলি (৩৫)। কঠিন পীড়ায় তিনি নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছেন। নিরাময়ের কোন আশা নেই। অনেক ডাক্তার ও কবিরাজকে তিনি দেখিয়েছেন। অবশেষে পীর গোরা সইদের দরগাহে এসে আকুল ভাবে প্রার্থনা জানালেন রোগ থেকে মুক্তির আশায়। তিনি পীরের দরগাহে

রইলেন ধর্ণা দিয়ে। অবশেষে তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন ; —"তুমি পীর গোরা সাইদের দরগাহে নিজেকে নিবেদন কর, তোমার রোগ মুক্তি ঘট্‌বে।"

পরদিন থেকে তিনি উক্ত দরগাহে ধূপ-বাতি দিতে আরম্ভ করেন। অচিরকাল মধ্যেই দেখা গেল যে তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করতে আরম্ভ করেছেন। বেশ কয়েক দিনের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি আজও (১৯৫০) উক্ত দরগাহে সেবক হিসাবে নিয়মিত ধূপ-বাতি দিয়ে থাকেন।

হিন্দু মুসলিম সকল ভক্তই তাঁর দরগাহে হাজত, মানত ও শিরনি দিয়ে থাকেন। এখানে মোরগ হাজত দেওয়া হয়। তবে সে মোরগকে জবাই করা হয় না ; পীরের নামে উৎসর্গ করে দেওয়াই প্রথা। এটি খুব সম্ভবতঃ বৌদ্ধাদর্শে জীব হত্যা না করার রীতি এখানে অনুসৃত হয়েছে। এখানে লুট দিবারও রীতি প্রচলিত।

দশম পরিচ্ছেদ

চম্পাবতী

চম্পাবতীর অপর নাম সুভদ্রা রায়। তিনি ব্রাহ্মণনগরের রাজকন্যা। তাঁর পিতার নাম মুকুট রায়, মাতার নাম লীলাবতী, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম কামদেব রায় এবং স্বামীর নাম বড়খাঁ গাজী।

মুকুট রায়ের সহিত বড়খাঁ গাজীর যুদ্ধ, মুকুট রায়ের পরাজয়, বড়খাঁ গাজীর সহিত কন্যা চম্পাবতীর বিবাহ, পুত্র কামদেব রায় প্রমুখের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা। পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর কথা প্রসঙ্গে তা আলোচিত হয়েছে। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিরর্থক।

বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত লাবসা নামক গ্রামে চম্পাতীর নামে একটি দরগাহ্ আছে। তাছাড়া আরো কোন কোন স্থানে চম্পাবতীর নামে নজরগাহ্ আছে। তাদের মধ্যে বারাসত মহকুমার অন্তর্গত বোলা নামক গ্রামের নজরগাহ্ সম্পর্কে জানা যায় যে রাজা রামমোহন রায় বংশীয় জমিদারী ধারার ধরণীমোহন রায় প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিনে খুব জাঁক-জমকের সহিত এখানে শিরনি দিতেন। তারপর থেকে স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম ভক্ত সেই প্রথা অনুসরণ করে আসতে থাকেন। জমিদারী উচ্ছেদের পর সে ধারা রুদ্ধ হয়ে গেছে।

এখানে চম্পাবতীর নামাঙ্কিত নজরগাহ-স্থানের জমির পরিমাণ বর্তমানে মাত্র তিন কাঠার মতন। পূর্বে নাকি নজরগাহ্টি মন্দিরসদৃশ ছিল। পরে সেই পাকা দরগাহটি ইটের স্তুপে পরিণত হয়েছে। অনেকে বলেন এখানে এককালে একটি নাম-না-জানা গাছ ছিল। মরহুম পাঁচকড়ি খাঁর পর শেখ মোজাম্মেল হক্, চম্পাবতীর নজরগাহে ধূপ-বাতি দিয়ে জিয়ারত করতেন। চম্পাবতীর দরগাহের উত্তর পাশে আর একটি ইটের স্তুপ আছে। সেটিকে কেহ বলেন চম্পাবতী বা বিবি চম্পার দরগাহ, কেহ বলেন বনবিবির দরগাহ্, আবার কেহ বা বলেন বিবি ফাতেমার দরগাহ্।

চম্পাবতীর শেষ পরিণতি কি হয়েছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্থানে তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—

১। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত লাবসা নামক গ্রাম পর্য্যন্ত স্বামী বড়খাঁ গাজীর সহিত চম্পাবতী আগমন করেছিলেন। মানসিক দিক দিয়ে কোন কারণে দারুণভাবে আহত হয়ে তিনি জীবন ত্যাগের সংকল্প নিয়ে পাল্কীর মধ্যে থাকা অবস্থায় গলায় ছুরিকাঘাত করেন। পাল্কী বেয়ে রক্ত ঝরতে দেখে বেহারাগণ পাল্কী মাটিতে নামায়। তখন চম্পাবতীর রক্তাক্ত মৃতদেহ সকলের নজরে পড়ে।৮ (আঞ্চলিক লোককথা)।

২। লাবসা গ্রামে আসবার পর গাজীর সঙ্গ ত্যাগ করে চম্পাবতী পলায়ন করেন এবং নিকটবর্ত্তী গণরাজার প্রাসাদে আশ্রয় নিয়ে বাকী জীবন সেইখানেই অতিবাহিত করেন।৫৩

৩। উক্ত লাবসা নামক গ্রামে তিনি আজীবন অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।৫৩

৪। লাবসা গ্রামে সাময়িক অবস্থিতির পর তিনি বড়খাঁ গাজীর সহিত বৈরাট নগরে শ্বশুরালয়ে গমন করেছিলেন।১৩

৫। চম্পাবতী ছিলেন রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা। পীর গোরাচাঁদের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।৯

৬। তিনি বোগদাদের খলিফা বংশের অনূঢ়া কন্যা। ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে তিনি এদেশে আগমন করেছিলেন।১২

কালের গতিতে চম্পাবতী রূপকথায় পর্য্যবসিত হয়েছে। প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। তবে ঘটনা বিশ্লেষণে এইটুকু উদঘাটিত হয় যে তিনি মুকুট রায়ের কন্যা, গাজীর সহিত তাঁর বিবাহও হয়েছিল। লাবসা গ্রামের দরগাহ ও তথাকার লোককথায় স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান হয় যে চম্পাবতীর দেহান্তর উক্ত স্থানেই ঘটেছিল।

চম্পাবতীর দেহান্তর ঘটা সম্পর্কে একটি লোককথা বসিরহাট উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত আছে। লোককথাটি সংক্ষেপে এইরূপ :—

১। চম্পাবতী :

মাতা-পিতার কাছ থেকে সাশ্রু নয়নে বিদায় নিয়ে সুভদ্রা রায় স্বামী গাজীর অনুগমন করলেন। সঙ্গে চলেছেন গাজীর সহচর কালু এবং সুভদ্রার

সহোদর ভাই কামদেব। ব্রাহ্মণ নগর তিনি ত্যাগ করে চলেছেন। যাবেন শ্বশুরালয় বৈরাট নগরে। দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হতে হতে এলেন লাবসা নামক গ্রামে। পাল্কী থেকে সুভদ্রা রায় তাকালেন বাইরের দিকে। দেখলেন দূরে আকাশে অসংখ্য চিল এবং শকুনি ও কাকের আনাগোনা। এত চিল-শকুনি কাক ওড়ার কারণ জানবার কৌতূহল হল তাঁর।

বড়খাঁ গাজী যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, তাঁর ভক্তগণের সে কি কম আনন্দের কথা! গাজী যুদ্ধে জয় লাভ করে রাজকন্যা সুভদ্রাকে বিবাহ করে এসেছেন, সেকি তাদের কম গৌরবের কথা! গাজীভক্তগণ বিজয়ী গাজীকে সম্বর্দ্ধনা না জানিয়ে কি পারে! সে জন্য তো একটা বিজয়-উৎসব হওয়া চাই!

দূরে গ্রামে সেই বিজয়-উৎসব হবে। একটা বড় দরের খানা-পিনা হবে সেখানে। সেখানে কত গরু জবাই করা হয়েছে তার হিসাব কে রাখে মাংস লোলুপ চিল-শকুনি কাকও সেখানে জটলা তো করবেই। হাঁড়-গোড় নিয়ে কলহে মত্ত কুকুরকুলের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে।

গোহত্যার ব্যাপারে সংস্কারাচ্ছন্ন সুভদ্রা ও কামদেব মুহূর্তে যেন মরমে মরে গেলেন। মনে মনে এমন সাংঘাতিক ভাবে আহত হলেন যে সুভদ্রা পাল্কীর মধ্যে থেকে গলায় ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করলেন। কামদেব আর গাজীর সঙ্গে অগ্রসর হলেন না। উদাসভাবে তিনি দিক পরিবর্তন করে একাকী পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

সুভদ্রার প্রাণহীন দেহ লাবসা গ্রামেই সমাহিত করা হল। তাঁর সমাধির উপর একটি চাঁপা ফুলের গাছ লাগানো হয়েছিল। চম্পাফুল শোভিত সুভদ্রার সমাধি কালক্রমে মায়ী চম্পার দরগাহ বা চম্পাবতীর সমাধি বা চম্পাবতীর 'থান' রূপে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী কালে তাঁর চম্পাবতী নামটিই সমধিক প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ঠাকুরবর সাহেব

জায়গার নাম লাউজানি। বাংলা দেশের অন্তর্গত যশোহর জেলার ঝিনাইদহ থানাধীন এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম ব্রাহ্মণনগর। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এখানকার রাজা ছিলেন মুকুট রায়। পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মুকুট রায়ের এক কন্যা ও এক পুত্র ছিল। তাঁদের নাম যথাক্রমে সুভদ্রা ওর্ফে চম্পাবতী ও কামদেব। চম্পাবতীর সঙ্গে বড়খাঁ গাজীর বিবাহ হয়। কামদেব কিশোর অবস্থাতেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

বড়খাঁ গাজী বিবাহের পর পত্নী চম্পাবতীকে নিয়ে ব্রাহ্মণ নগর থেকে তাঁরা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন এবং খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত লাবসা নামক গ্রামে আসেন। সেখান থেকে কামদেব কোন কারণে ব্যথিত হয়ে ভগিনীপতির সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং খুলনা সীমান্ত অতিক্রম করে চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমাধীন স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত গাবর্ডা নামক গ্রামে আসেন। সেখানে অল্প সময় অবস্থানের পর চারঘাট নামক গ্রামে এসে উপস্থিত হন। কথিত আছে, তিনি হাঁড়ি বুকে নিয়ে যমুনা পার হন এবং চারঘাট গ্রামে আসেন। চারঘাটের যেখানে তিনি যমুনা পার হয়েছিলেন তা আজো 'হেঁড়ের ঘাট' নামে পরিচিত। চারঘাটের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে বাঁওড়ের ধারের নির্জন স্থানটি সন্ন্যাসী বা ফকিরগণের সাধন ভজনের পক্ষে অনুকূল। তিনি সেখানে মুসলমান ফকিরের বেশে হিন্দু সন্ন্যাসীর মত কুটীর নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। তাঁর নাকি একটি পোষা বাঘ ও একটি পোষা কুমীর ছিল। তারা কাকেও হিংসা করত না। গভীর রাত্রে তারা ঐ ফকির-বেশী সাধকের সাথে সাক্ষাত করতে আসত। তিনি ছিলেন বাক্‌সিদ্ধ। বিনা ওষুধে তিনি কত লোকের নানারকম ব্যাধি আরোগ্য করতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর অসাধারণ তপঃশক্তির কথা চারিদিকে

প্রচারিত হতে থাকে। সাধারণের নিকট তিনি ঠাকুরবর নামে পরিচিত হন। তাঁর মাধ্যমে ঠাকুরের বর অথবা ব্রাহ্মণ ঠাকুরের বর লাভ করে জনসাধারণ ধন্য হতে পারত বলে হয়তো ঠাকুরবর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বহুলোক তাঁব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবে। যশোহর-অধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যও তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি কবতেন। অনেক সময় ঠাকুরবর সাহেব প্রতাপাদিত্যেব বাজধানী ধূমঘাটে যেতেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য কার্য্য ব্যপদেশে এতদ্ অঞ্চলে এলে অবশ্যই ঠাকুরবর সাহেবের আস্তানায় এসে শ্রদ্ধা জানিযে যেতেন।

চাবঘাটেব পার্শ্ববর্ত্তী অন্যতম গ্রামেব নাম কাঁচদহ। এ গ্রামের এক শৌণ্ডিক (শুঁডি)-এর পুত্র মাঠে গোচাবণ কালে মাঝে মাঝে ঠাকুরবর সাহেবের কাছে আসত। বালকটির নাম হবি। সে ফকিরের প্রতি ভক্তিমান। ভক্তিমান বালক হবির প্রতি ঠাকুববর আকৃষ্ট হন। সে ভবিষ্যতে তাঁব ধর্ম প্রচাবেব প্রধান সহায হবে মনে করে তিনি হরিকে বিশেয কৃপা করেন। তাতে হরির অসম্ভব উন্নতি হয। অর্থোন্নতির সাথে সাথে হবি কাঁচদহ গ্রাম ত্যাগ কবে এবং চাবঘাটে এসে বসতি স্থাপন করে। চারঘাটে হরি শুডিব ভিটে আজো বিদ্যমান।

হবিব ব্যবসায বানিজ্যে এত উন্নতি হয যে তার বেশ কয়েকখানি পণ্যডিঙ্গা ছিল। সেগুলি পণ্য নিযে নানা দেশে গমনাগমন কবত। চারঘাটের মাটির নীচে এক সমযে তামাব পাতযুক্ত প্রকাণ্ড নৌকাব ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিযেছিল। চাবঘাটেব দক্ষিণে মাঠেব মধ্য দিযে 'হরে শুডিব' রাস্তার চিহ্ন বযেছে। ঐ বাস্তা গৌডবঙ্গেব প্রাচীন বাস্তা থেকে নির্গত হযে যমুনাব মোহনা পয্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

হবি ধনশালী হযে খুব গর্বিত হয এবং হিন্দুব সন্তান মুসলমান হওয়ায় ঠাকুরবব সাহেবকে সে ঘৃণাব চোখে দেখতে থাকে। ঠাকুরবর সাহেব কিছু অলৌকিক শক্তিব প্রকাশ করে হবিব উপব প্রভাব বিস্তারেব চেষ্টা করেন। তাতেও ঠাকুববর সাহেবকে অমান্য কবলে হবি শেষে পীরের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়। তাব অনেক দৈব দুর্ঘটনা ঘটে। পর্টুগীজ জলদস্যু কর্তৃক তার পণ্যতরী বিনষ্ট হয় এবং আবো কিছু ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও সে পীরের শিষ্যত্ব মেনে নেয় না। অবশেষে সে এক নিদারুণ বিপদের মধ্যে পতিত হয়।

সে সময় পোর্টুগীজ দস্যুরা খুব অত্যাচার করত। তাদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ব্যবসায়ীরা পরামর্শ করে একজন দস্যুকে ধরে আনে এবং তাকে তারা মন্দিরে নিয়ে বলিদান করে। এ সংবাদ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কর্ণগোচর হয়। নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়ায় মহারাজ সেই ব্যবসায়ীদের ঔদ্ধত্যকে সহ্য করেননি। তিনি বিচারার্থে কয়েকজন ব্যবসায়ীকে রাজ-দরবারে আসতে আদেশ পাঠান। এ ব্যাপারে সন্দেহ করে হরিকেও উক্ত আদেশ জারী করা হয়। এ অবস্থায় ঠাকুরবর সাহেব তাকে রক্ষা করতে চাইলেন, কিন্তু হরি তাঁর শিষ্যত্ব নিয়ে রক্ষা পেতে চাইল না।

রাজদরবারে বিচারে হরির শাস্তি বিধান হলে তার অবর্তমানে পাছে তার পরিবারবর্গ ধর্মান্তর গ্রহণ করে—এই আশঙ্কায় সংবাদবাহী দুটো পায়রা নিয়ে সে ধুমধাটে যাত্রা করে। পরিবারবর্গকে বলে যায় যে, বিপদ ঘটলে পায়রা ছেড়ে দেওয়া হবে এবং এমত ভাবে পায়রা ফিরে এলে পূর্ব ব্যবস্থামত তার পরিবারবর্গ যেন সছিদ্র প্রকাণ্ড নৌকায় করে যমুনার জলে প্রাণ ত্যাগ করে।

উক্ত হত্যাকাণ্ডে নিজে লিপ্ত না থাকায বিচারে হরি অব্যাহতি পায়। কিন্তু ঠাকুরবরের কৃপা-বঞ্চিত হরির হাত থেকে পায়রা দুটী ফস্‌কে উড়ে যায়। তারা বাড়ীতে ফিরে এলে পরিবারবর্গ মনে করে যে হরির সমূহ বিপদ ঘটেছে। পূর্ব ব্যবস্থামত যমুনার জলে ডুবে তারা আত্মহত্যা করে। হরি দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এসে দেখে, সব শেষ। তখন হরিও মনের দুঃখে অশ্বারূঢ় অবস্থায় লম্ফ দিযে যমুনার জলে সমাধি লাভ করে এবং পরিজনের সঙ্গে মিলিত হয়। প্রবাদ আছে,—"মরল, তবু হরি 'পীর ঠাকুরবর' বলল না।"

যমুনার যে স্থানে হরি সপরিবারে প্রাণত্যাগ করেছিল তাকে এখনও লোকে 'হরে শুঁড়ির দহ' বলে।

৺সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁর যশোহর খুলনার ইতিহাসে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। ঠাকুরবর সাহেবের আস্তানাটি যেখানে অবস্থিত সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন মনোরম, সেখানকার যে স্থানে তাঁর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল তার উপরে নির্মিত ছোট দরগাহগৃহটিও তেমন সুন্দর। একটা গম্বুজসহ চারকোণে ছিল চারটা মিনারেট। দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে দুটো দরজা। উভয় পার্শ্বে উত্তর ও দক্ষিণ দিক বরাবর

কয়েককটি করে ঘর, সবই ইটের তৈরী। সেগুলি যাত্রীনিবাসরূপে ব্যবহৃত হত। দরগাহের পূর্ব দিকের দরজার উপর দুখানি ইটে আরবী হরফে খোদিত লিপি। দক্ষিণ দিকের দরজার উপর আরবী অক্ষরে অঙ্কিত হস্তী মূর্ত্তি। গম্বুজটি বহুদিন ভগ্ন অবস্থায় ছিল। পরে কড়ি বরগা দিয়ে ছাদ এঁটে সংস্কার করা হয়েছিল। সংস্কারকালে আরবী-লিপি খোদিত ইটগুলির লেখা পাঠোদ্ধারের আশায় সেবায়েতগণ সযত্নে তুলে রেখেছেন, কিন্তু আজো তার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। সেখানকার যাত্রী নিবাসগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং দরগাহ গৃহাদিরও কিছু কিছু ক্ষতি হয়েছে।

পীর সাহেবের সমাধি-স্তম্ভটি উপবীত দ্বারা বেষ্টিত। সমাধি স্তম্ভের পাশে একটি তছবী বা জপমালা দেখা যায়। বিল্বপত্রাদি দিয়ে ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহে নিত্য সংক্ষিপ্তভাবে পূজা করবার রীতি প্রচলিত। বর্তমানে সে পূজা পদ্ধতির ধারা কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। সমাধি-স্তম্ভ-বেষ্টিত যে উপবীত ছিল তাও গত বৎসরের প্রথম দিক থেকে আর দৃষ্ট হয় না। মুসলিম সেবায়েতগণ নিত্য ধূপ ধুনা ও বাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্থানীয় বা দূর অঞ্চল থেকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক এখানে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করতে আসেন। হিন্দুরা বাতাসাদি মিষ্ট দ্রব্য দিয়ে মানত ও শিরনি নিবেদন করেন, মুসলিমরা মানত ও শিরনি ছাড়াও ছাগ-মুরগী হাজত নিবেদন করতেন। অনেক হিন্দু মুসলিম ভক্ত আজো তা প্রদান করেন। ঠাকুরবরের নামে মানসিক না করে গ্রামবাসীগণ সাধারণতঃ কোন কাজে অগ্রসর হন না। গ্রামের নব বর-বধূ ঠাকুরবর সাহেবের দরগায় গিয়ে পূজা ও ভোগ দিয়ে তবে গৃহে প্রবেশ করে থাকেন। বহু পূর্বে পীরের উরস উপলক্ষে এখানে মেলা বসত বলে শোনা যায়। এখনও পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ সময়ে ভক্ত যাত্রীগণের সমাগম হয়।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতনের পরও ঠাকুরবর সাহেব বহুদিন জীবিত ছিলেন। অনুমান করা যায়, চিরকুমার এই সন্ন্যাসী মুসলমান ফকিরের বেশে সিদ্ধ পুরুষ হিসাবে দীর্ঘজীবি ছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কাল হল ১৫৬০ থেকে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। অতএব ঠাকুরবর সাহেব সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও জীবিত ছিলেন।

ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহের অন্যতম বয়ঃবৃদ্ধ এবং মূল সেবায়েত সেখ আবুল হোছেনের নিকট থেকে জানা গেছে যে, তাঁদের পূর্ববর্ত্তী কোন এক পুরুষ মেদিনীপুর জেলার কোনো এক স্থান থেকে চারঘাটে আসেন ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহের সেবায়েত নিযুক্ত হয়ে। তাঁর নাম বারফন্দজ।

ঠাকুরবর সাহেবের নামে দু'একজন গ্রামবাসী গান রচনা করে গ্রামের আসরে গেয়ে বেড়াতেন। তেমন একজন গায়কের বাড়ী ছিল গোবরা নামক গ্রামে। তাঁর নাম চাঁদ মিঞা। নারিকেল বেড়িয়ার আব্দুল মালেকও অনুরূপ গায়ক ছিলেন। সে সব গানের পূর্ণ হদিশ এখন দুপ্রাপ্য। গানের দু'একটি পংক্তি এইরূপ :—

ক) নিষেধ করি তোরে হরি
যাস্‌নে তুই দরগা বাড়ী।

খ) ধরার বৌ অন্তঃপতি গায় কত গীত।
বাড়ীর বার হয়ে দেখে ধরা পাটুনী চিং

গ) `কি করিব কোথা যাব রে—
মোর ভগিনী সুভদ্রাকে
হায় দিতে হল তোমারে। ইত্যাদি—

ঠাকুরবর সাহেবের কথা কুশদহ পত্রিকা, কুশদহের ইতিহাস : হাসিরাশি দেবী, খাটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী : বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় (১৩২৩) আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থখানির নাম "শাহ্ ঠাকুরবর", রচয়িতা "নছিমদ্দিন।" রচনাকাল ১৩১০ বঙ্গাব্দ। শাহ্ ঠাকুরবর আমাদের আলোচ্য ঠাকুরবর সাহেব কি না নির্ণীত হয়নি।

ঠাকুরবর সাহেবের অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপকে কেন্দ্র করে কয়েকটি লোক-কথা প্রচলিত আছে। তাদের কয়েকটি এইরূপ :—

১। অশ্বের প্রণাম

চারঘাট অঞ্চলের সুবিখ্যাত সমাজনেতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। দূর দূর গ্রামেও বিচার-সালিশীতে তাঁদের আসতে হত। তাঁদের দুটি বলশালী অশ্ব ছিল। অশ্ব দুটি দরগাহ-সংলগ্ন এলাকায়

প্রবেশের আগে হাটু ভেঙে নত হয়ে পীরের প্রতি প্রণাম জানাত। কোন একবার খেয়াল-বশতঃ প্রমথবাবু ও পঞ্চাননবাবু একটা সালিশীর ব্যাপারে ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহে আসবার পূর্ব্বে নিজ নিজ অশ্ব বিনিময় করেন এবং সওয়ার হয়ে আসেন। প্রমথবাবুর অশ্বটি পঞ্চানন বাবুর কাছে খুব দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। সে দরগাহ এলাকায় প্রণাম বা সালাম না জানিয়ে প্রবেশ করে এবং সেখানকার বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই বটগাছের একটি প্রকাণ্ড ডাল ভেঙে পড়ে সেই অশ্বের পৃষ্ঠে। অশ্বটি যন্ত্রনায় আর্তনাদ করে ওঠে।

এর পর সেই অশ্ব নাকি কোন দিন দরগাহে এসে ঠাকুরবর সাহেবের প্রতি পূর্ববৎ সালাম না জানিয়ে সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে নি।

২। গজারোহীর পদব্রজে গমন

গোবরডাঙ্গার জমিদার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। তিনি শিকারী সেজো বাবু নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। হাতীর পিঠে চড়েই তিনি যাতায়াত করতেন। ঠাকুরবর সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তিনি চারঘাটে আসতেন বটে কিন্তু যমুনার ধারে তিনি হাতীকে রেখে বাকী দীর্ঘ পথ পদব্রজেই গমন করতেন। ঠাকুরবর সাহেবকে তিনি যে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন এ থেকেই তা বোঝা যায়।

৩। ফুরফুরার পীর প্রসঙ্গ

ফুরফুরার দাদাপীর হজরত আবু বকর সিদ্দিকী এতদ্ অঞ্চলে সর্বাধিক সম্মানিত পীর ব.ল উনবিংশ শতাব্দীতে বহু লোকের নিকট গৃহীত সত্য। তিনি খুব কম বারই বসিরহাট তথা চারঘাট অঞ্চলে এসেছেন। কিন্তু যখনই এ অঞ্চলে আসতেন, তিনি তখনই একবার অবশ্য চারঘাটে পীর ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহে জিয়ারত করে যেতেন। সেই সময়ে তিনি ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহের সেবায়েতগণের সঙ্গে সাক্ষাত করে দীর্ঘক্ষণ বসে ধর্মালোচনা করতেন।

৪। ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহে ধর্ণা দিয়ে রোগমুক্তি

জনৈক ওড়িশা-বাসী একবার এ অঞ্চলে কর্মোপলক্ষ্যে এসে "শূল বেদনা" নামক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। ডাক্তার, বৈদ্য প্রভৃতির নিকট

ঔষধপত্রাদি নিয়েও কোন সুফল না হওযায তিনি আত্মহত্যায় উদ্যত হন। ঘটনা জান্‌তে পেরে ঠাকুববব সাহেবের জনৈক ভক্ত তাঁকে পীরের দরগাহের পবিত্র মাটি ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন। পরামর্শ মোতাবেক ঐ ব্যক্তি প্রত্যহ দরগাহেব মাটি গাযে মাখ্‌তে এবং সামান্য পরিমাণে খেতে আরম্ভ করেন। বেশ কিছুদিন মাটি ব্যবহাব কবে কোন সুফল না পেযে তিনি দারুণ ভাবে বিক্ষুব্ধ হযে ওঠেন এবং একবাব দরগাহে পদাঘাত কবেন। পরদিন থেকে তাঁর শূল-বেদনা আরো তীব্র আকাব ধারণ করল। লোকে বল্‌ল যে তাঁর ভক্তিতে নিশ্চয় খাদ আছে। লোকটি ব্যথিত হযে পবে ব্যাকুলভাবে পীরের দরগাহে ধর্ণা দিলেন এবং অল্প দিনেব মধ্যে তিনি সম্পূর্ণরূপে বোগ-মুক্ত হলেন।

রোগ-মুক্ত হওযার পব ওডিশাব সেই ব্যক্তি তাঁর জীবনের সেই আশ্চর্য্য ঘটনার কথা আত্মতৃপ্তি সহকারে গ্রামে গ্রামে বলে বেড়াতেন।

৫। বকনা গরুর দুধ

রাখাল হরি গুডি একবাব ফকিব ঠাকুববকে তাদেব চড়ুই-ভাতিতে আমন্ত্রণ জানালো। হরিকে ফকিব সাহেব গরুব দুধ দিযে ক্ষীব ভোগ কবৃতে বল্‌লেন। পালে একটি মাত্র দুধলো গাভী ছিল। তাব দুধ অল্প দেখে ফকির সাহেব, হবিকে বল্‌লেন বকনা গরুকে দোহন কবতে। শুনে তো সকল রাখাল বালক অবাক্। ইতঃস্তত কবৃতে কবৃতে তাবা বকনা দোহন কবে সত্য সত্যই দুধ পেল। সেই দুধ দিযে তাবা ক্ষীরভোগ বা শিরনি তৈবী করল।

চড়ুইভাতিতে নিমন্ত্রিতগণ একে একে এসে জমা হল। তাদের সংখ্যা যে অনেক। শিরনিতে সংকুলান হওয়া অসম্ভব। ঠাকুববর সাহেব সব অবগত হয়েও রাখালগণকে সেই শিরনি ভাগ কবে দিতে বল্‌লেন। তাই কবা হল। দেখা গেল শিরনি পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত কোন ভক্তই অতৃপ্ত নেই।

৬। মান কাটার খাল

যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে যদি চারঘাট অঞ্চলের উপব দিযে যাতায়াত কবতেন তবে তিনি অবশ্যই একবার ঠাকুরবর সাহেবের সহিত সাক্ষাত কবে শ্রদ্ধা নিবেদন কবে যেতেন। মহারাজ এ অঞ্চলে অধিকাংশ সময়ে নদী পথেই যাতাযাত করতেন। ইচ্ছামতী নদী

বেয়ে নৌকা যে পথে ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহের ঘাটে আসত, সেই পথে ফিরে যেতে অনেক সময় লাগত। তাই মহারাজ প্রতাপাদিত্য পথের দূরত্ব কমাবার জন্য চারঘাটের দরগাহ থেকে দক্ষিণ দিকে ইচ্ছামতীকে সংযুক্ত করে একটি খাল কাটিয়ে নিয়েছিলেন। চারঘাট থেকে বাদুড়িয়ার নিকটবর্ত্তী কাঁকড়াস্মৃতি গ্রাম পর্য্যন্ত খালটি মহারাজের আদেশে মাত্র একমাসে কাটা হয়েছিল বলে এই খালটিকে মাস-কাটার খাল বলে।

৭। মুসলমানহীন গ্রাম

ব্রাহ্মণ নগর থেকে সাতক্ষীরার পথে লাব্‌সা নামক গ্রামে কামদেব রায় ওরফে ঠাকুরবর সাহেবের ভগিনী চম্পাবতী আত্মহত্যা করেছিল বলে অনেকের মত। এই আত্মহত্যার মূলেও নাকি ছিল ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর বীতশ্রদ্ধা। ঠাকুরবর সাহেবও বিক্ষুব্ধ হয়ে বুড়ন পরগণার মধ্য দিয়ে চারঘাটের দিকে আসছিলেন। গাবর্ডা-কৈজুড়ী নামক গ্রামে এসে তাঁর দারুণ পিপাসা পায়। এক গৃহস্থের বাড়ী গিয়ে তিনি 'পানি' প্রার্থনা করেন। গৃহস্থ জানান যে তাঁরা তো মুসলমান নন। ঠাকুরবর সাহেব উক্ত গ্রাম দুটিতে কোন মুসলমান বসতি নেই জেনে নাকি আবেগভরে বলেছিলেন যে কোন মুসলমান যেন ঐ গ্রামে বসতি না করে।

আজিও পর্য্যন্ত (১৯৫০) উক্ত গ্রামদ্বয়ের কোন বাসিন্দা মুসলমান নন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তিতুমীর

তিতুমীর নামে যিনি জনসাধারণের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ তাঁর মূল নাম সৈয়দ নিসার আলি। তিনি ভারত-বিখ্যাত পীর হজরত শাহ্ জালাল এয়মনির অন্যতম সুযোগ্য শিষ্য পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজীর একত্রিংশ অধঃস্তন পুরুষ।

তিতুমীর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে বসিহাট মহকুমার বদুড়িয়া থানাধীন হায়দারপুর নামক গ্রামে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁকে লোকে তিতুমীর বলে কেন? বাল্যকালে তিনি প্রায়ই ঘুষঘুষে জ্বরে ভুগতেন। রোগমুক্ত হওয়ার জন্য তাঁকে প্রায়ই শিউলী পাতা বা অন্যান্য অনুরূপ তিতা পাতার রস খেতে হত। তিনি তিতা পাতা খেতে তেমন আপত্তি করতেন না বলে জয়নাব খাতুন আদর ক.র দৌহিত্রকে তিতা মিঞা বলে ডাকতেন। পরবর্ত্তীকালে মীর তিতা মিঞা "তিতুমীর" নামে অভিহিত হন।

কিশোর বয়সে কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকায় তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল। শরীর চর্চার সাথে তিনি মল্লযুদ্ধ, লাঠি-সড়কি চালনা এবং অন্যান্য ক্রীড়ায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তৎকালে দেশে চোর ডাকাতের উৎপাত ছিল, ছিল জমিদারের ভাড়াটে লোকের অত্যাচার। তাদের অত্যাচারী-হাত থেকে জনসাধারণের রক্ষা করার সংকল্প তিনি মনে মনে গ্রহণ করেছিলেন।

নদীয়ায় কোন এক জমিদারের অধীনে চাকুরীরত থাকাকালে অন্য এক জমিদারের বিপক্ষে দাঙ্গা করে তিনি অভিযুক্ত হন। তাতে তাঁর কারাদণ্ড হয়। কারাবাসের শেষে তিনি মুক্তি পেয়ে বেদনাহত মন নিয়ে মক্কা শরীফে গমন করেন। সেখানে হজরত শাহ্ সৈয়দ আহ্মদ ব্রেলভীর সাহচর্যে এসে মানসিক-স্থৈর্য্য পান এবং ওয়াহাবী ধর্মাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

কিছুদিন পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ওয়াহাবী আদর্শ প্রচারে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন।

হিন্দু বা বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিমগণের আচার-ব্যবহারাদি তৎকালে ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী ছিল না। তা দূর করার জন্য ওয়াহাবীগণ প্রথমে ধর্মান্দোলন আরম্ভ করেন।

বঙ্গদেশে তখন জমিদার ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের তাণ্ডব চল্‌ছে। তাতে কৃষক সমাজের জীবন হয়ে উঠেছে অতিষ্ঠ। এইসব কৃষকগণের অধিকাংশই মুসলিম। জমিদার ও ইংরেজ সাহেবগণের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকগণ ন্যায় ও সত্যের জন্য তাঁদের পাশে দাঁড়াবার লোকের অভাব অনুভব করছিলেন। সেই সমূহ বিপদের দিনে অত্যাচারিত মুসলিমগণের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করা ধর্মান্দোলনকারীগণের নিকট অবশ্য কর্তব্যরূপে দেখা দিল। এতে শুধু মুসলিম নয় হিন্দু কৃষকগণও নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে এসে এই আন্দোলনের সংগে সংযুক্ত হলেন। এইসব হিন্দু ছিলেন বিশেষভাবে নিম্নবর্গীয় ; সামাজিকভাবেও উচ্চবর্গীয় উচ্চহিন্দুগণের অবজ্ঞা তথা ঘৃণাপূর্ণ নির্যাতনের কারণে তাঁরা বিক্ষুব্ধ হয়েই ছিলেন।

তিতুমীর নিজেও ছিলেন কৃষকের সন্তান। স্বাভাবিকভাবে সহজেই তিনি কৃষককুলের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত হলেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন ধর্মান্দোলন তাই এক ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে পরিণত হল।

সেকালে নীল চাষ খুব লাভজনক ব্যবসায় ছিল। এতদ্ অঞ্চলে যাতে ব্যাপকভাবে নীল চাষ হয় তার জন্য নীলকর সাহেবগণও খুবই তৎপর ছিল। এ ব্যাপারে স্থানীয় জমিদারগণই ছিল তাদের প্রধান সহায়-সম্বল। বিশেষতঃ কৃষকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নীলচাষকে আরো লাভজনক করার জন্য নীলকরগণ ছিল উদ্‌গ্রীব। স্থানীয় জমিদারগণও ইংরেজের তাঁবেদারী করে নিজেদের ভাগ্যপ্রসন্ন করার সুযোগ গ্রহণ করতে চাইল। তাই সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত বিক্ষোভকে দমন করার জন্য জমিদারগণ নানাভাবে কৃষকগণের উপর অত্যাচার করতে লাগল। এমন কি পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় মুসলিমগণের "দাড়ির" উপর কর ধার্য্য করলেন। এবার তিতুমীর কৃষকগণের উপর ঐ অত্যাচারের প্রতিবাদ করলেন। গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায় প্রমুখ কৃষ্ণদেবের সহায়তা করে তিতুমীরের বিরুদ্ধাচরণ করলেন। তিতুমীর এবার সহজেই

বুঝলেন যে, ইংরেজের রাজশক্তিই এই সব জমিদারগণের যথেষ্ঠ অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে; অতএব ইংরেজ বিতাড়নই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ফলে কৃষক আন্দোলন, ইংরেজ বিতাড়ন আন্দোলনে পর্য্যবসিত হল। তাই তাঁর সংকল্প হল :—

১। ইংরেজকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে।
২। দেশে স্বাধীন ও সার্বভৌম সরকার গঠন করতে হবে।
৩। ইংরেজের সাকরেদ জমিদারকে দমন করে কৃষকসমাজকে শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে হবে। ইত্যাদি।

তিতুমীর পরিচালিত ওয়াহাবী আন্দোলনকে কেউ কেউ ধর্মসংস্কার ও সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নিম্নলিখিত বক্তব্য কয়টি থেকেও তা প্রমাণিত হতে পারে :—

১। হাণ্টার সাহেব তাঁর "ভারতের মুসলমান" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেছেন,—"কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন বা যে কোন বিত্তশালী ব্যক্তির পক্ষেই ওয়াহাবীদের উপস্থিতি একটা স্থায়ী ভীতির কারণ।...... অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ওয়াহাবী বিদ্রোহ কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাতে নিম্নবর্গের হিন্দুগণও অংশ গ্রহণ করেছিল।"

২। "ভারতে আধুনিক ইসলাম" গ্রন্থে ক্যাণ্টোয়েল স্মিথ লিখেছেন,—
—"...ওয়াহাবী বিদ্রোহ ছিল পূর্ণমাত্রায় শ্রেণী সংগ্রাম। ইহা হতে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়েছিল। শিল্প বিকাশের পূর্বযুগে শ্রেণীসংগ্রাম যেভাবে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় ধ্বনি গ্রহণ করেছিল, সেইভাবে এই শ্রেণীসংগ্রামেও ধর্মীয় ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে;—কিন্তু সেই ধ্বনি ধর্মীয় হলেও সাম্প্রদায়িক ছিল না।"

৩। "শহীদ তিতুমীর" গ্রন্থে আবদুল গফুর সিদ্দিকী লিখেছেন, "তিতুমীর অন্য মতাবলম্বী মুসলমানদেরও বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তাদের অনেক মসজিদও পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবার এও জানা যায় যে, ভূষণার জমিদার মনোহর রায়, তিতুর দলভুক্ত ছিলেন এবং তিতুকে বহুপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন।"

৪। ইংরেজের পরম ভক্ত ও তিতুমীরের প্রথম বাঙালী জীবনীকার বিহারীলাল সরকার প্রায় শত বৎসর পূর্বে ইংরেজ আমলের স্বর্ণযুগে তাঁর "তিতুমীর ও নারিকেলবেড়িয়ার লড়াই" গ্রন্থে লিখেছেন,—"তিতুমীর এই সকল অঞ্চলের বিভিন্ন জমিদারীর অধীনস্থ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাগণকে জমিদারের খাজনা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ পেয়ে অধিকাংশ প্রজা খাজনা বন্ধ করে দেয়।......ক্রমে ক্রমে কয়েকখানি গ্রামের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের চাষীগণ তিতুকে স্বাধীন বাদশাহ বলে স্বীকাব করল।"

ভারতের বৃটিশ শাসকের বিতাড়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তিতুমীর ছিলেন অগ্রগণ্য শহীদ। অধ্যাপক শান্তিময় রায় লিখেছেন,—"তিতুমীর সংগ্রামরত অবস্থায় বীরের মত মৃত্যু বরণ করে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ হবার সম্মান লাভ করেন। ......এই বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া ভুল। যারা দিতে চান তারা সত্যের উপাসক নয়। কোন বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যই তারা এই মুসলিম দেশ-প্রেমিকদের কাহিনীগুলিতে সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক কালিমা লেপন করেছেন।"

—তিতুমীর।

সুফী আদর্শের ন্যায় লৌকিক ইসলামের আদর্শ অনুসারী তিতুমীর বর্তমানে পীরের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। ডঃ এনামুল হক লিখেছেন,—"শহীদ তিতুমীর ওয়াহাবী আদর্শপন্থী,—সুফী মতবাদী নন। তবু তাঁর আদর্শ ছিল যেন সুফী আদর্শের ন্যায় লৌকিক ইসলামের আদর্শ।"৩৫ বস্তুতঃ তিতুমীরের বহু ভক্ত তাঁকে সুফী পীর ফকিরের ন্যায় শ্রদ্ধা করেন। দুইশত বছর অতীত হল, যশোহর, খুলনা, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলের জনসাধারণ তাঁর ঐতিহাসিক মৃত্যুর জন্য গৌরব বোধ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংহতি সমিতির উদ্যোগে ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে তিতুমীরের দ্বিশতবর্ষ জন্মবার্ষিকা স্মরণে নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে শহীদস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীপ্রভাত কুমার পাল যে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেছিলেন তা এইরূপ,—

তিতুমীর প্রশস্তি

তুমি বীর বিপ্লবী বীর সালাম লহ সালাম
নিপীড়িত কৃষকের কাছে বীর তিতুমীর একটি নাম।
জমিদার জোতদার ইংরাজ বেনিয়া
বুভুক্ষু কৃষকে মেরেছিল দলিয়া
বলেছিলে তুমি সহিও না আর এ অত্যাচার অবিরাম ॥
লড়ে যাই ধরি, ভাই হাতিয়ার সকলে
অধিকার আপনার কেড়ে আনো দখলে
রক্তলোলুপ শ্বাপদে নাশিতে কর আপোষহীন সংগ্রাম ॥
কৃষকের সরকার করেছিলে গঠন
ছিল নাকো জুলুম অবসান শোষণ,
মুক্তি আনন্দে করে ঝলমল এই এলাকার প্রতি গ্রাম ॥
তব ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে স্বাধিকার রক্ষায়
সহস্র জান কোরবান নারিকেলবেড়িয়ায়
মুক্তিপথের তুমি যে শহীদ লহ মোর ছোট্ট সালাম ॥

মহম্মদ মুজিম বিশ্বাস প্রমুখ সেবায়েতগণ তিতুমীরের স্মৃতি-বিজড়িত মসজিদে ধূপ-বাতি প্রদান করেন। প্রতি বৎসর বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত সলুয়া নামক গ্রাম থেকে মহরমের সময় এক তাজিয়া বের হয় এবং তা নারিকেলবেড়িয়ায় তিতুমীরের স্মৃতিস্থলে শোভাযাত্রা-সহকারে আসে। পথিমধ্যে ঘোষপুর, চণ্ডীপুর, বুরুজ প্রভৃতি গ্রামের হিন্দু-মুসলিমগণ অনুরোধ করে সেই শোভাযাত্রাকারীগণের সাময়িক গতিরোধ করেন এবং ভক্তিসহকারে 'মাতম' অনুষ্ঠান প্রদর্শন ও ভক্তি-অর্ঘ নিবেদন করেন। প্রতি বৎসর তিতুমীরের জন্মভূমি হায়দরপুরেও মহরমের সময় বিরাট উৎসব হয়; তাতে প্রায় আট-দশ হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। দশদিন ধরে সে উৎসব চলে এবং শেষ দিনে সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়।

শহীদ তিতুমীর সম্পর্কে বাংলা ভাষায় যে সব পুস্তকে বিভিন্ন অভিমত লিখিত হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম এইরূপ :—

১। ভারতের ইতিহাস : থর্ণটন
২। মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশ চন্দ্র বাগল
৩। খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী : বিহারীলাল চক্রবর্তী

৪। তিতুমীর : অধ্যাপক শান্তিময় রায়

৫। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম : সুপ্রকাশ রায়

৬। বাঁশের কেল্লা : শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

৭। তিতুমীর : শ্রীশ্যামাকান্ত দাস। ইত্যাদি।

তিতুমীরকে নিয়ে কিছু স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থ বা পুথি রচিত হয়েছে। তাদের মধ্যকার কয়েকখানির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে লিপিবদ্ধ করা হ'ল :—

১। শহীদ তিতুমীর

শহীদ তিতুমীর নামক গ্রন্থের রচয়িতা আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব। চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত খাসপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পীর গোরাচাঁদ তথা শহীদ তিতুমীরের বংশের সহিত তাঁর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাঁর পরিচয় "বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী" নামক গ্রন্থ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে।

ছিয়াশি পৃষ্ঠায় লিখিত এই গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য। বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্য তার মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে। অধিকাংশই ঐতিহাসিক তথ্য-বহুল এবং জীবনী গ্রন্থ বলে চিহ্নিত হলেও তিতুমীরের অসমসাহসিক কার্য্যাবলীর বিবরণ পাঠকচিত্তকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে রাখে। যে সমস্ত অপ্রকাশিত পত্রাবলী এতে স্থান পেয়েছে তার মূল্য অপরিসীম। গ্রন্থখানি বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তাদের প্রথম প্রকাশকাল ১৩৫০ বঙ্গাব্দ। কলিকাতাস্থ ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগারে ঐ পুস্তকের এক কপি রক্ষিত হয়েছে। পুস্তকের নং বি ৯২২'৯৭—টি ৬৯৫ এস।

২। বাঁশের কেল্লা

"বাঁশের কেল্লা" একখানি নাটক। নাট্যকারের নাম শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। নাগরদোলা, লাল রাজপথ, রিক্তা নদীর বাঁধের পর, রক্তমাখা প্রভাত, রাজবন্দী প্রভৃতি নাটক রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন।

নাটকখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৮। এটি পঞ্চম অংক বিশিষ্ট এবং পঞ্চদশাধিক পুরুষ চরিত্র ও চতুর্থাধিক নারী চরিত্র সমন্বিত। নাটকটির গীত সংখ্যা ৯। এর মধ্যে একখানি গান রচনা করেছেন শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য—একথা গ্রন্থকার

উল্লেখ করেছেন। নাটকখানি উৎসর্গ করা হয়েছে প্রসিদ্ধ অভিনেতা ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের নামে।

সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

ইংরেজের অত্যাচার হায়দরপুর অঞ্চলের চাষীদের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে। খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহও দেখা দিয়েছে। চাষী সদানন্দের পুত্র রতন গুলীর আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে।

ইংরেজের পক্ষে কর্ণেল সুবেদার সিং কৃষক বিদ্রোহের নেতা তিতুমীরকে বন্দী করার চিন্তায় উদ্বিগ্ন। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় যে কোন মূল্যে তাঁর জমিদারী রক্ষায় ব্যগ্র। জমিদারের কর্মচারী হীরালাল যে কোন উপায়ে কালীপ্রসন্ন বাবুর জমিদারীটা কেড়ে নেবার মতলব করছে। ব্যবসায়ী দীনবন্ধু হাতী মুনাফা লুটবার ধান্ধায় তৎপর। মিস্কিন ফকির এদেশে ইসলামী-স্থান গড়ে তার বাদশাহ হবার আশায় আশান্বিত।

ষড়যন্ত্র করে কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও তিতুমীরের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা হল। জমিদারের ভাগনে অনাদি দেশমাতৃকার মুক্তির পণ নিয়ে সংগ্রামী নেতা তিতুমীরের পাশে এসে দাঁড়ালো। হিন্দুর সঙ্গে মিতালিতে মিস্কিন ফকিরের স্বার্থসিদ্ধ হবার নয়, তিতুমীরের মৃত্যুতেই তার লাভ। তাই সে কৌশলে তিতুমীরের পুত্রকে পাঠালো সুবেদার সিং-এর কবলে। অপরদিকে সুবেদার-পত্নী মহীয়সী ডলি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ধরা দিলেন তিতুমীরের নিকট। এই ঘটনায় সুবেদার সিং বিভ্রান্ত হল;—তিতুমীরকে ভুল বুঝল। প্রতিশোধের বদলায় তিতুমীরের পুত্র বাদশার প্রাণ গেল গুলীর আঘাতে। তিতুমীরের মহত্ত্বে বেঁচে রইল ডলি। তিতুমীরের ভগিনী পিয়ারা দেশপ্রেমিকা। অন্যদিকে সে ভালবেসে বিবাহে পর্য্যন্ত সম্মত। পিয়ারা ভালবাসে অনাদিকে। রুস্তম ভালবাসে পিয়ারাকে। অনাদিও ভালবাসে পিয়ারাকে। রুস্তমের আশায় বাদ না সেধে অনাদি স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করলেও শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজের বিচারে রুস্তমের হয়ে গেল ফাঁসি। তিতুমীর নারিকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা করে শেষ লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হলেন। কালীপ্রসন্ন প্রমুখ এগিয়ে গেলেন ইংরেজের সহযোগিতায়। ক্রমান্বয়ে ধরা পড়ল হীরালাল, দীনবন্ধু হাতী প্রমুখের শয়তানী। গুলীর আঘাতে প্রাণ গেল অনাদির, বল্লমের আঘাতে প্রাণ গেল মিস্কিনের, গুলীর আঘাতে মরল সুবেদার সিং, তিতুমীরেরও বুকে লাগল গুলীর আঘাত। কালীপ্রসন্ন নিজের ভুল বুঝে

তিতুমীরের কাছে এসে পড়লেন, তখন তিতুমীরের মৃত্যু উপস্থিত। শেষবারের মত তিনি বললেন, বিদেশী দুষমনদের হাত থেকে গরীব-দুঃখী দেশবাসীকে বাঁচাতে, দেশের স্বাধীনতা আনতে গাঁয়ে গাঁয়ে তারা যেন গড়ে তোলে এই তিতুমীরের "বাঁশের কেল্লা।"

বাঁশের কেল্লা নাটকে তিতুমীরের মূল বিরোধী চরিত্র পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায় অনুপস্থিত।

কিছু ঐতিহাসিক পুরুষ ও কিছু কল্পিত ব্যক্তিকে নিয়ে রচিত এই নাটক। যতদূর জানা যায়, বাদশা বলে কোন পুত্র বা পিয়ারা বলে কোন ভগিনী তিতুমীরের ছিল না। তাছাড়া ফুলজান বিবি নামে 'ভাবী' ছিল না তিতুমীরের, তিতুমীরই তাঁর ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ।

রুস্তম-পিয়ারা, অনাদি-পিয়ারা, সুবেদার-ডলির প্রণয়, এই নাট্যকাহিনীর অনেকখানি স্থান অধিকার করেছে। এতে জমিদার ও কৃষকের মধ্যকার সম্পর্কের বাস্তব রূপ ফুটে ওঠেনি, জমিদারের প্রতি নাট্যকারের পক্ষপাতিত্ব অনুভূত হয় অথবা তিনি এটাকে ঠিক ঐতিহাসিক নাটক করেন নি।

বৃদ্ধ বিশু, তিতুমীরের পুত্র বাদ্শার শিশুবেলা থেকে সাথী। সে হিন্দু বা মুসলিম নয়, সে বাঙালী। এই স্বজাতিত্ব বোধ তার মনে অঙ্কুরিত হয়েছে। তাই সে গেয়েছে,—

বাঙলা আমার সোনার মাটি বাঙলা মোর ভাই।
মায়ের গেহে ভাই-এর স্নেহে কতই সুধা পাই॥
কোরাণে আর পুরানেতে,
রাম-রহিমে এক সুরেতে,
মায়ের দুঃখে বুক ভাসাতে কোথাও দেখি নাই॥

হিন্দু-মুসলিমের মিলনের ভাবপ্রকাশক নাটকখানি এদেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করে। তিতুমীরকে বিরোধী পক্ষীয়গণ বিশেষতঃ জমিদাররা তাঁকে ডাকাত বলে অভিহিত করলেও তাঁর দেশ হিতৈষণা অপ্রকাশিত থাকে নি। তিতুমীরের ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না, ছিল প্রশস্ত হৃদয়। দেশের মুক্তির জন্য নিদারুণ পুত্রশোকও তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। তিনি আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামীর দৃষ্টান্তস্বরূপ মৃত্যুবরণ করেছেন।

৩। তিতুমীরের গান ঃ

তিতুমীরের নামে রচিত একখানি গানের পুঁথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

পুথিখানি রামচন্দ্রপুর গ্রামের মোহম্মদ সহরালি সাহেবের বাড়ী থেকে উদ্ধার করেছেন বলে উক্ত রামচন্দ্রপুর গ্রাম, থানা বাদুড়িয়া, জেলা চব্বিশ পরগণা নিবাসী শ্রীপ্রভাত কুমার পাল মহাশয় আমাকে বলেছেন। পুথিখানি শ্রীপালের কাছেই আছে। সংকলন আমার।

তিতুমীরের গান-রচয়িতার নাম সাজন (গাজী)। সাজন গাজী ছিলেন তিতুমীরের সহযোদ্ধা। গানগুলি প্রথমে লিপিবদ্ধ ছিল না, লোকের মুখে মুখেই ফিরত। সাজন গাজী যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বন্দী হন এবং জেলখানায় নিক্ষিপ্ত হন। সাত বছরের মেয়াদে তাঁর জেল খাটতে হয়। জেলে থাকাকালে এই গান তিনি রচনা করেন। গানের মধ্যে সাজন গাজীর নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায় ঃ—

মোরসেদের বাহুর তলে
নাচার সাজন বলে
ফজল কর আজিজেলগপফুল।
নামনি হালদারের গাতি
মেসে সোমপুর বসতি
জমা রাখি পাশ আউসে সোমপুর॥
বড ভাই-এর নাম মাজম্
ছোট পাতলা মেজ সাজন
ছোট ভাই গিয়েছে মরে।
সাজন বড় গোনাগার
সাত বছর মেয়াদ তার
কয়েদ হল দিনের লড়াই করে॥

সাজন গাজীর বসতি যে গ্রামকে 'মেসে' বলে উল্লেখ করা হয়েছে বর্তমানে তা মেসিয়া নামে পরিচিত। গ্রামটি ইছামতী নদীর একেবারে পশ্চিম তীর সংলগ্ন। ইহা বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত। জানা যায় যে তখনকার দিনে এতদ্ অঞ্চলে নানারকম গান লোকের মুখে মুখে ফিরত, লিখে রাখার প্রবণতা সাধরণ কৃষকের মধ্যে ছিল না। সাজন গাজীর গাওয়া এই গান বা 'সায়রি' কাঁকড়াসুতি গ্রাম নিবাসী পরাণ মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি শিখে নেন। পরাণ মণ্ডলের নিকট থেকে শিখে নেন রামচন্দ্রপুর গ্রাম নিবাসী সহরআলি মণ্ডল। সহরআলি মণ্ডলের বর্তমান বয়স (১৯৪৪) প্রায় নব্বই বছর। তিনি তাঁর ২০।২২ বছর বয়সকালে মুখে মুখে ফেরা গান লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

পুথিখানির নাম-পৃষ্ঠা বলে কিছু নেই। মাঝারি মোটা সাদা কাগজে নীল কালি দিয়ে লেখা। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ৫০।৬০ বছর আগে নীলের যে বড়ি কালি মুদির দোকানে পাওয়া যেত সেই কালিতে লেখা। কোথাও গাঢ় নীল, কোথাও হালকা নীল। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা। পুথির আকৃতি ১১½"×৯"। তার কোন কোন প্রান্ত পোকায় খেয়েছে। উত্তর পশ্চিম কোণে জল পড়ে বহু লেখা মুছে গেছে। পুথির প্রথম দিকে দু'এক জায়গায় বাজারের সংক্ষিপ্ত হিসাব লেখা আছে। প্রথম দিকের লেখা দেখে বোঝা যায় যে সেটি পুথির মুখবন্ধ। প্রথম পংক্তি দেখে বোঝা যায় যে তার আগের পংক্তি ছিল। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ১৩½। শেষ দিক অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিত। প্রথম থেকে কয়েকটি পংক্তির নমুনা ঃ—

রোজা নামাজ বন্দেগীর মূল।
মোরসেদের জবানে শোনা
না থাকিবে পাপ গোনা
ছেদেক দেলে কর দিন কবুল ॥

পয়ার ছন্দে এখানে সাজিয়ে দেওয়া হল ; কিন্তু মূলতঃ পুথিতে গদ্যাকারে একটানা লেখা আছে এবং প্রতি মিলের সাথে দুটী দাগ দেওয়া রয়েছে। এর মুখবন্ধের বা ভূমিকার পর কাহিনী আরম্ভ। পুথির প্রায় প্রতি পৃষ্ঠার উপরিভাগে লেখা আছে "শ্রীশ্রীএলাহি ভরসা।"

পুথির ভাষা এক রকম দুর্বোধ্য। একান্তভাবে স্থানীয় আঞ্চলিক মৌখিক ভাষার সঙ্গে আমি ও প্রভাতবাবু পরিচিত বলেই অনেক আয়াসে পুথির পাঠোদ্ধার করা এবং তার কিছু মর্মার্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। লেখক সহর আলি সাহেব যে নিতান্তই অল্প লেখা পড়া জানেন তা পুথির ভাষাদৃষ্টে সহজে অনুমান করা যায়। বহু এছলামী ভাবপ্রবণ চিন্তার প্রকাশে এতে বাংলা, আরবী প্রভৃতি শব্দের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। বানানে প্রচুর অশুদ্ধি আছে। ৺ চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার একেবারেই নেই। প্রায় সমগ্র পুথিখানি ত্রিপদী পয়ার ছন্দে রচিত। তবে চরণে সাজানো নেই,—একটানা লেখা একথা পূর্বেই বলেছি। একই শব্দ পর পর দুইবার ব্যবহারের পরিবর্তে ঐ শব্দের পাশে '২' লিখিত হয়েছে। স্থানীয় শব্দের কয়েকটি নমুনা ঃ—

যুতি	অর্থ	প্রকারে
গে	,,	গিয়ে

গামালি	,,	গ্রামাঞ্চল
জোনাষাত	,,	প্রতিজন
কেগোর	,,	কাকের
উব	,,	উপুড়
ধোমা	,,	ধোঁয়া ইত্যাদি।

বহু পদের শেষে 'ই'-কার আছে। যেমন,—পুরিচি, বন্দুকি, ইতাদি। কিছু কিছু ইংরেজী শব্দ বিকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যথা,—টোটা, ফয়ের, ছেপাই ইত্যাদি। ভাষার কিঞ্চিত নমুনা ঃ—

দৌড়ে এসে পূর্ব দিকে
তলোয়ার মারিল ফিকে
আশা করি রজিবুল্লার ছেরে।
তেরিজ দে মারিল গুড়ি
লায় লাহা কলমা পড়ি
কোপ ধরিল লাঠির উপরে॥

বাংলা বহু শব্দের বিকৃত উচ্চারণ আছে। তিতুমীরের ভাল নাম নিসার আলি। নিসার > মিসার > নেসার > মেসার > মেছের আলি অপভ্রংশে ব্যবহৃত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত কাহিনী

প্রাণপণ করে পুঁড়োর হাটখোলায় এসে দুইটি গরু জবাই করা হল। পরে সকলে নদীর ধার ধরে লাউঘাটির দিকে চল্‌ল।

লাউঘাটির সাকের সরদার তিন গরু কোরবানি করে সুষ্ঠুভাবে সকলের খানা-পিনা দিলেন। তারপর আবার আক্রমণ শুরু হল বজ্রের আওয়াজে। বিপক্ষ যোদ্ধার নাম হরিদেব (কৃষ্ণদেব ?) তার ডান হাতে তলোয়ার বাঁ হাতে ঢাল। রজিবুল্লার শিরে নিক্ষিপ্ত তলোয়ার, লাঠির আঘাতে আহত হল। লাঠির আঘাতে তার মাথায় বিরাট ক্ষত হল, পাঁজরার দুটো কাঠি ভেঙ্গে গেল,—তলোয়ার ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল দূরে। বহুলোক মারা পড়ল, বহু লোক দৌড়ে পালালো। জনৈক যোদ্ধা ব্রাহ্মণ পিপাসার পানি চাইলে, তার গালে গাবা গোস্ত দেওয়া হল। হরিদেবের পক্ষে লাব্‌সার রক্ষী বাহিনী এল। গোলাম মাছুমের হুকুমে তার ঘোড়া কেড়ে নেওয়া হল। সৈন্যগণ এবার ফিরে

এল সাড়াপোলে, সেখান থেকে বারঘরে হয়ে নারকেলবেড়েয় এসে জমা হল। আশ-পাশ থেকে ব্রাহ্মণদের ধরে এনে মাথা মুড়িয়ে দাড়ি রেখে দেওয়া হল। ব্রাহ্মণ বাড়ী এলে ব্রাহ্মণী অনেক তামাসা করে বল্‌ল,—(তারা) নামায পড়ে। তাতে তোমাদের কি ক্ষতি? কেন কর্‌লে দাড়ির জরিমানা? লক্ষ্মীছাড়া কৃষ্ণদেব পুড়োয় করল পীরের কারখানা। কার কাছ থেকে দুর্ব্বুদ্ধি পেয়ে ঝগড়া বাধিয়ে কৃষ্ণদেব গিয়ে বিবরণ জানাল কালীবাবুকে।

কালীবাবু সরাওয়ালা (ধর্মযোদ্ধা স্থানীয়) সকলকে দমন করার জন্য আলেকজাণ্ডার সাহেবকে হাজার টাকা নজরানা দিয়ে সিপাহী পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। থানায় থানায় রিপোর্ট গেল। বেলে অর্থাৎ বসিরহাটের দারোগাকে খবর দেওয়া হল। বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে বন্দুকধারীগণ প্রস্তুত হল। আক্কেল মোল্লা এসে খবর দিল নারকেলবেড়ের কেল্লায়। আলেকজাণ্ডার পুড়াঁর ঘাট পার হয়ে এল কাঁকড়াসুতি। কয়েত মণ্ডল ছুটে এসে সে খবর দিল। বহু ছেলেমেয়ে ঘর ছেড়ে পালালো। এদিকে গোলাম মাসুমের হুকুমে সকলে লাঠি নিয়ে প্রস্তুত হল। সিপাহীগণ গুলীর ভয় দেখিয়ে তিতুমীরের দলকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হতে বল্‌ল। কিন্তু ক্রুদ্ধ যোদ্ধাগণ কৃষ্ণদেবের উপর তীব্রভাবে ক্ষিপ্ত। তারা মৃত্যু পণ করেছে। ধর্মের শক্তিতে মোরসেদ বা নেতার হুকুম, তামিল করতে তারা প্রস্তুত। বন্দুককে তারা তুচ্ছ মনে করে। ইসলাম প্রচারক বিরাট ফকির (মেসের আলি) নিসার আলিকে মারবে এমন সাধ্য কার? তিনি যে মক্কার হাজি।

নিসার আলি দিনের যুদ্ধে জীবন দিয়েছেন। সকলে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে এগিয়ে গেল। সিপাহিগণ বন্দুক চালালো। যুদ্ধ করল গোলাপ। সে যুদ্ধ ঘোরতর। সে যুদ্ধ করল জামাত আলি জমাদারের সাথে। সে দৌড়ে গিয়ে পড়ল ভড়ভড়ে নামক জায়গায়। হানিফ দফাদারেরও সেই অবস্থা।

হতভাগ্য পয়েত মণ্ডল গেল সাহেবের সাথে। তিতুমীরের দল তাকে দিল বেদম প্রহার। কিন্তু সেই সাথে দারোগাকেও তারা ধরে ফেলল। দারোগা বলে,—আমার জাত মেরো না। আমি ব্রাহ্মণ আর তুমি সৈয়দ অর্থাৎ দুজনেই সমতুল।

হজরত হেসে বলে,—তোমার জাত ভাঙলে আর গড়ে না।

মঙ্গলবারের যুদ্ধে তিতুমীরের পক্ষের জয় হল। দরগ ভায়া দাগাবাজি করায় ময়জদ্দি খুব দুঃখিত। ষাট টাকার লোভে পেয়ার আলি বেইমানি করায় তার শাস্তি দেওয়া হল।

যুদ্ধে পরাজয়ের খবর শুনে কালীপ্রসন্নবাবু কৃষ্ণনগরে গিয়ে রাজ-দরবারে জানালেন যে, তিতুমীরের লোকেরা কায়েত-বামনকে ধরে মুসলমান করছে। বাংলায় জারি করছে আরবীয় মুসলমানী ভাবধারা। ময়জদি তাদের সমস্ত খরচ যোগান দিচ্ছে। পুড়োর কৃষ্ণদেব তাদের দাড়িপিছু আড়াই টাকা জরিমানা করায় সকলে ক্ষিপ্ত হয়েছে।

কৃষ্ণদেব খাজনা আদায় করতে লক্ষ্মীকান্ত পেয়াদাকে পাঠালেন। দায়েম ও মুন্নুকচাঁদ খাজনা দিতে রাজী হল না। ধাক্কাধাক্কি থেকে মারামারি আরম্ভ হল। দায়েম বন্দী হয়ে আনীত হল কৃষ্ণদেবের নিকট। কৃষ্ণদেব বললেন, মেরে জখম করে সবকে ধরে আন, সকলকে বারাসতে চালান করব।

দৌড়ে গিয়ে কৃষ্ণদেবের লোকেরা কাদেরের বাড়ী ঘেরাও করল। তখন সকাল। মোমিনগণ তখন নামায পড়ছে···[এরপর পুথি খণ্ডিত।]

উপরোক্ত কাহিনী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে পুড়াঁর জমিদার কৃষ্ণদেব রায় মুসলমান প্রজাগণের উপর দাড়ির জন্য মাথাপিছু আড়াই টাকা কর ধার্য্য করলে মুসলিমদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। স্বাভাবিকভাবে মুসলিমগণ ধর্মীয় আদর্শের কারণেই একতাবদ্ধভাবে এইরূপ কর বা খাজনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ধর্মীয় আদর্শের উপর হস্তক্ষেপ করে যে খাজনা আদায়ের জন্য অমানুষিক অত্যাচার করতে পারে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ব্যক্তি তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে এমন ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। জমিদারী সামন্ততান্ত্রিক শাসন ছিল এর মূল প্রেরণা। এক সাধারণ নাগরিকের নিম্নলিখিত উক্তি থেকে দেখা যায় ;—

নামাজ পড়ে দিবা-রাতি
কি তোমার করিল খেতি
কেনে কল্লে দাড়ির জরিপানা।
খেপেছে যতেক দেড়ে
কেষ্টদেবের লক্ষ্মি ছেড়ে
পুড়োয় কল্লে পীরির কারখানা॥

[লিপিপৃষ্ঠা ১০]

বৃটিশ রাজশক্তির সহায়তা নিয়ে মুসলমানগণকে দমন করার জন্য কৃষ্ণদেবের প্রচেষ্টা ছিল। স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা থাকলে নিশ্চয়

তিতুমীর ও তার দলবলকে দমন করতে বন্দুক-কামানের প্রয়োজন হত না। কৃষ্ণদেব স্থানীয় কিছু ভাড়াটে গুণ্ডার সাহায্যে তিতুমীরকে দমন করতে গিয়ে বারবার পরাস্ত হয়েছিলেন। এতদ্ অঞ্চলের মুসলিমগণের প্রায় সকলেই কৃষক। সুতরাং কৃষকদের ওপর সাম্প্রদায়িক কর বা খাজনা আদায়ের কৌশলে ইংরেজ ও তাদের সমস্বার্থবাদীরা যে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিল তার কুফল সম্বন্ধে হিন্দু-কৃষকগণ (যারা সাধারণ ভাবে নিম্ন-বর্গের) কিছু অনুমান করতে পেরে পূর্ণভাবে জমিদার কৃষ্ণদেবকে সহায়তা করে নি এবং তিতুমীরের সাহায্যকারী মুসলিম কৃষকদিগের বিরোধিতাও করে নি।

জমিদার কালীপ্রসন্ন কিভাবে কৃষ্ণনগরের মহারাজের নিকট বিবরণ দিচ্ছেন দেখা যাক ;—

হদরপুর ঘর তার নাম তিতুমীর।
মক্কা-মদিনায় গিয়ে হইল হাজির॥ ... ...
নামাজ রোজা শেখাইত রাখ্‌তে বলত দাড়ি।
দিনের তরিখ শেখায়ে ফেরে বাড়ি বাড়ি॥
পাপ-গোণা বদকাম তাও করে মানা।
বাংলায় জারি করে আরবের কারখানা॥ ... ...
না বুঝে যে কেষ্টদেব করিল বাহানা। ... ...
ফি দাড়ি আড়াই টাকা জরিপানা হয়।
সেইজন্য সরাঅওলা বড় খাপা হয়॥

[লিপি পৃঃ ২৮]

দরিদ্র ও নিপীড়িত কৃষকগণ যে আদর্শের ভিত্তিতে জীবন-পণে সামান্য লাঠি-নির্ভর করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এই গানে সেই ইসলামি আদর্শের কথাই বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। দেশের একপক্ষ যখন বৃটিশের আশ্রয় নিয়ে শুধু মুসলিম প্রজার খাজনা আদায়ের জন্য চরম অত্যাচারে নিরত তখন অপর পক্ষে বৃটিশ বিতাড়নের কথা উচ্চারণ করলে তার প্রতিক্রিয়া অমুসলিম জনসাধারণের মনে কিরূপ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

তিতুমীরের গান মূলতঃ আদর্শপরায়ণ যোদ্ধাগণের বীরত্ব গাথা। এ যুদ্ধ কাল্পনিক যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধের বর্ণনায় তাই নেই বজ্র, নেই মন্ত্রপূতঃবারি। সাধারণ মানুষের সংগ্রাম রাজশক্তির বিরুদ্ধে। তাই এ সংগ্রামে সাধারণ মানুষের নেই রথ, নেই সারথি। আছে শুধু ;—

গোলাম মাছুম হুকুম দিল লাঠি কেয়া সব হাতে নিল
ইট-পেটকেল ধরিল জোনাজাত ॥ [লিপি পৃঃ ১৭]
ফিরে আবার বন্দুক তাড়ে বাঘে যেমন…পড়ে
গুলী পুরতি নাহি দিল আর,।
গোলাপ গিয়ে মারে লাঠি লেগে গেল দাঁত কপাটি
পিছন্দে পালালে চৌকিদার ॥ [লিপি পৃঃ ২১]
চুল ধরে মারে ঝিকে তিন চার হাত পড়ে ফিকে
আছাড় মেরে চূর্ণ করে হাড় ॥ (লিপি পৃঃ ২২]

কাহিনীর সম্পূর্ণ অংশ না থাকায় যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। গীত রচয়িতা সাজন, সাত বছর জেল খাটবার সময়ে এই গান রচনা করেন। তারপর পরাণ মণ্ডল সে গান শিখে নেন। তাঁর থেকে গ্রহণ করেন সহর আলি। সুতরাং গানের অনেক অংশ সংযুক্ত বা বিযুক্ত হয়ে থাকতে পারে। তবু স্থানীয় অশিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষায় রচিত গানগুলি থেকে তিতুমীরের ন্যায়-যুদ্ধের প্রতি সমর্থনের প্রাণ-স্পর্শ পাওয়া যায়।

৪। তিতুমীর (নাটক)

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "অভিনয়" পত্রিকায় (শারদ সংকলন) শ্রীশ্যামাকান্ত দাসের লেখা "তিতুমীর" নাটক প্রকাশিত হয়েছে। নাটকটি দুটি পর্বে বিভক্ত। এর প্রথম পর্বে আছে পাঁচটি এবং দ্বিতীয় পর্বে তিনটি দৃশ্য। এটি সাতান্ন পৃষ্ঠার নাটক।

তিতুমীরের কৃষক-বিদ্রোহের কাহিনী, স্বাধীন ভারত গড়ার ঐতিহাসিক যুদ্ধ কথা, তাঁর অসাধারণ দেশ প্রেমের কথা প্রভৃতি এ নাটকের উপজীব্য। ধর্মের নামে অধর্মের যে কুৎসিত রূপ তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার কথা নিয়ে এই যে নাট্যকাহিনী তা পরিবেশন করা আপাততঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত মনে হলেও ইতিহাস হিসাবে তার মূল্য অপরিসীম। বস্তুতঃ কাহিনীর মধ্যে ঘটনার মূল-ঐতিহাসিক দিকটি রক্ষিত হয়েছে। তিতুমীরের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে সর্বপ্রথম আঘাত আসে পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের দিক থেকে। নাট্যকার সেদিক থেকে ভুল করেন নি। মুসলমান হয়ে ভণ্ড ধার্মিক মোল্লা-মৌলভীগণের বিরুদ্ধে তিনি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন নাট্যকার সেখানেও সত্য বস্তুকে এনেছেন। কিছু কাল্পনিক চরিত্র এই নাটকে আছে বটে কিন্তু তাতে মূল বক্তব্যের কোন ক্ষতি হয় নি। চরিত্র গুলি খুবই সাবলীল। ইংরেজকে

বিতাড়িত করে স্বাধীন ভারত গড়ার যে প্রবল মানসিকতা তিতুমীরের চরিত্রে প্রস্ফুটিত তা প্রশংসার্হ। তাঁর আন্দোলন যে অসাম্প্রদায়িক ছিল সে তথ্যও নাট্যকার নির্ভীকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর আন্দোলন যে শুধু ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না এবং প্রথম দিকে তা ধর্মীয় মনে হলেও পরে যে তা ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে পর্য্যবসিত হয়েছিল তাও এ নাটকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাটকের শেষদিকে তিতুমীরের বাদশাহ হওয়ার দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যথায় তাঁর অসাধারণ চরিত্র নিষ্কলুষ বলে প্রতিভাত হয়েছে।

নাট্যকার দু'একটি নাম সম্ভবতঃ অনবধানতাবশতঃ অন্যভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন, গোলাম মাসুমকে গোলাম মসুম বলা হয়েছে। আবার মইজুদ্দিনকে মঙ্গলুদ্দীন বলা হয়েছে।

কাহিনী এত চিত্তাকর্ষক যে দর্শকগণকে শেষপর্য্যন্ত সমানভাবে আকৃষ্ট করে রাখে।

প্রবাদ ঃ—শহীদ তিতুমীরের নামে কয়েকটি প্রবাদ ছড়ার আকারে প্রচলিত আছে। যথা—

১। গোলী খা ডালেগা।

২। আজ বেহুড়ের হাট,
দাড়ি কেস্তে দিয়ে কাট।

৩। সরষে খেতে পড়,
আর গোলা খেয়ে মর,
মুকি আর আল্লা,
বলতি দেলে না।

৪। নারিকেল বেড়ে গাঁয়েতে
একজন ছিল তিতুমীর,
সরা-শরিয়ত তিনি
করিলেন জাহির।
পীর-পয়গম্বর কুতব-অলি

কিছুই তিনি মানিতেন না,
এবার সারলে ইংরেজ মাসু
জানে রাখলে না।[২৬]

৫। হেই বন্‌বন্‌ ঘোরে লাঠি তিতুমীরের হাতে
ফট্‌ ফটাফট্‌ গুলী চলে বাঁশের কেল্লা ফতে।
(সিরাজ সাঁই ঃ দেবেন নাথ)

৬। শালা, যেন তিতুমীরের লাঠি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দাদাপীর সাহেব

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহম্মদ মোস্তাফার প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিকীর পরবর্ত্তী একত্রিশতম পুরুষ পীর হজরত আবু বকর সিদ্দিকী প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে ১২৬৩ হিজরী-অব্দে অর্থাৎ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার ফুরফুরা শরীফের অন্তর্গত মিঞা সাহেব মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'দাদাপীর সাহেব' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। হজরত নবী নাকি স্বপ্নযোগে তাঁর নাম রেখেছিলেন আবদুল্লাহ। তাঁর পিতার নাম মাওলানা হাজী আবদুল মোক্তাদের সাহেব এবং মাতার নাম মোছাম্মৎ মহব্বতুন্নেছা খাতুন।

হজরত দাদাপীর সাহেব মাত্র নয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃহারা হন এবং স্নেহশীলা মাতৃক্রোড়ে লালিত-পালিত হতে থাকেন। তিনি শৈশব থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ইংরাজী শিক্ষা বর্জন করেন। তিনি নাকি আল্লাহ্ তালার ইচ্ছায়, তাঁর পূর্বপুরুষ হাজী মাওলানা মোস্তাফা মাদানী সাহেবের স্বপ্নাদেশে এবং হজরত নবীর নির্দ্দেশে ইংরাজী পাঠগ্রহণ ত্যাগ করে আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর সীতাপুর মাদ্রাসা, মহসীনীয়া মাদ্রাসা (হুগলী) ও নাখোদা মসজিদ-মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করে শরীয়ত বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। ১৩১১ বঙ্গাব্দে হজ করতে গিয়ে তিনি মক্কা ও মদিনা শরীফে থেকে চল্লিশখানি হাদীস্ অধ্যয়ন করে প্রশংসা-পত্র পান। তিনি কয়েকবার মক্কায় যান এবং ইসলাম ধর্ম বিষয়ক বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরেও তিনি বহু দুর্লভ গ্রন্থ পাঠ করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। স্বদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে তিনি বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ' (তৃতীয় খণ্ড) নামক গ্রন্থে আছে যে নাকি প্রায় পাঁচ লক্ষ মুসলমান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব বলেন যে কত লক্ষ লোক দাদাপীর সাহেবের শিষ্যত্ব নিয়েছিলেন তা নির্ণয়

করা অসম্ভব। হজরত মাওলানা মোস্তাফা মাদানী নাকি এই ভবিষ্যত বংশধর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে সহস্র সহস্র লোক তাঁর খাঁটি মুরিদ হবেন।

শাস্ত্র-চর্চা ও আধ্যাত্ম-চিন্তা ছাড়াও তিনি বহু জনহিতকর কাজের মাধ্যমে তাঁর মহান-হৃদয়ের পরিচয় রেখে গেছেন। তিনি নিজ ব্যয়ে বহু দরিদ্র শিক্ষার্থীর আহার ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া মাদ্রাসার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের পাঠোপযোগী গ্রন্থ-সমন্বিত পাঠাগার তিনি নির্মাণ করে দেন। সুপেয় জলের জন্য নলকূপ খনন এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ও তিনি স্থাপন করেন। তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাঙলা ছাড়া আসামের বহু স্থানেও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি 'আঞ্জুমান ওয়াজিন' নামে এক সংস্থা গঠন করে দেশে দেশে ধর্ম-প্রচারের ব্যবস্থা করেন। সামাজিক কলহ মীমাংসার জন্য অনেক স্থানে তিনি সালিশী পরিষদ্ গঠন করে দেন। বাংলা ও আসামের আলেম বা মাওলানাদের নিয়ে স্বহস্তে গঠিত 'জামায়েতে-উলেমা' নামক একটি সংস্থার তিনি ছিলেন আজীবন সভাপতি। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের মধ্যে দলাদলির অবসান করে দৃঢ়বদ্ধ ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এই সংস্থার সহযোগিতা লাভের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ডঃ কিচ্‌লু, মৌলানা আজাদ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতা তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁর বহু গঠন-মূলক প্রচেষ্টার যা সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য তা হল ফুরফুরা শরীফের 'ইছালে-ছওয়াব' উৎসব। প্রায় আশী বৎসরের প্রাচীন এই উৎসবের বিবরণ দান প্রসঙ্গে 'মিজান' বিশ্বনবী সংখ্যা (১৯৪৪) লিখ্‌ছে,—

"ফুর্‌ফুরা শরীফের ইসালে সওয়াবে অভূতপূর্ব জনসমাবেশ। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ফুর্‌ফুরার বার্ষিক জলসা ২১, ২২ এবং ২৩শে ফাল্গুন অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হইতে দৈনিক ২২।২৫ খানি বাস ঐ তিনদিন জলসার যাত্রীগণকে লইয়া যাতায়াত করে। এবারে ঐতিহাসিক জনসমাবেশ হয়। ......বাংলাদেশ হইতে একটি বিশেষ ট্রেন শিয়ালদহে আসে। ...... এ বছর সর্বাধিক লোক সমাগম হয় বলে জানা যায়।"

বাংলা ছাড়া আসাম এবং ভারতের অন্যান্য বহুস্থান থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এই উৎসবে যোগদান করতে আসেন। দাদাপীর সাহেবের সহকর্মী ও শিষ্য মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগে লিখেছেন, "হজরত পীর সাহেব ইছালে-সওয়াব উৎসবে স্বদেশী-বিদেশী সমাগত লোকদের আহারাদি সর্বপ্রকার যত্নের ব্যবস্থা করতেন ও সর্বত্র ঘুরে সকলের অসুবিধা দূর

করতেন। সময়ে সময়ে নিজ-হাতে কাঠ নিয়ে যেতে দেখে শত শত মাওলানা কাঠ কাঁধে নিয়ে তাঁর পিছু পিছু ছুটতেন। তিনি একপ্রকার সারাদিন এমন কি অর্ধরাত্রি পর্যন্ত আহারের কথা ভুলে যেতেন। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখের পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় মাসউদ আর রহমানও লিখেছেন, "ইসালে-সওয়াব উৎসব 'সওয়াল' হাসিল বা পুণ্যার্জনের উৎসব।"

দাদাপীর সাহেবের অসাধারণ জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে মাওলানা রুহুল আমিন লিখেছেন, —তাঁর সভাতে ২০ হাজার থেকে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হত। ......হজরত পীর সাহেব যখন শেষবারে বসিরহাট যান, তখন লক্ষাধিক লোক তাঁর অভ্যর্থনার জন্য বসিরহাটের রাস্তা-ঘাট পূর্ণ করে ফেলেছিল। তিনি কোথাও ধর্মালোচনা করবেন জানতে পারলে চল্লিশ-পঞ্চাশ ক্রোশ দূর থেকেও লোক পতঙ্গের ন্যায় ছুটে আসত। ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, গুণী, মানী, আমির, নবাব, মন্ত্রী, মাওলানা, মৌলবী, মুনশী, মাষ্টার, পণ্ডিত সকলেই তাঁর দর্শন ও দোয়ার প্রার্থী। সহস্র সহস্র হিন্দু-মুসলমান তাঁর নিকট থেকে তেলপড়া নিতে মাতোয়ারা। তাঁর অমায়িক ব্যবহার এবং জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে দূর-দূরান্ত থেকে আগমনের কষ্ট সকলে ভুলে যেত।

মাসউদ আর রহমান সাহেব লিখেছেন,—বিরাট ও অসাধারণ প্রভাবশালী ধর্মপ্রচারক ছিলেন তিনি। বাঙলা ও আসামের লক্ষ লক্ষ মানুষকে তিনি পথ দেখিয়েছেন ; কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, বিভ্রান্তি ও হতাশাক্লিষ্ট তৎকালীন মুসলমান সমাজকে সুস্থ করবার চেষ্টা করেছেন। এই মহান পীর ও কর্মবীর প্রায় একশত বৎসর বয়সে ১৩৫৮ হিজরী ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ শুক্রবারে এন্তেকাল করেন।

হজরত দাদাপীর সাহেবের পূর্বপুরুষগণের বিবরণ ঐতিহাসিক বটে। তাঁর পূর্বতন পঞ্চদশ পুরুষ হজরত মাওলানা মনসুর বাগদাদী এ দেশের ইতিহাস-খ্যাত। ৭৯৬ হিজরীতে সুলতান গিয়াসুদ্দীন যখন ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থান অধিকারে অভিলাষী হন তখন বাংলায় ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ভূস্বামী। তারা ছিল বিদ্রোহী। তাদের দমন করবার জন্য সুলতান গিয়াসুদ্দীন সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। সেই সাথে তিনি প্রেরণ করেছিলেন বড় বড় ওলি। তিনি হজরত শাহ্ সুফী সুলতানকে একদল পরাক্রমশালী সৈন্য দিয়ে বঙ্গদেশের দিকে পাঠিয়েছিলেন। হজরত শাহ্ সুফী সুলতান তাঁর সৈন্যদলকে দুভাগে বিভক্ত করে তিনি স্বয়ং একদল সৈন্যসহ পাণ্ডুয়া অভিমুখে

যাত্রা করেন এবং অন্য দলকে সেনাপতি হজরত শাহ্ হোসেন বোখারির নেতৃত্বে "বালিয়া-বাসন্তী" অভিমুখে প্রেরণ করেন। এই শেষোক্ত দলের সঙ্গেই ফুরফুরার হজরত দাদাপীর সাহেবের পূর্বপুরুষ হজরত মাওলানা মনসুর বাগদাদীও ছিলেন।

বালিয়া-বাসন্তীর বাগ্দী রাজার সঙ্গে তাঁদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধকথা এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী। যুদ্ধ শেষে মাওলানা মনসুর বাগদাদী ও অপর তিনজন মুসলমান সৈন্য পলায়নরত রাজ-সৈন্যের পশ্চাদনুসরণ করে 'কাগমারী' নামক মাঠে যুদ্ধে শহীদ হন। সেনাপতি সে সংবাদ পেয়ে তাঁদের মৃতদেহ 'বালিয়া-বাসন্তী'-তে আনিয়ে দফন করতঃ স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করান। বালিয়া-বাসন্তীতে মুসলমানগণের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকার নাম করণ হয় ফুরফুরা শরীফ [২৭]।

বস্তুতঃ হজরত দাদাপীর সাহেবের সমগ্র জীবন হল বিশেষভাবে তাঁর অসাধারণ কীর্ত্তিকলাপের জীবন। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে জানতে হলে সেই সব কার্য্যাবলীর পরিচয় পেতে হবে। বলা বাহুল্য, তাঁর অসাধারণ কীর্ত্তিকলাপপূর্ণ (যাকে অলৌকিক বলা যায়) কথাতেই কয়েকখানি জীবনী গ্রন্থ লিখিত হয়েছে।

দাদাপীর সাহেবের জীবনী ও তাঁর অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপের বর্ণনা এ পর্য্যন্ত জ্ঞাত তিনখানি পুস্তকে পাওয়া যায় :—

১। ফুরফুরার হজরত দাদাপীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী
: হজরত মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব

২। ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী
: গোলাম মোহাম্মদ ইয়াছিন

৩। ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী : আব্দুল আজিজ আল্ আমীন

তাছাড়া হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ নামক গ্রন্থে দাদাপীর সাহেবের কথা বিবৃত হয়েছে।

হজরত মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব রচিত পুস্তকখানি অধুনা দুষ্প্রাপ্য।

"ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী" গ্রন্থের রচয়িতা গোলাম ইয়াছিন তাঁর পুস্তকে লিখেছেন যে তিনি সেখ সা'দীর জীবনী প্রণেতা বরুরিয়া (টাংগাইল) দারছে নেজমিয়া দারুল উলুম ছিদ্দিকিয়া মাদ্রাসার মোদাররেছ।"

৭"×৫" আকৃতিবিশিষ্ট মুদ্রিত পুস্তকখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১০। ইহা সূচীপত্র, উৎসর্গ, ভূমিকা ও জীবনী এই চারটি প্রধান অঙ্গে বিভক্ত। প্রকাশক মদিনা বুক ডিপো, ৯৮নং রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-১। দাম ৩ টাকা ৫০ পয়সা। প্রথম প্রকাশকাল জানা যায় না। দ্বিতীয় সংস্করণকাল ১৩৭৩ সন। এই পুস্তক রচনার জন্য গ্রন্থকার অবশ্য হজরত রুহুল আমিন সাহেবের পুস্তকখানির সাহায্য লওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন।

এই গ্রন্থখানি আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যে রচিত। এতে আছে বহু আরবী-ফারসী শব্দ। আরবী হরফে কয়েকটি উদ্ধৃতিও সংযুক্ত হয়েছে। গ্রন্থখানি পাঠকালে কোন কোন স্থানে আরবী-ফারসী শব্দাধিক্যে সচ্ছল গতির অভাব অনুভূত হয়।

আবদুল আজীজ আল্-আমীন সাহেব তিনজন পীরের আশ্চর্য্য কেরামতির কথা নিয়ে কতকগুলি লোককথা তাঁর গ্রন্থে গ্রথিত করেছেন। উক্ত পুস্তকে জনাব আবুবকর সিদ্দিকী শীর্ষক অংশে চৌদ্দটি লোক-কথা লিপিবদ্ধ আছে।

আমীন সাহেবের পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণকাল ১৩৬২ সালের ১লা ফাল্গুন। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণকাল ১৩৬৩ সালের ১লা বৈশাখ। মূল্য মাত্র দু'টাকা।

গ্রন্থকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী এবং অনেক উপন্যাস, সমালোচনা গ্রন্থ ও জীবনী গ্রন্থের রচয়িতা। কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট বাজারে অবস্থিত 'হরফ প্রকাশনী' থেকে সুলভে তিনি অনেক মূল্যবান সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। তিনি 'কাফেলা' নামক মাসিক পত্রিকারও সম্পাদক-পরিচালক।

হজরত দাদাপীর সাহেবের জীবনকথাভিত্তিক উপরোক্ত সমস্ত গ্রন্থে তাঁর মাহাত্ম্য কথা প্রত্যক্ষতঃ লিখিত হলেও পরোক্ষতঃ আল্লাহতালার মাহাত্ম্যকথাই প্রচারিত হয়েছে। ইহা নিছক জীবন কথা বটে। সরস সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। অবশ্য ইহা পাঠ করলে মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়।

বঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে জীবিত পীরগণের মধ্যে হজরত দাদাপীর সাহেবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন। তাঁর জীবিত-কালেই সম্ভবতঃ তাঁর জীবনী রচিত হয়েছিল। এ বিষয়ে হয়ত তিনিই একমাত্র পীর সাহেব। এন্তেকালের

পর অন্যান্য পীরগণের ন্যায় তাঁর নামে কোন কাল্পনিক দরগাহ্ বা নজরগাহ্ সৃষ্টি হয় নি।

হজরত দাদাপীর সাহেবের অলৌকিক কীর্তি-কলাপ সম্পর্কীয় যে সব লোককথা পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাদের শিরোনামার একটি তালিকা নীচে প্রদত্ত হল।

গোলাম মহম্মদ ইয়াছিন রচিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ লোককথাসমূহ নিম্নলিখিত শিরোনামায় চিহ্নিত করা যেতে পারে :—

১। ইছালে ছওয়াবের দিনে দাদাপীরের আদেশ
২। ফৎওয়ার ত্রুটি আবিষ্কার
৩। জিজ্ঞাসার পূর্বেই উত্তর প্রাপ্তি
৪। সুদখোরের জন্য অনাবৃষ্টি
৫। কম্পজ্বর আসিবার ভবিষ্যৎ বাণী
৬। আটটি প্রশ্নের জবাব
৭। ওয়াজের মধ্যেই মছলার জওয়ার
৮। বাক্যহীনের মুখে বাক্য
৯। পীরের আদেশে নুর লাভ
১০। স্বপ্নে পীরের দর্শনলাভ
১১। পীরের দয়ায় মরণাপন্ন পুত্রের সাক্ষাত লাভ
১২। ওয়াজের মধ্যে ওয়াএজদ্দিন সাহেবের প্রশ্নের জবাব
১৩। অতিথির উপস্থিতির সংবাদ পূর্বেই পীরের জানা
১৪। বসিরহাটের জনসভায়
১৫। আবদুল হাই-এর জন্য ঔষধ
১৬। আফছরদ্দিন সাহেবের অভিজ্ঞতা
১৭। জনৈক রুটি বিক্রেতার অভিজ্ঞতা
১৮। ত্রিপুরার আবদুল মজিদ সাহেব কথিত গল্প
১৯। পাহাড়পুরের কথা
২০। নোয়াখালির আবদুছ ছামাদ কথিত গল্প
২১। ভবানীগঞ্জের আজিজার রহমান কথিত গল্প
২২। আজিজার সাহেব কথিত দ্বিতীয় গল্প
২৩। রায়পুরার আশরাফউদ্দিন পণ্ডিত কথিত গল্প

৫৫।	"	"	"	নবম	"
৫৬।	"	"	"	দশম	"
৫৭।	"	"	"	একাদশ	"
৫৮।	"	"	"	দ্বাদশ	"
৫৯।	"	"	"	ত্রয়োদশ	"

আবদুল আজীজ আল আমীন সাহেব তাঁর "ধন্যজীবনের পুণ্য কাহিনী" পুস্তকে নিম্নলিখিত শিরোনামায় চৌদ্দটি লোককথা লিপিবদ্ধ করেছেন,—

৬০। বিশ্বমায়ের ভালবাসায়
৬১। পরিচয়ের যৎকিঞ্চিৎ
৬২। গোস্তচুরির ফ্যাসাদ
৬৩। আগুন লাগিল সব ঠাঁই
৬৪। জায়নামাজের নীচে হাজার টাকা
৬৫। কৈবর্ত শিশুর বিপদ মুক্তি
৬৬। অজ্ঞাত প্রশ্নের জবাব দান
৬৭। প্রতাপ সেনের রোগমুক্তি
৬৮। সরকারী পদে প্রতাপচন্দ্র
৬৯। ইসলামের ছায়াতলে
৭০। পীর সাহেবের আদেশে
৭১। ব্যাঘ্র মুখে আবদুল মোমেন
৭২। আল্লার আরাধনায় আবদুল মোমেন
৭৩। বিকল হল কলকবজা

মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব রচিত পুস্তক আমার হস্তগত না হওয়ায় তন্মধ্যস্থ লোক-কথাগুলির উল্লেখ এখানে করা সম্ভব হল না।

উপরোক্ত লোক কথার কোন কোনটি স্থান বিশেষে দুবার উল্লেখ হয়ে থাকতে পারে; তবে মূল বক্তব্য একই থাকলেও বর্ণনার তারতম্যে তাদের মধ্যকার গল্পাস্বাদের পার্থক্য লক্ষণীয়। এই সব লোক-কথা এখানে সংগ্রথিত করা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, শুধু পীর-সাহিত্যের লোক-কথাসমূহ পুস্তক আকারে প্রকাশ করলে তা বিরাট আয়তন বিশিষ্ট হবে এবং বাংলা লোক-সাহিত্যে তা হবে এক বিস্ময়কর সংযোজন।

———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নির্ঘিন শাহ

পীর হজরত নির্ঘিন শাহ্ রাজী নামে যে ফকির বা দরবেশ বারাসত মহকুমার কাজীপাড়া অঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন, তাঁর কোন সঠিক জন্ম বিবরণাদি জানা যায় না। এতদ্ অঞ্চলে তিনি সাধারণ ফকিরের বেশে ঘুরে বেড়াতেন এবং যেখানেই কোন অমঙ্গলের ছায়াপাত দেখা যেত, তিনি সেখানে ছুটে যেতেন। সেখানে তিনি আর্তমানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে তিনি ঘৃণা-শূন্য হয়ে সেবা করতেন। তিনি আজীবন এতদ্অঞ্চলে অবস্থিতি করেছিলেন। মৃত্যুর পর ভক্তগণ কাজীপাড়ায় তাঁর মরদেহকে কবরস্থ করেন।

ভক্তসাধারণ তাঁর সমাধির উপর ইটের একটি সুরম্য দরগাহ গৃহ-নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। দরগাহের পাশে কিছু মৌসুমী ফুলের গাছ চার কাঠা পরিমাণ জায়গাটিকে মনোরম করে রেখেছে। ভক্তগণ দরগাহে পীরের নামে জিয়ারত বা আত্মার শান্তি কামনা করে ধূপ-বাতি প্রদান করেন। অনেকে এখানে শিরনি বা মানত দিয়ে থাকেন।

পীর নির্ঘিন শাহের নামে তাঁর দরগাহের সামনের রাস্তাটির নাম হয়েছে নির্ঘিন শাহ্ রোড। রাস্তাটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। এই দরগাহের সেবায়েত হলেন জনসাধারণ। এখানে বাৎসরিক কোন মেলা হয় না। পীর হজরত একদিল সাহের দরগাহ এই অঞ্চলেই অবস্থিত। পীর হজরত একদিল শাহের যথেষ্ট প্রভাব থাকা সত্ত্বেও পীর হজরত নির্ঘিন শাহ একক বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত।

পীর হজরত নির্ঘিন শাহের নামে রচিত কোন সাহিত্য বা কোন পুথির সন্ধান পাওয়া যায় না। এমন কি কোথাও তাঁর নামোল্লেখ পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয় না। কোন শতাব্দীতে তিনি অবস্থান করেছিলেন তাও অজ্ঞাত। তাঁর অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপের নিম্নরূপ লোক-কথাটি এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে ;

১। কীট, না বেদানার দানা

এক ব্যক্তি কোন এক সময় কি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে একেবারে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। তিনি বহু চেষ্টা করেও রোগমুক্ত হতে পারেন নি। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পাগলের ন্যায় আর্তনাদ কর্‌তে কর্‌তে রাস্তায় রাস্তায় চল্‌তে থাকেন। একস্থানে তিনি এক ফকিরের সম্মুখীন হন। ফকির তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। তিনি ফকিরের সংবেদনশীল কথায় অভিভূত হয়ে তাঁর অসহনীয় যাতনার কথা প্রকাশ করেন। তিনি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফকিরের শরণাপন্ন হন এবং রোগমুক্ত করে দেবার জন্য কাকুতি-মিনতি কর্‌তে থাকেন। এই ফকির আর কেহ নন,—ইনিই পীর হজরত নির্ঘিন শাহ্‌ রাজী।

পীর নির্ঘিন শাহ্‌ উক্ত আর্তব্যক্তির সমস্ত কথা শুনে নিলেন। তিনি আর্তব্যক্তিকে পথের ধারে পড়ে থাকা একটি মৃত কুকুরের নিকট ডেকে নিয়ে গেলেন। মৃত কুকুরটির গায়ের ক্ষতস্থানটি পচে-গলে গিয়েছিল। দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ানোও কষ্টসাধ্য। গলিত স্থানে কুৎসিত-দর্শন বহু কীট ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পীর সাহেব বল্‌লেন ; "—ঐ যে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—কুকুরের ঐ গলা জায়গায় ঐ যে দেখা যাচ্ছে,—তুলে নিয়ে খেতে পারিস্‌ ? তা হলেই তোর রোগ সেরে যাবে।"

ঐ ব্যক্তির মনে কি যেন ভাবের উদয় হল। তিনি তৎক্ষণাৎ গভীর শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে বলে উঠ্‌ল,—"নিশ্চয় পারৃব।"

তিনি অবিলম্বে এগিয়ে গিয়ে পচা দুর্গন্ধ মাংসের উপর চলন্ত কতকগুলি কীট মুঠোয় তুলে নিয়ে সেই ফকিরের স্মরণ কর্‌তে কর্‌তে কয়েকটি কীট মুখের মধ্যে ফেলে দিলেন। কিন্তু একি। পর মুহূর্তে তিনি মুখের মধ্যে সুপক্ক বেদানার গন্ধে ভরপুর অফুরন্ত রসের স্বাদ পেয়ে স্তম্ভিত হলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি হাতের মুঠোর বাকী কীটগুলির দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, সেগুলিও আর কীট নেই,—সেগুলি বেদানার পরিপক্ক লাল টক্‌টকে দানা। তিনি বিস্ময়ে অসাধারণ সেই ফকিরের পা জড়িয়ে ধরার জন্য পিছন ফিরে দেখেন যে ফকির ইতিমধ্যেই অদৃশ্য হয়েছেন।

বেদনাহত চিত্তে তিনি বাড়ীতে ফিরে এলেন। তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যে রোগমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল ; অনেকেই তাঁর দরগাহে শিন্নি এবং মানত প্রদান করে থাকেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পাঁচপীর

পূর্ব্ববঙ্গের গাজীর গীত থেকে পাঁচজন পীরের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের নাম যথাক্রমে গিয়াসুদ্দিন, সামসুদ্দিন, সেকেন্দার শাহ্, বড় খাঁ গাজী ও কালু। এই পাঁচজন পীরকে নিয়ে পাঁচ-পীরের কল্পনা করা হয়েছে। এঁরা সকলেই ইতিহাস বিখ্যাত গাজী। বারাসত মহকুমার রঙ্গপুর, সেলারহাট, জালসুখা প্রভৃতি গ্রামে পাঁচ পীরের নামে পীরোত্তর জমি আছে দেখা যায়।[৪৪] সুবর্ণ গ্রামে এই পাঁচ পীরের নামে একস্থানে পাঁচটি দরগাহ বা মন্দির আছে। শ্রীহট্ট শহরে তাঁদের কবরস্থান "পাঁচ পীরের মোকাম" বলে পরিচিত।[৫৮]

দুস্তর নদী পথে নৌকা ছাড়্বার সময় যখন দাঁড়ি-মাঝি নৌকার যথাস্থানে উপবিষ্ট হয়ে দাঁড়ে ও হা'লে হস্তার্পণ করে ভক্তিবিনীত ধীর গম্ভীরভাবে ডাকে,—

আমরা আছি পোলাপান, গাজী আছে নিখাবান।
শিরে গঙ্গা দরিয়া, পাঁচ পীর বদর বদর॥

তখন মনে হয় শুধু গাজী এবং বদর নয়, নাবিকের আরাধ্য দেবতা আরো আছেন: গঙ্গাদেবী—তিনি শুধু হিন্দুর সম্পত্তি নন, আর আছেন পাঁচ পীর। [যশোহর-খুলনার ইতিহাস: ১ম খণ্ড: চতুর্দশ পরিচ্ছেদ: পৃষ্ঠা ৪১৮—৪২১]

পূর্ব্ববঙ্গে যে গাজীর গীত প্রচলিত আছে, তার ভিতর পাঁচ পীরের কথা পাই;—

পোড়া রাজা গয়েসদি, তার বেটা সমস্দি,
পুত্র তার সাই সেকেন্দর।
তার বেটা বরখান গাজী, খোদাবন্দ মুলুকের রাজী,
কলিযুগে যার অবসর;
বাদশাই ছিঁড়িল বঙ্গে, কেবল ভাই কালু সঙ্গে,
নিজ নামে হইল ফকির।[১৭]

ভারতবর্ষের অনেকস্থানে পাঁচ-পীর আছেন। সতন্ত্র লোক নিয়ে সে সব স্থানে পাঁচ-পীর হয়েছেন। বঙ্গের পাঁচ-পীর—গয়সউদ্দিন, সামসুদ্দিন, সেকেন্দর, গাজী ও কালু। কিন্তু গাজীর গীতে এদের সহিত যে সম্বন্ধ দেখা যাচ্ছে, তার সহিত ইতিহাস মেলে না। কেহ কেহ অনুমান করেন… গয়সৃউদ্দীন বল্‌তে দিল্লীর বাদশাহ গিয়াসুদ্দীনকে বুঝাচ্ছে কিন্তু তাঁর সহিত সামসুদ্দিনের কোন সম্বন্ধ নেই। বাঙ্গালায় এক বিখ্যাত গিয়াসুদ্দীন ছিলেন, কিন্তু তিনি সেকেন্দার শাহের পুত্র। ……সেকেন্দারের পুত্র গাজী কে ছিলেন বুঝা যায় না। মোট কথা পাঁচজনের মধ্যে সামসুদ্দীন ও সেকেন্দারকে বিশেষরূপে চিনতে পারা যায়। সামসুদ্দীন, বঙ্গের প্রথম স্বাধীন পাঠান শাসনকর্তা; তাঁর সময়েই শ্রীহট্টে শাহজালালের আগমন হয়েছিল……।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে জাফরখাঁ গাজী ত্রিবেণীতে এসেছিলেন। ……তাঁর এক পুত্রের নাম বরখান গাজী; তিনি স্থানীয় রাজাকে পরাস্ত করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই বরখান গাজী ও আমাদের প্রস্তাবিত "গাজীর গীতের" বরখান গাজী এক ব্যক্তি বলে মনে হয় না। কারণ জাফর খাঁর মসজিদের পারসিক লিপিতে যে তারিখ আছে, তাতে ১২৯৪ খৃস্টাব্দ হয়; কিন্তু সে সময় যশোহর জেলায় মুকুট রাজা প্রাদুর্ভূত হন নি।[৫৩]

————

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ফাতেমা বিবি

সমগ্র ইসলাম জগতের সমুদয় নারীর শিরোভূষণ পীরানী হজরত ফাতেমা যোহরা ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ রসুলউল্লাহ্ (সাঃ) এর কনিষ্ঠা নন্দিনী। তাঁর মাতা ছিলেন মহামাননীয়া উম্মুল মোমেনিন খাদীজাতুল কোব্রা। তাঁর জন্মস্থান "ছয়য়ব বনি হাসেম"-এ অবস্থিত। আজকাল ঐ স্থানে "শাশিদা ও ছাবকল্লায়েল" মহল্লা বিরাজিত। তিনি ছিলেন আদর্শ কন্যা, আদর্শ পত্নী ও আদর্শ জননী। তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা, দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ, পিতৃভক্তি ও স্বামীভক্তি ছিল অতুলনীয়। তাঁর স্বামীর নাম শেরে খোদা হজরত আলী। জগতবিখ্যাত তাঁর দুই পুত্রের নাম—হজরত ইমাম হাসান ও হজরত ইমাম হোসেন। হজরত রসুল করিম (সাঃ) এর চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম এবং হজরত খাদিজাতুল কোব্রা (রাঃ-আঃ) এর ষাট বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁর জন্ম হয়। ঐতিহাসিকগণের মতে ৬০৫ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে হজরত ফাতেমার জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয় হিজ্রী একাদশ সনের ৩রা রমজান তারিখে[৬৬]। কারো মতে তাঁর জন্ম তারিখ ৬১১ খৃষ্টাব্দের ২০শে জমাদিয়ল আখেয়ের পবিত্র জুম্মার দিন এবং মৃত্যুর দিন দ্বাদশ হিজ্রীর ৩রা রমজান[৬৭]। পীরানী হজরত ফাতেমা যোহরার সন্তান-সন্ততি মাধ্যমেই হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর বংশধারা রক্ষিত হয়েছিল।

হজরত ফাতেমা যোহরা খুব সম্ভবতঃ আরব জগতের বাইরে কোনদিন যাননি। তিনি ভারতবর্ষে কখনও আসেন নি। তবু তাঁকে মুসলিম-জগতের সকলেই সমূহ শ্রদ্ধা করেন। বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে তাঁর নামে কাল্পনিক দরগাহ্ আছে। বারাসত থানার খড়িগাছি মৌজায় সহরা নামক গ্রামে হজরত ফাতেমা যোহরার যে কাল্পনিক দরগাহ্ আছে তা ইট দিয়ে তৈরী। এতদ্ অঞ্চলে তিনি বিবি ফাতেমা নামে সমধিক পরিচিত।

হজরত ফাতেমা যোহরার নামে বারাসত থানাধীন মাঠগ্রাম, বেরুনান

পুখুরিয়া, মালিকাপুর, পশ্চিম ইছাপুর, ঘোলা, সোনাখড়্কি, খড়িগাছি-সহরা প্রভৃতি মৌজায় পীরোত্তর জমি আছে[৪৪]। তাঁর প্রতি ভক্তিতে স্থানীয় ভক্তগণ সহরা গ্রামে যে দরগাহ্ নির্মান করে দিয়েছিলেন তার উপর অশ্বত্থ-গাছ হয়েছে। সেখানে আজো প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত ধূপবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে জিয়ারৎ করা হয়। উক্ত দরগাহের বর্তমান (১৯৪৪) সেবিকার নাম মোসাম্মেৎ শুকজান বিবি। তাঁর স্বামীর নাম মরহুম মোহাম্মদ পাঁচু সাধু খাঁ। মহরমের সময় স্থানীয় ভক্তগণের এক বিরাট শোভাযাত্রা এই দরগাহে এসে হজরত ফাতেমার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তখন এখানে লাঠিখেলা বা অনুরূপ ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়। এ ছাড়া অন্য কোন সময়ে কোন অনুষ্ঠান বা মেলা হয় না। অনেক ভক্ত এই দরগাহে মাঝে মাঝে হাজত, শিরনি এবং মানত দিয়ে থাকেন। অনেকে রোগ নিরাময়ের আশায় হজরত ফাতেমা যোহরার এই দরগাহের মাটি ব্যবহার করেন। অনেকে এখানে তেল রেখে বিবি ফাতেমা কর্তৃক মন্ত্রপুতঃ হয়েছে এই বিশ্বাসে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করে রোগমুক্ত হন। এই দরগাহের পীরোত্তর জমির পরিমাণ এখনও প্রায় পাঁচ কাঠা। এখানে কোন ওরস হয় না বা তদুপলক্ষে মেলাও বসে না।

পীরানী হজরত ফাতেমা যোহরার নামে নিম্নলিখিত গ্রন্থ বা খণ্ড রচনা বা তাঁর জীবনী বিষয়ক রচনা পাওয়া যায়,—

১। হজরত ফাতেমা যোহরার জীবনচরিত : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ

২। হজরত ফাতেমা : মনিরউদ্দীন ইউসুফ

৩। ফাতেমার সুরত নামা : শেখ তনু (তিনখানি পুথি)

৪। " " " : শেখ সেরবাজ চৌধুরী

৫। ফাতেমার জহুরা নামা : আজমতুল্লাহ খোন্দকার

৬। বিবি ফাতেমার বিবাহ : অজ্ঞাত

৭। ফাতেমার সুরত নামা : কাজী বদিউদ্দীন

সংখ্যা ৩ থেকে ৭ পর্য্যন্ত পুথিগুলির কথা উল্লেখ করেছেন আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ তাঁর পুথি পরিচিতি নামক গ্রন্থে।

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের হজরত ফাতেমা যোহরার জীবনচরিত গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় তাঁর বসতি ছিল চব্বিশ

পরগণা জেলার দম্‌দম্‌ রেলওয়ে জংশন অঞ্চলের রমানাথ কুটীরে। তাঁর জন্মস্থান কোথায় তা জানা দুঃসাধ্য। আরো জানা যায়, তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও রচনা করেছিলেন,—

১। এসলাম তত্ত্ব,

২। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ)-এর জীবনচরিত,

৩। গ্রীস্‌-তুরস্ক (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ),

৪। আমার সংসার জীবন,

৫। কৃষকবন্ধু,

৬। জোবেদা খাতুনের রোজনামচা, প্রভৃতি।

তাছাড়া তিনি নিম্নলিখিত পত্র-পত্রিকার প্রবর্তক বা সম্পাদক বা সহযোগী সম্পাদক ছিলেন,—

১। সুধাকর,

২। সোলতান,

৩। ইসলাম-প্রচারক,

৪। মোসলেম-হিতৈষী,

৫। নবযুগ,

৬। মোসলেম বাণী,

৭। রায়ত-বন্ধু, প্রভৃতি।

হজরত ফাতেমা যোহরার জীবনচরিত গ্রন্থখানিতে লিখিত ভূমিকায় দেখা যায় তাঁর উক্ত বাসায় অবস্থান-কাল হল ১৫।৭।'৩৫। তাঁর পুস্তকখানি মৌলভী মোহাম্মদ কামালউদ্দিন সাহেব কর্তৃক সংশোধিত। লেখক সম্পর্কে এর অধিক কিছু জানা যায় না।

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ রচিত গ্রন্থের আকৃতি ৭"×৫"। গ্রন্থখানি বাঁধাই ও মুদ্রিত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৮। তা ছাড়া চার পৃষ্ঠায় একটি ভূমিকা আছে। এতে কোন সূচীপত্র নেই। অনেকগুলি শিরোনামায় গ্রন্থখানি লিখিত। আরো আছে পনেরোটি উর্দ্দু কবিতা ও তার বঙ্গানুবাদ। তাতে হজরত ফাতেমা যোহরার কথাই বিবৃত হয়েছে। পুস্তকখানির প্রকাশক "মদিনা বুক ডিপো।"

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ সাহেব রচিত হজরত ফাতেমা যোহরার জীবনচরিত গ্রন্থের ভাষা সাধু বাঙ্গালা গদ্য। এতে এত বেশী আরবী-ফারসী

শব্দ রয়েছে যাতে গ্রন্থখানি পাঠকালে বাঙ্গালা ভাষার যে মাধুর্য্য অনেকখানি বিনষ্ট হয়েছে তা বোঝা যায়। তাছাড়া পীর-পয়গম্বরগণের নামের শেষে বার বার সম্মান-সূচক শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় আরো বোঝা যায় যে, গ্রন্থখানি একেবারেই ধর্মগ্রন্থ বটে। ভাষার নমুনা এইরূপ ;—

"হজরত সারাদ-বিন-আবি ওক্কাছ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত ছরওয়ারে আলম (দঃ) বলিয়াছেন, জিবরাইল আলায় হেচ্ছালাম জান্নাতের একটি ছেব আমার নিকট আনয়ন করিলেন—যাহা আমি মেয়-রাজের রাত্রিতে দেখিয়াছিলাম। ঐ ফল ভক্ষণ করায় ঐ রাত্রিতেই হজরত খদিজাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ) আমার দ্বারা গর্ভবতী হইলেন। সেই গর্ভেই ফাতেমা (রাঃ—আঃ) জন্মগ্রহণ করিল।" (পৃষ্ঠা ১৩)

এই গ্রন্থে বাঙ্গালা হরফে পনেরোটি উর্দ্দু কবিতা রয়েছে। অবশ্য তার বাঙ্গালা অনুবাদও রয়েছে। বলা বাহুল্য সেই উর্দ্দু কবিতাগুলি লেখক মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ সাহেবের নিজের রচনা নয়। উর্দ্দু কবিতার কয়েকজন রচয়িতার নাম ;—

১। আবদুল মজিদ সিদ্দিকী,

২। মাষ্টার ছৈয়দ বাছেতে আলী বাছেত বছওয়ানী,

৩। লেছানুল হিন্দ হজরত আখিয লখনবী,

৪। মওলানা ছিমাব ছিদ্দিকী প্রভৃতি।

কয়েকটি উর্দ্দু কবিতার রচয়িতার নাম-উল্লেখ নেই।

গ্রন্থখানির কোন কোন অংশ বিশেষ বিশেষ শব্দের জন্য জীবনী পুস্তক হিসাবে পাঠ করতে ভালই লাগে।

রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ সাহেব রচিত গ্রন্থ অনুযায়ী হজরত ফাতেমা যোহরার জীবন কাহিনীর সংক্ষিপ্তরূপ ;—

৬১১ খৃষ্টাব্দের ২০শে জমাদিয়ল-আখেরের পবিত্র জুমার দিন প্রত্যুষে হজরত ফাতেমা যোহরা জন্মগ্রহণ করেন। তখন হজরত রছুল করিম (দঃ)-এর বয়ক্রম ৪০ বৎসর অতিক্রম করে ৪১-এ পড়েছিল। এই সময় পবিত্র কা'বাগৃহ নূতনভাবে সংস্কার হচ্ছিল।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মাতৃহীনা হওয়া অতি হৃদয়বিদারক ব্যাপার। এই ঘটনা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল পরিণাম বলেই পরে প্রতিভাত

হয়েছিল। যদি তিনি শৈশবে মাতৃহীনা না হতেন, তবে হয়ত অন্যের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ, আর্ত-দুঃখীর প্রতি করুণা বিতরণ প্রভৃতি তাঁর মহৎ গুণের বিকাশ হত না।

কিছুদিন পরে হজরত রছুল করিম (দঃ) এই মাতৃহীনা বালিকার লালন-পালন ও গৃহ-কার্য্যাদির সুশৃঙ্খলা সাধনের জন্য হজরত ছওদাকে বিবাহ করেন। তিনি মাতৃহীনা বালিকাদিগের প্রতি যথোচিত যত্ন ও স্নেহ প্রদর্শন করতেন।

হজরত ফাতেমা যোহরা মহাল্লার মেয়েদের সাথেও বড় একটা মিশতেন না। এই নির্জন বাসে তাঁর হৃদয়ে দৃঢ়তা জন্মেছিল। ঐ সময় মক্কার সমুদয় অধিবাসী হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি নিতান্ত বিদ্বেষপরায়ণ ছিল; সকলেই তাঁর সঙ্গে শত্রুতাচরণ করত। এমত বিপদের মধ্যেও হজরত রছুল (দঃ) ধর্মপ্রচারের জন্য ইতস্ততঃ গমন করতেন; সময় মত আহার এবং বিশ্রাম পর্য্যন্ত ঘটত না। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি হজরত ফাতেমার প্রতি মনোযোগী ছিলেন। হজরত ফাতেমা যোহরাও পিতার পবিত্র রচনাবলী ও উপদেশমালা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ এবং পালন করতেন। কোন বিষয় নিয়ে জিদ বা হটকারিতা করতেন না। বিপদ ও দারিদ্রতার ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁকে দুনিয়ার লোভ, লালসা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি দোষ হতে আল্লাহ-তায়ালা পবিত্র রেখেছিলেন। তিনি কোন জিনিষেরই অভাব বোধ করেননি। সাধারণ মোটা ও তালিযুক্ত কাপড় পরিধান এবং যবের মোটা আটার রুটি আহার করেই পরিতৃপ্ত থাক্‌তেন। সে খাদ্যও সকল দিন মিল্‌ত না। তিনি সকল বিষয়েই স্বীয় মহান পিতার পদানুসরণ করে চল্‌তেন। তাঁকে কখনও নামাজে 'গাফেল' দেখা যায় নি। যথানিয়মে কোর-আন 'তেলাওত' করতেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে তিনি পিতার প্রচারিত এছলাম ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ ভাবে জ্ঞান লাভে সক্ষম হন।

হজরত আলীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়েছিল। হজরত আলি ছিলেন দরিদ্র। দরিদ্র স্বামীর গৃহে এসেও তিনি মহামান্য পিতার উপদেশকে শিরোধার্য্য করতে লাগলেন। তিনি দরিদ্র স্বামীর প্রতি ক্ষণকালের জন্যও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নি। হজরত ইমাম হাসান ও হজরত ইমাম হোসেন নামক জগতবিখ্যাত দুই ভাই তাঁর পুত্র। পুত্রদ্বয় তাঁর নিকট ধর্ম ও নীতি শিক্ষা নিতেন।

দ্বাদশ হিজরীর ৩রা রমজান-মবারক মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রিকালে হজরত ফাতেমা যোহরা মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রন্থখানি আকারে যত বড়, কাহিনী হিসাবে তেমন বিস্তৃত ভাবে হজরত ফাতেমা যোহরার কথা দিয়ে একটানা গ্রথিত নয়। এতে বরং হজরত মহম্মদ রছুল করিম (দঃ)-এর বিচিত্র এবং মহনীয় কর্মধারার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। আরো লিপিবদ্ধ আছে তৎকালে 'এছ্‌লাম' প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস।

গ্রন্থখানি পাঠকালে মাঝে মাঝে যে দীর্ঘ কবিতা পাওয়া যায় তার অর্থ বুঝ্‌তে না পারলে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন হতে পারে। সেই হিসাবে গ্রন্থটি একজন উদ্দু' জানা 'মোর্শেদের' নিকট বসে পাঠ নেওয়া ও তার ব্যাখ্যা শোনবার মতন উপযুক্ত বলে মনে হয়। তবে তার মধ্যে যতটুকু বাংলা ভাষায় বোধগম্য তা পাঠ করলে পাঠক অবশ্যই দুঃখ-দারিদ্রের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামে বিজয়িনী এবং আদর্শ নারী হিসাবে হজরত ফাতেমা যোহরার প্রতি ও তদীয় পিতা হজরত করিম (দঃ)-এর প্রতি তথা ইসলামের মহান আদর্শের প্রতি পাঠক অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল হবেন।

মনিরউদ্দীন ইউসুফ সাহেব রচিত পুস্তকখানির আকৃতি ৭½''×৫½''। বার্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪। পুস্তকে ভূমিকা প্রদত্ত হয় নি। তবে "প্রাচীন আরবে নারীর স্থান" শীর্ষক সূচনা-প্রবন্ধে প্রাচীন আরবের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। হজরত জোহরার জীবন বৃত্তান্ত তিনি নিম্নলিখিত শিরোনামায় আলোচনা করেছেন ;—

আল আমীন ও তাহেরার পরিণয়
ফাতেমার জন্ম
বাল্য ও কৈশোর
মদীনায়
বিবাহ
পতিগৃহে
সংসার জীবন
জননী রূপে
মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ্বের সফর
পিতৃশোক
দীপ নির্বাণ

পুস্তকখানির প্রকাশক ওসমানিয়া লাইব্রেরী। ৩০, মদনমোহন বর্মণ স্ট্রীট

(মেছুয়া বাজার স্ট্রীট), কলিকাতা-৭। গ্রন্থের প্রথম ভারতীয় সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে হয়ত পুস্তকখানির পূর্ব্ব-পাকিস্তানী (অধুনা বাংলাদেশ) সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল বা হয়ে থাকবে।

মনির উদ্দীন ইউসুফ রচিত গ্রন্থে বিবৃত হজরত ফাতেমার কাহিনীর সংক্ষিপ্তরূপ—

ধনবৈষম্যমূলক দাসত্বের যুগ। দুর্নীতিপরায়ণ কোরেশ সর্দ্দারগণ সব চাইতে বুদ্ধিমান ও প্রতিষ্ঠাবান। এর অন্তরালে চারিত্র ও মানবীয় গুণাবলীও ফল্গুধারার মতন প্রবাহিত ছিল। আবহুল্লাহ্-পুত্র মুহম্মদের বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতা দর্শন করে মক্কাবাসী তাঁকে আল্ আমীন বলে সম্বোধন করতেন। অন্যদিকে ধনাঢ্য মহিলা খোয়ালেদ কন্যা খাদীজার নিষ্কলুষ জীবনের স্বীকৃতি দিয়ে লোকে তাঁকে তাহেরা বা পবিত্রা বলে সম্বোধন করতেন। বাণিজ্যকে উপলক্ষ্য করে এই দুই মহামূল্য মনি একদিন পরস্পরের সান্নিধ্যে আসেন। উভয় পক্ষের আলাপ-আলোচনার পর উভয়ের শুভ পরিণয় সম্পাদিত হয়।

খাদীজার গর্ভে দুই পুত্র ও চার কন্যা জন্মলাভ করে। শৈশবেই দুই পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার নাম ফাতেমা। এই ফাতেমার সন্তান-সন্ততির মাধ্যমেই রসুলের বংশধারা রক্ষিত হয়।

ঐতিহাসিকগণের মতে ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে রসুলুল্লাহের পয়গম্বরী প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে, মতান্তরে নবুওত লাভের পাঁচ বছর পর, ফাতেমার জন্ম হয়। এই সময় মক্কায় আন্তর্গোত্রীয় এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূত্রপাত হচ্ছিল। ফাতেমার মহান পিতার কল্যাণকর হস্তক্ষেপে তা বন্ধ করা সম্ভব হয়। এই হজরত ফাতেমাই মুসলমান জগতের নারী-শিরোমণি, "খাতুনে জান্নাত"। মুসলমান জনগণ তাঁকে 'বতুল' বা সংসার বিরাগিনী বলে অভিনন্দিত করেছেন। তিনি মাত্র আটাশ বছরের স্বল্প-পরিসর জীবনে ধর্মবোধ, পাতিব্রত্য, ধৈর্য্য ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার সহানুভূতি, ন্যায়-পরায়ণতা এবং সমর্পিত-চিত্ততার আদর্শ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

হজরত ফাতেমার চরিতকারগণ বলেন যে শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল ও গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। তিনি জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণের ন্যায় প্রতিবেশী

মেয়েদের সঙ্গে খেলা-ধূলা ও বাক্যালাপ করার জন্য পাড়ায় যাওয়ার চেয়ে গৃহে গুণবতী মাতার সাহচর্যে অবস্থান করাকেই শ্রেয় জ্ঞান করতেন। তিনি দেখেছেন, কি ভাবে তাঁর মাতা স্বীয় অগাধ ঐশ্বর্য্যপতির পায়ে উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন, দীন-দরিদ্রের বন্ধু মহান পিতা যখন সর্ব্বস্ব দান করে নিঃস্ব হয়ে ঘরে ফিরেছেন, মহীয়সী মাতার হাসিমুখে তখনও উচ্চারিত হচ্ছে স্বামীর প্রতি সুমধুর স্বাগতম ধ্বনি। তিনি দেখেছেন মহান পিতা অজ্ঞাত কোন্ এক মহাকর্তব্যের হাতছানিতে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ছেন, আর পতিব্রতা মাতা তাঁর যাত্রাপথকে মধুর উৎসাহবাণীর পুষ্পস্তবকে আচ্ছাদিত করে দিচ্ছেন। ফাতেমা মায়ের এইসব সৎগুণ পুরাপুরিই আয়ত্ব করেছিলেন। একদিন রসুলুল্লাহ তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে তিনি যেন পয়গম্বরের মেয়ে বলে কোনদিন অহঙ্কার না করেন। আল্লাহর সামনে ছোট-বড়র কোন প্রভেদ নেই—সেখানে সকলের সমান বিচার হবে।

খাদীজার পরলোকপ্রাপ্তি হয় নবুয়তের দশম বৎসরে। এর সামান্য কয়েকদিন পূর্বে স্নেহময় পিতৃব্য আবু তালেবের মৃত্যু রসুল পরিবারে নিদারুণ শোকের ছায়া আনে। মক্কার কোরেশ সর্দারগণ রসুলুল্লাহর বিরুদ্ধাচরণে খোলাখুলিভাবে অবতীর্ণ হয় এবং স্বয়ং রসুলুল্লাহর উপর নির্যাতন শুরু করে দেয়। এইসব দুর্ঘটনার সময় নবী-কন্যাকে কখনও সজল চোখে কখনও অনলবর্ষী দৃপ্ত ভঙ্গিমায় পিতার পাশে স্নেহময়ী জননীর মতন দাঁড়াতে দেখা যেত।

কোরেশ সর্দ্দারগণ রসুলুল্লাহকে অসহায় ভেবে তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। রসুল সেই রাত্রেই মক্কা ত্যাগ করে মদীনা-অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিছুদিন পরে ফাতেমাকেও সেখানে আনানো হল।

নবী-নন্দিনী হলেন পূর্ণযৌবনা, তাঁর বিবাহের সময় উপস্থিত হল। রসুলুল্লাহ হলেন জ্ঞানের নগরী, আলী তার দরওয়াজা। দরিদ্র আলীর সহিত ফাতেমার বিবাহে হজরত রসুলুল্লাহ সানন্দে অভিমত দিলেন। ফাতেমাও লজ্জাবনতা হয়ে পিতার অভিমত অনুমোদন করেছিলেন। সেই বিবাহে বাজার থেকে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি কেনা হল যৌতুক হিসাবে,—

একখানা পশমভরা তোষক, একখানা খেজুরের ছালভরা তোষক ; ঐরূপ যথাক্রমে পশম ও ছালভরা দুটি তাকিয়া, একটি রেশমী একটি সূতী চাদর,

দু'গাছি চাঁদির বাজুবন্দ, দুটি মাটির কলসী, একটি আটা-পেষার যাঁতা ও একটি করে মোশক, খাট এবং জায়নামাজ। অভিজাত বংশীয়দের বিবাহ-রীতির বিপরীত সরল ও অনাড়ম্বর এই বিবাহ ও ততোধিক সাদাসিধা যৌতুক।

পতিগৃহে গমনকালে পতির দারিদ্রহেতু তাঁর দুঃখ প্রকাশ পেলে মুহম্মদ (দঃ) বলেছিলেন,—"মা, পুরুষদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান এবং আমার সাহেবাগণের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান তাঁরই সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছে, —এতে দুঃখ কি ?"

পিতার উপরোক্ত সান্ত্বনাবাক্যে মুহূর্তের মধ্যে সন্তোষের জ্যোতির্ময় আভা ফিরে পেলেন ফাতেমা।

অবশেষে ফাতেমা পতিগৃহে যাত্রার উদ্যোগ করলেন। যাত্রার পূর্ব্বে রসুলের আদেশ অনুসারে তিনি ঘৃত, পনির ও খোরমা সহযোগে এক সুখাদ্য প্রস্তুত করে উপস্থিত মোজাহেদ ও আনসারগণকে প্রদান করবার ব্যবস্থা করলেন। একটি বাটীতে কন্যা ও জামাতাকে আহার করতে দেওয়া হল। পরে হজরত মহম্মদ (দঃ) উভয়কে উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন।

আলী ও ফাতেমা মদীনার উপকণ্ঠে হারেসা নামক এক আনসারের ভাড়াটে ঘরে এলেন।

নবী-নন্দিনী ফাতেমা ও আলীর সংসার জীবন ছিল সরলতা ও হৃদয়তার প্রতীক। কায়িক পরিশ্রমে আলীকে তাঁদের জীবিকা অর্জন করতে হত। হজরত আলীর একদিন মজুরী জুটল না। দিনান্তে বন্দরে এক মালবোঝাই কাফেলা এসে হাজির হতে তাঁর কাজ জুটে গেল। মাল নামাতে রাত হয়ে গেল। হজরত ফাতেমা ততক্ষণ পর্য্যন্ত উৎসুকভাবে স্বামীর পথপানে চেয়ে রইলেন। স্বামী ঘরে এলে ফাতেমা বস্ত্রাঞ্চলে তাঁর কপালের ঘাম মুছে দিলেন, তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়ে যাঁতায় যব পিষতে বসলেন। তারপর গভীর রাত্রে আহার শেষ করে আল্লাহকে দিলেন অশেষ ধন্যবাদ।

হঠাৎ একদিন রসুলুল্লাহ এসে হাজির হলেন কন্যা ফাতেমার বাড়ীতে। কিন্তু পিতার মুখ গম্ভীর কেন ? নবীকন্যা তো কেঁদে আকুল। রসুলের অনুগত আবু রাফের কাছে জানা গেল যে তিনি ফাতেমার ঘরের রঙীন পর্দা এবং

তাঁর হাতের রৌপ্যবলয় দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। হায়! এখনও এমন অনেক মুসলমান রয়েছেন যাঁদের পরণে কাপড় পর্যন্ত নেই, দুইবেলা খাদ্যের সংস্থান নেই।

ফাতেমার এ এক নতুন শিক্ষা। ঐশ্বর্য্য মানুষের ভোগের সামগ্রী কিন্তু অন্যকে বঞ্চিত করে নয়। মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব শুধু মুখের কথাতেই শেষ হয়ে যায় না,—একের দুঃখ দূর না হলে অন্যের সুখভোগ অবাঞ্ছনীয়। তাই মদীনার ঘরে ঘরে গৃহিনীগণ দুপুরের শ্রান্তিতে যখন গা এলিয়ে দেন, ফাতেমা গৃহদ্বার রুদ্ধ করে তখনও গৃহকর্ম করেন। একদিন উম্মে আয়মন দেখেন যে নবীনন্দিনী একহাতে যাঁতা ঘুরাচ্ছেন এবং অন্যহাতে শিশু হোসেনের দোলনায় দোল দিচ্ছেন।

একবার তিনবেলা উপবাসের পর কিছু যব সংগ্রহ করে তা থেকে রুটি তৈরী করলেন এবং আহার করবার আগে পিতার কথা মনে পড়ায় ফাতেমা কয়েকটি রুটি এনে পিতার নিকট হাজির করলেন। নবীবর একটুকরা রুটি মুখে দিয়ে বল্‌লেন,—"চারবেলা অনাহারে থাকার পর এই রুটিটুকু তোমার পিতার মুখে গেল।"

একদা আলীর সঙ্গে নবী-কন্যার মতান্তর হল। ফাতেমা অভিমানে পিতার নিকট এলেন। সঙ্গে সঙ্গে আলীও সেখানে এলেন। অভিযোগ শ্রবণান্তে পিতা কন্যাকে বল্‌লেন,—"মেয়েদের মধ্যে সহিষ্ণুতার অভাব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।"

হজরত আলীও শ্বশুরের এই আচরণ লক্ষ্য করে বল্‌লেন—"আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আর কখনও নবীকন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ কর্‌ব না।"

ঐতিহাসিকগণের মতে বিখ্যাত ওহুদ যুদ্ধের বছরে রমজান মাসে ফতেমার প্রথম সন্তান হাসানের জন্ম হয়েছিল। ওহুদ যুদ্ধের পরের বছর হজরত ফতেমার দ্বিতীয় পুত্র হোসায়নের জন্ম হয়। উভয় ভ্রাতার নাম রেখেছিলেন নবী নিজে। ফতেমা তাঁর সন্তানদ্বয়কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আবার দীন-দরিদ্রকেও তিনি সন্তানদের ন্যায় স্নেহ করতেন। একদিন এক ক্ষুধার্তকে দিবার মত আহার্য ঘরে না থাকায় নিজের গলার হারটি তাকে অর্পণ করেছিলেন। অন্যদিন প্রতিবেশী শত্রু শামউনের স্ত্রীবিয়োগ হলে কেউ সেখানে খবর পর্যন্ত নিতে গেল না; তখন ফাতেমা সেখানে গিয়ে মৃতের গোসল করিয়ে এবং দাফন্‌-কাফনের ব্যবস্থা করে এলেন।

হজরত ফাতেমার দুই কন্যা সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম যথাক্রমে জয়নব ও উম্মে কুলসম।

মক্কা বিজয়ের অভিযানে হজরত ফাতেমাও রসুলুল্লাহের সঙ্গে ছিলেন। হোসায়েন যুদ্ধে জয়লাভের পর রসুলুল্লাহ্ মদিনায় ফিরে আসেন, এবং সম্ভবতঃ সেই সময় নবী-নন্দিনীও মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

হজরত ফাতেমার ইচ্ছা বহুদিন পর এবার পূর্ণ করে তাঁর গৃহকর্মে সহায়তার জন্য রসুলুল্লাহ্ খয়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত প্রচুর দাস-দাসীর মধ্য থেকে একজন দাসী প্রদান করেন।

সাম্যবাদী ইসলামী সমাজে দাস-দাসী বিষয়ক প্রশ্নটি গুরুতর প্রশ্ন। তখন দুনিয়ার সর্বত্র সামন্ত যুগের শৈশবকাল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ্ দাস-প্রথাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। তবু তাঁর কাছে আপন কন্যা ও দাসীর মধ্যকার যে সম্পর্কের কথা বলেছেন ত লক্ষ্যণীয় ;—

> "ঘরের অর্ধেক কাজ তুমি করবে, বাকী অর্ধেক দাসীকে দিয়ে করাবে। দু'জনে মিলে যাঁতা পিষবে। তুমি নিজে যা খাবে, তাকেও তা খেতে দেবে, নিজে যা পরবে তাকেও তা পরতে দেবে। তাকে আপন জনের মত দেখো।"

বস্তুতঃ এ ঘটনা সেই দাসীর জীবনে দাসীত্ব থেকে সাম্যবাদী বিবেচনায় মুক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

পিতা যখন সমগ্র আরবের অধীশ্বর তখনও কিন্তু সমাজের কঠোর বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে জান্নাতে-খাতুনের সংসারে অর্থকষ্টের লাঘব হয়নি। এমন অবস্থাও একদিন গেছে যে ঈদের দিনে হাসান-হোসেনকে নতুন পোষাক কিনে দিতে খাতুনে-জান্নাত অক্ষম হয়ে পড়লে কোনো এক ব্যক্তি, ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্য ঈদের সওগাত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

রসুলুল্লাহ্ মদীনা থেকে ফিরে এলেন মক্কায়। সেখানে তিনি হজব্রত উদ্‌যাপন করলেন। তারপরই তাঁর জ্বর হল, এল অন্তিমকাল। হজরত ফাতেমা অহোরাত্র পিতার শয্যাপার্শ্বে বসে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। মৃত্যুর পূর্বে কন্যাকে রসুলুল্লাহ বলেছিলেন যে মৃত্যুর পরপারে খাতুনে-জান্নাতের সঙ্গে রসুলুল্লাহের প্রথম সাক্ষাৎ হবে। বাস্তবিক, পিতার পরলোকগমনের মাত্র ছয়মাস পরেই হজরত ফাতেমার মৃত্যু ঘটেছিল।

পিতার মৃত্যুর পর হজরত ফাতেমার বাকী কয়েক মাসের জীবন বৈরাগ্যের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। তিনি "জান্নাতুল বাকী" নামক মরুদ্যানে এক লতামণ্ডপ নির্মাণ করে সেখানে ধ্যানমগ্না হতেন।

কথিত আছে, পুত্র-কন্যাদের হাতে ফিদক নামক মরুদ্যানের অধিকার তুলে দেবার জন্য খলিফা আবু বকর সিদ্দীকের নিকট প্রার্থনা করলে খলিফা বলেছিলেন—"নবীর কোন ওয়ারিশ হয় না, গোটা উম্মতের দীন-দুঃখীই নবীর উত্তরাধিকারী।"

খলিফার এমন যুক্তিপূর্ণ কথায় হজরত ফাতেমা লজ্জিতা হয়েছিলেন।

বলা হয় যে "জান্নাতুল বাকীর" শোক মণ্ডপে থাকাকালে হজরত ফাতেমা নিম্নলিখিতরূপ শোক-গীতি রচনা করেছিলেন—

"আকাশের বুক ভরিল ধূলায় নিভিল সহসা সূর্যকর,
শত জ্যোতিষ্ক আকাশ-বেলায় মলিন হইল—হোল নিথর!
এ জগত-সভা ভাঙ্গিয়া গেল রে,—শোকেতে ভরিল বক্ষ তার,
পশ্চিম হতে পূরব সীমায়, ছড়াইয়া পড়ে সে হাহাকার।
মিশর এ্যমনে উঠে ক্রন্দন, গিরি-প্রান্তর কাঁপিছে হায়,
ধরণীর বুকে এলো কি প্রলয়? সেই ভয়ে সবে কেঁদে লুটায়।
এই পৃথিবীর মর্মে মর্মে বাজিছে একই ব্যথার সুর,
আর আসিবে না খোদার রসুল, নারিবে না ওহী পূত মধুর।
সালাম সালাম, হে পিতঃ রসুল জানাই তোমারে লাখো সালাম,
আমিন, আমিন! বলে ফেরেস্তা শুনি পবিত্র তোমার নাম।"

চরিতকারগণ বলেন যে রসুলুল্লাহের মৃত্যুর পর আর কোনদিন হজরত ফাতেমাকে হাসতে দেখা যায়নি। পিতৃশোকে তিনি দিনে দিনে কৃশতনু হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর কোন পীড়া দেখা দেয়নি। সেদিনটি একাদশ হিজরীর ৩রা রমজান; তখন তাঁর বয়স সাড়ে আটাশ বছর পূর্ণ হয়েছিল।

হজরত ফাতেমা কোথায় শেষ-শয্যায় শায়িতা আছেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে "জান্নাতুল বাকী" নামক স্থানই তাঁর সমাধিভূমি। তাঁর স্বামী হজরত আলী ছিলেন মুসলিম জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। আরবীয় সেই কবি একস্থানে পত্নী হজরত ফাতেমা সম্পর্কে লিখেছেন—

"আমার নসীব মন্দ বলেই কবর হতে পাইনে সাড়া
নিত্য এসে জানাই সালাম দাওনা জবাব হে জোহরা।
দীর্ঘ দিনের মধুর স্মৃতি সব ভুলেছ আজকে বুঝি,
তাই, হৃদয় হারার সালাম শুনেও নীরবে রও দুচোখ বুঁজি।"

পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা কম হলেও হজরত ফাতেমা যোহরা সম্পর্কে অনেক কথাই মনির-উদ্দীন সাহেবের পুস্তকে স্থান পেয়েছে। খাতুনে জান্নাত সম্পর্কে এমন সরস ভাষায় ও একটা স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় লিখিত কোন গ্রন্থ সম্ভবতঃ এখনো পর্য্যন্ত লিখিত হয়নি। পুস্তকখানি পাঠের সময় পাঠকের স্বতঃউৎসারিত একটা ভক্তিভাব জেগে ওঠে। এই গ্রন্থের অন্যতম লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা আরবী, ফারসী প্রভৃতি শব্দের প্রাচুর্য্যে কণ্টকিত নয়। আরবী বা উর্দ্দু কবিতা নেই। দু একটি কবিতার সহজবোধ্য ভাবানুবাদ গ্রন্থখানিকে রসগ্রাহী হতে যথেষ্ঠ সহযোগিতা করেছে। মূলতঃ হজরত ফাতেমা জোহরার জীবনকথা বিবৃত হলেও কাহিনী পরিবেশন করার শিল্প-কৌশল পাঠকের ভক্তিনম্র ভাবনাকে ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। তাছাড়া মুসলমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হজরত ফাতেমা যোহরার কথা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তৎকালীন আরবের ঐতিহাসিক বিবরণের কিছু অংশ লেখক সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হজরত ফাতেমা যোহরার কথা প্রায় হাজার বৎসরের পূর্বের কথা, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে তার প্রথম স্থান লাভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। শেখ সেরবাজ চৌধুরী, আজম তুল্লাহ খোন্দকার, কাজী বদিউদ্দীন এবং অজ্ঞাত কোন এক কবি কর্তৃক লিখিত ফাতেমা বিষয়ক গ্রন্থের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী বলে অভিহিত। "বিবি ফাতেমার বিবাহ" নামক আরো একখানি পুঁথির নাম পাওয়া যায়। উক্ত পুথিরও রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ রচিত "হজরত ফাতেমা যোহরা" গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৫. ৭. ৩৫। ১৯৩৫ ইংরেজী, নাকি ১৩৩৫ বাংলা তা বুঝা যায় না। আমার হস্তগত পুস্তকখানির অষ্টম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৩৭১ বঙ্গাব্দ। বস্তুতঃ প্রথম প্রকাশ ৩৬। ৩৭ বৎসর (১৯৭২-১৯৩৫) পূর্বে হয়েছিল বলে ধরা যায়। মনির-উদ্দীন ইউসুফ রচিত গ্রন্থের রচনাকাল বাংলা ১৩৭৩ সালের পয়লা বৈশাখ। সম্ভবতঃ

মনিরউদ্দীন ইউসুফ রচিত "হজরত ফাতেমা" নামক গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত খাতুনে জান্নাতের জীবনী সম্পর্কীয় সর্বাধুনিক সাহিত্য-সংযোজনা।

বারাসত থানাধীন সহরা গ্রামে পীরানী হজরত ফাতেমা যোহরার নামে কল্পিত যে দরগাহ আছে, তাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি লোককথা প্রচলিত আছে। সেই লোককথার দুটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হল ;—

১। **দরগাহের অশ্বত্থগাছ**

বিবি ফাতেমার দরগাহ-গৃহটির উপর চার-পাঁচটি অশ্বত্থ গাছ ছিল। সেবার কাঠের বাজার-দর ছিল ভাল। স্থানীয় কোন এক লোভী ব্যক্তি উক্ত অশ্বত্থগাছ বিক্রী করে অর্থ লাভ করতে চাইল। দরগাহের গাছ বিনষ্ট করতে নিষেধ করল অনেকে। সে কারো কথা না শুনে গাছ বিক্রী করে টাকা নেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় দরগাহের উপরিস্থ একটি অশ্বত্থ গাছ বাদে সবগাছ মরে যায়। বাকী গাছটি দিনে দিনে সতেজ হয়ে ওঠে। অপর দিকে উক্ত ব্যক্তির ঘরে আগুন লাগে এবং আরো কিছু কালের মধ্যে কোন ঘটনায় লোকটি নাকি খুন হয়ে যায়। উক্ত ব্যক্তির নাম ছবুলাল।

২। **ভক্তির পুরস্কার**

খুব বেশী দিনের কথা নয়,—বছর তিরিশেক হবে। কোন কারণ বশতঃ উক্ত দরগাহের আশ-পাশের ঘরে আগুন লেগে যায়। দরগাহের সেবায়েত ছিলেন অতীব দরিদ্র ব্যক্তি। তিনি একমনে শুধু বিবি ফাতেমার নাম স্মরণ করতে থাকেন,—হে বিবি ফাতেমা! তুমি আগুন সংবরণ করে দাও। আগুনের তেজ আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে এবং শেষে নিভে যায়। পরে গিয়ে দেখা গেল যে,—মাঝখানের উক্ত সেবায়েতের ঘরখানি বাদে আর সমস্ত ঘরই পুড়ে ছাই হয়ে মাটিতে মিশে গেছে।

সহরা গ্রামে অবস্থিত দরগাহকে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধা করেন। ভক্ত জনসাধারণ এখানে হাজত, মানত এবং সিরনি প্রদান করে থাকেন। অবিচলিত বিশ্বাসে তাঁদের অনেকে দরগাহ থেকে তেল-মাটি নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করেন। তাতে তাঁদের নাকি উপকার হয় বলেও শোনা যায়।

————

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বদর পীর

শাহ্ বদর একজন খ্যাতিমান পীর। লোকে তাঁকে সাধারণতঃ বদর পীর, বদর শাহ্ বা পীর বদর বলে থাকেন। তাঁর পুরা নাম মখদুম শাহ বদরুদ্দীন বদর আলম যাহিদী। কদলখান গাজীর সমসাময়িক দরবেশ বদর আলম এবং মখদুম শাহ্ বদরুদ্দীন বদর আলম যাহিদী একই ব্যক্তি বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক,—কারণ উভয়ের আগমনকাল একই। শাহ্ বদরকে চট্টগ্রামে মুসলিম বিজয়ের অগ্রগণ্য পথিকও বলা হয়। চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বটতলী গ্রামে মহসীন আউলিয়ার মাজারে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে বুঝা যায় যে, পীর বদর শাহ্ ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। চট্টগ্রাম শহরের মধ্যবর্ত্তী বখশীবাজার মার্কেটের দক্ষিণে তাঁর প্রসিদ্ধ দরগাহ্ বিদ্যমান। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তাঁর দরগাহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি তাঁর মাযার নয়। তিনি এসে এখানে একটি খানখাহ স্থাপন করেছিলেন। সেটিই মাযার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। চট্টগ্রামের ভক্তগণ তাঁকে অভিভাবক ওলী বলে থাকেন। মাঝি-মাল্লারা তাঁর নামে নদীতে পাড়ি দেন। কেহ কেহ তাঁকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রথম ইসলাম ধর্ম-প্রচারক বলে মনে করেন। চট্টগ্রামের যে পাহাড়টি পীর-পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ, তিনি নাকি সেখান থেকে জিন-পরীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই পাহাড়টিই এককালে আরকানের মগ দস্যুদের আড্ডা ছিল। অনুমিত হয় যে ঐ অঞ্চল থেকে জিন-পরী বা মগ দস্যুদের বিতাড়নকালে পীর বদরের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়েছিল। প্রতি বৎসর ২৯শে রমজান তারিখে এখানে উরস হয়। সে উরসে বহু লোক-সমাগম হয় এবং তাতে জনসাধারণের মধ্যে শিরনী বিতরণের প্রচলন আছে।

নওল কিশোর কর্তৃক প্রকাশিত ও মৌলবী গোলাম নবী খান কৃত মিরআতুল কওনয়ন নামক গ্রন্থ থেকে মাওলানা মহম্মদ উবয়দুল হক কৃত তযকিরায়ে আউলিয়াই বাঙ্গালা প্রথম খণ্ডের উদ্ধৃতি পাঠে জানা যায় যে, মখদুম শাহ্ বদরুদ্দীন বদর আলম যাহিদীর পূর্ব্ব-পুরুষ ছিলেন হজরত

শিহাবুদ্দীন ইমাম মক্কী। তাঁর পুত্র হজরত ফকরুদ্দীন, ইসলাম প্রচার উদ্দেশ্যে পিতার আদেশে প্রথম এ দেশে এসে মিরাঠাবাদের নিকট বাস করতে থাকেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শিহাবউদ্দীন যখন শহীদ হন তখন তাঁর পুত্র হজরত ফকরুদ্দীন মাতৃগর্ভে ছিলেন। তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র শাহ বদরুদ্দীন বদর আলম যাহেদী মিরাঠাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে বিখ্যাত পরিব্রাজক সুহরাবর্দ্দীয়া দরবেশ হজরত মখদুম জালালুদ্দীন জাহানীয়া জাহান গশতের (১৩০৭-১৩৬৩ খৃঃ) বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করেন। তিনি পিতার উপদেশ ও বিহার শরীফের হজরত মখদুম শরফুদ্দীন আহম্মদ ইয়াহ্ইয়া মানেরীর (১২৬৩-১৩৬৩ খৃঃ) অনুমতিক্রমে তিন-চার শত দরবেশ সঙ্গে নিয়ে বঙ্গদেশে আসেন এবং চট্টগ্রামের সমুদ্রোপকূলে আস্তানা স্থাপন করে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। পরে হিঃ ৭৮২/১৩৮০ খৃষ্টাব্দে হজরত মানেরীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বিহার শরীফে যান। কিন্তু তাঁর পৌঁছুবার অল্প কিছুদিন পূর্বে মানেরী দেহত্যাগ করেন। সুদীর্ঘ জীবন যাপন করে হিঃ ৮৪৪/১৪৪০ খৃষ্টাব্দে শাহ্ বদরুদ্দীন বদর আলম যাহিদী বিহারে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বংশধরগণের মধ্যে নওয়াব শামসুল উলেমা মৌলবী সইয়িদ আবদুল জব্বার খান বাহাদুর ও তৎপুত্র খান বাহাদুর সইয়িদ আবদুল মুমিন (চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার / আগস্ট ১৯৪৪) সুপরিচিত। তাঁর অপর আস্তানা বর্ধমান জেলার কালনায় (দ্রষ্টব্য : পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো : চৌধুরী শামসুর রহমান) এবং বঙ্গের আরো স্থানে আছে। চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত পৃথিবা-বদর নামক গ্রামে বদর পীরের একটি দরগাহ আছে।

বদরুদ্দীন সংক্ষেপে বদর এই নামে আরো পীরের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। চৌধুরী শামসুর রহমান লিখেছেন :—

শেখ বদরুল ইসলাম শহীদ, হজরত নুর কুতবুল্ আলমের সমসাময়িক বলে জানা যায়। রিয়াজুস সালাতীন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তাঁকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত রাজা কংসের হস্তে তিনি শহীদ হন। রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করার অপরাধেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। আশরাফ জাহাঙ্গীর সিম্নানী, জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর নিকট লিখিত পত্রে এই শহীদ দরবেশের কথা উল্লেখ করেন।

শামসুর রহমান সাহেব আর একজন পীরের কথায় লিখেছেন,—দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ নামক স্থানে পীর বদরুদ্দীন বদ্‌রে আলম নামক একজন প্রাচীন দরবেশের মাজার বিদ্যমান। সুলতান হোসেন শাহের সময়ে (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ) এ দরবেশ কতিপয় শিষ্য-সাগরেদসহ উত্তরবঙ্গের এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করেন। দরবেশ সম্পর্কে স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, মহেশ রাজা নামে জনৈক হিন্দু সামন্ত তখন এ অঞ্চলে বাস করতেন এবং তিনি ছিলেন ভীষণ অত্যাচারী। শেখ বদরুদ্দীনের প্রচেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই স্থানীয় বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় তিনি, দরবেশ ও তাঁর অনুচরদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠেন। দরবেশ তখন রাজাকে দমন করার জন্য সোলতান হোসেন শাহের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। রাজা তাতে ভীত হয়ে স্বীয় প্রাসাদ ত্যাগ করে স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। এভাবে রাজার পলায়নের পর বদরুদ্দীন পরিত্যক্ত রাজবাড়াতে গিয়েই নিজের আস্তানা করেন। প্রাচীন কোন হিন্দু মন্দির বা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত প্রস্তর-রাজির সাহায্যেই পীর বদরুদ্দিনের সমাধি নির্মিত হয়েছে দেখা যায়। বারাসতের অন্তর্গত পৃথিরা-বদরে যে দরগাহ্ আছে তার বিবরণ এইরূপ ঃ—

বদরের হাটখোলায় অবস্থিত দরগাহ-গৃহটি ইটের তৈরী। গৃহটি সুরম্য বটে। গোলাম সুভান শাহজী প্রমুখ এখানকার সেবায়েত। প্রতিদিন সেখানে তাঁরা ধূপবাতি প্রদান করেন। পূর্বে এখানে মেলা বসত। প্রতি বৎসর ১২ই মাঘ তারিখে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ভক্তগণ পীর বদরের নামে হাজত, মানত ও শিরনী প্রদান করেন। তাঁর নামে প্রায় নয় বিঘা জমি পীরোত্তর আছে। এখানকার হাটের নামকরণ তাঁর নামানুসারেই হয়েছে। অনেকে তাঁর নাম স্মরণ করে হাটে সওদা বেচা-কেনা করেন। এতদঞ্চলে তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক একটি লোককথা প্রচলিত আছে। লোককথাটি এইরূপ ঃ—

ফকির বেশে বদর পীর

স্থানীয় এক বেহালা-বাদক পালা-জ্বরের প্রকোপে মরণাপন্ন। তখন পালা-জ্বরে তেমন কোন অব্যর্থ ঔষধের কথা এ অঞ্চলে সম্ভবতঃ অজানা ছিল। বেহালা-বাদক নিরাশ হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এমতাবস্থা দেখে পীর বদরের ভক্ত জনৈক ব্যক্তি উক্ত বেহালা-

বাদককে সেই পীরের দরগাহে ধর্ণা দিতে পরামর্শ দান করেন। তিনি কয়েকদিন বদর পীরের দরগাহে ধর্ণা দেবার পর একদিন ভোরের আব্‌ছা আলোয় আলখাল্লা পরা এক ফকিরকে দেখতে পেলেন। ফকির তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমি এখানে ধর্ণা দিচ্ছ কেন?"

বেহালাবাদক বল্‌লেন,—"আমার রোগ নিরাময়ের জন্য।"

—"তোমার বেহালাখানা আমায় দিলে আমি তোমার রোগ সারিয়ে দিতে পারি।"

বেহালাখানি সব সময় তাঁর কাছে থাক্‌ত। তিনি তৎক্ষণাৎ বেহালাখানি ফকিরকে দিতে গেলেন। আশ্চর্য্য! ফকির অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সকালে বেহালা-বাদক দোদুল্যমান মানসিক অবস্থা নিয়ে বাড়ী এলেন,—পীর কি তাঁর সঙ্গে ছলনা করলেন!

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় যে কয়েকদিনের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে উঠ্‌লেন।

বদর পীরের নামে রচিত কোন সম্পূর্ণ-গ্রন্থের সন্ধান আজো পাওয়া যায় নি। কবি আশক মহম্মদ রচিত "পীর একদলি শাহ্‌ পাঁচালী কাব্যের" মধ্যকার ২২৬ পংক্তির একটি খণ্ড-কাহিনী পাওয়া গেছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ :—

পীর একদলি শাহ্‌ দীক্ষা নেবার জন্য চট্টগ্রামের পীর বদরের সন্ধানে চল্‌লেন। চট্টগ্রামে গিয়ে যার সাক্ষাত পেয়ে তিনি আকৃষ্ট হলেন, সে একজন রাখাল বালক। রাখাল বালকটি তখন ছিল ক্রীড়ায় মত্ত। এমনই মত্ত যে কোন দিকে তার খেয়াল নেই। একদিল শাহ্‌ তাকে নেহাত বালক-রাখাল বলে মনে মনে একটু অবজ্ঞা প্রকাশ করলেন। রাখাল-বালক আর কেউ নন, তিনিই পীর বদর। একদিল শাহ অবজ্ঞা করায় তিনি অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে যান। এই ঘটনায় একদিল শাহ্‌ সম্বিৎ ফিরে পান এবং বদর পীরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

একদিল শাহ্‌ তখন বদর পীরের অন্যতম ভক্ত 'সরুয়ার' শরণাপন্ন হন। সরুয়ার বাড়ীতেই পীর বদরের কবর। তিনি গেলেন সেই কবরের সন্ধানে। কবরের মধ্যে পেলেন বদর পীরের গলিত দেহ। অনেক কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা তিনি পীর বদরের সাক্ষাত পেতে চাইলেন, কিন্তু তাতেও দেখা না পাওয়ায়

পীর একদিল আগুনে প্রবেশ করে আত্মাহুতি দিতে গেলেন। এবার বদর পীর হলেন সন্তুষ্ট। আগুনকে তিনি ফুলে রূপান্তরিত করে একদিল শাহের জীবন রক্ষা করলেন। পরে তিনি একদিল শাহকে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যত্বে বরণ করলেন এবং পীর একদিলকে কিছু অলৌকিক শক্তিতে শক্তিমান হতে সাহায্য করলেন। এর পর পীর একদিল শাহ বিদায় নিলেন বদর পীরের নিকট থেকে।

উপরোক্ত কাব্য ব্যতীত জহদি রচিত মানিক পীরের "জহুরানামা পাঁচালীতে" সন্নিবেশিত বদর পীরের মাহাত্ম্যকথা বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ যোগ্য।

দুস্তর নদীপথে যাত্রার আগে মাঝিরা নৌকার যথাস্থানে উপবিষ্ট হয়ে হা'লে হাত রেখে ভক্তিভরে সমবেত সুরে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন ;—

আমরা আজি পোলাপান
গাজী আছে নিখাবান।
শিরে গঙ্গা দরিয়া
পাঁচ পীর বদর বদর ॥

সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ নামক গ্রন্থের এক প্রবন্ধে মনির-উদ্দীন-ইউসুফ লিখেছেন,—"হিন্দু–মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মাঝি-মাল্লারাই তাদের গানে এই সাধকের নামকে যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় করে রেখেছে। হিন্দুরা বলে,—

আমরা আছি পোলাপাইন
গাজী আছে নিগাবান,
শিরে গঙ্গা দরিয়া
পাঁচ পীর বদর বদর।

মুসলমানেরা বলে ঃ—

আমরা আছি পোলাপাইন
গাজী আছেন নিগাবান,
আল্লা নবী পাঁচপীর
বদর বদর।

এই পীরের নাম নিয়েই পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার তাঁর পালা শুরু করেন এইভাবে,—

চাইর দিক মানি আমি মন কৈলাম স্থির।
মাথার উপরে মানম আশী হাজার পীর ॥
আশী হাজার পীর মানম লাখ পেকাম্বর।
শিরের উপরে মানম চাটীগাঁর বদর ॥

———

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বড়খাঁ গাজী

পীর মোবারক বড়খাঁ গাজী বঙ্গে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন নামে পরিচিত। সে নামগুলি এইরূপ ঃ—

মোবারক সাহ্ গাজী,[৬৮]
বড় খাঁ গাজী,[১৩]
বরখান গাজী,[৫৩]
মব্‌রা গাজী,[৪৭]
গাজী সাহেব[১৭]
গাজী বাবা[৬৮]।

সমগ্র চব্বিশ পরগণা জেলায় পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর প্রভাব বিস্তৃত। তা ছাড়া যশোহর, খুলনা, নদীয়া, ময়মনসিংহ জেলার বহুস্থানে তাঁর প্রভাব আছে। তাঁর লীলা-ক্ষেত্র মূলতঃ চব্বিশ পরগণা জেলাকে নিয়ে প্রায় আট-দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী।

তাঁর পিতার নাম সেকেন্দার শাহ,[১৩] —মতান্তরে চন্দন শাহ্[৬৮]। কারো মতে, তাঁর পিতা ছিলেন পীর গোরাচাঁদের সহচর শাহ্ আবদুল্লাহ্ ওরফে শাহ্ সোন্দলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর মাতার নাম কুলসম বিবি। [৪০]

তাঁর জন্ম বেলে আদমপুরে, —মতান্তরে বৈরাটনগরে[১৩]। বেলে আদমপুর [৬৮] গ্রামটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত। কিন্তু বৈরাটনগর গ্রামটি যে কোথায় তা জানা যায় না। তাঁর কবরস্থান আলিপুর সদরের ক্যানিং থানাধীন ঘুটিয়ারী গ্রামে, [৬৮] —মতান্তরে তাঁর মৃত্যু হয় শ্রীহট্ট জেলার শিবগাঁও গ্রামে অথবা গাজীপুরে। [১৩]

পীর মোবারক গাজীর দেহ-বর্ণনা এইরূপ ঃ—

তাহার রূপেতে আলো হইল ভুবন।
শশীছটা নিন্দেরূপ অতি সুশোভন॥

সেরূপ বর্ণনা করা অক্ষম আমার।
দুনিয়াতে নাহি কিছু উপমা তাহার ॥ ১৩

অথবা,

ইন্দ্র যেন স্বর্গমাঝ বড়খাঁ গাজীর সাজ
দেখিয়া জুড়ায় দুটি আঁখি ॥
গীরিদা হেলান গা ময়ূর পুচ্ছের বা
খাবাসে তুলিয়া দেয় পান ॥
মাথায় চিকন কালা হাতে ছিলিমিলি মালা
গাজী পড়ে বসিয়া কোরাণ। ৫৪

অথবা,

মোবারক বসে আছেন কদম্ব তলায় ॥
হাসা চিতা দুটি বাঘ আছে দুইদিগে।
গাজীর মাথায় জট দেখে দুই বাঘে ॥ ৬৮

অথবা,

জট মাথে গুণের চট্ গায়েতে দিয়াছে।
পঞ্চম বৎসরের বালক হইয়া রয়েছে ॥ ১৫

অথবা,

গাজী সাহেবের মূর্তি সুশ্রী বীরপুরুষের মত। রঙ্ ফরসা, সব সময় যোদ্ধার বেশ পরেন। মুসলমানী চোগাচাপকান, পিরান, পায়জামাও পরেন। মাথায় টুপি বা পাগড়ী, মুখে লম্বা দাড়ি, গোঁপ-জোড়া কান পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জুল্‌ফি নামানো, চোখ দুটি বড় বড়, এক হাতে অস্ত্র বা আশাদণ্ড, অপর হাতে লাগাম। পায়ে বুট জতো, পা দুটি রেকাবের উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা। বাহন বৃহৎ আকৃতির ঘোড়া। ......পূর্ণ মূর্তি বিরল। ৩৮

গাজীর পট আশুতোষ মিউজিয়ামে আছে। ২

পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর বিবাহ হয়েছিল ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের কন্যা চম্পাবতীর সঙ্গে। চম্পাবতী অল্পদিনেই মৃত্যু বরণ করেন, বা আত্মহত্যা করেন।

মতান্তরে চম্পাবতী আত্মহত্যা করেন নি বা অল্পদিনে মৃত্যুবরণ করেন নি।

পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর দুই পুত্রের নাম পাওয়া যায়। নাম দুটি যথাক্রমে দুঃখী গাজী ও মেহের গাজী। তাঁর কন্যা ছিল কিনা জানা যায় না। ৮

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ঘুটীয়ারী শরীফে অবস্থিত পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর কবরস্থান বা দরগাহে প্রতি সাঁজ-সকালে ধূপবাতি দিয়ে তাঁর আত্মার শান্তির জন্য জিয়ারত অর্থাৎ আল্লাহ্ তালার নিকট প্রার্থনা করা হয়। ভক্ত জনসাধারণ তাঁর কবরস্থানে ফুল, ফল, দুধ, বাতাসা প্রভৃতি দিয়ে থাকেন। তাঁরা হাজত, মানত এবং শিরনিও দিয়ে থাকেন। তাঁর বংশধরগণই এখানকার দরগাহের সেবায়েত। বর্তমান (১৩৬৩) সেবায়েতগণের বয়োজ্যেষ্ঠ মোহাম্মদ আজিজ দেওয়ান (৮০), নানাজী (৮৫) মোহাম্মদ সৈয়দ আলি (৮২) প্রমুখ বলে অভিহিত।

ঘুটিয়ারী শরীফে প্রতি বছর ৭ই আষাঢ় তারিখ থেকে সাতদিনের এক মেলা বসে। উক্ত তারিখটি পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর তিরোধান দিবস বলে চিহ্নিত। উক্ত মেলা উপলক্ষে জনসাধারণের যে সমাগম হয় তার গড় পরিমাণ প্রায় ছয়–সাত হাজার।

প্রতি বছর ১৭ই শ্রাবণ তারিখে ঘুটিয়ারী শরীফে পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীকে স্মরণ করে যে "উরস" উৎসব উদ্‌যাপিত হয় তা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। একদিনের সেই উৎসবে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। শিয়ালদহ থেকে বিশেষ ট্রেনেরও ব্যবস্থা করতে হয়। বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বঙ্গের বাইরে থেকেও বহু ভক্তের আগমন ঘটে। এখানকার মেলা, মেলা-প্রধান বাংলার অন্যতম বিশেষ মেলা বলে প্রসিদ্ধ।

ঘুটিয়ারী শরীফে অবস্থিত পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর সমাধি বা দরগাহটি একটী সুদৃশ্য সৌধ বিশেষ। সৌধটী অনেকের নিকট গাজী বাবার দরবার নামে পরিচিত। দরবার বা দরগাহের গা ঘেঁসে ছোট-বড় কুটীর গড়ে উঠেছে। সেখানে পীরের দরগাহে দিবার জন্য প্রস্তুত শিরনি অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায়। দরগাহের পাশে বাজার গড়ে উঠেছে। সেখানে গোমাংস ব্যতীত প্রায় সব পশার পাওয়া যায়। ঘুটীয়ারী ষ্টেশন সংলগ্ন স্থানটী সব সময়ই জনবহুল। এখানকার প্রধানতঃ দুটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যথা—

১। এখানে কেহ এমন কি কোন মুসলমানও গোমাংস গ্রহণ করেন না অর্থাৎ গোমাংস গ্রহণের রীতি একেবারেই নিষিদ্ধ। কথিত আছে যে জবরদস্তি কেহ গোমাংস গ্রহণ করে সেই অবস্থায় যদি সে দরগাহে প্রবেশ করে তবে তার রক্তবমন হয় এবং তাতেই নাকি তার মৃত্যু ঘটে।

২। পীর মোবারক বড়খাঁ গাজী বড় জবরদস্ত পীর। কথিত আছে যে তিনি খুব উগ্রস্বভাবের। তাঁর নামে কেউ অসম্মান-জনক উক্তি করলে তিনি তাকে ক্ষমা করেন না, তাতে ঐ ব্যক্তির কোন মারাত্মক ব্যাধি হবে অথবা তাকে কোন দুর্ঘটনায় পড়তে হবে। অবশ্য বিপদাপন্ন হয়ে পীরের শরণ নিলে তার নাকি বিপন্মুক্তি হয়ে থাকে।

পীর মোবারক বড়খাঁ গাজী একজন ঐতিহাসিক পীর। তাঁর কীর্তি-কলাপের বর্ণনায় ক্রমান্বয়ে রং মিশ্রিত হয়ে জনসাধারণের মনে তাঁর প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের বিশ্বাস।

"খাড়ীগ্রামে একটী প্রাচীন বৃহৎ পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব পাড়ে বড়খাঁ গাজীর আস্তানাটী অবস্থিত। পুষ্করিণীর উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড়ে বাঁধানো প্রশস্ত ঘাট আছে। ইষ্টক-নির্মিত আস্তানা-ঘরটী দক্ষিণমুখী; সম্মুখে বারান্দাযুক্ত ও উপরে গম্বুজ বিশিষ্ট। সংস্কার অভাবে ঘরটী জীর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই ঘরের মধ্যে মাথায় পাগড়ী বাঁধা, মুখে চাপদাড়ি, পায়ে জুতা এবং দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া যোদ্ধাবেশী অশ্বারোহী বড়খাঁ গাজী সাহেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটী মনুষ্যপ্রমাণ হইবে। ......বড়খাঁ গাজীর নিয়মিত পূজা হয় না। ভক্তরা যে যখন আসেন তখনই পূজার আয়োজন করা হয়। সুন্দরবনে যাঁহারা কাঠ কাটিতে অথবা মধু সংগ্রহ করিতে যান তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই বড়খাঁ গাজীর আস্তানায় হাজত-পূজা দিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন প্রতি বৎসর নন্দাস্নান উপলক্ষে যে সকল যাত্রী চক্রতীর্থে আসেন, তাহারা খাড়ীতে স্নান সারিয়া গাজীর উদ্দেশ্যে পূজা দিয়া যান।"

(পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বন ও মেলা, ৩য় খণ্ড, ১৯৬৮।)

পূর্ববঙ্গে প্রচলিত গাজীর গীতে পাঁচ পীরের কথায় গাজীর নিম্নরূপ পরিচয় পাওয়া যায়:—

পোড়া রাজা গয়েশদি. তার বেটা সমসদি
পুত্র তার সাই সেকেন্দার॥
তার বেটা বরখান গাজী, খোদাবন্দ মুলুকের রাজী
কলিযুগে যার অবসর।
বাদসাই ছিড়িল বঙ্গে, কেবল ভাই কালু সঙ্গে
নিজনামে হইল ফকির॥ [১৭]

• বারাসত মহকুমার পাথরা নামক গ্রামে পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর নামে একটি নজরগাহ আছে। সেটি প্রাসাদ বা গৃহ নয়। স্থানটি পুরাতন ইটের একটি গৃহাকৃতি বিশেষ। প্রাচীন অশ্বত্থ, নিম, জাম, শিরিষ প্রভৃতি গাছে অঞ্চলটি সমাকীর্ণ। স্থানটি কেন্দ্র করে প্রায় ষোল বিঘা পীরোত্তর জমি রয়েছে। তার কিছু অংশে সম্প্রতি চাষ হয়। পীরোত্তর সেই স্থানকে স্পর্শ করে বারাসত—হাসনাবাদ রেল লাইন বিস্তৃত। এই স্থানে শিরনি-হাজত-মানত প্রদত্ত হয়ে থাকে। এই দরগাহের পূর্ব্বতন খাদিমদার মোহাম্মদ সোন্দল শাহজী (৫৫) জানান যে, তাঁর কোন এক পূর্ব্বপুরুষ তৎকালীন বাংলার সুবাদারের কাছ থেকে উক্ত দরগাহ-চিহ্নিত স্থান পীর বড়খাঁ গাজীর নামে পীরোত্তর পান। কোন মৌলভীর পরামর্শক্রমে নাকি এই নজরগাহে জিয়ারত উপলক্ষে ধূপ-বাতি দিবার যে রীতি ছিল তা বন্ধ হয়ে যায়। ধূপ-বাতি দিবার পুনরুদ্যোগ হয় ১৯৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা ইষ্টার্ণ রেলওয়েতে চাকুরীতে নিযুক্ত থাকা সূত্রে পাথরা-দাদপুরে অবস্থিত রেল ফটকে আগমনের পর এক দৈব ঘটনা থেকে সেই পুনরুদ্যোগের সূচনা। রেলকর্মীটির নাম শ্রীমদন মোহন মণ্ডল। শ্রীমদন মণ্ডলই বর্তমানে (১৯৬৯ খৃঃ) উক্ত নজরগাহের সেবায়েত রূপে ধূপ-বাতি প্রদান করতে আরম্ভ করেছেন। বহুদিন পূর্বে এখানে বিরাট মেলা বসত। কোন্ বিশেষ তারিখে মেলা-অনুষ্ঠান আরম্ভ হত তা আজ আর নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে সোন্দল শাহ্‌জী জানালেন যে প্রতি চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহের কোনও একদিন সেই মেলার সূত্রপাত হত। কি কারণে যে মেলাটি বন্ধ হয়ে গেছে তা আজ অজ্ঞাত।

পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর নামে চিহ্নিত নজরগাহের একেবারে পাশেই অবস্থিত আছে মানিক পীরের একটি "স্থান"। পীরোত্তর জমির মধ্যে আরো আছে ছোট অথচ গভীর একটি পুকুর। তাকে পীর পুকুর বলা হয়। মাঠের বিচরণরত গরু বাছুর এই পুকুরের পানি পান করে পিপাসার তৃপ্তি করে। এখানকার একটি তালগাছের পাতা কাটার একটি রীতি আছে। সাধারণতঃ ঐ গাছের পাতা কেউ কাটে না; যদিও কেউ কাটে তবে সে বাধ্যতামূলকভাবে অন্ততঃ দুইখানি পাতা গাছে রাখে। ঐরূপ না করলে পীর ক্রুদ্ধ হন। তার ফলে উক্ত ব্যক্তির ক্ষতি হতে পারে বলে স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা। পীরের ভক্তগণ নজরগাহ-স্থানে দুধ, ফল-মূল, ধানের প্রথম আঁটি প্রভৃতি দান করে থাকেন।

বারাসত মহকুমার বারাসত থানান্তর্গত উলা নামক গ্রামে পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর নামে আর একটি নজরগাহ্ আছে। নজরগাহ্-স্থানটির পরিমাণ বর্তমানে (১৯৭১) প্রায় চার-পাঁচ কাঠা। স্থানীয় কোন কোন অধিবাসীর নিকট শুনা যায় যে পূর্বে ঐখানে প্রায় সাঁইত্রিশ বিঘা পীরোত্তর জমি ছিল। বর্তমানে নজরগাহ স্থানটিতে স্তূপাদি কোন চিহ্নও নেই। সাদা জমির উপর কিছু বিক্ষিপ্ত ইট দেখা যায়। উক্ত পীরোত্তর জায়গার মধ্যে মসজিদ ও একটি হাই মাদ্রসা রয়েছে। এখানকার বর্তমান সেবায়েত বা খাদিমদার হলেন মহম্মদ শামসুজ্জুহা মোল্লা (৬০) প্রমুখ। মূল সেবায়েতের নাম মুন্সী দবিরুদ্দীন মোল্লা বলে জানা যায়। তিনি উক্ত পীরোত্তর জমি পেয়েছিলেন ৮২নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতার কৃষ্ণচন্দ্র বসু মহাশয়ের মাতা মাতঙ্গিনী দেবীর নিকট থেকে। অনেকে আরো বলেন যে, গাজীসাহেব নাকি তাঁর সহচর কালুকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। প্রতি বছরের মাঘ মাসে নাকি এখানে মেলা বসত এবং তাতে প্রায় হাজার লোকের সমাবেশ হত।

এখানকার নজরগাহ 'থানে' ধূপ-বাতি প্রদত্ত হত। অনেকে হাজত, মানত বা শিরনিও দিতেন।

বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বসিরহাট থানাধীন ফতেপুর নামক গ্রামে পীর মোবারক বড় খাঁ গাজীর নামাঙ্কিত একটি নজরগাহ আছে। এখানে পাঁচ-ছয় কাঠা জমি পীরোত্তর হিসাবে পতিত আছে। পূর্ব্বে নিয়মিতভাবে এখানে ধূপ-বাতি প্রদত্ত হত, প্রতি পৌষ মাসে মেলা বসত। এখনও (১৯৭০) কেহ কেহ মোরগ বা খাসি হাজত দেন,—অনেকে দুধ, ডাব, বাতাসাদি দিয়ে থাকেন। সর্বসাধারণই এখানকার সেবায়েত।

জানা যায় স্থানীয় মোহাম্মদ মাদার খাঁর পুত্র মোহাম্মদ আন্সার আলি খাঁর নাকি শিশুকালে এক কঠিন ব্যাধি হয়েছিল। পীর মোবারক বড় খাঁ গাজীর উক্ত নজরগাহে মানত করে তিনি রোগমুক্ত হন। মানত অনুযায়ী রোগমুক্ত হয়ে তিনি সাত-পালা জারীগান-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে ছিলেন।

উপরোক্ত স্থানসমূহ ব্যতীত বঙ্গের অনেক স্থানেই পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর নামে নজরগাহ আছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি স্থানের নাম,—

বারাসত মহকুমা; হাবড়া থানা,	লটনী গ্রাম,
আলিপুর	নারায়নপুর
আলিপুর	শাহপুর,
সোনারপুর থানাধীন	সাঙ্গুর
সোনারপুর থানাধীন	নভাসন
বারুইপুর থানান্তর্গত	বারুইপুর

এইরূপ অনেক স্থানে বড়খাঁ গাজীর নজরগাহ আছে।

পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর জীবন ও তাঁর কীর্তিকলাপ সম্বলিত কাব্য-কাহিনী বা গদ্য-কাহিনী বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। তাদের কয়েকখানির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে লিপিবদ্ধ করা হ'ল,—

১। গাজী-কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুথি

গাজী কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুথি রচয়িতা পাঁচালীকার আবদুর রহিম সাহেবের বিবরণ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর পাঁচালী কাব্যের একস্থানে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন ;—

আবদুর রহিম আমি
হীনের বচন,
পরিচয় শোন মোর
কোথায় ভবন।

ময়মনসিংহ জেলায় বাস গলাচিপা গ্রামে,
আগুত্যার বাজারের উত্তর পশ্চিমে।
বাটির দক্ষিণে নদী নগুন্দা নামেতে,
মহকুমা কিশোরগঞ্জের অধীনেতে।
জোয়ার হোসেনপুর তার অন্তঃপাতি,
আছি কতদিন আমি করিয়া বসতি।

কবি আবদুর রহিম সাহেব রচিত আর কোন পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি যে কিছু কিছু ইতিহাস জানতেন তা বুঝা যায়। কারণ তিনি তাঁর কাব্যে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীহট্টের পীর শাহ্ জালালের সহিত তৎস্থানীয় রাজা গৌরগোবিন্দের যুদ্ধ-কথা উল্লেখ করেছেন। কবির জীবৎকাল জানা

যায় না। উনবিংশ শতাব্দীতে পাঁচালী কাব্যটি রচিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।

পাচাঁলীকার কবি আবদুর রহিম রচিত কাব্যখানি ৯২/২" × ৬" আকৃতি বিশিষ্ট। পুস্তকখানি মুদ্রিত। তার পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র বিরানব্বই। তার শব্দগুলি হেমেটিক রীতিতে এবং পৃষ্ঠাগুলি সেমেটিক রীতিতে সজ্জিত—অর্থাৎ ডানদিক থেকে বাঁ দিক পৃষ্ঠা উল্টে পাঠ করতে হয়। গ্রন্থখানি হাম্‌দো-নাত্‌ [বন্দনা] এবং কেচ্ছা [কাহিনী] এই দুই প্রধান অঙ্গে বিভক্ত। আবার কেচ্ছার মধ্যে নিম্নলিখিত বিভাগটি রয়েছে ;—

গাজীর জন্ম ও ফকিরত্ব গ্রহণের বয়ান

বস্তুতঃ এই অংশে কাহিনী সম্পূর্ণ করা হয়েছে। আর কোন শিরোনামা কবি কেন দেন নি তা অজ্ঞাত। কাব্যে নিম্নপরিচয়ের উনচল্লিশটি গীত আছে ;—

গীতের তালের নাম	গীতের সংখ্যা
আদ্ধা	২৩
খয়েরা	১
আড়া	১
ঠ্যাস কাওয়ালি	১
ঠেকা	১
ধূয়া	১২

সমগ্র কাব্যখানি পয়ার ও ত্রিপদী এই দুই প্রকার ছন্দে রচিত। তাদের নমুনা এইরূপ :—

পয়ার :

প্রথমে বন্দিনু নাম প্রভু নিরঞ্জন ॥
এ তিন ভুবনে যত তাঁহার সৃজন *

ত্রিপদী :

বৈরাট নগরে ধাম, শাহা সেকেন্দার নাম,
রূপে যিনি পূর্ণ শশধর ॥
নগরের শোভা তার, কি কব বয়ান আর
স্বর্গতুল্য দেখিতে সুন্দর *

অবশ্য পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে উপরোক্ত রূপ সুস্পষ্ট বিভাগ অনুযায়ী পদ্যের আকারে লিখিত নয়,—কেবলমাত্র গীতগুলি প্রতি চরণে মিল করে পদ্যের আকারে সাজিয়ে লেখা। একেবারে গদ্যের আকারে লিখিত সেগুলি পাঠকবর্গের বুঝবার সুবিধার্থে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রতি প্রথম পংক্তির শেষে দুই দাড়ি এবং প্রতি দ্বিতীয় পংক্তির শেষে তারকা চিহ্ন আছে। ত্রিপদী ছন্দে লিখিত অংশে 'কমা' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। পদ্যের আকারে লিখিত হলে পাঁচালী কাব্যখানি প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার গ্রন্থ হতে পারত।

পাঁচালী কাব্যখানি মূলতঃ সরল বাংলা ভাষায় রচিত হলেও তাতে আরবী ও ফার্শী শব্দ মিশ্রিত হয়েছে। কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে একই শব্দ দুইবারের স্থলে একবার লিখে তারপরই '২' লিখিত হয়েছে। কোথাও বা ক্রিয়া পদান্তে 'ক' যোগে বিদ্যাসাগরী রীতি অনুসৃত হয়েছে। অনেক স্থলে অশুদ্ধ বানান রয়েছে। কতকগুলি নাম, যথা শ্রীরামকে শ্রীদাম, সম্ভবতঃ চম্পাই নগরকে ছাপাইনগর, দক্ষিণ রায়কে দক্ষিণা দেও প্রভৃতি বিকৃত ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ইহা হয়ত কবির ইচ্ছাকৃত নয়,—হয়ত ভাষার ওপর কবির দখলের অভাবের কারণে ঘটেছে।

সংক্ষিপ্ত কাহিনী ঃ

বৈরাট নগরের অধিপতি শাহা সেকেন্দার যেমন ধনবান এবং শক্তিমান তেমনই দয়াবান। পাতালের রাজা তাঁকে রাজকর দিতে অস্বীকার করায় অনিবার্য্য যুদ্ধে পাতাল-রাজ পরাজিত হলেন। আত্মসমর্পণ করে তিনি নিজের সুন্দরী কন্যা অজুপাকে শাহা সেকেন্দারের সঙ্গে বিবাহ দিলেন।

সেকেন্দার শাহার ঔরসে ও অজুপার গর্ভে যথাক্রমে জুলহাস সুজন এবং গাজী নামক দুই পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে। তাছাড়া রাণী অজুপা একদিন সাগরে স্নান করতে গিয়ে ভাসমান এক কাঠের সিন্ধুকের মধ্যে এক শিশু-পুত্রকে পেলেন। সেই শিশুও তাঁর পুত্ররূপে প্রতিপালিত হতে লাগল। তার নাম রাখা হল 'কালু।'

জ্যেষ্ঠপুত্র জুলহাস বয়ঃপ্রাপ্ত হল। একদিন শিকারে গিয়ে সে মায়ামৃগের পশ্চাদধাবন করে পাতালে জঙ্গ রাজার রাজ্যে উপস্থিত হল। জঙ্গ বাহাদুর সুদর্শন জুলহাসের সাক্ষাত পেয়ে খুশী হলেন। তিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকে জুলহাসের হাতে সমর্পণ করলেন। জুলহাস সুজন সেখানে বধূ "পাঁচতোলা" ও অন্যান্য পরিজনসহ রয়ে গেল।

কনিষ্ঠপুত্র গাজীর বয়স দশ বছর হলো। সেকেন্দার শাহ্ পুত্র গাজীকে সিংহাসনে আরোহন করতে আদেশ করলেন। গাজী তাতে সম্মত হলেন না; কারণ তাঁর তখন বৈরাগ্য-ভাব উপস্থিত হয়েছে। সেকেন্দার ক্রুদ্ধ হয়ে গাজীকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড করতে জল্লাদকে হুকুম দিলেন। জল্লাদের অস্ত্রাঘাতে গাজীর দেহে কোন ক্ষতও হল না।

তিনি আরো ক্রুদ্ধ হয়ে গাজীকে দশটি হাতীর পায়ের তলায় ফেলে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তাকে হাতীর পায়ের নীচে দেওয়া হল কিন্তু কিছু হল না, বরং হাতীর দাঁত ও পা ভেঙে গেল। গাজীকে আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হল। আল্লাকে স্মরণ করায় গাজীর গায়ে আগুনের তাপ লাগল না। দশ মন ওজনের পাথরের সংগে বেঁধে গাজীকে সাগরের জলে নিক্ষেপ করা হল,—তবু তাঁর কিছু হল না,—বরং পাথরও জলে ভাসতে লাগল। গাজী যে ফকির হয়েছেন,—তাঁকে মারে এমন সাধ্য কার!

সেকেন্দার শাহ পুত্রের ফকিরির খাঁটিত্ব পরীক্ষার জন্য সাগরের জলে মার্কা-মারা সূঁচ ফেলে দিয়ে তাকে কুড়িয়ে আনতে বললেন। গাজী স্মরণ করলেন আল্লাহকে। আল্লাহ তাতে সাড়া দিয়ে খোয়াজকে ডেকে এনে তার কাছে সব বিবরণ শুনলেন। আল্লাহের অনুমতি অনুসারে খোয়াজ ডেকে আনলেন সুর ও অসুরি নামক দুই দানবকে এবং গাজীর আদেশ পালন করে সমুদ্র থেকে সূঁচ খুঁজে আন্তে বললেন। দানবদ্বয় সমুদ্র সেচন করেও সূঁচ পেল না; পেল পাতালের ফলানির বেটীর মাথার চুলে। দানবদ্বয় সেখান থেকে সূঁচ সংগ্রহ করে এনে দিল গাজীর হাতে। গাজী পিতার হাতে সেই সূঁচ দিলেন। সেকেন্দার শাহ এবার নিরস্ত হলেন। তিনি তবু পুত্রকে পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানালেন। গাজী সেবারও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পিতাকে 'সালাম' জানিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন মাতার কাছে। গাজী সেই গভীর রাত্রে নিদ্রামগ্ন সকলকে রেখে ফকিরের বেশ ধারণ করে গৃহত্যাগ করলেন। গৃহ প্রাঙ্গন ত্যাগ করার পূর্বে দেখা হল কালুর সঙ্গে। কালুও দৃঢ় মন নিয়ে গাজীর অনুগমন করলেন।

প্রাতঃকালে গাজী ও কালুকে নগরের মধ্যে পাওয়া গেল না। গাজীর বিরহে সকলে হায় হায় করে কেঁদে উঠল,—কাঁদল হাতী, ঘোড়া, গরু, পাখী প্রভৃতি।

ফকির গাজী ও কালু পথ চলেছেন। চলতে চলতে এসে উপনীত হলেন সমুদ্রতীরে। সমুদ্র পার হওয়া যায় কি করে! তাঁরা শরণ নিলেন আল্লাহ তালার। আল্লাহের পরামর্শে তাঁরা হাতের "আশাবাড়ি" সমুদ্রের উপর ফেলে আশাতরী-যোগে ভাসতে ভাসতে এসে উপস্থিত হলেন বাঙ্গলা দেশের সুন্দরবনাঞ্চলে। এখানে থাকাকালে সুন্দরবনের প্রায় সকলে গাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল।

সাত বছর সেখানে থাকার পর দুই ফকির আবার যাত্রা সুরু করলেন। চললে চলতে গেলেন ছাপাই নগরে। এখানকার রাজা শ্রীদামের বাড়ির সামনে এসে তাঁরা জিগীর বা উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ দিলেন—"লা এলাহা।"

এত বড় স্পর্দ্ধা,—বাড়ীর সামনে মুসলমানের আগমন এবং জিগীর ছাড়া! ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা তখনই কোটালকে হুকুম দিলেন যে ফকিরদ্বয়কে গর্দান ধরে নগর থেকে বের করে দাও।

ক্ষুধার্ত গাজী ও কালু দুঃখিত হয়ে নিকটবর্তী এক কাননে প্রবেশ করলেন। খেদরত দুই ফকিরের দুঃখে সহানুভূতিশীল হয়ে আল্লাহ তালা আহার্য্য পাঠিয়ে দিলেন। গাজী ও কালু সেই আহার্য্যে তৃপ্ত হলেন। কালু ভাবলেন, এমন দুরাচার রাজার বাড়ীতে আগুন লাগলে ভালই হত। সত্য সত্যই রাজবাটীতে, তথা রাজধানীতে আগুন ধরে গেল। বহু ধন-সম্পদ অগ্নিদগ্ধ হল। রাজা শ্রীদাম তখনই জ্যোতিষী ডাকিয়ে আগুন লাগার রহস্য জেনে নিলেন এবং তাঁর পরামর্শে গাজী ও কালুর পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। রাজাকেও রাজপুরীর সকলকে কলেমা পড়ে মুসলমান হতে হল। পুরীর আগুন নিভে গেল, যেমনকার পুরী তেমনই অক্ষত রূপ ফিরে পেল। রাজা সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে দিলেন। দুই ফকিরের সুখে দিন কাটতে লাগল।

ফকিরের শয্যা বন, ধূলা, মাটি-ছাই। মায়ার জালে আবদ্ধ সুখের জীবন তো ফকিরের জন্য নয়! সুতরাং গাজী ও কালু তখনই শ্রীদাম রাজার রাজ্য ছেড়ে চললেন—অন্যত্র, অন্যখানে।

তাঁরা বুঝলেন, "কাটিলে মায়ার জাল কেহ কার নয়।" নগরবাসী তাঁদের বিচ্ছেদে রোদন করতে লাগল।

ভ্রাম্যমান ফকিরদ্বয় এলেন এক গভীর অরণ্যে। সেখানে কর্মরত সাতজন কাঠুরিয়ার সাথে তাঁদের হল সাক্ষাত। কাঠুরিয়ারা বড়ই গরীব, কিন্তু

অতিথি আপ্যায়নে তাদের সে কি আন্তরিকতা। পরম সন্তুষ্ট হয়ে গাজী সেই কাঠুরিয়াগণের দুঃখ দূর করার জন্য তাদেরকে সঙ্গে নিলেন। এরপর তাঁরা এলেন সমুদ্রের তীরে। সেখানে গাজী যেইমাত্র "মাসি মাসি" বলে ডাক দিলেন, সেইমাত্র এক দেবী ভেসে উঠলেন জলের উপর। গাজী তাঁর মনের বাঞ্ছা প্রকাশ করলেন। দেবী ও তদীয় কন্যা সেই ফকিরের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে বহু ধনরত্ন দান করলেন। গাজী, সাহা-পরীকে ডাকিয়ে সেই জঙ্গল কাটিয়ে এক সুন্দর পুরী নির্মাণ করতে আদেশ দিলেন।

সাহা-পরী আনলো আরো বাহান্ন হাজার পরী। দুই দিনের মধ্যে তারা নগরী গড়ে দিল। সাধারণ মানুষ সেই পুরী দেখে চমৎকৃত হল। প্রজাগণকে কর দিতে হয় না,—তারা সবাই পেল লাখেরাজ। শহরের সে এক অপরূপ শোভা; তার নাম রাখা হল সোনারপুর।

গাজী ও কালু পরম আনন্দে সোনারপুরে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন কোকাফ থেকে ছয়জন পরী এল। তারা গাজীর রূপ দেখে মুগ্ধ। দক্ষিণা নগরের মটুক রাজার কন্যা চম্পাবতী ভিন্ন গাজীর রূপের তুলনা নেই। পরীগণ নিদ্রাভিভূত গাজী ও চম্পাবতীর মিলন ঘটাল। গাজী ও চম্পাবতী পরস্পর পরস্পরের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে বিবাহে সম্মত হলেন। কিন্তু মুসলমান ফকির গাজীর পরিচয় পেয়ে চম্পাবতী লজ্জায়, ক্ষোভে ভেঙে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখলেন "গাজী বিনে সংসারেতে পতি নাহি আর।" চম্পাবতী সম্পূর্ণরূপে গাজীর উপর নির্ভর করলেন। কিন্তু গাজী বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত চম্পাবতীকে পত্নীত্বে বরণ করলেন না,—শুধু ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিলেন।

পরদিন গাজী ও কালু পথে নেমে এলেন। গাজী তখন সবিস্তারে চম্পাবতীর সঙ্গে তাঁর মিলন কথা কালুর নিকট ব্যক্ত করলেন। অন্যদিকে চম্পাবতীও তাঁর তার মনের কথা জননী লীলাবতীর নিকট ব্যক্ত করলেন। লীলাবতী, কন্যা চম্পাবতীকে সান্ত্বনা দিলেন যে "তার ধ্যানে রহ তারে ঘরে বসি পাবে।" কালু,—গাজীর আভীপ্সা পূরণের জন্য ব্যবস্থা করতে দক্ষিণানগর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

দক্ষিণানগরে প্রবেশের পথে কালু এলেন এক নদীর তীরে। খেয়াঘাটের পাটনীর নিকট থেকে তিনি জানতে পেলেন যে দক্ষিণানগরে কোন শূদ্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কোন শূদ্র সেখানে প্রবেশ করলে তার প্রাণ হানি হওয়ার

সম্ভাবনা। কালু সব ভীতিকে উপেক্ষা করে নগরে প্রবেশ করলেন এবং রাজসভায় উপস্থিত হয়ে সজোরে আওয়াজ দিলেন,—"ইল্লাল্লা।"

রাজা ক্রোধান্ধ হয়ে কোটালকে আদেশ দিলেন,—ঘাড় ধরে এ ফকিরকে বের করে দাও!

কালু আর অপেক্ষা না করে পূর্ব্ব ঘটনা উল্লেখ করতঃ সরাসরি গাজীর সঙ্গে চম্পাবতীর বিবাহের প্রস্তাব দিলেন।

কালুর এই প্রস্তাবে অপমান, ঘৃণা ও ক্রোধে অগ্নিসম হয়ে রাজা দৃঢ় কণ্ঠে কোটালকে হুকুম দিলেন,—"হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে, বুকে দশ মণ ওজনের পাথর চাপিয়ে একে কারাগারে বন্দী রাখ।"

রাজা 'তেগ' নিয়ে চম্পাবতীকে প্রহার করতে ছুটে গেলেন, কিন্তু চম্পাবতী কৌশলে আত্মরক্ষা করলেন।

গাজী উদ্বিগ্ন,—কালুর ফিরতে দেরী কেন! কালু বন্দী অবস্থায় কারাগার থেকেই গাজীকে স্মরণ করছেন। গাজী ধ্যানযোগে কালুর অবস্থা জানতে পারলেন। কালুর জন্যে তিনি কেঁদে ফেললেন। বিপদের দিনে আহ্বান জানালেন বাঘ-শিষ্যগণকে। সুন্দরবনের বিভিন্ন দিক থেকে বাঘগণ ছুটে এল তাঁর কাছে। তারা সদর্পে বলল,—হে পীর! তোমার পাশে আমরাও আছি।

নানা নামধারী, নানা আকৃতির বাঘ। খান্দেওরা, দানেওয়ারা, কেন্দুয়া, কালকূট, লোহাজুড়ি, নেখোড়া, নাগেশ্বরী এবং আরও কত কত। তারা তখনই যুদ্ধসাজে সজ্জিত হল। গাজীর নির্দ্দেশমত তারা অগ্রসর হল দক্ষিণা নগরের দিকে। পথিমধ্যে সাধারণ লোক এত বাঘ এক সঙ্গে যেতে দেখে ভীত হতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করে গাজী তাদেরকে ফুক্ দিয়ে ভেড়া-ভেড়ীতে রূপান্তরিত করে দিলেন।

দক্ষিণা নগরে যাবার পথে গাজী সসৈন্যে এসে উপস্থিত হলেন এক নদী তীরে। সেই নদীর খেয়াঘাটের পাটনী ছিরা ও ডোরার লোভ গেল সেই সুডৌল ভেড়া-ভেড়ীর মাংসে। তাদের দাবী, পারানী হিসাবে তাদেরকে দুটো ভেড়া দিতে হবে। গাজী তাতে সম্মত হয়ে দুটি ভেড়া পাটনীদের জন্য রেখে নিজে সসৈন্যে পার হয়ে চললেন। পথিমধ্যে তিনি তিনশত পরী সংগে নিয়ে অগ্রসর হলেন।

পাটনী তো ভেড়া-রূপী দুই বাঘকে ঘরে এনে খুব খুশী। পরদিন তাদের বুড়ী মা গোয়াল ঝাঁট দিতে গিয়ে ভেড়ার এক 'ঢুস' খেয়ে তো অজ্ঞান এবং তাতেই তার মৃত্যু হল। পাটনীদের মৃতা মাতার শ্রাদ্ধের ভোজ হবে ভেবে ব্রাহ্মণ গেলেন সেই ভেড়াদ্বয়কে উৎসর্গ করতে। ততক্ষণে ভেড়া রূপান্তরিত হল বাঘে। সকলে ভয়ে যেদিকে পারল পলায়ন করল। পাটনী বলল—মুসলমান ফকিরের কাছ থেকে সে আর কোনদিন পারের কড়ি নেবে না। বাঘ দুটি ততক্ষণে ছুটে এসে উপস্থিত হল পীর গাজীর নিকট।

গাজীর পরামর্শ মতন রাত্রে বাঘগণ দক্ষিণা নগরের প্রত্যেক বাড়ী ঘিরে অবস্থান করতে লাগল। প্রভাত হলেই গৃহবাসী ঘরের বাইরে এসে দেখে বাঘের সমাবেশ। কেউ তৎক্ষণাৎ ঘরে প্রবেশ করে কপাট বন্ধ করল, কেউ বা দ্রুত ছুটে পালিয়ে চলে গেল অন্য কোথা। সংবাদ গেল রাজবাড়ীতে। রাজা নগরবাসীকে ভীত হতে নিষেধ করলেন। তিনি দূত মাধ্যমে প্রধান সেনাপতি দক্ষিণ দেও-এর নিকট ত্বরিত-সংবাদ পাঠিয়ে বাঘ সৈন্যগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানালেন। দক্ষিণাদেও তৎক্ষণাৎ রণসাজে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। রাজা-সভাসদ এবং আরো অনেকে বাড়ীর ছাতে বসে সে যুদ্ধ অবলোকন করতে লাগলেন।

গাজী একা নন, তাঁর আছে বাঘ সৈন্য। দক্ষিণাদেও একাই বীর-যোদ্ধা। দুর্বল মন দক্ষিণাদেও তাই নদীতীরে গিয়ে জলদেবীর সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। এতে জলদেবীর নিকট তিনি কুমীর সৈন্য পেলেন।

বাঘ ও কুমীরের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। কুমীরের কাঠসম শক্ত দেহে আঘাত করতে পারল না বাঘ সৈন্য, বরং তারা আহত হল। বিমর্ষ হয়ে বাঘ ফিরে এল গাজীর কাছে। গাজী বিবরণ শুনে খোদার কাছে প্রার্থনা জানালেন। রৌদ্রের খরতাপ দেখা দিল খোদার ইচ্ছায়। কুমীরগণ সে তাপ সহ্য করতে না পেরে সাগরের জলে ঝাঁপ দিল। দক্ষিণা দেও তখন দানব-রাজের শরণ নিলেন। দক্ষিণা দেও-এর পীড়াপীড়িতে দানবরাজ তার সাহায্যে ভূত ও প্রেতগণকে আদেশ দিলেন লণ্ড-ভণ্ড কাণ্ড করতে। গাজী তা জানতে পেরে 'ফুক' দিলেন চারদিকে। সংগে সংগে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। ভূত-প্রেতগণ প্রাণ নিয়ে পলায়ন করল। দক্ষিণা দেও সম্মুখ যুদ্ধে গাজীর নিকট শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করলেন।

দক্ষিণা দেওএর পরাজয় রাজাকে চিন্তান্বিত করল। সভাসদগণ স্বপক্ষীয় সৈন্যবলের অসাধারণ শক্তির বিবরণ দিয়ে রাজার প্রাণে সাহস সঞ্চার করলেন। এবার তোপ, তীর, হাতী প্রভৃতি সমর-উপকরণে সজ্জিত হয়ে রাজা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। গাজীও যুদ্ধে খোদা ভরসা করে অগ্রসর হলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। রাজার তোপের মুখে গাজীর পক্ষের কোন ক্ষতি হল না দেখে রাজা স্তম্ভিত হলেন। বাঘ-সৈন্য বেপরোয়াভাবে রাজ-সৈন্য ধ্বংস করতে লাগল।

রাজার ঐশীশক্তি-সম্পন্ন একটি কুয়া ছিল। রাত্রিকালে নিহত রাজ-সৈন্যের গায়ে সেই কুয়ার জল ছিটিয়ে তাদেরকে পুনরায় জীবন্ত করা হল। জীবনপ্রাপ্ত সৈন্যগণ পুনরায় এল যুদ্ধক্ষেত্রে। এইভাবে প্রতিদিন যুদ্ধ চলতে লাগল। সংবাদ এল গাজীর কাছে যে বাঘ-সৈন্য কিছু সংখ্যক করে প্রতিদিন আহত হচ্ছে। অথচ রাজার পক্ষে কেউ মরছে না। গাজী ধ্যানযোগে ঐশীশক্তি-সম্পন্ন কুয়া-রহস্য জানতে পারলেন। গো-বোধ করে ঐ কূপের মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করে তার ঐশীক্ষমতাকে নষ্ট করলেন গাজী। ঘটনা জানতে পেরে রাজা বুঝলেন যে এবার তাঁর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। রাজা দ্রুত পলায়ন করলেন। এবারে বাঘ-সৈন্যগণ কারাগার থেকে কালুকে মুক্ত করল। তারা রাজাকে খুঁজে বার করে এনে হাজির করল গাজীর নিকট। রাজাকে বাঘের হাত থেকে মুক্ত করে গাজী ও কালু কিন্তু তাঁকে সসম্মানে আসন দিলেন। রাজা আশ্বস্ত হয়ে গাজী-কালুকে সাদরে রাজ-সিংহাসনে বসালেন। রাজা পরে কলেমা পড়ে মুসলমান হলেন এবং সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গাজীর সহিত কন্যা চম্পাবতীর বিবাহ দিলেন।

রাজপ্রাসাদে মহানন্দে গাজী-কালুর এক পক্ষকাল অতিবাহিত হল। ফকিরের পক্ষে এইরূপ মায়ায় আবদ্ধ হওয়া অনুচিত অনুভব করার সাথে তাঁরা পুনরায় পথে বাহির হলেন। তখন বধূ চম্পাবতীও তাঁদের সঙ্গ নিলেন। গাজী কিছুতেই চম্পাবতীকে সঙ্গ থেকে নিরস্ত করতে পারলেন না। তাই তিনি অলৌকিক শক্তিবলে চম্পাবতীকে কখন হরিদ্রা ফুল, কখন অঙ্গুরীয়রূপে সংগোপনে কিছুদিন নিজের কাছে রাখলেন। পরে ফকিরি জীবনের জঞ্জালস্বরূপ মনে হওয়ায় চম্পাবতীকে শেওড়াগাছে রূপান্তরিত করে স্থাবর করতে চাইলেন। তাতে চম্পাবতী কেঁদে আকুল হলেন। গাজী তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি চম্পাবতীকে অবশ্যই ত্যাগ করবেন না। কিছুদিনের জন্য তাঁরা ভ্রমণ করে

ফিরে আসবেন, —ততদিনে চম্পাবতী যেন নিশ্চেন্তে বসে আল্লাহ্‌তালার নাম স্মরণ করতে থাকেন।

গাজী ও কালু প্রস্থান করলেন। পথিমধ্যে তাঁদের সাথে সাক্ষাত হল গোদ রোগাক্রান্ত জামালিয়ার সঙ্গে। তার দুঃখে ব্যথিত হয়ে পীর গাজী, জামালিয়াকে রোগমুক্ত করলেন এবং সে যাতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ধনশালী থাকতে পারে এরূপ আশীর্ব্বাদ করে অগ্রসর হলেন। এবার তাঁরা তপস্যারত তিনশত যোগীর সম্মুখীন হলেন। যোগীগণ গাজীকে প্রহার করতে উদ্যত হলে গাজী তাঁদেরকে দেব-দর্শন করিয়ে মুগ্ধ করলেন এবং পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন।

সেখান থেকে পীরদ্বয় বিদায় নিয়ে এলেন পাতালে জঙ্গ রাজার রাজ্যে। সেখানে জ্যেষ্ঠভ্রাতা জুলহাসের সাথে গাজী ও কালুর সাক্ষাত হল। ক্রন্দনরতা মাতার নিকট প্রত্যাবর্তন করার জন্য জুলহাসের নিকট গাজী অনুরোধ করলেন। জুলহাসের শ্বশুর-শ্বাশুড়ীও সে প্রস্তাব শুনলেন। অবশেষে তাঁরা সকলের সম্মতিতে জুলহাস ও তাঁর পত্নী পাচতোলাসহ প্রস্তুত হয়ে বিদায় নিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে গাজী সেই শেওড়া গাছকে চম্পাবতীর পূর্ব্বরূপে রূপান্তরিত করে সাথে নিলেন। তাঁদের সকলের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথন চলল। তাঁরা এলেন দক্ষিণানগরে। মটুক রাজা ও লীলাবতী রাণী তাঁদেরকে যথোপযুক্ত আদর-আপ্যায়ন করলেন। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বহু স্থানে ভ্রমণ করে তাঁরা তিন বছর পর ফিরে এলেন সোনারপুরে। তারপর এলেন ছাপাইনগরের শ্রীদাম রাজার নিকট। সেখানে আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হলেন এবং অবশেষে ফিরে এলেন বৈরাটনগরে।

গাজী ও কালুর ফকিরি জীবনের বিস্তৃত কাহিনীসহ পুত্র জুলহাস ও পুত্রবধু পাচতোলা এবং চম্পাবতীকে লাভ করে রাজা সেকেন্দার ও রাণী অজুপা আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হলেন।

আবদুর রহিম সাহেব প্রণীত "গাজি-কালু-চম্পাবতী কন্যার পুথি" নামক কাব্যে বর্ণিত উপরোক্ত কাহিনী, পীর মোবারক বড় খাঁ গাজীর জীবন কাহিনীর সবটুকু নয়। এটি তাঁর জীবনের প্রথম দিককার কাহিনী মাত্র। বড় খাঁ গাজীর অলৌকিক কীর্ত্তিকথা প্রাধান্য পেলেও এই কাহিনীতে ইসলাম

ধর্ম প্রচার-প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নারীপুরুষের মধ্যে বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব পাঠকের মনে কৌতূহল উদ্রেক স্বাভাবিক ভাবেই করেছে এবং একে অবলম্বন করে কবি প্রণয়-আখ্যানটিকে অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষের মাধ্যমে বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। অলৌকিক শক্তি পরিচায়ক যে সব ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছে তা একেবারেই অবিশ্বাস্য—বিশেষতঃ বর্তমান যুগে। পীর মোবারক একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে তাঁর কার্য্যাবলীর সংগে এইসব অলৌকিক-কীর্তিকলাপ অবিশ্বাস্য রোমান্টিক কাহিনীতে পর্য্যবসিত হয়েছে। সরল বিশ্বাসী গ্রামবাসীর মনে এই কাব্যের যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও ইসলামি আদর্শের সঙ্গে অলৌকিকতার এই কাহিনী সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আবদুর রহিম সাহেব প্রণীত কাব্য এবং এরই আদর্শে রচিত একখানি নাটক ব্যতীত রায়মঙ্গল কাব্য, গাজী সাহেবের গান, হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থে পীর মোবারক বড় খাঁ গাজীর মাতার নাম, শৈশবকালের কথা, তাঁর জন্মকথা প্রভৃতি পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগীয় অন্যান্য পাঁচালি কাব্যের বৈশিষ্ট্য এতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ—

১। আল্লাহ তালার কৃপায় অজুপা সুন্দরীর গর্ভস্থ সন্তানের দেহে প্রাণ প্রবেশ করণ।

২। অন্তঃসত্ত্বা অজুপা সুন্দরীর দশমাস্যা অর্থাৎ দশ মাসের অবস্থার বর্ণনা করণ।

৩। গাজী ও দক্ষিণ রায় বা রাজা মটুক-এর যুদ্ধের সহযোগী সৈন্য বাঘগণের নামবৈচিত্র্য এবং চরিত্র বর্ণনায় দৃষ্ট হয় খন্দেওরা নামক বাঘ সৈন্যগণের প্রধানকে। সে রাক্ষসের গর্দ্দান ভেঙে আহার করে। বেড়াভাঙ্গা নামক বাঘ অতিশয় ভীষণাকৃতি। সে অসুর সিংহকে হত্যা করে ভক্ষণ করে। দানেওরা নামক বাঘ লাফ দিয়ে চলে। সে যেন আকাশের সূর্য্যকে ধরে খেতে চায়। এইরূপ আরো কয়েকটি বাঘের নাম ভিঙ্গরাজ, কালকূট, চিলাচক্ষু, কেন্দুয়া, মেচি, লোহা জুড়ি, পেচামুখা ইত্যাদি।

৪। মঙ্গল কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হিসাবে এই কাব্যে নমনীয়তার দৃষ্টান্ত আছে যে মুসলমান হয়ে গাজীর পক্ষে হিন্দু ব্রাহ্মণ কন্যা

বিবাহ করার বিপক্ষে কোন বিরুদ্ধ মানসিকতা সৃষ্টি হয় নি। অপর দিকে ব্রাহ্মণ রাজা মটুক দেবের হিন্দু সংস্কারের ভিত্তি এত দৃঢ় ছিল না যাতে তিনি মুসলমান হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ মনে করতে পারেন। তবু কাব্যখানি মৌলিকভাবে ইসলামি ভাবনা ভিত্তিক।

৫। পীর বড় খাঁ গাজীর অলৌকিক শক্তির কাহিনী মনসামঙ্গল কাব্যাদির অলৌকিক কাহিনীর কথা স্মরণ করায়।

৬। উপরোক্তরূপ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অধিকন্তু লক্ষ্যণীয় যে এই কাব্য-কাহিনীতে কৃষ্ণকথার প্রভাব, প্রহ্লাদ চরিত্র প্রভাব, লায়লা-মজনুর প্রণয় কাহিনী প্রভাব, সংসার বিরাগী বুদ্ধদেবের প্রভাব প্রভৃতি সুস্পষ্টভাবে পড়েছে

৭। কৃষ্ণের মথুরায় গমনের পর ব্রজে যে বিরহভাব সৃষ্টি হয়েছিল, গাজী দক্ষিণানগর ত্যাগ করলে সেখানে অনুরূপ বিরহভাব জাগরিত হয়েছিল।

৮। কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-পরীক্ষা দিতে প্রহ্লাদকে যেরূপ মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল, আল্লার প্রতি ভক্তির প্রমাণ স্বরূপ গাজীকে সেইরূপ বুকে পাষাণ নিয়ে সমুদ্রে নিমজ্জন বা হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট হওয়ার মতন আরো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

৯। সুফী মতাদর্শে আকৃষ্ট হলেও গাজী কর্তৃক সংসার ত্যাগ ও ফকিরবেশে ঘরের বাইরে অর্থাৎ পথে পথে আপন আদর্শ প্রচার করার ঘটনা বুদ্ধদেবের সংসার ত্যাগের ও তাঁর কার্য্যাবলীর সঙ্গে তুলনীয়।

এইরূপ আরো বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কাব্যখানির নিজস্ব যে সব বৈশিষ্ট্য আছে তাদের কয়েকটি এইরূপ ঃ—

হিন্দুর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত মুসলমান যুবকের প্রণয় এবং বিবাহ সংঘটিত হয়েছে।

দেব-দেবী মাহাত্ম্য প্রচারের ন্যায় আল্লাহ্ মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টার মধ্যে প্রধানতঃ ইসলাম ধর্ম প্রচার প্রবণতাই প্রকাশিত হয়েছে।

পাতালের দেবীর সহযোগিতায় গাজী ও কালু সোনারপুরে এক সুন্দর নগর গড়ে তুললেন।

পত্রবাহক পারাবত-মাধ্যমে প্রণয় নিবেদন ও বিবাহ কিছু কিছু সংস্কৃত পুস্তকের কাহিনীতে দৃষ্ট হয়। এখানে গাজী ও চম্পাবতীর প্রণয় বিষয়ক যোগাযোগ-মাধ্যম হিসাবে পরীগণের ভূমিকা দৃষ্ট হয়।

লায়লা-মজনু বা রোমিও-জুলিয়েট বা কিছুটা দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রণয় কাহিনীর মত গাজী-চম্পাবতীর প্রণয় কাহিনী এ কাব্যে অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। বিশেষ করে শিকারে গিয়ে পাচতোলার সঙ্গে বিবাহ ঘটনা স্মরণীয়।

সুফী-পীরগণের আদর্শ হিসাবে গাজীকে অবিবাহিত ফকির হিসাবে পাওয়া যায় নি। সংসার ত্যাগী ফকিরের পক্ষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

হিন্দু ব্রাহ্মণ কন্যা হয়ে মুসলমানের পানি গ্রহণ ঐ হিন্দু কন্যার পক্ষে যেমন অনতিক্রম্য বাধা, তেমনি এক পুরুষে অনুরক্ত নারীর অন্য পুরুষে মনোনিবেশ করা সেই হিন্দু কন্যার আর এক দুরতিক্রম্য বাধা। এতে প্রথম সংস্কারের ঘটল পরাজয় এবং দ্বিতীয় সংস্কার হল বিজয়ী।

মন্ত্রবলে বাঘকে ভেড়ায় পরিণত করার মতন ঘটনা এই শ্রেণীর পাঁচালী কাব্যের বৈশিষ্ট্য। জীবন-কূয়ার জলের সাহায্যে মৃতকে পুনর্জীবিত করার ঘটনা পীর গোরাচাঁদ কাব্যেও দৃষ্ট হয়।

পরাজিত দক্ষিণ রায়কে নিয়ে পরীগণ তামাসা করেছে। কবি এই প্রসঙ্গে কিছু হাস্যরস পরিবেশন করেছেন।

গাজী-কালু-চম্পাবতীর কাহিনী উপলক্ষে মুসলমান কবি ইসলামি মানসিকতার জন্য ইউসুফ জোলেখার কথা, সতী মরিয়ম, হুর, নবীকথা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া শাহ জালাল পীর, বদর পীর, গৌর গোবিন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক বহু ব্যক্তি সম্পর্কিত কিছু কিছু ঘটনার গল্পস্থানীয় কথা এই কাব্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

পীর পাঁচালী কাব্যে অনেকস্থলে ধর্মপ্রচার করা নিয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীর সহিত সংঘর্ষ হয়েছে দেখা যায়। কিন্তু পীর মোবারক বড়খাঁকে নিয়ে রচিত এই কাহিনীতে প্রণয় নিয়ে সংঘর্ষ এবং পরে ধর্মান্তর গ্রহণের প্রশ্ন এসেছে।

গাজি-কালু-চম্পাবতী কাহিনীতে অঙ্কিত চরিত্রগুলিতে নিম্নলিখিত বিভাগ দৃষ্ট হয়—

১। মানব চরিত্র, যথা—গাজি, কালু, চম্পাবতী, মটুক, লীলাবতী প্রভৃতি।

২। দেব চরিত্র, যথা—জলদেবী।

৩। পশু চরিত্র, যথা—বাঘ, কুমীর, ভেড়া প্রভৃতি।

৪। রাক্ষস চরিত্র, যথা—দক্ষিণা দেও।

৫। পরীচরিত্র (এদের নামকরণ করা হয়নি), এবং

৬। প্রেত চরিত্র,—দানব, ভূত প্রভৃতি।

প্রত্যেকটি চরিত্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। মানব চরিত্রে মানবীয় সাধারণ গুণাবলী, রাক্ষস চরিত্রে রাক্ষসীয় ব্যবহার এবং এইরূপ ভাবে অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একমাত্র গাজী ও কালুকে মানব হওয়া সত্ত্বেও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শনের মাধ্যমে যেভাবে দেখা যায়,—তাতে তাঁদেরকে কখন কখন যাদুকর বলে মনে হয়। পরী, প্রেত, দেব-দেবী তো কাল্পনিক ব্যাপার,—তাদের চরিত্র তেমন ভাবেই চিত্রিত করা হয়েছে।

সমগ্র কাহিনীতে কালু শাহের চরিত্রটি অতীব চিত্তাকর্ষক। তিনি গাজীর সহোদর নন, নন সেকেন্দার সাহের পুত্র বা গাজীর বৈমাত্র ভাই। তিনি শুধু ভ্রাতৃপ্রতিম সাথী—ইসলামি আদর্শের অনুসরণকারী সহযাত্রী ফকির মাত্র। একসাথে শৈশব-কৈশোর কাল অতিক্রম করার ফলে তাদের মধ্যে যে মমত্ব যে সহমর্মিতা গড়ে উঠেছে তা পবিত্র এবং অটুট। তাই তিনি গাজীর সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার হতে পেরেছেন মনে-প্রাণে। তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি একজন সত্যকার সুফী-ফকির। তাই তিনি বিভ্রান্ত গাজীকে বলেছেন,—

ফকিরের বিধি নহে থাকা এক ঠাঁই।
এদেশ ছাড়িয়া চল অন্য দেশে যাই॥

কালু অন্যত্র যে ভাব প্রকাশ করেছেন তার অংশ বিশেষ এইরূপ :—

বন্দী হইল ভাই মোর ভবের মায়ায়॥
এ জাল কাটিতে তার সাধ্য নাহি আর।
ফকির হইল মিছে নামেতে আল্লার॥
এই সব লোভ যদি মনে তার ছিল।
রাজত্ব ছাড়িয়া কেন ফকির হইল॥

কালু বস্তুতঃ গাজীর সহিত রক্ত-সম্পর্কে সম্পর্কিত নন। গাজীর মাতার নিকট কালু সন্তানবৎ প্রতিপালিত হয়েছিলেন। সেই সম্পর্ক ধরে গাজীর

একনিষ্ঠ সহচর হিসাবে কালুকে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। কালুও একজন রক্ত-মাংস সম্বলিত মানুষ। তাঁকে কোথাও ভাব-প্রবণ দেখা যায় না। নারীর প্রতি তাঁর কোন দুর্বলতা দৃষ্ট হয় না। বরং তাঁকে সাধন-ভজনের পক্ষে বিহ্বল-চিত্ত গাজীকে সংযত করার জন্য উপদেশ দিতে দেখা যায়। গাজী সংসার ত্যাগ করে পরিব্রাজক হলে কালু তাঁর সঙ্গ গ্রহণ করেন, যেন তিনি ব্যতীত গাজীকে রক্ষা করবার অন্য কেহ ছিল না। বাস্তবিক সশরীরে সুস্থ অবস্থায় গাজী ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে বৈরাট নগরে শাহ্ সেকেন্দার ও তদীয় পত্নী অজুপার নিকট উপস্থিত করতে পারায় কালু খুব তৃপ্ত। কালু যেন এক বিরাট দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করতে পারায় পরম আনন্দিত।

গাজী এই কাব্যের নায়ক চরিত্র। মানুষ হিসাবে তাঁর মধ্যে ষড় রিপুর কিছু বহিঃপ্রকাশ হতে পারে এটাই স্বাভাবিক। তা বলে তিনি মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হন নি, যদিও এক-আধটু বিপথগামী হয়েছিলেন। যে যুগের চিত্র এই কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে, সে যুগে ইসলাম ধর্ম এ দেশে ব্যাপক আকারে প্রচারিত এবং প্রসারিত হচ্ছে। সে সময় আরব, পারস্য প্রভৃতি স্থান থেকে সুফী দরবেশগণ ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসছেন। সুফী দরবেশ হিসাবে ধর্মপ্রচারকের মানবিক ব্যবহার এদেশের জনসাধারণের মনকেও স্পর্শ করেছে। মুসলমান জনমানসও যেন এই ধরণের প্রচারের স্বপক্ষে উন্মুখ হয়েছিল। তদুপরি এ দেশের গোঁড়া বর্ণাশ্রমবাদীগণের তখন ক্ষয়িষ্ণু। অবস্থা এবং নির্য্যাতিত তথা অবহেলিত অন্ত্যজশ্রেণীর সাধারণ মানুষ সামাজিক ন্যায্য অধিকার পাওয়ার আগ্রহে ছিল অধীর। গাজী এইরূপ অনুকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারুণ্যের সরলতায় সামাজিক মুক্তির বাণী নিয়ে এগিয়ে এলেন জনসাধারণের মাঝে। চম্পাবতী-লাভের উন্মাদনা গাজীর চরিত্রে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কবি যে ভাবে কাহিনী গ্রথিত করেছেন তাতে মনে হয় "প্রেম মানুষের জন্য, কোন বিশেষ ধর্মের জন্য নয়।" মধ্যযুগে অনেকে সামাজিক বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন—প্রচলিত বর্ণগত বিভেদ দূর করতে। নর-নারীর প্রেমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য হিসাবে পরিলক্ষিত হয়েছে।

গাজীর নিজস্ব দর্শনের আর এক পরিচয় তাঁর উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়।

কালু যেখানে গাজীকে উপদেশ দিচ্ছেন যে তিনি নারী-ধ্যানে খোদাকে হারাবেন, সেখানে তার উত্তরে গাজী বলছেন—"এই ধ্যানে খোদা লাভ হবে।"

কালু বলে নাহি আছে খোদার আকার।
গাজী বলে যত মূর্তি সকলি তাহার॥

কালু আরো প্রশ্ন করেছেন এবং তার উত্তরও পেয়েছেন। যথা—

কালু বলে প্রেমে প্রাণ যদি যায়।
গাজী বলে স্বর্গে গিয়া পাইব তাহায়॥
কালু বলে সংসারেতে হয় যদি বিয়া।
গাজী বলে গেল তবে কার্য্য সিদ্ধি হৈয়া॥
কালু বলে কিবা কহ না পারি বুঝিতে।
গাজী বলে সোজা পথ নাহি ইহা হইতে॥
কালু বলে বিয়া কর ভজিবা কাহারে।
গাজী বলে গাঁথা যেই আমার অন্তরে॥

অর্থাৎ সংসারী থেকেও সাধন-ভজন সম্ভব। কান্ত-কান্তা ভাবকে গাজী সাদরে আশ্রয় করেছেন। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন যে জীবন-সর্বস্ব নয় গাজী তা নিশ্চয় জানেন। তবে নারী যখন তাঁকে মূল লক্ষ্য থেকে আকর্ষণ করছে বলে মনে হয়েছে, তখনি তিনি বিবি চম্পাকে সেওড়া গাছে পরিণত করে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। পুনরায় তিনি চম্পাবতীকে মানবী রূপে রূপান্তরিত করে বৈরাট নগরে মাতা পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন করেছেন—তিনি সংসার জীবনের সহিত সংযুক্ত হয়েছেন।

চম্পাবতী চরিত্রে পতিপ্রাণ নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কারও তাঁকে মুসলমানকে বিয়ে করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। প্রেম সংস্কারকে অতিক্রম করে গেছে। মাতা লীলাবতীর প্রভাব তাঁর মধ্যে এসেছে। যেখানে দেখি মাতা লীলাবতীর মাতৃহৃদয় কন্যার বেদনায় ব্যথিত, সেখানে তিনি বলেছেন—

বিধির যদি লিখা হয় কপালে তোমার।
তাহা কে খণ্ডিতে পারে শক্তি আছে কার॥

এক্ষেত্রে লীলাবতী ঘোরতর অদৃষ্টবাদী। গাজী যে মুসলমান তা তিনি জেনেও কন্যার প্রতি সমর্থন জানিয়ে উভয়ের মিলনের পথে প্রতিবন্ধক হন নি। হিন্দু-ব্রাহ্মণ রমণীর চরিত্রে সতীত্ব যে কত বড় স্থান অধিকার করে থাকে এটি তার অন্যতম একটি দৃষ্টান্ত। জাতি নয়, ধর্ম নয়,—সেখানে শুধু সন্তানের প্রতি মাতার অপরিসীম ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে।

সকল চরিত্রের বিস্তৃত আলোচনা এখানে বাহুল্য মাত্র। সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজচিত্রে যতটুকু চরিত্র-পরিচয় পাওয়া যায় তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :—

বৈরাটনগরের অধিপতি শাহ সেকেন্দার সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ধনবান, তিনি হাতেমের সমান দাতা, তিনি রোস্তম বা শাম নুরিমানের চেয়ে শক্তিশালী। পাতাল রাজও তাঁর কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন এবং সমর্পণ করেছেন কন্যা অজুপা সুন্দরীকে। তাঁর পরিবারের চিত্র হল তৎকালীন রাজা-বাদশাহ্ মুসলমান পরিবারের চিত্র। তাই তাঁর পুত্র জুলহাস শিকারে গেলেন এবং পাতাল-রাজ জঙ্গের একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে সেখানেই থাকৃতে মনস্থ করলেন। পিতা ও মাতার অনুমতি গ্রহণ করার আগেই পুত্র বিবাহে সম্মত হলেন,—রাজা-বাদশার কোন কোন পরিবারে এমন ধারা ছিল। তবে অপর দিকে রাণী অজুপা সাগরে যাওয়ার আগে স্বামীর অনুমতি নিয়েছেন দেখা যায়।

রাণী অজুপাকে খোদার নিকট স্তব (নামাজ) করতে হয় সকলের মঙ্গল কামনায়। তিনি গর্ভবতী হওয়ার পর সাত মাসে নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য সাধ-ভক্ষণ করেন। বাদশাহ্ সেকেন্দার দশ বছরের পুত্র গাজীকে সিংহাসনে বসাবার জন্য আহ্বান জানান। সমাজে তখন এইরূপ চিন্তার পরিবেশ যে ছিল তা এইসব ঘটনার সূত্রধরে বোঝা যায়।

গাজী, পিতার আদেশ অগ্রাহ্য করেন আল্লাহভাবে বিভোর হওয়ার কারণে। এইরূপ পিতৃদ্রোহী সন্তানকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার রেওয়াজ অপ্রচলিত ছিল না। অবশ্য কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনার বিবরণ বিবৃত হয়েছে যার সামাজিক কোন মূল্য দেওয়া চলে না। তবে সেকেন্দার শাহের পরিবার তথা মুসলমান সমাজের মানুষের মন যে হিন্দুধর্মাশ্রিত পৌরাণিক কাহিনী-প্রভাবিত মানস-লোকের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না—তা সুস্পষ্ট।

সন্তানের প্রতি জননীর কি অপরিসীম বাৎসল্য এবং জননীর প্রতি সন্তানের কি অসাধারণ ভক্তি তৎকালেও মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল, এখানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সন্তান গাজী আপন মাতাকে সালাম জানাচ্ছেন। গাজী সালাম জানালেন পিতাকে,—মাথা নীচু করে পিতার উপদেশ বাক্য শোনেন,—তাঁর চোখ থেকে ঝরে অশ্রু। মাতা অজুপা পুত্রকে কোলে বসিয়ে আদর করেন, নিজের হাতে আহার করান। মাতা, পুত্রের বিমর্ষ বদন দেখে দুঃখে বিহ্বল হন। পুত্রকে নিজের বুকে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে নিদ্রা যাওয়ার যে বাৎসল্য অনুভূতি তা গাজীর সংসারের তথা মুসলমান সাধারণের সমাজেরও এক বাস্তব চিত্র। অধুনা যেমন গ্রামের কে কোথায় গেল, কিভাবে দেশত্যাগী হল তার খবর রাখার প্রতি সাধারণের ঔৎসুক্যে অভাব লক্ষিত হয়,—তখনকার দিনে ঠিক তেমটি ছিল না। বরং গ্রামের একজন লোক ফকির হয়ে যাওয়ার ব্যথায় গ্রামবাসীর মধ্যকার যে বেদনার চিত্র পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে এই ঘটনায় গ্রামের জনসাধারণসহ সমগ্র প্রকৃতিই যেন হতো বিষণ্ণা-ক্রন্দনরতা।

একান্নবর্তী পরিবারের ভ্রাতৃ-সদৃশ কালু বৈরাগ্য-আদর্শে নিজের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে ভ্রাতৃ-বাৎসল্যের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আদর্শ থেকে মুক্ত হয়ে উঠতে তৎকালীন নও-মুসলমান সমাজ সক্ষম হন নি। তাই দেখা যায় গাজী ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লে আল্লা করুণা পরবশ হয়ে তাঁর আহারের জোগান দিলেন,—অর্থাৎ গাজী বিনা প্রচেষ্টায় আহার পেলেন। এইরূপ ঘটনার বাস্তবতা ইসলামি ধ্যান বা ধারণায় নেই। অন্যত্র দেখি তিন বার ফুকদিয়ে পানি নিক্ষেপ করতেই ছাপাইনগরের পরিব্যাপ্ত আগুন নিভে গেল। এ থেকে জানা যায় যে তৎকালীন মুসলমান সমাজেও অনুরূপ কুসংস্কারের স্থান ছিল। শুধু তাই নয়,—ভূত-প্রেত প্রভৃতির অস্তিত্বে এবং মন্ত্র-তন্ত্রেও বিশ্বাস ছিল দেখা যায়।

এ কাব্যে মুসলমান নারী সমাজের সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠেনি। মাত্র কয়েকজন মুসলমান নারীর চরিত্রের বিক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। অজুপা ও পাচতোলার নারীসুলভ আচরণ তৎকালীন সমাজের নারীর সহৃদয়তার চিত্র বটে,—তবে সামাজিক আচার-আচরণের বিশেষ কোন চিত্র মিলে না। এক স্থানে দেখি কালু গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পিতৃসদৃশ শাহ্ সেকেন্দারকে ছালাম জানাচ্ছেন। সেখানে নিম্নলিখিত দৃশ্যটি অনুধাবনযোগ্য :—

পালঙ্গে বসিয়া ছিল শাহা সেকেন্দার।
হেনসমে কালু সাহা জোড় করি কর ॥
ছালাম করিয়া খাড়া সম্মুখে হইল। ইত্যাদি—(৮৮ পৃঃ)

কালু হাতজোড় করে সেকেন্দারকে ছালাম জানাচ্ছেন,—অভিবাদনের এ পদ্ধতি ইসলামে দেখা যায় না। অন্যত্র দেখা যায়,—

চাম্পাবতী-পাচতোলা আসিয়া ত্বরায়।
ছালাম করিল ধরি শ্বাশুড়ির পায় ॥ (৮৯ পৃঃ)

মুসলমান নারী সমাজের মধ্যে ছালাম করার পদ্ধতিতে শ্বাশুড়ির পায়ে ধরার রীতি এখানে দৃষ্ট হচ্ছে। এ দৃশ্য আজ আর বড় একটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই আদর্শ সমূহ সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ্য-আদর্শ প্রভাবিত। কবি আবার রহিম সাহেব নিজেও এই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। কারণ তিনি তাঁর ভণিতার এক স্থানে লিখেছেন,—

পাঠকে প্রণমি পুথি সমাপ্ত হইল। (৮৯ পৃঃ)

আরো দ্রষ্টব্য যে, চম্পাবতীর মাতার নিকট জুলহাসের পত্নী পাচতোলা এবং গাজীর পত্নী চম্পাবতী এসে—

"লীলাকে প্রণাম তারা দুজনে করিল।" (৮৭ পৃঃ)।

বলা বাহুল্য লীলাবতী তখন মুসলমান হয়েছেন, চম্পাবতীও তো গাজীর সাথে বিবাহের পূর্ব্বেই মুসলমান হয়েছেন এবং পাচতোলা তো মুসলমান বটেই। অতএব দেখা যায় যে মুসলমান হয়েও তাঁরা তখনও ব্রাহ্মণ্য আদর্শকে বিসর্জন দিতে পারেন নি,—তাই তাঁরা "প্রণাম" জানিয়েছেন "ছালাম" (আস্‌ছালাম আলায়কুম)-এর স্থানে।

কালু-গাজী-চম্পাবতী (নাটক)

"কালু-গাজী-চম্পাবতী" নাটকের রচয়িতার নাম সতীশচন্দ্র চৌধুরী। তিনি বাইশখানি গ্রন্থের প্রণেতা বলে এ পর্য্যন্ত জানা গেছে। তাঁর রচিত শুধু নাটকের সংখ্যা তেরো। তা ছাড়া তাঁর বহু সাময়িক রচনাও আছে। মাত্র দু'একখানি গ্রন্থ ব্যতীত সমস্ত গ্রন্থই অমুদ্রিত রয়েছে। তাঁর রচনাবলীর একটি সাধারণ তালিকা এইরূপ :—

১।	পূজার পঞ্চরঙ	নাটক	
২।	যুগল মিলন	”	
৩।	উতঙ্ক	”	
৪।	পঞ্চরঙ	”	
৫।	আবেগ বিভোরা	”	
৬।	কালচক্র বা বশিষ্টের ব্রহ্মত্বলাভ	”	
৭।	আহুতি	”	
৮।	চন্দ্রবিন্দু	”	
৯।	মনসা মহিমা	”	
১০।	রণলতা	”	
১১।	বনবিবি	”	
১২।	কালু-গাজী-চম্পাবতী	”	
১৩।	পীর একদিল শাহ্	”	[প্রাপ্তব্য নয়]
১৪।	হিন্দুস্থান	কবিতা সংকল	—মুদ্রিত
১৫।	রঘু ডাকাত	নাটিকা	”
১৬।	দিগ্বিজয়	রহস্য উপন্যাস	
১৭।	ব্রহ্মশাপ	বড় গল্প	

১৮। প্রবন্ধ সংকলন ঃ—

(ক) কে তুমি, (খ) কেন ভালবাসি, (গ) প্রেমের বন্ধন, (ঘ) হায় হায় কেন কেঁদে মরি, (ঙ) ভালবাসি

১৯। ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী —মুদ্রিত

২০। বাংলা প্রবাদ-প্রবচন

কালু-গাজী-চম্পাবতী নামক এই নাটক তিনি মাত্র দুই দিনে লিখে সমাপ্ত করেছিলেন। এতে বোঝা যায় যে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ছিল। নাট্যকার ছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত বামনমুড়া গ্রামের অধিবাসী। তাঁর পিতার নাম রামলাল চৌধুরী। তাঁর দুই সহোদরের অন্যতম অরুণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় নাট্যকারের অনেক নাটকের কপি করে দিয়েছিলেন। নাট্যকার গুস্তিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে বহুদিন শিক্ষক—করণিক হিসাবে কাজ করছিলেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ হল ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী। গুস্তিয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তারকনাথ সিংহ ১৭-৩-১৯২০

খ্রীষ্টাব্দের একটি প্রশংসাপত্রে লিখেছেন যে বাবু সতীশ চন্দ্র চৌধুরী ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, কষ্ট সহিষ্ণু এবং বুদ্ধিমান যুবক। তিনি ছিলেন ভদ্র এবং কর্তব্যপরায়ণ।

নাট্যকার সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের "কালু-গাজী-চম্পাবতী" নামক নাটকখানি পুথি আকারে পাওয়া গেছে অর্থাৎ নাটকখানি এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নি। পুথির আকৃতি ১০½"×৮½"। তার পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ৫১। বেশ পুরু সাদা কাগজে লেখা। পুথির কিছু অংশ পোকায় কেটেছে। তার অবস্থা জরাজীর্ণ। এর পৃষ্ঠাঙ্ক লিখিত নেই। নাটকখানি পঞ্চাংক বিশিষ্ট। প্রতি অংকে চারটি করে দৃশ্য। প্রতি দৃশ্যান্তে বিরতি-সূচক চিত্র অংকিত হয়েছে। প্রতি দৃশ্যারম্ভের সংযোগস্থল উল্লেখ করা হয়েছে। যথারীতি কুশী-লবগণের একটি আলাদা পরিচিতি-পত্র আছে। পুথির শেষ পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দৃশ্যানুযায়ী প্রদত্ত হয়েছে। নাটক আরম্ভের আগেই আছে আবাহন ও বন্দনাগীতি। তারপরই শুভ সূত্রপাতের পূর্বেই শিরোভাগে লিখিত আছে "শ্রীশ্রী হক নাম"। নাটকে নাট্যকার "প্রবেশ-প্রস্থান" নির্দ্দেশিকাও দিয়েছেন। বন্দনা-গীতির মধ্যে তিনি ভণিতায় বলেছেন,—

> এ দীন সতীশে ভণে, (খোদা) কর কৃপা নিজগুণে,
> পীর ফেরেস্তা যত প্রথমে করি বন্দন।
> (আজি) হও সবে অনুকূল অধম লয় স্মরণ ॥

নাটকখানি গাঢ় কালো কালিতে লেখা,—অক্ষরগুলিও বেশ মোটা মোটা গোটা গোটা। নাটকের শেষে লিখিত আছে copied by Arun Chandra Chowdhury কিন্তু copied by শব্দ দুটি কাটা। নাট্যকারের অন্যান্য রচনার লেখা হস্তাক্ষর দেখে মনে হয় এ নাটক তাঁর নিজের হাতের লেখা নয়। অরুণচন্দ্র চৌধুরী তাঁর সহোদর। তাঁদের একান্নবর্তী পরিবার। তাঁর লেখা সহোদর অরুণচন্দ্র চৌধুরী নকল করে দেবেন এটা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং এটি মূল নাটক নয় বলে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। তবে এর মধ্যকার আবাহন, বন্দনা-গীতি ও পাত্র-পাত্রী পরিচয় অংশে যে নাট্যকারের নিজের হস্তাক্ষর রয়েছে তা তাঁর নিজের লেখা অন্যান্য রচনার হস্তাক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝা যায়। এতে সর্বমোট ৪৩ খানি গান আছে। প্রকৃতিগতভাবে এদের সংখ্যা যথাক্রমে এইরূপ :—

ভক্তি গীতি	৫ খানি,
বাৎসল্য গীতি	৭ খানি,
প্রণয় গীতি	১০ খানি,
অধ্যাত্ম গীতি	২ খানি
প্রহসন গীতি	৫ খানি
বীর রসাত্মক গীতি	১ খানি,
দেশাত্মবোধক গীতি	৪ খানি,
ঈশ্বর বন্দন.	৬ খানি,
অন্যান্য গীতি	৩ খানি।

নাটকখানির রচনাকাল এইরূপ লিখিত আছে,—"এই পুস্তক সন ১৩২০ সালের ৬ই পৌষ রবিবার আরম্ভ এবং ৮ই পৌষ মঙ্গলবার সমাপ্ত হইল।"

এ নাটক যে একখানি কাব্যের নাট্যরূপ তা নাট্যকারের স্বীকৃতিতেই পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,—"হিন্দুস্থান, মনসা মহিমা, বনবিবি প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা বামনমুড়া নিবাসী শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক নাট্যকারে পরিবর্তিত।" তবে এ পুস্তক যে কোন্ পুস্তকের নাট্যরূপ তা কোথাও লিখিত নেই। সম্ভবতঃ মুনশী আবদুর রহিম প্রণীত 'গাজী-কালু ও চম্পাবতী' কাব্যের ছায়া অবলম্বনে রচিত নাট্যরূপ। আবার দেখা যায় যে আবদুর রহিমের কাব্যের নামকরণের প্রথম শব্দ 'গাজী' কিন্তু সতীশচন্দ্র চৌধুরীর নাটকের নামকরণের প্রথম শব্দ 'কালু'। তবে খোন্দকার আহম্মদ আলী এবং মোহাম্মদ মুনশী রচিত কাব্যদ্বয়ের নামকরণের সঙ্গে সতীশচন্দ্র চৌধুরীর নাটকের নামকরণের সম্পূর্ণ মিল আছে। দুঃখের বিষয় শেষোক্ত কাব্যদ্বয় আজো আমাদের হস্তগত হয়নি,—হয়ত তা একেবারেই দুষ্প্রাপ্য।

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক ভাষার সঙ্গে বারাসত—বসিরহাট অঞ্চলের চলিত ভাষার সংমিশ্রণ এই নাটকে দৃষ্ট হয়। নবাব বা রাজার মুখে পাওয়া যায় মার্জিত ভাষা, অন্যদিকে কৃষক, ব্যাধ, পাটনী, বিড়িওয়ালা প্রভৃতির মুখে পাওয়া যায় স্থানীয় অমার্জিত ভাষা। নবাব সেকেন্দার বলছেন,—"এ ক্ষীণ শরীরে আর গুরুতর পরিশ্রম কর্তে পারি না। বিচার-বিতর্ক-রাজনীতি যেন বিষময় বলে বোধ হয়।"

পাটনীর মুখের ভাষার নমুনা ; —"যে আজ্ঞে, তবে আমি চল্লেম—পেরণাম্।"

নবাবের কোষাধ্যক্ষের পত্নীর মুখের ভাষা,—"কে রা হাঘরে হতভাগা—বেয়াক্কেলে—বরাখুরে উনপাঁজুরে! বল্লে কথা শুনিস্‌নে। মুড়ো খ্যাংরায় সোজা কর্‌ব।"

ব্যাধিনী বল্‌ছে,—"আর ন্যাক্‌রা কত্তে হবে না।"

নাটকে নায়ক-নায়িকা হতে আরম্ভ করে রাজা-পুরোহিত-বেগম প্রভৃতি প্রায় সকলের কণ্ঠে গীত সন্নিবেশিত হয়েছে। গানগুলিও যথেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কয়েকটি গান পাঁচালীর সুরে গাইবার উপযুক্ত। কতকগুলি অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ। কতকগুলি গান সস্তা রসপুষ্ট। গানগুলি অবশ্য বিশেষভাবে 'যাত্রায়' ব্যবহারের উপযোগী।

সমগ্র নাটকখনি গদ্য ও পদ্য উভয় ছন্দে রচিত। পরীরাও পদ্যে কথোপকথন করেছে।

নাট্যকার এই অল্প পরিসর নাটকের মধ্যে অনেক প্রবচন সংযুক্ত করেছেন। যথা,—

১। এ দুনিয়া ভোজের বাজী।

২। রাখে কৃষ্ট মারে কে ?

৩। নির্লজ্জের নাহি লাজ নাহি অপমান,
সুজনকে এক কথা মরণ সমান।

৪। নথ নাড়ার বেলা তো কসুর নেই,
নে নে আর নাচ্‌তে এসে
ঘোমটা টেনে কাজ নেই।

৫। কুসন্তান হলেও কখন কুমাতা হতে পারে না।

৬। মাতা-পিতা ধন-জন কেউ কারো নয়।

৯। গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি,
রাম না হতেই রামায়ণ।

৮। গরজে গয়লা ঢেলা বয়।

৯। মধু অভাবে গুড়, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

১০। হল তিল তো কল্লেন তাল,
খেলেন কচু তো বল্লেন নিচু।

নাটকখানিতে ব্যবহৃত ভাষার গতি সহজ ও স্বচ্ছন্দ। হেকমৎ, কসম, দরদ, নফর প্রভৃতি কিছু কিছু আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ইংরেজী কোন শব্দ পরিলক্ষিত হয় না। স্থানীয় ভাষায় ক্রিয়াপদে 'আম' প্রত্যয়ের স্থলে 'এম' প্রত্যয় লক্ষ্যণীয়। যথা :—কল্লেম, চল্লেম প্রভৃতি। আঞ্চলিক ভাষার প্রকৃষ্ট নিদর্শন নাটকের অন্যতম চরিত্র "রূপচাঁদের" মুখে পাওয়া যায়। যথা :—

> ঘরে দোর দিয়ে কচ্চে কি? আচ্ছা রও, আমি কেঁদে ককিয়ে সাড়া দিয়ে দেখি। (গলা শানাইয়া) বলি বাড়ী আছ গা?"

"কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটকের" কাহিনীর সঙ্গে মুনশী আবদুর রহিম সাহেবের কাব্য "গাজী-কালু-চম্পাবতী" কাহিনীর সাধারণ মিল আছে। সুতরাং কাহিনীর বিবরণ পুনরায় এখানে প্রদত্ত হল না। কাহিনীটিকে নাটকোপযোগী করার জন্য রূপচাঁদ, বিড়িওয়ালা, বিশু প্রভৃতি কিছু পার্শ্ব-চরিত্র নাট্যকার সংযুক্ত করেছেন। তা ছাড়া এতে নৃত্য সহযোগে গান পরিবেশন করা হয়েছে। উক্ত কাব্যের সাথে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করা যায়—

১। চম্পাবতী, গাজী ও কালু, এই তিন নামের গাজী নামটি আবদুর রহিম সাহেব আগে ব্যবহার করেছেন এবং কালু নামটি সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় আগে ব্যবহার করেছেন কেন তা কবি বা নাট্যকার কেউই কিছু বলেন নি। তবে এর প্রধান দুটো কারণ আছে বলে মনে হয়। প্রথমতঃ গাজী অপেক্ষা কালু বয়সে বড়। সুতরাং সম-আদর্শে বিশ্বাসী এবং ধর্মপ্রচারে সম অংশীদার কালুকে নাট্যকার গৌণ ব্যক্তি বলে মনে করেন নি। দ্বিতীয়তঃ ইসলামের বাণী ও আদর্শ প্রচারই পীর-দরবেশগণের জীবনের মূল উদ্দেশ্য, অতএব সেই আদর্শ থেকে কালু বিচ্যুত হন নি, উপরন্তু মাঝে মাঝে গাজী যখন বিভ্রান্ত হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার উপক্রম করেছেন, তখন কালুই তাঁকে পদস্খলন হতে রক্ষা করেছেন।

২। পাঁচালী কাব্যের কাহিনীতে গাজী ও চম্পাবতীর প্রণয়-কথা মুখ্যস্থান অধিকার করেছে, যদিও তাঁরা শেষপর্য্যন্ত ইসলামের জয়গান গেয়েছেন। সতীশ চৌধুরী মহাশয় তাঁর নাটকে গাজী ও চম্পাবতীর প্রেম-কথাকে উপেক্ষা

করেন নি। তিনি পীর-ফকিরগণের যে আসল উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম প্রচার—তা মূল চিন্তায় রেখে এই কাহিনী গড়ে তুলেছেন।

৩। আবদুর রহিম সাহেব রচিত কাব্যে মটুক রাজার রাজ্যশুদ্ধ সকলের ইসলাম ধর্মগ্রহণের কথা আছে, কিন্তু নাট্যকার সতীশচন্দ্র চৌধুরী তাঁর নাটকে মটুক রায়কে ধর্মান্তরিত হয়েছেন এমন দেখান নি। কেবল রাজার পুরোহিত দক্ষিণা দেওকে মুসলমান হতে হবে, গাজীর এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে মাত্র—তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এমন কিছুই দেখানো হয় নি। তবে সাফাই নগরের রাজা মুসলমান হলেন—সে চিত্র সতীশবাবু দিয়েছেন। বস্তুতঃ, মটুক রাজা এবং দক্ষিণ রায় যে মুসলমান হয়েছিলেন এমন বক্তব্য আপাততঃ নজরে পড়ে না। কৃষ্ণরাম দাসের "রায়মঙ্গল" কাব্যে শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের ভিত্তিতে মিলন ঘটতে দেখা যায়—ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা সেখানেও নেই। মহম্মদ এবাদোল্লা রচিত "পীর গোরাচাঁদ" কাব্যেও দেখা যায় দক্ষিণ রায় ধর্মান্তরিত হন নি,—তবে রাজ্য নিয়ে উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ পীর গোরাচাঁদ ও দক্ষিণ রায়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। মুন্সী খোদা নেওয়াজ রচিত "গোরাচাঁদের কেচ্ছা" কাব্যেও দক্ষিণ রায়ের মুসলমান হওয়ার কথা নেই—সেখানেও উভয়ের মধ্যে সহাবস্থানের কথা ঘোষিত হয়েছে।

৪। আবদুর রহিম সাহেব পীর মাহাত্ম্য-কথা শুনাতে গিয়ে গাজী-চম্পাবতীর বিবাহকে কেন্দ্র করে কাহিনীটিকে আদি-রসাত্মক করে তুলেছেন। তাদের প্রেমকথায় সন্তুষ্ট না হতে পেরে যেন কিছু রতিলীলার কথা বলে সাধ মিটিয়েছেন। আদি-রসাত্মক চটুলতা প্রকাশের দুর্বলতা দূর করবার চেষ্টায় তাই কবি শেষ দিকে গিয়ে নবী কথা, শাহ জালাল কথা, বদর শাহ কথা প্রভৃতি অনেক কথা বলে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। নাট্যকার সতীশ চৌধুরী এ সব দিক থেকে পরিমিতির পরিচয় দিয়েছেন। ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির নিকট তাঁর নাট্য-কাহিনী আদিরসাত্মক বলে মনে হবে না। গাজী ও চম্পাবতীর মধ্যে প্রণয়ালাপের মধ্যে একটা সংযত ভাব লক্ষিত হবে—উভয়ের মিলনের মধ্যে একটা স্বর্গীয় পবিত্র ভাবধারা পরিবেশনের প্রচেষ্টা দেখা যায়।

৫। দেশপ্রেমাত্মক কথা "গাজী-কালু-চম্পাবতীর" কাব্য-কাহিনীতে স্থান পায় নি। গাজী-চম্পাবতীর প্রেমকথা দিয়ে সাধারণের মনোরঞ্জন-প্রবণতা

স্পষ্ট অনুভূত হয় ; ধর্মকথা পরিবেশনা গৌণ হয়ে উঠেছে। সতীশবাবুর নাটকে কোন সংঘর্ষমূলক চিন্তার চেয়ে, দেশাত্মবোধক প্রত্যক্ষ ঘটনার উপস্থাপনা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

৬। কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটকের কাহিনীতে সমাজের তৎকালীন অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীয় দশকের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল সমাজ, এমন কি সমাজ-শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের আচার-আচরণ, এই নাটকের অন্যতম চরিত্র রাজা রামচন্দ্রের ন্যায় শ্রেণী-চরিত্র এই নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে।

রাজা রামচন্দ্র যিনি রাজসভায় নৃত্যপটিয়সীগণের নাচ-গানে আনন্দ-বিভোর হয়ে চরম সুখ অনুভব করতে চাইতেন, তিনি ভোজন রসিকতার যে পরিচয় দিয়েছেন তা এইরূপ—

লুচিশ্চ মণ্ডাশ্চ ক্ষীর দধি সন্দেশং।
খাজা গজা কচুরিঞ্চ পরমান্ন ইত্যাদিং॥

তিনি আরো বলেছেন যে, পঞ্চ 'ম' কারই সুখের আধার। সেখানে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নস্য নিয়ে আপত্তি জানালেন,—"আমি জানি পঞ্চ 'ম' কার সবচেয়ে খারাপ জিনিষ।"

এ সবই তৎকালীন বিলাসী রাজন্যবর্গের খাঁটি চিত্র। ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণের চাতুরী-চরিত্র এখানে সুস্পষ্ট। মুসলমান কালু রাজসভায় উপস্থিত হলে রাজসভা অপবিত্র হয়েছে ; অতএব তা পবিত্র করার ব্যয়-কার্পণ্য ভাব প্রকাশ পাওয়ায় ভট্টাচার্য্য মশায় বললেন—"অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা দিতে না পারলে কি আজকাল পুরুতগিরি চলে!"

৭। দেশ-প্রেমের হাওয়া যে গ্রামে গ্রামে তখন (১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দ) বেশ খানিক প্রবেশ করেছিল তা বিড়িওয়ালার গান থেকে বুঝা যায়—

চাই, গোলাপী বিড়ি চাই,
বিদেশী সিগারেটের
মুখে দে না ছাই।
মৌরী এলাচ মৃগনাভি,
বোম্বে মাদ্রাজ বর্মা পাবি,
ঘরের সোনা ফেলে দিয়ে,

পরের বিষ কেন খাই।
কাজ কর মিলে মিশে
দেশের পয়সা থাকবে দেশে
কেন মর কয় সতীশে
আপশোষে বাঙালী ভাই।
যেও না আর পরবশে
যায় প্রাণ ক্ষতি নাই ॥

৮। অনুরূপ দেশ-প্রেমাত্মক কথা গাজী-কালু-চম্পাবতী কন্যার পুথিতে নেই। এইসব পুথিতে কিছু প্রণয়-কথা ও ধর্মকথা ছাড়া সাহিত্য-রসাত্মক কিছু নেই। তাই কোন কোন সমালোচক এইরূপ পাঁচালী কাব্যগুলিকে উপেক্ষা করেছেন। এমনকি তাঁর এইসব রচনাকে কদর্য ভাষায় রচিত বলে মন্তব্যও করেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁরা হয়ত খবর রাখেন না যে, এখনও কোন কোন অঞ্চলের নিরক্ষর জনসাধারণ আগ্রহসহকারে ভক্তিভাবে এই সকল রচনার মাধ্যমে পীরগণের মাহাত্ম্য-কথা অবগত হয়ে থাকেন। তাঁরা এগুলিকে যথেষ্ঠ আগ্রহ সহকারে উপভোগ তো করেনই এবং সেই সাথে প্রচুর আনন্দও লাভ করেন। যে মুসলমান সমাজ-চিত্র অন্য কোন সাহিত্যে স্থান পায়নি, ইতিহাসের ক্ষেত্রে যার মূল্য অপরিসীম,— ত এই রচনাবলীতে ধরা পড়েছে।

৯। আধুনিক কালের স্ত্রৈণ-ব্যক্তির এক মনোরম চিত্র অঙ্কন করে নাট্যকার লিখেছেন :—

কলির একি কাণ্ড দেখি ॥
বলব কারে মনের কথা,
কে আছে এমন দুঃখের দুঃখী।
এখন মাগ হয়েছে মাথার মণি,
ভাতার ব্যাটা যেন ঢেঁকি।
বাপ-মা যে গো পায় না খেতে,
ছেলে আছেন হয়ে খেঁকী।
কলির একি কাণ্ড দেখি ॥

১০। গাজীর মাতা 'অজুপা'র পাগলিনী হওয়া আচার-ব্যবহার দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের নবীনমাধবের মাতার পাগলিনী হওয়া আচার ব্যবহারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। গাজীর মাতা অজুপা বলেছেন,—

—"কে তুই, কে তুই ? দূর হ দূর হ !·········তুই আমার সাম্‌নে থেকে সরে যা,—আমার নিঃশ্বাস গায়ে লাগবে। ···(উচ্চ হাস্য, চিন্তা, ক্রন্দন)"

কিংবা,— "ছেড়ে দে, ছেড়ে দে রাক্ষসী !"···ইত্যাদি।

১১। নাটকখানি পূর্ণমাত্রায় পীরমাহাত্ম্য-নাটক নামেই অভিহিত। এতে পীরের সাথে দেব-দেবীরও আগমন ঘটেছে, দৈববাণী শ্রুত হয়েছে, মর্ত-পাতালের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লাকে ভক্তিভাবে ডেকে অলৌকিক শক্তিতে শক্তিশালী হতে দেখা গেছে, স্বপ্ন-দর্শনকে বাস্তবে পরিণত হতে দেখা গেছে, যাদু বা মন্ত্রবলে নিজ রূপ পরিবর্তিত হতে বা তৎকর্তৃক অসম্ভব কাজ সম্পন্ন করতে দৃষ্ট হয়েছে, এমন কি দেখা গেছে যে—ভাগ্যবিচারের ফল ঠিকভাবে ফলেছে। বাস্তব সমাজ-জীবন ভিত্তিক নাটকে এ সবের অনুপ্রবেশ অস্বাভাবিক বলে সহজেই স্বীকৃত হতে পারে। তা ছাড়া জল্লাদের হাতের তরবারি ভেঙে যাওয়া, হাতীর পায়ের তলায় পিস্ট হওয়া সত্ত্বেও আহত না হওয়া, ভারী পাথর শোলার ন্যায় হাল্কা বোধ হওয়া, প্রহ্লাদের ন্যায় গাজী তাঁর পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহের ভক্ত হয়ে সংসার ত্যাগ করা প্রভৃতি ঘটনাগুলি বিচার করে কাহিনীটিকে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীর অনুকৃতি বলা সঙ্গত।

১২। নাটকের কাহিনী থেকে প্রমাণিত হয় যে, পীরগণের কীর্তিকলাপে হিন্দুগণও মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। পীর দরবেশও দেখা যায় হিন্দুর দেবীকে যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। একস্থানে পীর বড়খাঁ গাজী পাতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাগর-মাসীর শরণাপন্ন হয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা কর্‌ছেন,—

মাসী পূর্ণ কর বাসনা।
যাচি তব করুণা॥
তুমি বিনা বিজন বনে
কে আছে আর বল না।
··· ··· ···
নগরে বসাতে সাধ
উপায় তো দেখি না।
স্বীকার না হলে মাসী
ও চরণ তো ছাড়ব না।

সাগর-মাসীও দেখা গেল গাজীর অনুরোধের উত্তরে বল্‌লেন,—

"বাপ গাজি! এর জন্য চিন্তা কি! উঠ, চল,—আমি এর উপায় করে দেব। চল, পাতালে আমার কন্যা পদ্মাবতীর কাছে চল। সে তোমাকে দেখলে বড় খুশী হবে।"

১৩। পৌরানিক আদর্শের কাহিনী হলেও তৎকালীন বাঙালী-সমাজ-চিত্র এই নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। রূপচাঁদ ও তাঁর গৃহিনীর চরিত্র, অজুপা ও পাঁচতোলার চরিত্র এবং আচার-ব্যবহারাদি খাঁটি বাঙালী চরিত্ররূপে উদ্ভাসিত। জামাতা গাজী ও কন্যা চম্পাবতীকে বিদায় দিবার সময় শ্বাশুড়া লীলাবতী বল্‌ছেন ঃ—

"বাবা, চম্পা আমার অভিমানিনী, বড় যত্নের, বড় আদরের সামগ্রী। যত্ন করে রেখ। আর অধিক কি বল্‌ব।

মা চম্পা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করো। পতি পরম গুরু, কখনও তাঁর অবাধ্য হয়ো না। তাঁর অমতে কোন কাজ করো না। লোকে যেন নিন্দা না করে। মনে রেখ, তার চেয়ে কলঙ্ক মেয়ে মানুষের আর কিছুই নেই। আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও।"

১৪। নাট্যকার ভূত-প্রেতের অবতারণা করে সুন্দরবনাঞ্চলের তৎকালীন সরল অধিবাসীদেরও মনোভাব এবং তৎসহ তাদের ভূত-প্রেতে বিশ্বাসের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

১৫। ব্রাহ্মণ্য আদর্শ ইসলাম ধর্ম সমাগমে আহত। দৃঢ়ভাবে তা প্রতিষ্ঠিত করার শেষ চেষ্টায় ব্রাহ্মণ রাজা মটুক রায় আহ্বান জানাচ্ছেন ঃ—

"উঠ সৈন্যগণ, এস ব্রাহ্মণগণ, যদি নিজ ধর্ম-অস্তিত্ব রক্ষা কর্তে চাও, —যদি জাতিকুল মান বজায় রাখ্‌তে চাও,—তবে চল, সকলে একযোগে বীরদর্পে যুদ্ধে গমন করি।"

১৬। নাট্যকার বাঘসৈন্যের মুখে ভাষা আরোপ করেন নি, যদিও তিনি বাঘগণকে মঞ্চে আনয়ন করেছেন, তাদেরকে যুদ্ধে আহ্বান করা হয়েছে মাত্র। গাজী প্রসঙ্গে বিভিন্ন কাব্যে বাঘগণের নামের বিবরণ লিখিত হয়েছে,—নাট্যকার সেরূপ নামও উল্লেখ করেন নি।

১৭। স্বাধীনতা আন্দোলনের আবহাওয়া এই নাটককে স্পর্শ করেছে। কারণ, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কথোপকথনের মধ্যে একটি গানে আছে :—

"—প্রাণনাথ পায়ে পড়ি,
দাও না কিনে দেশী শাড়ী,
নইলে চলেই যাব বাপের বাড়ী
যতন করে দেশের জিনিষ মাথায় তুলে রাখ না।
হৃদয় খুলে 'সতীশ' বলে এই কথাটি ভুল না ॥

১৮। নাট্যকার স্বদেশী যুগের তৎকালীন আবহাওয়ায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহবন্ধনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তবু বিদেশী জিনিষকে বরদাস্ত করেন নি। তিনি নিজে "এলাহি ভরসা" স্মরণ করে প্রথমে শিরোনামা লিখে নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন তবু ইংরেজগণের অধীনতাপাশকে স্বীকার করেন নি। তিনি চার খানা দেশাত্মবোধক গান এই নাটকে স্থান দিয়েছেন। গানগুলির শব্দচয়ন ও গ্রন্থনা দেখ্‌লে বোঝা যায় যে নাট্যকার এইরূপ গান রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি তার বিভিন্ন গ্রন্থে অসংখ্য গান রচনা করে গেছেন।

কালু-গাজী ও চম্পাবতী নাটকে অঙ্কিত চরিত্রাবলীকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিভাগে বিভক্ত করা যায়—

১। মানব। যথা,—সেকেন্দার, গাজী, কালু, চম্পাবতী প্রমুখ
২। দেবতাস্থানীয়। যথা,—সাগর মাসী।
৩। অমানব। যথা,—রাক্ষস, ভূত-প্রেত ও পরী।
৪। পশু। যথা,—বাঘ ও কুমীর।

তাছাড়া চরিত্রগুলি অন্য ভাবে বিভক্ত করলে দেখা যাবে যে মানব চরিত্রে অভিজাত ও অনভিজাত শ্রেণীর চরিত্র রয়েছে। অনভিজাত বলতে—বিড়িওয়ালা, কৃষক, ব্যাধ প্রভৃতিকে চিহ্নিত করা যায়।

গাজী ধর্মপরায়ণ মানব। সূফী ফকিরের আদর্শ-অনুসারী গাজী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন—কিন্তু সেখানেই তাঁর গতি শেষ হয়ে যায় নি। গাজী উদাসীন, যোদ্ধা, প্রেমিক, দয়াবান; গাজী ভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল; গাজী মানসিক দিক থেকে যথেষ্ট দৃঢ়।

কালুও ধর্মাপরায়ণ মানব। তিনি গাজীর বন্ধু, ভ্রাতা, ভৃত্য—সব কিছু ঃ তিনি গাজীকে সূফী-ফকিরের আদর্শে নিষ্ঠাবান থাকতে সর্ব্বপ্রকার পরামর্শ দিয়েছেন। পীর গোরাচাঁদের সাথী সোন্দলের সঙ্গে তাঁর বেশ কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। সোন্দলের ন্যায় তিনিও পালক-পুত্র।

সেকেন্দর শাহকে বাদশাহ অপেক্ষা পিতা হিসাবে অধিকতর আকর্ষণীয় চরিত্র বলে মনে হয়। তিনি ভাগবতের হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে কিছুটা তুলনীয়। তবে তিনি আল্লাহকে অস্বীকার করেন নি। পুত্রের প্রতি সমধিক স্নেহপরায়ণ ছিলেন বটে।

মাতা হিসাবে অজুপা ছিলেন খাঁটি বাঙালী ঘরের আদর্শ জননী। পুত্র বিহনে বিরহ যে কতখানি তীব্র হয়ে জননী হৃদয়ে আঘাত করে তার জ্বলন্ত নিদর্শন এই চরিত্রটি। পুত্রবধূর সহিত তাঁর ব্যবহার, পুত্রের জন্য তার মূর্ছা যাওয়া বা পাগলিনী হওয়া দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ"—নাটকের কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

রাজা মটুক ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধারক ও বাহক। রাজা হিসাবে তিনি কঠোর নীতি অনুসরণকারী। আপন কন্যার প্রতিও তিনি রাজোচিত ব্যবহার করেছেন। শেষ পর্য্যন্ত গাজীর নিকট পরাজিত না হলে কিছুতেই তিনি মুসলমান ধর্মাবলম্বীর সহিত কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হতেন না। অর্থাৎ ধর্মত্যাগ করা বরং তাঁর পক্ষে সহজ কিন্তু জীবন ত্যাগ করা যায় না। অপরপক্ষে চম্পাবতীর পতিগৃহে যাত্রাকালে পিতা হিসাবে মটুক রাজা যে উপদেশ দান করেছেন তা থেকে তাঁর আদর্শ গৃহী হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাণী লীলাবতী ছিলেন একজন আদর্শ নারী। তিনি জননী। তাই কন্যার অন্তর-বেদনাকে তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। গাজী মুসলমান হলেও যেহেতু গাজীর নিকট চম্পাবতী আত্মসমর্পণ করেছেন, সেই হেতু আর কারো কাছে তিনি আত্মদান করতে পারেন না—এ শিক্ষা তাঁর মায়ের কাছ থেকে গৃহীত। রাণী লীলাবতীর নিকট পতির ধর্মই পত্নীর ধর্ম। ব্রাহ্মণ-রমণী হয়েও মুসলিমকে পতিত্বে বরণ করার মতন এত বড় সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া কম বিস্ময়ের বিষয় নয়।

চম্পাবতী চঞ্চলা-চপলা, গাজীর প্রেমে উন্মাদিনী। পিতার আদেশে তাঁকে

কারাগারে থাকতে হয়েছে। অবশ্য তিনি পিতার প্রতি কিছু অভিমান প্রকাশ করেছেন। তিনি মাতার আনুকূল্যে সংস্কার-মুক্ত হয়ে মুসলমান গাজীকে বিবাহ করেছেন। শ্বশুর বাড়ীতে এসে যথাভক্তিতে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এবং অন্যান্যকে গ্রহণ করেছেন।

সাগর মাসী দেবী হলেও সাধারণ নারীর মতনই অধিকাংশ আচরণ করেছেন। তাঁর কথায় কোথাও হিন্দু বা মুসলমান এমন প্রশ্ন আসে নি।

রামচন্দ্রের মতন মুসলমান বিদ্বেষী লোকের অভাব সেকালে ছিল না। 'পঞ্চ'-ম কার সাধনাই তাদের অনেকের জীবনের সর্বস্ব। তবে চরম আঘাতে এ সব চরিত্রের লোক সাধারণ ভাবে একেবারেই ভূমিতে প্রণিপাত করে।

অনুরূপভাবে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, রূপচাঁদ, বিদূষক, হরি, তরি প্রভৃতি প্রত্যেকটি চরিত্র স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর।

নাটকখানি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে রচিত। তৎকালেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ সংঘটন বাঙালী সমাজে অননুমোদিত ছিল না—এই নাটক তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেই সংগে আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—

১। সংসার ত্যাগী সুফী ফকিরের বিবাহ,

২। দেবীর সঙ্গে পীরের কথোপকথন,

৩। বাঘ ও কুমীরের যুদ্ধ বর্ণনা,

৪। প্রণয়াখ্যান এই কাহিনীতে যথেষ্ঠ প্রাধান্য লাভ করেছে,

৫। গাজীর বিরহ—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ ত্যাগের ফলে ব্রজপুরে যে বিরহ সৃষ্টি হয়েছিল—তার সঙ্গে তুলনীয়,

৬। পীর গোরাচাঁদ কাব্য বা পেড়ুয়ার কেচ্ছাতে বর্ণিত জীবন-কুঁয়ার জল অপবিত্রকরণ কাহিনীর প্রতিফল দৃষ্ট হয়।

৭। পীর একদিল শাহ্ কাব্যেও দেখা যায় মন্ত্রবলে পীর এক সময় বাঘকে ভেড়ায় রূপান্তরিত করেছেন।

৩। রায়-মঙ্গল কাব্য

রায়মঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কৃষ্ণরাম দাসের বাসস্থান ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত নিমতা নামক গ্রামে। তাঁর জন্ম তারিখ আনুমানিক ১৬৫৬—'৫৭ খৃস্টাব্দ। কাব্য রচনার কাল ১৬৮৬ খৃস্টাব্দ। তাঁর রচিত

পুস্তক সংখ্যা পাঁচটি বলে জানা যায়। তাদের নাম যথাক্রমে কালিকা মঙ্গল, ষষ্ঠিমঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল। কবি ছিলেন বৈষ্ণব ভক্ত। ধর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমন্বয়ের পক্ষপাতী। বাস্তবতা তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কৃষ্ণরাম দাসের তৃতীয় রচনা এই রায়মঙ্গল কাব্য। কাব্যের আকার ১৪"×৫"। পত্রসংখ্যা ১ হতে ২৫ পর্য্যন্ত। পুঁথিতে দুই-তিনজনের হস্তাক্ষর পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিসংখ্যা ১৭৯৮।

এই কাব্য দ্বিপদী ও ত্রিপদী পয়ারে রচিত। এতে বেশ কিছু বর্ণাশুদ্ধি আছে। ল ও ন এর আকৃতি একই প্রকার। য় ও অ এর মধ্যে ব্যবহারের কোন নিয়ম নেই। ন য ব জ শ এরও ব্যবহারের কোন নিয়ম নেই। প্রচুর আরবী (যেমন মোকাম), ফারসী (যেমন গীরিদা) ও হিন্দী (যেমন পাগ্) শব্দ থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় লিখিত কাব্যখানি সুখপাঠ্য। বেশ কয়েকটি সুপ্রচলিত প্রবাদ এতে রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত কাহিনী

পুষ্প দত্ত সাধু, পাটনে যাওয়ার পথে সেই নৌকার মাঝিগণের নিকট পীর বড়খাঁ গাজীর নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ শুনলেন :—একবার ধনপতি সওদাগর পাটনে যাবার পথে পীর বড়খাঁ গাজীকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে কেবল দক্ষিণ রায়ের পূজা করায় গাজীর সাথী ফকিরগণ অসন্তুস্ট হয়ে ঘটনাটি পীর বড়খাঁ গাজীর গোচরে আনলেন। পীর সাহেব সব বৃত্তান্ত শুনে নিয়ে বুঝলেন যে সেই অঞ্চলে তাঁর অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তিনি রুষ্ট হলেন এবং দক্ষিণ রায়ের নামে সৃষ্ট ঘর ভেঙে দিলেন। ফলে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়ে উঠ্‌ল অনিবার্য্য। উভয় পক্ষেরই সৈন্য হ'ল বাঘ-সৈন্য। নানা বর্ণের, নানা চেহারার, নানা চরিত্রের এবং নানা নামের বাঘ তারা। পীর বড়খাঁ গাজী এবং দক্ষিণ রায়ের আহ্বানে সেই সকল বাঘ নিজ নিজ অধিপতির নিকট উপস্থিত হল এবং নিজ নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। এক নির্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হল তুমুল সংগ্রাম। যুদ্ধ আর থামে না। যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তির কোন সম্ভাবনা নেই। এমতাবস্থায় এক মিশ্র দেবতা তাঁদের উভয়ের মধ্যে এসে উপনীত হলেন ;—

অর্দ্ধেক মাথায় কাল। একভাগ চূড়া টাল।
বনমালা ছিলিমিলী তাতে
ধবল অর্দ্ধেক কায় অর্ধ নীলমেঘ প্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাতে।

অর্ধ-শ্রীকৃষ্ণ ও অর্ধ-পীর (?) বেশধারী সেই পরমেশ্বর যুদ্ধরত দক্ষিণ রায় ও বড়খাঁ গাজীকে ঠাণ্ডা কর্‌লেন। তিনি উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য পুনরায় স্থাপন করে দিলেন। মিটমাটের সর্ত হ'ল,—

বড় খাঁর মহাকায় গোরে কেরামত তায়
হইবে লোকের কাম ফতে
যেখানে পীরের নাম বারাম মোকাম থান
যত ফয়তালা নাম হতে।
মায়া মুণ্ড এইরূপ দক্ষিণ দেশের ভূপ
পূজা করিবেক যতজন……
এখানে দক্ষিণ রায় সব ভাটী অধিকার
হিজলীতে কালু রায় থানা
সর্বত্র সাহেব পীর সবে নোয়াইবে শির
কেহ তাহে না করিবে মানা।

সেই দিন হতে পীর মোবারক বড়খাঁ গাজী এবং ঠাকুর দক্ষিণ রায় আঠারো ভাটি রাজ্যের সমান অধিকারি হলেন। পরাজয়ের গ্লানি কারো স্পর্শ করল না।

এই কাহিনী শুনে পূজা দিয়ে তবে গাজী পীরের মোকাম থেকে সওদাগর ডিঙ্গা ছাড়লেন।

রায়মঙ্গল কাব্যাংশের এই কাহিনীটিতে মূলতঃ সমন্বয়ের কথা প্রাধান্য লাভ করেছে। সে সমন্বয় ঈশ্বর-অভিপ্রেত। এমন প্রচেষ্টা সরাসরি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। পীর গোরাচাঁদ-কাব্যে পীর গোরাচাঁদ এবং দক্ষিণ রায়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন ভাটি প্রদেশের উপর উভয়ের সমান অধিকারের সর্তে সহাবস্থান প্রবর্তিত হয়েছে। বাঘ-সৈন্যের বিভিন্ন পরিচয় এবং তাদের মধ্যকার যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ হৃদয়গ্রাহী।

রায় এবং পীরের দ্বন্দ্ব মূলতঃ অধিকার বিস্তারের দ্বন্দ্ব। স্থূল দৃষ্টিতে হিন্দু

ও মুসলিমের মধ্যকার আপন আপন প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা বলে অনুভূত হয়। উভয়েই দেব বা অল্লাহের বলে বলীয়ান। উভয়েরই বল বাঘ-সৈন্য নিয়ে। সমগ্র কাব্যে মানব ও পশু এই দুই চরিত্রের সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

যৌবরাজ্য পরিত্যাগ করে সংসার বিরাগী হয়ে দেশদেশান্তরে ভ্রমণকালে চম্পাবতীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হওয়ার পরের কিছুদিনের কাহিনীর সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য নেই। এতে প্রৌঢ় বড়খাঁ গাজীর জীবন-চিত্র সুপরিস্ফুট হয়েছে। গৌরমোহন সেন রচিত কাব্যের কাহিনী এবং কলেমদ্দী গায়েন গীত, গাজী সাহেবের গানে বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। গাজীর মাহাত্ম্য যে দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়, আলোচ্য কাব্যাংশে তা পরিস্ফুট হয়েছে। অপর পক্ষে দক্ষিণ রায় যে গাজীকে অবজ্ঞা করতে সমর্থ নন তাও এই কাহিনীতে স্পষ্ট। প্রত্যক্ষভাবে ধর্মপ্রচার বা ধর্মরক্ষা বিষয়ক প্রশ্ন এখানে নেই। কাহিনী দৃষ্টে মনে হয় এই কাব্যাংশে বর্ণিত দক্ষিণ রায় এবং গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্যে বর্ণিত দক্ষিণা দেও বা দক্ষিণ রায় একই ব্যক্তি নন। খুব সম্ভব দক্ষিণ রায় কোন ব্যক্তি বিশেষ নন; দক্ষিণ রায় অর্থাৎ দক্ষিণের রায় আঠারো ভাটি রাজ্যের প্রতিনিধি বিশেষ। এবং এই কারণেই দক্ষিণের বংশানুক্রমিক অধিপতিগণ "দক্ষিণ-রায়" উপাধিতে অভিহিত হয়ে আসছেন।

৪। গাজী সাহেবের গান

গাজী সাহেবের গানের রচয়িতা কে তা জানা যায় না। উক্ত গান রচয়িতা আদৌ একজন মাত্র কবি ছিলেন কিনা তাও অজ্ঞাত। বংশানুক্রমে গ্রামের বিশেষতঃ মেদনমল্ল পরগণার ফকিরগণ গ্রামে গ্রামে এই গান গেয়ে ফেরেন। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই গান জনৈক কলেমদ্দী গায়েনের নিকট থেকে সংকলন করেন। বাংলা ১৩৩৫ সালের ৬ই শ্রাবণ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে উক্ত গান নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পঠিত হয়। কলেমদ্দী গায়েন ছিলেন উক্ত অঞ্চলের সিতাঙ্গণ্ডু গ্রামের অধিবাসী। তিনি মেদনমল্ল পরগণার অন্যতম জমিদার দুর্গাদাস বাবুর প্রজা। লোকমুখে প্রচলিত এই গান তিনি গেয়ে বেড়াতেন।

গাজী সাহেবের গান, মোবারক গাজী সাহেবের উপাখ্যান নামেও পরিচিত। এই সংকলিত গানের মধ্যে ৮২৮টি পংক্তি রয়েছে। গানগুলি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম চব্বিশ পরগণার সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত মানুষের ব্যবহৃত চলিত ভাষায় গাজী সাহেবের গানগুলি রচিত। ভ্রাম্যমান ফকিরগণ আপনার সুবিধামত শব্দ সংযোজন-নিয়োজন করায় এর ভাষা অনুরূপ বিশেষ অঞ্চলের মৌখিক ভাষায় সমৃদ্ধ হয়েছে। কয়েকটি শব্দের রূপান্তর কিভাবে হয়েছে তা দেখানো হল,—

পুকুর > পুখুর
সিপাহী > সেফাই
আসিল > আইল। ইত্যাদি

তাছাড়া বেশ কিছু আরবী, ফারসী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ—

গোছল্	অর্থে	হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করা,
চৌহদ্দি	”	সীমানা,
ভেজিল	”	পাঠালো,
মেরা	”	আমার,
বোলাইয়া	”	ডেকে নিয়ে, ইত্যাদি।

গানগুলি দ্বিপদী পয়ারে রচিত। এতে অনেক অশুদ্ধ বানান রয়েছে।

গাজী সাহেবের গানের ভাষায় গায়েন ও নকলকারীর দোষে আধুনিক ছাপ পড়লেও এর মধ্যে ইংরেজ প্রভাবের কোন নিদর্শন নেই। মুসলিমের রচনা হলেও বা মুসলিম গায়েনরা এই গান সর্বত্র সুর-লয় যোগে গাইলেও এতে তেমন বিশেষ একটা উর্দ্দু ভাষার ছাপ পড়েনি। গোছল, সিরনী, হাজত, মুর্শিদ, তলব, হকিকৎ, বেসরিকৎ, আউলে প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি শব্দ ছাড়াও সর্বত্র চব্বিশ পরগণার স্থানীয় বাংলা ব্যবহৃত হয়েছে। এইরূপ গান বঙ্গের নানাস্থানে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের নানা অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যেও প্রচলিত আছে।

সংক্ষিপ্ত কাহিনী

মোবারক গাজী আপন পুত্র দুঃখী গাজীকে জানালেন যে তিনি ঘুটিয়ারীতে একটি পুকুর কাটিয়ে তাতে মক্কা থেকে পানি এনে রাখ্‌বেন এবং এই স্থানকে মক্কা বলে প্রচার করবেন। এতে যাত্রীরা এসে পদধৌত করবে না; গোছল করতে পারবে এবং যদি তারা খোদার নিকট মোনাজাত করে তবে তাদের মনের আশা পূর্ণ হবে।

মোবারক গাজী আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী সেইরূপ একটি মক্কা সেখানে নির্মাণ করালেন।

নবাব ঢাকায় এসে খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারগণকে তলব করতে সেরেস্তাদারকে আদেশ দিলেন। সেরেস্তাদার জানালেন যে, মেদনমল্ল পরগণার রাজা মদন রায়ের নিকট তিন সনের খাজনা বাকী আছে। নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে মদন রায়কে হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে আনতে বললেন। বারো জন সিপাহী তিন মাস হেঁটে এসে পৌঁছালো কলকাতার কালীঘাটে। তারা কালীমাতার কাছে মানত করল যে যদি তারা রাজাকে বাড়ীতে সন্ধান পায় তবে ফেরবার পথে বিল্বপত্রে কালীমাতাকে পূজা দিয়ে যাবে। অন্তর্য্যামী গাজী এ কথা জানতে পেরে পুত্র দুঃখী গাজীকে ডেকে জানালেন যে যদি রাজার হাতে দড়ি পড়ে তবে কেউ যেন তাঁকে বাবা বলে না ডাকে। এর উপায়ের কথায় গাজী জানালেন যে, রাজা তাঁর কাছে এলে তিনি অবশ্যই আশীর্ব্বাদ করবেন।

সিপাহীগণ রাজপুরীতে আসতেই চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। রাজা ভীত হয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঘরের মধ্যে লুকালেন। পেয়াদারা বাইরে হৈ চৈ করতে থাকায় রাজা শেষে দেওয়ান মহেশ ঘোষকে তাদের সামনে কথা বলতে অনুরোধ করলেন। মহেশ ঘোষ তো চাকরী ছাড়তে চায় তবু পেয়াদাদের সামনে যেতে চায় না। অনেক অনুরোধে মহেশ ঘোষ তো কালীঠাকুরের নাম স্মরণ করে তাদের সামনে এল। সে বলল,—রাজা পেঁচাকুল পরগণায় তালুকে গেছেন। জমাদার সে কথা বিশ্বাস করল না। তাকে চাঁপা গাছে বেঁধে খুব প্রহার করল। সেই প্রহারে মহেশ ঘোষ মৃতপ্রায় হল। শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রী মহাশয় রাজার নিকট থেকে আটাশ টাকা নিয়ে মোবারক গাজীর নাম স্মরণ করে পেয়াদাগণকে ঘুষ দিলেন এবং তার বদলে দশ দিনের সময় পেলেন। মন্ত্রী এবার মৃতপ্রায় মহেশ ঘোষকে রাজার নিকট আনলেন এবং গাজীর স্মরণ করে অনেক চিকিৎসা-শুশ্রূষা দ্বারা তাকে বাঁচালেন। মৃতপ্রায় মহেশ শেষ পর্য্যন্ত অসাধারণ উপায়ে জীবন ফিরে পাওয়ায় রাজা বিস্মিত হলেন। তখন সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করে মন্ত্রী বললেন,—

মন্ত্র-তন্ত্র নহে, গাজী সাহেবের গান ॥

মহারাজ মদন রায় তখন মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট মোবারক গাজীর বিস্তৃত বিবরণ নিলেন। তিনি বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে ফুল-শিরনি সংগ্রহ করে শিরনির

হাঁড়ি ভক্তিভরে নিজ মস্তকে বহন করে সোনারপুর থেকে ঘুটারির বনে এসে উপস্থিত হলেন।

অন্তর্য্যামী গাজী, রাজার আগমন বিষয় জেনে পাঁচ বছরের বালকরূপে ছেঁড়া গুনের চট গায়ে দিয়ে পথে বসে ধূলা-বালি মাখ্‌তে লাগলেন।

মন্ত্রী মহাশয়ের পরামর্শে উক্ত বালকের স্বরূপ জেনে রাজা মদন রায় গাজীর চরণ ধরে কাঁদতে লাগলেন। বালক গাজী সান্ত্বনা-বাক্যে রাজাকে আশ্বস্ত করে তাঁর পুকুরে খানিক মাটি কাটতে বললেন।

গাজীর নির্দ্দেশমতন তিন কোপ মাটি কোদাল দিয়ে কাটতেই রাজার পরণের কাপড় খুলে গেল। কাপড় খুলে যাওয়ার ঘটনায় গাজী মন্তব্য করলেন যে তাঁর জমিদারী মাত্র তিন পুরুষ থাকবে। রাজা অপরাধ মার্জনা প্রার্থনা করলেন। তখন গাজী সেই রাজার পোষ্য-পুত্রের সাহায্যে জমিদারী রক্ষা হবে বলে শান্ত করলেন। সর্ব্বশেষে রাজা ঢাকা থেকে আগত সেফাইদের কথা জানিয়ে বিপদ উদ্ধারের প্রার্থনা জানালে গাজী বললেন ;—

শমনের ভয় আদি নাহিক রহিবে।
দরওয়াজাতে যাবা মাত্র সেলাম করিবে ॥
তোমার সঙ্গেতে যাবে চাকর হইয়া।
মোকদ্দমা ফতে হবে ঢাকাতে গিয়া ॥

শুভ মঙ্গলবার যাত্রার দিন স্থির হল। গাজী তাঁকে শুক্রবার রাত্রে উদ্ধার করবেন। রাজা বললেন,—

সাত খাশী দিয়ে তব নামে হাজত দিব।
গান-বাইন্ ডেকে তব গান করাইব ॥

গাজীর আশীর্বাদ নিয়ে রাজা বাড়ীতে ফিরলেন। জমাদার রুষ্ট হল। রাজা স্মরণ করলেন গাজীর নাম। তখন সেফাইগণ অজ্ঞান হয়ে (কাঠের পুতুলের ন্যায়) দাঁড়িয়ে রইল। পরিচয় পেয়ে জমাদার তখন মদন রায়কে মহারাজ বলে সেলাম করল। শেষে মহারাজের প্রার্থনায় গাজীর দয়ায় সেপাইগণ জ্ঞান ফিরে পেল।

রাজা এবার নবাব সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করলেন। বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করে তিন মাস পরে তিনি ঢাকায় পৌঁছিলেন।

রাত্রি দুই প্রহরে গাজী সাহেব পুত্র দুঃখী গাজীকে কুশা ঘাস অনতে বললেন। দুঃখী গাজী কুশা ঘাস আনলেন। কুশা ঘাস নিয়ে ভ্রমরের রূপ ধরে গাজী আঁখির পলকে ঢাকা শহরে উপনীত হলেন।

নবাব নিদ্রিত অবস্থায় শুনলেন—মদন রায় দরবারে এলে যেন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। একথা শুনে নবাব কেঁদে ফেললেন। তিনি গাজীকে আর দেখতে পেলেন না। গাজী ভ্রমর-রূপে নবাবের দপ্তরখানায় গিয়ে বকেয়া তিন লক্ষ তিন হাজার টাকার অঙ্ক ডাইনে থেকে বামে ফেলে তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন ঘুটিয়ারী আস্তানায় এবং 'অজু' করে আপনার ধড়ে প্রবেশ করলেন।

পরের দিন নবাবের লোকজন সাদরে রাজাকে দরবারে নিয়ে গেলেন। দপ্তরে দপ্তর আনা হল। নবাব তখন রাজাকে বেশরিকের পাট্টা করে দিলেন। সেখান থেকে অনতি বিলম্বে রাজা বিদায় নিলেন।

কয়েদখানার পাশ দিয়ে যাওয়ার কালে কয়েদগণ রাজার নিকট তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাল। রাজা সম্মতি নিলেন নবারের কাছ থেকে এবং নিজে কয়েদখানায় প্রবেশ করলেন তাদের মুক্তির জন্য। বন্দী বারভূঞার পায়ের বেড়ী কাটতে তাঁকে আড়াই ঘন্টা কয়েদখানায় থাকতে হল। তারপর তিনি গাজীকে স্মরণ করে প্রত্যাবর্তন করলেন।

রাজা মদন রায় পাল্কী করে দুই সপ্তাহ পরে কলকাতায় এসে পৌঁছুলেন। কয়েদীগণ-প্রদত্ত পীরের হাজত বাবদ এক হাজার টাকার মিঠাই কিনে তিনি একশত এক ভার মুটের স্কন্ধে দিয়ে সোনারপুরে এলেন। গৌড়দহে এসে সাতটা খাশী কিনলেন এবং সব নিয়ে গাজীর সম্মুখে এসে গলবস্ত্রে অর্পণ করলেন। গাজী সাহেব খুশী হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন। আড়াই হালা কাঁচা বেনার সাহায্যে খাশীর মাংস রান্না করে হাজত দেওয়া হল। গাজী সাহেব একটি মসজিদ নির্মাণ করার জন্য রাজাকে স্থান দেখিয়ে দিলেন। রাজা শুধু বিপদকালে গাজীর চরণ পাওয়ার প্রার্থনা জানালেন। গাজী বললেন—কোন চিন্তা নেই। রাজা তখন সেলাম করে আপন ভবনে চলে গেলেন।

গাজী সাহেবের মাহাত্ম্য প্রচারই এই কাব্যাংশের মূল উদ্দেশ্য। এটি খণ্ড কাব্য। গাজীর সম্পূর্ণ জীবন কথা এতে নেই। কালু-চম্পাবতী প্রসঙ্গ এতে বাদ পড়েছে। রায়মঙ্গল কাব্যের অংশ বিশেষ এবং গৌরমোহন সেন রচিত

জীবনী গ্রন্থের অংশ বিশেষের সঙ্গে এই কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। পীর একদিল শাহ কাব্যে বর্ণিত পীরের শিশুরূপ ধারণ বিবরণের সঙ্গে এর মিল দৃষ্ট হয়।

রাজস্ব আদায়ের জন্য কিরূপ জুলুম করা হত তার বিবরণ এই কাব্যাংশে আছে। অলৌকিক শক্তিতে মেদনমল্ল থেকে চক্ষের নিমেষে ঢাকায় উপস্থিত হওয়ার গল্প তখনকার দিনে সাধারণ মানুষের নিকট অবিশ্বাস্য ছিল না বলে মনে হয়।

গাজী সাহেবের গানে বর্ণিত চরিত্রাবলী অনেকখানি বাস্তব। প্রধান চরিত্র মদন ও রায় গাজী সাহেব। তাছাড়া মন্ত্রী, নবাব, দেওয়ান প্রভৃতির চরিত্র পাঠকের মনে রেখাপাত করে।

৫। কালু-গাজী

কালু-গাজী-চম্পাবতীর কাহিনী-ভিত্তিক একখানি নাটকের পুঁথি সম্প্রতি পাওয়া গেছে। নাট্যকারের নাম কোথাও লিখিত নেই। কোন ভণিতা বা মুখবন্ধ বা ভূমিকা বা কুশী-লব পরিচিতি নেই। পুথিখানি আমি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমায় স্বরূপনগর থানাধীন তরণীপুর নামক গ্রামের অধিবাসী মোহাম্মদ আতিয়ার রহমানের বাড়ী থেকে পেয়েছি। জনাব আতিয়ার রহমান বলেন যে পুথিখানি তাঁর পিতা মরহুম জেহের আলি পাড়ের লেখা। পুথিখানির কভার পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে যা লেখা আছে তা খুবই অস্পষ্ট। লেখা আছে Hachamudin. "উক্ত হাচামউদিন" এর পর যা লেখা আছে তা পাঠসাধ্য নয়। পুথিখানি জেহের আলি পাড় সাহেবের লেখা নয় বলে আমার ধারণা। কারণ—

১। জেহের আলি পাড় সাহেব তরণীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি নাকি "নর্মাল" পাশ ছিলেন। এ হেন ব্যক্তির পক্ষে মারাত্মক রকমের বানান ভুল এই নাটকে ভূরি ভূরি থাকতে পারে না।

২। জেহের আলি পাড় সাহেব ছিলেন "এজিদ বধ" নাটকের রচয়িতা এবং উক্ত নাটকের পরিচালক। তাঁর নাটক বসিরহাট উত্তরাঞ্চলে অসাধারণ অভিনয় সাফল্যে ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জন করেছে। তাঁর পক্ষে অঙ্ক ও দৃশ্য নির্দেশনায় সাধারণ ত্রুটি থাকতে পারে না।

অতএব কালু-গাজী নাটকের রচয়িতাকে হাছাম-উদ্দীন সাহেব বলে গ্রহণ করতে পারা যায়।

পুঁথিখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা চৌষট্টি। ষষ্ঠ অংক কিন্তু নাটকখানি দৃশ্যবিহীন। পুথিটি মনে হয় অসম্পূর্ণ। এতে চৌদ্দটি গীত আছে, আছে স্বগতোক্তি।

বদর, খোয়াজ, জল্লাদ, শিব, গঙ্গা প্রভৃতি অতিরিক্ত চরিত্র নাট্যকার সংযুক্ত করেছেন। পরীগণের নামকরণে যথা,—নীলাম্বরী, পক্ষরাজ, যমরদ প্রভৃতি লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য। গাজী ও চম্পাবতীর মিলন কাহিনীই এই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য।

গ্রামাঞ্চলে যাত্রার আসরে সাধারণ মানুষ আনন্দলাভ করেন। আলোচ্য নাটকখানি সেই উদ্দেশ্যটুকু সফল করতে সমর্থ বটে। নাটকখানি সম্পূর্ণরূপে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান ভাবনার উপযোগী।

নাটকখানি রচনার তারিখ নির্ণয় করা যায় না। জেহের আলি পাড়ের মৃত্যুকাল ১৩৬২ বাংলা সাল। অতএব তাঁর সমসমায়িক কালে রচিত বলে ধরলে এই নাটকের রচনাকাল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পূর্ব্বে হতেই পারে না।

৬। গাজী-কালু-চম্পাবতী

মোছায়েফ গোলাম খয়বর ও আবদুর রহিম সাহেব বিরচিত ৭৮ পৃষ্ঠার একখানি কাব্য পাওয়া যায়। কাব্যখানি সন ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের কাছে তার একটি কপি আছে।

গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্যের রচয়িতা আবদুর রহিম সাহেব এবং এই কাব্যের অন্যতম রচয়িতা আবদুর রহিম সাহেব একই ব্যক্তি বলে অনুমিত হয়। আবদুর রহিম সাহেবের কাব্যের প্রকাশকাল ১৩৭৪ সাল। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২। পরবর্তীকালে তার পরিমার্জন ও পরিবর্দ্ধন হওয়া খুব স্বাভাবিক। এর পক্ষে কাব্যদ্বয়ের প্রথম দুই পংক্তি লক্ষ্যণীয় :—

প্রথম কাব্য (প্রকাশ ১৩৪৫) : প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতর ॥
আকাশ পাতাল আদি সৃজন যাহার *

দ্বিতীয় কাব্য (প্রকাশ ১৩৭৪) : প্রথমে বন্দিনু নাম প্রভু নিরঞ্জন ॥
এ তিন ভুবনে যত তাঁহার সৃজন *

খুব সম্ভবতঃ প্রকাশকগণ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ইচ্ছামত প্রোথিতযশা গ্রন্থকারের নাম ব্যবহার করেছেন এবং কাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করেছেন।

৭। হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ্ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান

"হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান" নামক গ্রন্থের রচয়িতা গৌরমোহন সেন মহাশয় বাংলা ১৩০০ সালের চৈত্র মাসে ৫নং মদন দত্ত লেন, বহুবাজার, কলিকাতার আপনার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সিদ্ধেশ্বর সেন। গৌরমোহন সেন ছিলেন ধর্মপরায়ণ, ছিলেন অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। ব্যবসায়-জনিত ব্যাপারে বঞ্চনা-লাভের ফলে তিনি তীব্র মানসিক অশান্তি-সাগরে নিমজ্জিত হন। আশাহত হৃদয় নিয়ে অবশেষে তিনি এক পরম শুভক্ষণে ঘুটিয়ারী শরীফের পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর সমাধি বা দরগাহ-স্থানে এসে উপনীত হন এবং সেখানকার পরিবেশ তথা গাজী সাহেবের মাহাত্ম্য-কথায় অভিভূত হয়ে এক নির্মল সান্ত্বনা খুঁজে পান। সেই সময় থেকে শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি প্রতিদিন কলকাতা থেকে ঘুটিয়ারী শরীফে পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর দরগাহে ভক্তি নিবেদন করতে আসতেন। এমনকি তাঁর পুত্রের বিবাহের দিনেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। দরগাহে বসে তিনি স্বরচিত গান এমন তন্ময় হয়ে করতেন যে তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে অঝোরে অশ্রুধারা নামত। বহু ভক্ত তাঁর সেই গান মুগ্ধ হয়ে শুনে ভক্তি-প্রণতঃ হতেন।

"হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ্ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান" নামক পুস্তিকা ছাড়া তিনি অন্য কোন পুস্তিকাদি প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায় না। প্রথম জীবন থেকেই তিনি সঙ্গীত রসিক ছিলেন। স্বনামধন্য আবদুল আজিজ খাঁ ছিলেন তাঁর সঙ্গীত-গুরু। গুরুর কাছে তিনি গাজী সাহেবের গান শুনতেন। পরবর্তীকালে সঙ্গীত-গুরু আবদুল আজিজ খাঁ, শিষ্য গৌরমোহন সেনের নিকট গাজী-ভক্ত হিসাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সাতষট্টি বছর বয়সে ইংরেজী ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফাল্গুন তারিখে এই মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন। তিনি সাত পুত্র ও পাঁচ কন্যা রেখে যান। ঘুটিয়ারী শরীফের গাজী সাহেবের দরগাহের সন্নিকটস্থ সুদেবী নিকেতনের সুসজ্জিত বাগান বাটীতে তিনি সমাধিস্থ হন। পরবর্তীকালে তিনিও পীরের পর্য্যায়ে

উন্নীত হয়েছেন বলে অনেকের ধারণা। তাঁর সমাধির উপর ইষ্টক-নির্মিত একটি সুরম্য স্মৃতি–সৌধ নির্মিত হয়েছে।

তাঁর পুত্র গাজীভক্ত শ্রীনিমাইচাঁদ সেন মহাশয় তাঁর পিতার সমাধি বা দরগাহ-স্থানের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক।

গৌরমোহন সেন বিরচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের একখানি আমার হস্তগত হয়েছে। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা পঞ্চাশ। আকৃতি ৭ ১/১০"×৪ ১/৫"। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ কাল বাংলা ১৩৬৮ সালের ১৭ই শ্রাবণ। হাজী শেখ মহম্মদ ইয়ার আলী, সাকিম ঘোড়াদহ, জেলা হাওড়া কর্তৃক ভাষান্তরিত পরিবর্জিত ও সন্নিবেশিত। পুস্তকটির প্রথম সংস্করণের তারিখ জানা যায় নি। এটি মুদ্রিত পুস্তক। তার মাঝারি কভার পেজ আছে। পুস্তকের চারিটি অঙ্গ যথাক্রমে—

১। নিবেদন বা ভূমিকা,
২। ধন্য গাজীর আস্তানা বা বন্দনা গীতি,
৩। কেচ্ছা এবং
৪। সমাপ্তি সংগীত।

কেচ্ছার মধ্যে আটটি শিরোনামা আছে। যথা ;—

১। মন্দিরায়ের (মহেন্দ্র রায়ের ?) জমিদারী ও মোবারক গাজীর বন্দী হওয়ার বয়ান,
২। মোবারক গাজীর নারায়ণপুর গ্রামে যাত্রা,
৩। মোবারকের সাপুর যাত্রা,
৪। মোবারকের ঘুঁটারি গ্রামে যাত্রা,
৫। রাজা মদন রায়ের তলবে সিপাহী আগমন,
৬। পীরপুকুরে রাজা মদন রায়ের মাটি কাটা,
৭। মদন রায়ের আড়াই ঘন্টা জেলবাস ও
৮। দুঃখী দেওয়ানের সন্তানাদি হওয়ার বয়ান।

সবশুদ্ধ পাঁচটি গান ও ষোলটি কবিতার মধ্যে কেবল কেচ্ছা অংশেই চারটি গান ও পনেরোটি কবিতা আছে। তাছাড়া এই পুস্তকে আছে আরো চারখানি ছবি (আলোক চিত্র)। চিত্রগুলি যথাক্রমে ঃ—

১। গাজী বাবার দরবার,
২। নারায়ণপুরে গাজী বাবার হোজ্‌রা,

৩। সাহপুরের সেই শুষ্ক শেওড়া গাছ যার তলায় গাজী পীর আসন করবার পর গাছটি আবার বেঁচে ওঠে, এবং

৪। পীর পুকুরে যাত্রীরা শিরনী ভাসিয়ে বসে আছেন।

গ্রন্থখানি সাধু ভাষায় রচিত। দীর্ঘ বাক্য ব্যবহারে দক্ষতার অভাব থাকায় অনেক স্থলে ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ হয় নি। গ্রন্থের ভাষা আধুনিক। ইসলামি ভাবাদর্শে বহু আরবী, উর্দ্দু, হিন্দী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বানানে অনেক স্থলে অশুদ্ধি আছে। গান ও কবিতাগুলি বিভিন্ন ছন্দে, যথা ;—কোথাও দ্বিপদী কোথাও ত্রিপদী পয়ারে রচিত। বিশেষ বিশেষ অংশ রেখাঙ্কিত রয়েছে। কবিতার পংক্তিগুলির মধ্যকার সর্ব্বত্র অক্ষরের সংখ্যাগত সমতা রক্ষিত হয় নি।

সংক্ষিপ্ত কাহিনী

কোন এক সময় দিল্লীতে চন্দন শাহ্ নামক জনৈক বাদশাহ রাজত্ব করতেন। তাঁর সময়ে একবার বর্গীদের উৎপাত দেখা দেয়। বাদশাহ্ তৎক্ষণাৎ উজীরকে ডেকে বর্গীদের তাড়াবার নির্দ্দেশ দিলেন। আদেশ পেয়ে উজীর চল্‌লেন শিবির অভিমুখে। পথিমধ্যে সাক্ষাত হল এক বৃদ্ধ ফকিরের সাথে। ফকির জানালেন, বাদশাহ যেন বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হন। কারণ তাঁর রাজত্বের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। উজীর ফিরে এসে ঘটনাটি বাদশাহকে জানালেন। বাদ্‌শাহ ক্রুদ্ধ হয়ে উজীরকে লাঞ্ছনা করলেন। উজীর অগত্যা সেনাপতির সঙ্গে যোগাযোগ কর্‌লেন। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হল, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাদশাহের অধিকাংশ সৈন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হল। বাদশাহ্ ব্যাপক সৈন্য ধ্বংসের সংবাদ পেয়ে অচৈতন্য হলেন এবং স্বপ্নে সেই ফকিরের সতর্কবাণী পুনরায় শুনতে পেলেন। এবারে ফকিরের পরামর্শ শিরোধার্য্য করে মিয়া-বিবি অর্থাৎ সেই বাদশাহ ও বেগম দু'জনেই চলে এলেন ঢাকার এক মোমিনের বাড়ীতে। মোমিন তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কিছুদিন পর সেই মোমিন তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় বাদশাহের নিকট সমস্ত ঘটনা জানালেন। বাদশাহ্‌ও সানন্দে বেলে-আদমপুরের জঙ্গলের পাট্টা দিয়ে দিলেন চন্দন শাহ্‌কে। চন্দন শাহ্ বেলে-আদমপুরের পাট্টা পেয়ে এসে উপস্থিত হলেন সেখানকার বাবন মোল্লার (বাবুর আলি মোল্লা) বাড়িতে। নিজের পরিচয় দিতেই আনন্দিত হলেন বাবন মোল্লা। তখন বাবন মোল্লা, চন্দন শাহ্‌কে

জমিদারী বালাখানায় বসিয়ে নিজে উজিরের কার্য্যভার গ্রহণ করলেন।

বেশ কিছুকাল পরে সেই ফকির এলেন চন্দন শাহের খবর নিতে। কোন সন্তান না হওয়ার কারণে চন্দন শাহের দুঃখের কথা তিনি অবগত হলেন। মনোবেদনা দূর করার উদ্দেশ্যে তাঁকে একটি ফুল দিয়ে ফকিব বিদায় নিলেন। সেই ফুলের ঘ্রাণ নেওয়ায় বিবির সন্তান লাভ সম্ভব হল। সেই সন্তানই হলেন মোবারক গাজী।

মোবারক গাজী পঞ্চম বছরে মক্তবে গেলেন। যথা সময়ের মধ্যে তাঁর শিক্ষালাভ সমাপ্ত হল। পিতা চন্দন শাহ জমিদারী ভার মোবারক গাজীকে দিয়ে জঙ্গলের এক কদম্ব গাছের তলায় বসে আল্লার জেকের আরম্ভ করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে চন্দন শাহের মৃত্যু হল। কদম্ব গাছ তলায় তাঁর দফন করা হল। মোবারক গাজী সেখানে প্রতিদিন জিয়ারত করতেন এবং যোগাসনে বসতেন। সেই ফকির আবার এসে মোবারক গাজীকে ফকির হওয়ার উপদেশ দিলেন। গাজী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁকে সংসারে ধরে রাখার জন্য বাবন মোল্লা বিবাহ দিলেন গাজীকে। দুঃখী গাজী ও মেহের গাজী নামে তাঁর দুই পুত্রও হল। তবুও মোবারক গাজী আস্তে আস্তে সংসারের কথা এক প্রকার ভুলে গেলেন।

ঘোলা নামক স্থানের রাজা মন্দির (মহেন্দ্র ?) রায়ের দরবারে সাড়ে তিন বছরের খাজনা বাকী পড়ায় মোবারক গাজীকে কারারুদ্ধ হতে হল। গাজী স্মরণ করলেন পীর মহিউদ্দীনকে (মঈনুদ্দীন ?)। পীর মহিউদ্দীন অবিলম্বে গাজীকে কারাগার থেকে উদ্ধার করে বেলের জঙ্গলের কদম্ব গাছের তলে নিয়ে গেলেন। সেই রাতে কারাগার দগ্ধ হল। রাজা মন্দির রায় সিপাহীগণকে গাজীর অস্থিগুলি কবর দিতে নির্দেশ দিলেন। সিপাহীগণ গাজীর পলায়ন সংবাদ দিল। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে গাজীকে পাকড়াও করতে হুকুম জারী করলেন। সিপাহীরা জঙ্গলে দুটি সাদা বাঘ কর্তৃক গাজীর মাথার জট আংলাতে (আঙ্গুলের সাহায্যে বিলি দিতে) দেখে ভীত হয়ে সে সংবাদও রাজ-সমীপে নিবেদন করল। রাজা স্বয়ং এসে সে দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হলেন। তিনি গাজীর পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। গাজী কিছু প্রসন্ন হলেন। রাজা

জমির লাখেরাজ পাট্টা লিখে দিলেন গাজীর পুত্র দুঃখী গাজীর নামে। শেষ পর্য্যন্ত গাজী বাঘের ভয় দেখিয়ে রাজা মন্দির রায়কে সেখান থেকে বিতাড়িত করলেন।

অন্য একদিন মোবারক গাজী এক অজ্ঞাতজনের গায়েবী আওয়াজ শুনলেন,—"হে গাজী! এখানে থাকলে তোমার জাহির হবে না। তুমি অপরা পৃথিবীতে যাও।"

গাজী অবিলম্বে সাদা বাঘ দুটিকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে দেখা হল দেবাদিদেব মহাদেবের সাথে। মহাদেবকে প্রশ্ন করে তিনি অপরা পৃথিবীর সন্ধান পেলেন না। তখন তিনি সেখান থেকে মহাদেবের পরামর্শে দুর্গা মাতার কাছে গেলেন। দুর্গা মাতার পরামর্শ পেয়ে এবার তিনি সেখান থেকে গেলেন রসাসাকিনের পাগল পীরের নিকট অপরা পৃথিবীর সন্ধান নিতে। পাগল পীর, গাজীকে পাইকহাটির দিকে যেতে বললেন। পথিমধ্যে পঞ্জরা নামক গ্রামের এক বিখ্যাত আলেম তাঁকে আপন বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে গাজী অনেক উপদেশ গ্রহণ করে পাইকহাটির হেলা খাঁ নামক জমিদারের বাড়ীতে এসে কিছু আহার্য্য চাইলেন। হেলা খাঁ তাঁকে সাদরে দুধ-ভাত খাওয়ালেন এবং যাতে অপরা পৃথিবীর সন্ধান পান এমন আশীর্বাদ করলেন। মোবারক গাজী সেখান থেকে এলেন বিদ্যাধরী নদীর তীরে। খেয়া ঘাটের পাটনী মটুক, কপর্দ্দকহীন গাজীকে পার করতে অস্বীকার করল। গাজী, বদরসা পীরের সহায়তায় নদী পার হলেন। তবুও মটুক পারের কড়ি চাইল। গাজি তখন পুত্র দুঃখী সে কড়ি মিটিয়ে যাবে বলে প্রস্থান করলেন। তিনি এবার এলেন নারায়ণপুরে। সেখানে মন্দিরের পুরোহিতের পত্নী নিখোঁজ হয়েছিলেন। পুরোহিত শরণাপন্ন হলেন গাজীর নিকট। গাজী সদয় হয়ে ব্রাহ্মণীকে গৃহে ফেরাবার ব্যবস্থা করে চলে গেলেন 'তারাহেদে' পুকুরের ধারে। সেখানে সেওড়া গাছ তলায় আস্তানা নিলেন। সেখানে কেবল ব্রাহ্মণের বাস। ব্রাহ্মণের গ্রামে মুসলমান! গ্রামের জমিদার রাম চাটুজ্জ্যের মাতার অনুরোধে ফকিরকে অন্যত্র যেতে বলা হল। ফকির গাজী ক্ষুব্ধ হয়ে অন্যত্র গেলেন। রাম চাটুজ্জের পত্নী দীঘিতে জল আনতে গিয়ে আর ফিরে এলেন না। ঘটনার কারণ জেনে রাম চাটুজ্জের বৃদ্ধা মাতা ফকিরের নিকট ক্ষমা চাইলেন। গাজীর প্রভাব

অনুযায়ী বড় পীর সাহেবকে জোড়া খাসি হাজত দিবার প্রতিজ্ঞা করলে তবেই পুত্রবধূ ঘরে ফিরে আসতে পারলেন। কিন্তু খাসির বদলে মোরগ হাজত দেওয়ায় গাজী বল্‌লেন,—'এ জনমে যাবে না নারায়ণপুরে বাঘের ভয়।'

অবশেষে মোল্লা পাড়ায় গিয়ে রামবাবু ডেকে আনলেন কাছিম নস্করকে এবং মোরগের হাজত দিলেন। গাজী তাদেরকে সুখে থাকার আশীর্বাদ করলেন।

পরে একদিন হঠাৎ কি ভেবে গাজী, দেবী নারায়নীর মন্দিরে গিয়ে দেবীর নিকট 'অপরা পৃথিবীর' সন্ধান জানতে চাইলেন। নারায়ণী তাঁকে গোমাংস গ্রহণ করতে নিষেধ করে কুরালী নামক স্থানের এক মরা সেওড়া গাছের তলায় আসন নিতে বললেন। গাজী সেখানে আসন নিলে কয়েকদিনের মধ্যে মরা সেওড়া গাছ জীবিত হয়ে ওঠে এবং তাতে কদম্ব ফুল ফোটে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে গ্রামবাসী সেই ফকিরকে অসামান্য ব্যক্তি বলে বুঝতে পারে। তারা গাজীর নিকট থেকে নানা প্রকারে উপকার পেলে সে ধারণা দৃঢ়মূল হয়।

মোবারক গাজী তাঁর বাঘ দুটিকে দিনে ভেড়ায় রূপান্তরিত করে রাখতেন। কয়েকজন লোভী ব্যক্তি তাদেরকে গাজীর নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে যায়। দিনে তারা ভেড়া থাক্‌ত কিন্তু রাত্রে হত বাঘ। রাত্রে সেই বাঘ দুটি নিজমূর্তি ধারণ করায় তারা ভেড়া দুটিকে সকালে গাজীকে ফিরিয়ে দিল।

গ্রামবাসীগণ পানীয় জলের অভাবে একটা পুকুর খনন করাবার জন্য গাজীকে আবেদন জানালেন। গাজী মাত্র দেড় শত কোরাদার আনাতে বললেন। কোরাদার এল। পুকুরের স্থান নির্দিষ্ট হল। পুকুর কাটাও হল। পরে গাজী কর্তৃক আহূত হয়ে কোরাদারগণ কিছু খাবার খেতে বসল। মাত্র দুই মালসার "খানা" বা খাদ্যদ্রব্যও তারা খেয়ে শেষ করতে পারল না,—গামছায় বেঁধে বাড়ী নিয়ে গেল। পরদিন জলভর্তি দুই পুকুর দেখে সকলে আনন্দে নাচতে লাগল।

এই গ্রামে রামা মালুঙ্গী ও শ্যামা মালুঙ্গী নামে দুই কাঠুরিয়া ছিল। ৫000 টাকা পাওয়ার ব্যাপার নিয়ে গাজীর সঙ্গে তাদের মনোমালিন্য ঘটল। একদিন জঙ্গলে বাঘে রামার কান ছিঁড়ে নিয়ে গেল। সে ফিরে এসে গাজীর পা ধরল জড়িয়ে। গাজী তাঁর কানে হাত বুলিয়ে কাটা কান জোড়া

জাগিয়ে দিলেন। এবার সে প্রতিদিন গাজীকে 'নাস্তা' (দুধ ও ফল) দিবার প্রতিজ্ঞা করে চলে গেল।

সেই রাত্রে গাজী শুনলেন গায়েবী আওয়াজ—"এই বনে আগুন লাগাও। সে আগুন যেখানে নিভ্‌বে সেখানেই 'অপরা পৃথিবীর' সন্ধান পাবে।" সেই কথা মত আগুন লাগানো হল। আগুন এসে নিভ্‌ল ঘুটিয়ারী গ্রামে। গাজী সেখানে বিদ্যাধরী নদীর তীরে বাদাম গাছের তলায় আপন যোগের আসন করলেন। সেখানে বসে তিনি জিগির দিতেই এলেন তাঁর মুরশিদ, যিনি গাজীকে আল্লার দরগাহে 'একিন' করতে বললেন।

গাজী বাঘগণকে আহ্বান করলেন এবং তাদের দ্বারা সেখানে ঘর তৈরী করালেন।

এবার এলেন জগত বিখ্যাত বড়পীর সাহেব। বড়পীর সাহেব সেখানকার সেই নজরগাহের খাদিম হিসাবে মোবারক গাজীকে নিযুক্ত করে অন্তর্হিত হলেন। মোবারকের নাম শুনে কেহ এলে গাজী তাকে বড়পীরের নামে হাজত দেওয়াতেন। এইভাবে গাজীর জাহির হল চারিদিকে।

কিছুদিন পর এক 'দেউনীর' (দেবনী বা দেবী) আত্মা নদীর কূল ভেঙে মোবারকের আসনের দিকে অগ্রসর হল। গাজীর নিষেধ-অনুরোধ অমান্য করায় দেউনী বদ-দোয়া পেয়ে বড়পীর সাহেবের হাজতের জন্য মশলা পেষার পাথরে পরিণত হল। অবশ্য দেউনীর অনুরোধে গাজী সেখানে যাতে গোহত্যা না হয় তার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পরে একদিন গাজী বেলে আদমপুর থেকে তাঁর পুত্রদ্বয়কে ঘুটিয়ারী শরিফে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য সংবাদ পাঠালেন। দুঃখী গাজী তৎক্ষণাৎ পিতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এলেন নদীর ধারে ও মটুক পাটনীর খেয়া নৌকা চড়ে পিতার বকেয়া প্রাপ্যসহ পারানির উপযুক্ত কড়ি দিয়ে দিলেন। তারপর তিনি ঘুটিয়ারী শরীফের পথ-নির্দ্দেশ নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন যথাস্থানে এবং পিতাকে 'সালাম' জানালেন।

[পরবর্তী কিছু ঘটনা 'গাজী সাহেবের গান'-এর প্রায় সমতুল্য। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ নিরর্থক।]

একবার সাতই আষাঢ় পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় গ্রামবাসীগণ পীর মোবারক গাজী সাহেবের শরণাপন্ন হলেন। তিনি তাঁদেরকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে একটি ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করলেন। নিষেধ রইল যে যতক্ষণ তিনি আপনা হতে দরজা না খুলছেন ততক্ষণ যেন অপর কেউ সে দরজা না খোলেন। পীর গাজী সেই অর্গলবদ্ধ ঘরে একাকী খোদাতায়ালার প্রার্থনায় নিযুক্ত হলেন।

ইতিমধ্যে একদল পাঠান দূর থেকে এল বড়পীরের নামে হাজত দিতে। তারা অপেক্ষা করে ধৈর্য্যহারা হয়ে পড়ল এবং দরজা খুলে ফেলল। দরজা খুলে দেখা গেল—কি সর্বনাশ!—পীর মোবারক বড়খাঁ গাজী সেখানেই 'ইন্তেকাল' অর্থাৎ দেহত্যাগ করেছেন।

গাজী বাবার নির্দ্দেশ মতন ফরিদ নস্কর আপন কন্যাকে দুঃখী গাজীর সহিত বিবাহ দিলেন। দুঃখী গাজীর পুত্র সা-দেওয়ানের বংশধরগণ আজো গাজী বাবার আশ্রয়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে চলেছেন্।

গৌরমোহন সেন বিরচিত 'হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ্ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান' নামক গ্রন্থ ব্যতীত এমন সম্পূর্ণ গাজী-জীবনী গ্রন্থ আর পাওয়া যায় নি। কোন কোন কাব্যে বা গানে গাজীর প্রথম বা মধ্য জীবনের কথা আছে কিন্তু শেষ জীবনের কথা আর কোন গ্রন্থে নেই। এই গ্রন্থে চম্পাবতী প্রসঙ্গ নেই, নেই দক্ষিণ রায় প্রসঙ্গ। "গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্য, গাজী সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান, রায়মঙ্গল কাব্যাংশ, গাজী সাহেবের গান ও কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটক" এই কয়খানি গ্রন্থের মধ্যে গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্য ও গাজী সাহেবের জীবন চরিতাখ্যানে তাঁর জন্মকথা আছে, —অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। কাব্যে এবং নাটকে 'সেকেন্দার শাহ' বলে তাঁর পিতার নামোল্লেখ আছে কিন্তু এই জীবন চরিতাখ্যানে তাঁর পিতার নাম বলা হয়েছে 'চন্দন সাহা'। কাব্যে-নাটকে মাতার নাম 'অজুপা' লিখিত হয়েছে। এ গ্রন্থে সে উল্লেখ নেই। এই পুস্তক ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁর পুত্র দুঃখী গাজী ও মেহের গাজীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। গাজী সাহেব জনৈক রাজার নিকট নিগৃহীত হয়েছিলেন—এমন ঘটনার প্রসঙ্গে একাধিক রাজার নাম পাওয়া যায়। গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্যে রাজার নাম শ্রীদাম রাজা, গাজী-কালু-চম্পাবতী নাটকে তাঁর নাম রামচন্দ্র এবং জীবন

চরিতাখ্যানে এমন ব্যক্তি হলেন মন্দির (মহেন্দ্র) রায়। শ্রীদাম রাজা ও রামচন্দ্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন কিন্তু মন্দির রায় ধর্মান্তরিত হন নি। এই জীবন চরিতাখ্যানে ধর্মপ্রচার প্রসঙ্গ নেই। বড়খাঁ গাজী যে বড় পীর সাহেবের ভক্ত ছিলেন সে কথা কেবলমাত্র এই গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থখানি ইতিহাসের মত করে লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু এর সব তথ্য ইতিহাস-ভিত্তিক নয়। লোকমুখে প্রচারিত রঞ্জিত-অতিরঞ্জিত কাহিনী নিয়ে সজ্জিত বলে অনুভূত হয়। পীর একদিল শাহ কাব্যের সঙ্গে এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত সাদৃশ্য দেখা যায়ঃ—

১। ঘোলার কাছারিতে পাইক-পিয়াদার সঙ্গে রাজা মন্দির রায়ের নিকট উপস্থিত হওয়া।

২। গরুকে বাঘে এবং পুনরায় বাঘকে গরুতে রূপান্তরিত করার অনুরূপ ঘটনা।

৩। গাজী সাহেবের ন্যায় একদিল শাহের পঞ্চম বর্ষীয় বালকরূপ ধারণ করা।

৪। গাজী সাহেবের ন্যায় একদিলের ভ্রমর-রূপ ধারণ করা,

৫। পীর একদিলের সহিত লক্ষ্মী দেবীর সাক্ষাতের ন্যায় পীর বড়খাঁ গাজীর সহিত দুর্গামাতা এবং নারায়ণী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

নৌকা ছাড়া জলের উপর দিয়ে পদচারণা করে নদী পার হওয়ার কথা পীর গোরাচাঁদ কাব্যে দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থে মটুক নামক পাটনীর কথা আছে। গাজী-কালু-চম্পাবতী কাহিনীতে মটুক ছিলেন ব্রাহ্মণনগরের রাজা, তিনি চম্পাবতীর পিতা অর্থাৎ গাজীর শ্বশুর, তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

এই গ্রন্থে মদন রায়কে ঢাকার নবাব দরবারে যাবার কথা দেখি, গাজী সাহেবের গানেও দেখি তাঁকে ঢাকার নবাব দরবারে যেতে হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদ কুলীখাঁর দরবারে মদন রায়ের যাওয়ার প্রসঙ্গ কি ভাবে উত্থাপন করেছেন তা প্রণিধান যোগ্য। গাজী সাহেবের গান প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেছেন যে সপ্তদশ শতাব্দীতে নবাব নাজিমের পূর্ব্বে গাজী সাহেবের নাম জাহির হয়েছিল। মদন রায়ের অষ্টম অধঃস্তন

পুরুষ ৺দেবেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরীর বক্তব্য অনুসারে ঢাকার তৎকালীন নবাবের নাম সায়েস্তা খাঁ বলে উল্লেখযোগ্য।

পীর আউলিয়াগণের প্রভাব তৎকালে রাজশক্তিকেও নিয়ন্ত্রিত করত। মোবারক গাজীর পিতা চন্দন শাহ দিল্লীর বাদশাহ হয়েও এক ফকিরের নির্দেশে সিংহাসন ত্যাগ করেন। অন্যত্র দেখা যায়, মদন রায় স্থানীয় অধিপতি হয়েও তিনি পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর প্রভাব-মুক্ত নন। ঢাকার বা মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ পর্য্যন্ত পীর মোবারক গাজীর নির্দ্দেশে মদন রায়ের তিন সনের রাজস্ব মকুব করে পীরের প্রতি উপযুক্ত মর্য্যদা প্রদর্শন করেছেন। ফকিরের নির্দ্দেশে ফকিরি গ্রহণ—এমত ঘটনার দৃষ্টান্ত অন্য গ্রন্থের কাহিনীতে বিরল।

এ গ্রন্থে মোবারক গাজীকে মোবারক বা মঙ্গলময় বলে যতখানি প্রতিভাত হয়, গাজী বা যোদ্ধা বলে তা হয় না। তাঁর অলৌকিক কীর্তিকলাপের পরিচয়ে অনেকে মুগ্ধ হয়েছে, হয়েছে ভীত, মদন রায় প্রমুখ হয়েছেন আশান্বিত। তিনি আজীবন থেকেছেন আল্লাহের পরম ভক্ত এবং কেবলমাত্র জনকল্যাণকর কাজেই রাজা-প্রজাকে আহ্বান করেছেন,—ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজনকে মূল্য দিতে আগ্রহী ছিলেন না।

বড়খাঁ তদীয় পুত্র দুঃখী গাজী ও মেহের গাজীর সৎভাবে কৃষিকাজ করাকে স্বাভাবিকভাবে প্রিয় কর্ম বলে অনুমোদন করেছেন। সংস্কারের গোঁড়ামি তাঁকে পরাভূত করতে পারে নি বলেই তো তিনি দেউনীর অনুরোধ রক্ষা করে ঘুটিয়ারী শরীফে গো-হত্যা নিষিদ্ধকরণ অনুমোদন করেছেন।

মোবারক গাজী ধর্মীয় সহাবস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে হিন্দু ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন নি। অপরা পৃথিবীর সন্ধানে তিনি মহাদেব, মক্কা থেকে দুর্গা, নারায়ণীর কাছ পর্য্যন্ত ধাবিত হয়েছেন এবং অভীষ্ট লাভ করেছেন, —আবার নবাবের উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করেছেন। রাম চাটুজ্জের মাতাও দেউনীর অন্যায় আচরণকে সহ্য করেন নি। অপরদিকে রাজা মদন রায় কিন্তু পীর মোবারক গাজীর মহত্বকে বা অলৌকিক ক্ষমতাকে অস্বীকার তো করেন নি বরং অনুগত হয়ে সেই মহত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লাভবান হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আপনার সেরেস্তায় মুসলিম মন্ত্রী ফরিদ নস্করকে যথেষ্ট মর্য্যাদা না দিবার কোন প্রশ্নই আসে নি।

রাজা স্বয়ং, পীর মোবারক গাজীর অনুরোধে জনহিতকর কাজে অগ্রসর হয়ে এসেছেন, এমন কি মসজিদ পর্য্যন্ত নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন।

ঘটনা পরম্পরায় অনেকগুলি চরিত্র এই গ্রন্থে এসে পড়েছে। দু'একটী বাদে প্রায় সবই সাধারণ মানুষের চরিত্র। রাজা, মন্ত্রী, পেয়াদা, গৃহবধু, রামা ও শ্যামা মালুঙ্গী, পাটনী, নবাব প্রভৃতির মধ্যে অতি-মানবিকতার কোন চিহ্ন নেই। মোবারক গাজী, দেউনী প্রভৃতি চরিত্রে কিঞ্চিত ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। গৌরমোহন সেনের এই গ্রন্থে পশু চরিত্র বলতে কোন পরিচয় নেই—দুইটি সাদা বাঘের কিছু কথা আছে মাত্র। দেউনীর চরিত্র-পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে অতি সংক্ষেপে।

হজরত সৈয়দ শাহা মোবারক গাজী সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

সম্প্রতি (১৯৭৫ অক্টোবর) 'হজরত সৈয়দ শাহা মোবারক গাজী সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী' নামক একখানি পাঁচালী আমার হস্তগত হয়েছে। এই পাঁচালীর ভিতরের প্রতি পৃষ্ঠায় লেখা আছে. "ছহি মোবারক গাজী ও জেন্দা পীরের কেচ্ছা"। এর কভার পৃষ্ঠায় লেখকের নাম দেওয়া আছে নুর মহম্মদ দেওয়ান ; রেজিষ্টার্ড নং ২১০২।

নুর মহম্মদ দেওয়ান বলেন,—"শেরে মস্ত্ নামক এক কামেল ব্যক্তি, গাজীবাবা এন্তেকালের পর দুখী দেওয়ান ও মেহের দেওয়ান (পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর পুত্রদ্বয়) সাহেবের অনুমতি সূত্রে ও সহযোগিতাতে এক গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হয় এই গ্রন্থ।

জনাব নুর মহম্মদের বয়স আনুমানিক ২৬ বৎসর। তাঁর পিতার নাম মহম্মদ ওয়াহেদ আলি দেওয়ান। বাস ঘুটিয়ারী শরীফে। এই গ্রন্থে লেখক হিসাবে নুর মহম্মদ দেওয়ানের নাম কভার পৃষ্ঠায় ছাপা থাকলেও গ্রন্থ-অভ্যন্তরের ভণিতা থেকে জানা যায় যে, এই কাহিনীর মূল রচয়িতার নাম ফকির মহাম্মদ। অবশ্য ফকির মহাম্মদ বিরচিত সেই মূল কাহিনী সম্বলিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি। ফকির মহম্মদের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পংক্তি এইরূপ :—

এই কেচ্ছা যে শুনিবে কিম্বা যে পড়িবে।
বালা মুছিবত হইতে নাজাত সে পাবে॥
ফকির মহাম্মদ যে কহে এই বাত।

এলাহি আমাকে যেন করেন নাজাত ॥
ইমান আমান আল্লা রাখে ছালামেতে।
পয়ার ছাড়িয়া এবে লিখি ত্রিপদীতে ॥

নূর মহম্মদ সাহেবের গ্রন্থখানির আকৃতি ৮"×৫"। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০ এবং পৃষ্ঠাগুলি ডান দিক থেকে বাম দিকে সাজানো। এর বিজ্ঞপ্তিতে গ্রন্থকার এই গ্রন্থের নকল না করতে ভারত সরকারের আইনগত দণ্ডবিধির উল্লেখ করেছেন।

পাঁচালীখানি বাংলা ভাষায় রচিত। এতে আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য্য বর্তমান। পদ্যছন্দে লিখিত এই পাঁচালী, গদ্যের আকারে লিখিত। এর ভাষা প্রাঞ্জল বাংলা। দ্বিপদ, ত্রিপদ কোথাও বা চতুঃপদে বিরচিত যার একটি নমুনা নিম্নলিখিত ভণিতাতে দৃষ্ট হয়—

উপদেশ পাই যত
নাহি হয় সে মনোমত
দেখিলাম কত শত
নানা মত জনে জনে।
ফকির মহাম্মদ কহে পরে
শেষে এই হতে পারে
সকল মত একত্র করে
ভ্রমি কেবল বনে বনে। পৃঃ—৫

এই পাঁচালীতে অন্যান্য পাঁচালীর ন্যায় হাম্‌দ-নায়াত বলে উল্লেখ না থাকলেও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বক্তব্য মূলতঃ তাই। প্রথম পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার 'বিছমিল্লা বলি নামেতে আল্লার, শুরু করিলাম·········' ইত্যাদি বলে গদ্যের আকারে কয়েক পংক্তিতে ভক্তিপূর্ণ ভূমিকা লিখেছেন। গদ্যের আকারে লিখিত এই স্তবকের শেষে স্বাক্ষরের আগের বিনয়-প্রকাশক দুইটি পংক্তি সাজালে পদ্যের আকারে নিম্নরূপ দাঁড়ায়—

পীরের দোয়ায় কি যে লিখিব তাহা নাহি জানি আমি।
আপনি লিখিবেন কেচ্ছা মেনে নিব আমি ॥

চতুর্থ পৃষ্ঠা থেকে বড় হরফে 'কেচ্ছা শুরু' শিরোনাম দিয়ে কাহিনী আরম্ভ

হয়েছে। তা শেষ হয়েছে ৬০ নম্বর পৃষ্ঠায় এসে। কেচ্ছার মধ্যে নিম্নলিখিত উপ-শিরোনামগুলি বিদ্যমান।

১। চন্দন শাহা ও বর্গীর লড়াই
২। চন্দন শাহার ফকির হইবার বয়ান
৩। মোবারক গাজীর ফকির হইবার বয়ান
৪। মন্দির রায়ের জমিদারী এবং গাজী সাহেবের কারারুদ্ধ হইবার বয়ান
৫। পীর মঈনুদ্দিন আসিয়া মোবারক গাজীকে কারাগার হইতে খালাস করিবার বয়ান
৬। বেলের বনে আসিয়া গাজী সাহেব মন্দির রায়কে বর্দোয়া করিবার বয়ান
৭। বিবির চক্ষের আধি ভাল হইবার বয়ান
৮। গাজী সাহেবের অপোড়া পৃথিবীর সন্ধান এবং বদরের নিকট হাসা জোড়া কুম্ভীর পাইবার বয়ান
৯। গাজী সাহেব নারায়ণীর কাছে থাকিয়া মহেশ ঠাকুরকে বর্দোয়া করিবার বয়ান
১০। বড় পীর সদ্রুকে খোয়াব দেখায় ও মেহেরের সাদি হইবার বয়ান
১১। নবাবের খাজনা বাকীর জন্য ধরিয়া লইয়া যায় এবং গাজী সাহেব, মদন রায় ও অন্যান্য জমিদারদিগের উদ্ধার করিবার বয়ান
১২। মদন রায়ের জমিদারী ও গাজী সাহেবের মউত
১৩। দুঃখীর কান্দনায় মোবারক গাজী আসিয়া দুঃখীকে সান্ত্বনা দিয়ে যায়।

শেষ কভার পৃষ্ঠার ভিতরের দিকে বাংলা হরফে উর্দু ভাষায় ১২ পংক্তির একটি কবিতায় কিছু দরবেশী ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া ২৫ পৃষ্ঠায় 'স্মরণের সুর', ২৭ ও ৩০ পৃষ্ঠায় 'ধুয়া' এবং ৪০ পৃষ্ঠায় 'গান' এই নামে ছোট ছোট কয়েকটি গান সন্নিবেশিত আছে। ৪০ পৃষ্ঠায় গানের একমাত্র লাইনটি—

আমার এ দেহ নদী, যতই বাঁধি, ঠিক মানে না রে মন।

গৌরমোহন সেন রচিত "হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি সাহ্ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান" শীর্ষক গ্রন্থখানিতে বর্ণিত কাহিনীর সহিত এই

পাঁচালী কাব্যখানির মূলতঃ বিশেষ পার্থক্য নেই। তবে "জীবন চরিতাখ্যানে" রয়েছে প্রচুর গান এবং বেশ কয়েকখানি চিত্র। "সংক্ষিপ্ত জীবনীতে" গান দু'একটি আছে বটে কিন্তু চিত্র সংখ্যা একেবারেই নেই। 'জীবন চরিতাখ্যান' মূলতঃ গদ্যে এবং 'সংক্ষিপ্ত জীবনী' মূলতঃ পদ্যে লিখিত। উভয় গ্রন্থে প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। উভয় গ্রন্থকার সূফী আদর্শের অনুসারী বলে বোঝা যায়।

সংক্ষিপ্ত জীবনীতে পীরের জন্ম বিবরণ একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা। পীর মইনুদ্দীন আল্লার নিকট এসে চন্দন শাহার ফকির হওয়ার বিবরণ প্রদান করলেন এবং তার পুত্র-কামনার কথা জানালেন। তৎক্ষণাৎ জেবরিল-মাধ্যমে বেহেস্তের এক ওলিকে ডাকিয়ে এনে—

আল্লা কহেন শুন গাজি কহি যে তোমারে।
আমার হুকুমে যাহ চন্দনের ঘরে॥

গাজি বল্‌লেন,—

যদি আল্লা যাব আমি চন্দনের ঘরে।
ওলি আর না পাঠাইবে দুনিয়ার পরে॥
আল্লা বলে গাজি ওলি শোন মন দিয়া।
কেতাবে খবর আছে বাইশ আউলিয়া॥
এই কথা শুনিয়া গাজি খোশাল হইল।
এনুসাল্লা বলিয়া যে মুরশিদে ডাকিল॥

এবার পীর মঈনুদ্দীন বল্‌লেন—

এই ফুল দিই আমি তুমি লিয়া যাও।
বিবির হাতেতে এই ফুল গিয়া তুমি দাও॥
এই ফুল দিলে বিবির লাড়কা হইবে।
আল্লার দরগায় মোনাজাত ভেজিবে॥

পীর মোবারক গাজী সাহেবের এইরূপ জন্ম-কাহিনী অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যেও দৃষ্ট হয়। মনসা, চণ্ডী বা পীর একদলি শাহ্‌ কাব্যের প্রভাব এতে সুস্পষ্ট। "বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি" বা মানিক পীর কাব্যের সাথে এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। গাজি-কালু-চম্পাবতী কাব্যে গাজীর ফকির হয়ে যাওয়ার

পূর্ব মুহূর্তে মাতার নিকট থেকে বিদায় নেবার করুণ বর্ণনা। এই পাঁচালী কাব্যে বর্ণিত নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির সহিত যথেষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত—

আখির পুতুল তুমি ধড়ের পরাণ।
আমাকে ছাড়িয়া বাবা যাবে কোন স্থান ॥
কেমনে থাকিব আমি না দেখে তোমাকে।
মা বলিয়া বল বাবা কে ডাকিবে আমাকে ॥
গাজি বলে লোহার বেড়ি যদি দেও তুমি।
কারার দিয়াছি মাগো ফকির হব আমি ॥
মা বলে ওরে বাছা ফকির যদি হলে।
বিদায় দিই ডাক একবার মা বলে ॥

কবি ফকির মহাম্মদ বাংলা পীর-সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর ইসলামি বাংলা-সাহিত্যে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (১ম খণ্ড অপরার্ধ) ফকির মহাম্মদের কথা উল্লেখ করেছেন। 'ইউসুফ জোলেখা' নামক গ্রন্থের রচয়িতা ফকির মহাম্মদ এবং 'ছহি মোবারক গাজি ও জেন্দা পীরের কেচ্ছা' নামক পাঁচালীর রচয়িতা ফকির মহাম্মদ যদি একই ব্যক্তি হন তবে 'ইউসুফ জোলেখা'র রচনাকাল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ—এই হিসাবে কবিকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের লোক বলে ধরা যেতে পারে।

বড়খাঁ গাজীর পিতার নাম সেকেন্দার শাহ্। দেখা যায় তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্য এবং কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটকে গাজীর পিতার নাম সেকেন্দার শাহ্ বলে উল্লেখ আছে। এই কাহিনীতে আরো পাওয়া যায় দক্ষিণ রায়, মুকুট রায় ও রামচন্দ্র খাঁর কথা। তাঁদের কাল হল ১৫৭৪ খৃস্টাব্দ থেকে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ[৬০]। উক্ত রামচন্দ্র খাঁ ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নীলাচলে যাত্রার পথে উড়িষ্যা রাজ্যে যেতে (ছত্রভোগের উপর দিয়ে) সাহায্য করেছিলেন[৫৭]। রামচন্দ্র খাঁর কাল কোনটি? রামচন্দ্রের মূল নাম শান্তিধর। শান্তিধরের বঙ্গাধিপ হুশেন সাহের নিকট থেকে রামচন্দ্র খাঁ উপাধি পাওয়ার কাল হল ১৪৯০ খৃস্টাব্দ।[৫৩] মুকুট রায় ও রামচন্দ্র খাঁ সমসাময়িক। অতএব পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর যুদ্ধকাল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী হবে—এটাই স্বাভাবিক। আবার মুকুট রায়ের পুত্র কামদেব ওরফে ঠাকুরবর সাহেব,

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন।[৩৬] মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কাল হল ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দ। শায়েস্তা খাঁর ঢাকার দরবারে বড়খাঁ গাজী এবং মদন রায়ের গমন করতে হয়েছিল। শায়েস্তা খাঁর কাল হল ১৬০৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দ। শায়েস্তা খাঁ বাংলাদেশের শাসন কর্তা হয়ে এসেছিলেন ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে।[৫৩] অতএব বড়খাঁ গাজীর জীবৎকাল ১৩৯৩ খৃস্টাব্দ থেকে ১৬৬৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে হবে এটা খুবই স্বাভাবিক।

একাধিক বড়খাঁ গাজী ছিলেন কিনা এ বিষয়েও আজো কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় নি। তবে মোবারক সাহ্ গাজী, বড়খাঁ গাজী, বরখান গাজী, মব্রা গাজী, গাজী সাহেব ও গাজী বাবা এই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন গ্রন্থে যাঁর কথা লিখিত হয়েছে তিনি একই বড়খাঁ গাজী—তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

হাওড়া-হুগলী সীমান্তে ভুরশুট পেঁড়োতে সুফী খাঁ বা ইসমাইল গাজীকে কেন্দ্র করে একটি পীরস্থান গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে সুফী খাঁ হয়েছেন বড়খাঁ। এই বড়খাঁ গাজীকে আশ্রয় করে ভুরশুট মান্দারণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইসলামি সাহিত্যের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।[২] এই বড়খাঁ গাজী ও আমাদের আলোচ্য বড়খাঁ গাজী একই ব্যক্তি বলে আমার মনে হয় না, যদিও ডাঃ এনামুল হক অনুমান করেন যে ত্রিবেণী বিজয়ের পর বড় খান গাজী সম্ভবতঃ দক্ষিণাঞ্চল বিজয়ে বর্হিগত হয়ে যশোর, খুলনা ও চব্বিশ পরগণার ভাটি অঞ্চলে তাঁর বিজয়াভিযান পরিচালনা করেছিলেন।[৩৮]

"জাফর খাঁ বা দরাফ খাঁ গাজী ও তাঁর পরিবারবর্গের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাতে দরাফ খাঁর তৃতীয় পুত্রের নাম বরখান গাজী (H. Blochman's Notes on Arabic and Persian inscriptions in the Hooghly District: J. A. S. B. XII 280) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এঁরা ত্রিবেণীতে সুলতান রুকুনউদ্দিন কৈকাউসের সময় আগমন করেন। হুগলীর রাজা ভূদেবের সঙ্গে লড়াই করে বিজয়ী হয়ে গাজী উপাধি গ্রহণ করেন। জাফর খাঁর পুত্র বরখান গাজীই যে লৌকিক বিশ্বাসের বড়খাঁ গাজী তা সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর।

আমরা বড়খাঁ গাজী সম্বন্ধে যে তথ্য হিন্দু ও মুসলমান রচয়িতাদের রচনায়

পাই তাতে মনে হয় তিনি জাফর খাঁর সমসাময়িক হলেও তাঁর পুত্র নন। এই বিশ্বাসের মূলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভাটি অঞ্চলে বড় খাঁর কবর এবং কিংবদন্তীতে তাঁকে সেই অঞ্চলেই পাওয়া যায়, পাণ্ডুয়া বা ত্রিবেণীতে নয়। তবে একথা সত্য যে তিনি শুধু ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন, কোন সম্ভ্রান্ত পাঠান আমীর ওমরার বংশ-সম্ভূত হবেন, কিন্তু আরব সুফী-দরবেশের সংস্পর্শে এসে সংসারে বা রাজধর্মে তাঁর বৈরাগ্য জন্মে।" (বাংলা সাহিত্যের কথা : দ্বিতীয় খণ্ড : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্)।

সেকেন্দার শাহের পুত্র বড়খাঁ গাজী ব্যতীত ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজীর পুত্র বরখান গাজীর নাম পাওয়া যায়। জাফর খাঁর মসজিদের পারসিক লিপিতে যে তারিখ আছে তাতে ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হয় ;—কিন্তু সে সময় যশোহর জেলায় রাজা মুকুট রায়ের আবির্ভাব হয়নি।[৫৩]

ঐতিহাসিক আরো লিখেছেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আর একদল গাজী বাংলা দেশে এসে বঙ্গেশ্বর হোসেন শাহের সহায়তায় হিজলী থেকে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। বরখান বা বড়খাঁ গাজী তাঁদেরই অন্যতম। তিনিই মোবারক শাহ্।[৫৩]

আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে পীর মোবারক গাজীর পিতা ছিলেন পীর গোরাচাঁদের শিষ্য পীর হজরত আবদুল্লাহ ওরফে সোন্দলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই মন্তব্যের পক্ষে কোন যুক্তি তিনি উপস্থাপিত করেন নি। পীর গোরাচাঁদের আগমন-কাল চতুর্দ্দশ শতাব্দী বলে গৃহীত হলে আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্যকে একেবারেই ভ্রান্ত বলা যায় না। আবার দেখা যায়, বঙ্গের সুলতান সেকেন্দারের এক পুত্রের নাম বড় খাঁ গাজী। সেকেন্দারের রাজত্বকাল ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর আঠারো জন পুত্রের অন্যতম গিয়াসউদ্দীন বাকী সতেরো জনকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন।

অতএব আমরা এ পর্যন্ত কয়েকজন বড়খাঁ গাজীর নাম পাচ্ছি। প্রথমতঃ জাফর খাঁর পুত্র বড়খাঁ গাজী। তাঁর কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ। দ্বিতীয়তঃ, সেকেন্দার সাহের পুত্র বড়খাঁ গাজী। তাঁর কাল চতুর্দ্দশ শতাব্দী এবং তৃতীয়তঃ, আবদুল্লাহ্ ওরফে সোন্দলের পুত্র বড়খাঁ গাজী। তাঁর কাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

আমাদের ধারণা উক্ত তৃতীয় বড়খাঁ গাজীই আমাদের আলোচ্য বড়খাঁ গাজী। কারণ,—তাঁর অবস্থিতি কাল আমাদের হিসাবে গৃহীত কালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ কোন কবির কাছে তিনি সেকেন্দার শাহের পুত্র, কোন ভক্তের কাছে তিনি চন্দন সাহার পুত্র। কারো মতে তিনি দিল্লীর সুলতানের পুত্র, কারো মতে বঙ্গের সুলতানের পুত্র। তাঁদের বক্তব্য ইতিহাস-ভিত্তিক নয়। তৃতীয়তঃ সেকেন্দার সাহের পুত্র বড়খাঁ গাজী যে সময়ে নিহত হন, সোন্দলের পুত্র বড়খাঁ গাজী প্রায় সেই সময়ে আবির্ভূত হন। সুতরাং সুলতান-পুত্র বড়খাঁ গাজী রূপেই সাধক সোন্দল-পুত্র বড়খাঁ গাজীর পরিচিতি প্রচারিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

কবি কৃষ্ণরাম দাস রচিত 'রায়মঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল নিয়ে কোন মতভেদ নেই। কবি তাঁর কাব্যের রচনাকাল এইভাবে নির্দেশ করে গেছেন ঃ—

কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতু চন্দ্র সকের বৎসর ॥

নাট্যকার সতীশচন্দ্র চৌধুরীর নাটকের রচনাকাল ১৩২০ বঙ্গাব্দ। নাট্যকার লিখেছেন,—"এই পুস্তক সন ১৩২০ সালের ৬ই পৌষ রবিবার আরম্ভ এবং ৮ই পৌষ মঙ্গলবার সম্পূর্ণ হইল।"

অতএব উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল নিয়ে সমস্যা নেই। আবদুর রহিম সাহেব তাঁর "গাজি-কালু-চম্পাবতী" কাব্যের রচনাকাল লিখে যান নি। উপরোক্ত নামে আরো দুখানি পাঁচালি কাব্যের কথা জানতে পারা যায়। তাদের রচনাকাল যথাক্রমে ১২৮৫ বঙ্গাব্দ ও ১৩০২ বঙ্গাব্দ। আবদুর রহিম সাহেবের এই পাঁচালি কাব্যের রচনাকাল আনুমানিক উনবিংশ শতাব্দী। এই প্রসঙ্গে বড়খাঁ গাজীর চরিত্র-সমন্বিত আরো যে কয়খানি গ্রন্থের কথা জানতে পারা যায় সেগুলি হল,—

১। কালু-গাজী-চম্পাবতী, রচয়িতা খোন্দকার আহম্মদ আলি। এর রচনাকাল ১২৮৫ সাল।[৩১]

২। কালু-গাজী-চম্পাবতী, রচয়িতা মহম্মদ মুন্সী সাহেব। এর রচনাকাল ১৩০২ সাল।[৩১]

৩। কালু-গাজী-হামিদিয়া।[৩১]

৪। মোবারক গাজীর কেচ্ছা (অষ্টাদশ শতাব্দী), রচয়িতা ফকির মহাম্মদ।[২৬]

৫। কালু-গাজী-চম্পাবতী (অষ্টাদশ শতাব্দী), রচয়িতা আবদুল গফ্ফর (গফুর)।[২৩] তাঁর কাহিনীতে হিন্দু মুসলমান দেবতত্ত্বের অদ্ভুত মিশ্রণ হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে "প্রচুর বিকৃতি সত্ত্বেও জনপদ সংস্কৃতির একদিকের ভাল নমুনা হিসাবে এই কাহিনীর মূল্য আছে।

৬। বড়খাঁ গাজী (অষ্টাদশ শতাব্দী), রচয়িতা সৈয়দ হালুমিয়া। [২৩]

৭। গাজী বিজয় (অষ্টাদশ শতাব্দী), রচয়িতা ফয়জুল্লা।

৮। গাজীর পুথি, রচয়িতা আবদুর রহিম। এই কাহিনীর নায়িকার নাম লাবণ্যবতী।

কলেমদ্দী গায়েন কর্তৃক গীত সে গীত মেদনমল্ল পরগণার ভ্রাম্যমান ফকির-গণের মুখে মুখে চলিত গীত। কে এবং কবে যে সে গীত রচিত হয়েছিল তা আজ অজ্ঞাত। ফকিরগণের মুখে মুখে ফেরা গান পরিবর্তিত, পরিমার্জিত, সংযোজিত, পরিবর্জিত হয়েছিল এটাই স্বাভাবিক। যাহোক্, নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গাজী সাহেবের গান ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করায় তা রক্ষা পেয়েছে। অতএব "গাজী সাহেবের গান" রচনার সঠিক কাল নির্ণীত হয় নি।

গৌরমোহন সেন মহাশয়ের গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ আমাদের হস্তগত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ। লেখক সেন মহাশয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম ঘুটিয়ারী শরীফে যান এবং পীর বড়খাঁ গাজীর প্রতি ভক্তিতে তিনি আপ্লুত হন। তারপরই তিনি এই গ্রন্থ রচনায় হাত দেন। কবে যে সে রচনা শেষ হয়েছিল তার কোন উল্লেখ নেই। তবে অনুমান করা যায় যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ বা দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়েছিল।

'গাজি-কালু-চম্পাবতী' কাহিনীতে দেখা যায় বড়খাঁ গাজীর জন্মস্থান বৈরাটনগর। 'মোবারক আলি শাহ্ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যানে' দেখা যায় তাঁর জন্মস্থান বেলে আদমপুর। 'বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী' গ্রন্থে দেখা যায় যে তিনি হজরত আবদুল্লাহ্ ওরফে সোন্দল রাজীর

পুত্র। হজরত সোন্দল, হজরত গোরাচাঁদ রাজীর নির্দ্দেশে বীরভূমে জায়গীর গ্রহণ করেন। সেখানেই মোবারক গাজীর জন্ম হয়। বৈরাটনগর যে কোথায় আজো তার হদিস পাওয়া যায় নি। বেলে আদমপুর চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। সেখান থেকেই তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। 'বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী' গ্রন্থে লিখিত আছে যে মোবারক গাজীর আস্তানা ঘুটিয়ারী শরীফে। অতএব মেদনমল্ল পরগণার বেলে আদমপুর বা ঘুটিয়ারী নামক গ্রাম থেকে তাঁর প্রকাশ ঘটেছিল তাতে সন্দেহ থাকতে না পারাই স্বাভাবিক।

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি রাজসুখ, সংসারসুখ ত্যাগ করে ফকির হয়ে যান। অল্পদিন পরেই তিনি চম্পাবতী নাম্নী কামিনীর আকর্ষণে এবং ধর্মপ্রচার আদর্শে ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বাঘ-সৈন্য পরিচালনা করে গাজী ব্রাহ্মণনগর অভিমুখে যাওয়ার পথে উত্তর চব্বিশ পরগণার চারঘাট গ্রামের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত যমুনা নদীর যেখানে তিনি পার হয়েছিলেন সেটি আজো 'বাঘঘাটা' নামে পরিচিত। অর্থাৎ মেদনমল্ল অঞ্চল থেকে আপনার বহিঃপ্রকাশ নিয়ে গাজী প্রথমে ব্রাহ্মণনগরে উপস্থিত হলেন। মাঝপথে তিনি কোথায় কোথায় অবস্থিতি করেছিলেন তা বলা যায় না। ব্রাহ্মণনগরের যুদ্ধে জয়লাভ করে চম্পাবতী, কামদেব ও কালু সমভিব্যাহারে গাজী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। প্রথম যে স্থান একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে চিহ্নিত হয়ে আছে সে স্থানের নাম লাব্‌সা। এই গ্রামে চম্পাবতী পরিত্যক্ত হন বা আত্মহত্যা করেন বা সেওড়া গাছে পরিণত হন (রূপকথা), বা এখান থেকে পলায়ন করে গণ রাজার আশ্রয়লাভ করেন। লাব্‌সা গ্রামটি খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত। এই গ্রাম আজিও চম্পাবতীর স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে বিদ্যমান। কামদেব ছিলেন মুকুট রাজার পুত্র। তিনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে গাজীর অনুগমন করেছিলেন,—কিন্তু লাব্‌সা গ্রামে উপনীত হয়ে ভগিনীর তাদৃশ মর্মন্তুদ ঘটনায় ব্যথিত চিত্তে গাজীর সঙ্গ ত্যাগ করেন। কামদেব লাব্‌সা গ্রাম থেকে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হন। প্রথমে তিনি বিশেষভাবে অবস্থিতি করেন বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত গাবর্ডা গ্রামে। সেখানে অধিক বিলম্ব না করে তিনি উত্তর পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হন এবং ইছামতী নদী পার হয়ে চারঘাট নামক গ্রামে এসে জায়গীর স্থাপন করেন। কোন কোন কাব্যে আছে যে

চম্পাবতী পুনর্জীবন লাভ করে গাজীর অনুগমন করে বৈরাটনগরে এসেছিলেন। কালু ও গাজীর সঙ্গে বৈরাটনগরে এসেছিলেন বলে কবির বর্ণনা আছে। কিন্তু চম্পাবতী প্রসঙ্গের পর রাজা মদন রায়ের প্রসঙ্গে এসে কালুর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কালুর স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত কালুতলা গ্রাম আছে। খুব সম্ভব লাব্‌সা থেকে তিনিও কিছু কালের জন্য গাজীর সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং এই গ্রামে এসে অবস্থিতি করেন। এখানে তাঁর নামে দরগাহ আছে। তাঁর নামানুসারে এই গ্রামের নামও হয় কালুতলা। কালুতলা বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত। লাব্‌সা থেকে কালুতলার দূরত্ব খুব বেশী নহে।

আপনজন একে একে ত্যাগ করায় গাজীর মনে বৈরাগ্য ভাব পুনরায় উদিত হয় এবং তা তীব্র আকার ধারণ করে। তখন তিনি উক্ত লাব্‌সা অঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পশ্চিমাভিমুখে ঘুটিয়ারীর দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তিনি যে যে স্থানে অবস্থিতি করেছিলেন তাদের কয়েকটি স্থান আজিও চিহ্নিত হয়ে আছে। তাদের মধ্যে বারাসত মহকুমার বারাসত থানার অন্তর্গত উলা এবং পাথরা–দাদপুর উল্লেখযোগ্য। উক্ত দুটি গ্রামে তাঁর নামাঙ্কিত নজরগাহ আছে। পাথরা-দাদপুর থেকে পশ্চিমাভিমুখে ঘুটিয়ারী বা বাঁশড়া বা বেলে আদমপুর অর্থাৎ মেদনমল্ল পরগণার ব্যবধান খুব বেশী নহে।

পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর অলৌকিক কীর্তিকলাপের উপর উপরোক্ত পুস্তকাদি ছাড়া কিছু গল্পকথা কোন কোন অঞ্চলে শোনা যায়। সেই গল্পকথার কয়েকটি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হল।

১। দরবেশ বড়খাঁ গাজী

উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত পাথরা নামক গ্রামে পীর বড়খাঁ গাজীর নামে যে নজরগাহটি আছে, সেখানে একটি পুকুর আছে। পুকুরটি পীরপুকুর নামে খ্যাত। গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলা। চারিদিকে আগুন বর্ষিত হচ্ছে। ঐ গ্রামের এক রাখাল বালক তার পালের গরুগুলিকে পীরপুকুরে জল খাওয়াতে নিয়ে এল। গরুগুলিকে পুকুরে নামিয়ে দিয়ে পুকুরের পরপারের দিকে তাকিয়ে সে বিস্মিত হয়ে যায়। পুকুর পাড়ের গাছের ছায়ায় লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে ঐ পুরুষটি কে? কি দারুণ লম্বা ঐ

লোকটি। গায়ের রং একেবারে দুধের মতন সাদা! সাদা ধব্‌ধবে আলখাল্লা তাঁর পরণে। ইনি কি তবে গল্পে শোনা সেই দরবেশ। রাখাল-বালকটি তার জীবনে এমন দৃশ্য দেখে নি। সে বিমোহিত হয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ ফিরে এল তার সম্বিৎ। পীরপুকুর থেকে তার বাড়ী খুব দূরে নয়। সে তীব্র বেগে ছুটে গেল বাড়ীতে। সবাইকে জানাল সে হাঁপাতে হাঁপাতে। কেউ বিশ্বাস করল, কেউ বা বিশ্বাস করল না। রাখাল বালক নাছোড়বান্দা হয়ে দু'একজনকে টেনে নিয়ে এল পীরপুকুরে। কিন্তু হায়! বালক অপ্রতিভ হয়ে দেখল—গাছের সে ছায়াটি আছে কিন্তু সেখানে কেউ নেই। বালকটিকে কেউ উপহাস করল,—কেউ বা উপহাস করল না। তারা বিস্মিত হল এবং বলল,—ইনিই পীর মোবারক বড়খাঁ গাজী। তিনি এখানকার নজরগাহে মাঝে মাঝে আসেন এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে স্থানান্তরে চলে যান।

২। গাজীর নামে ঝুটির শাস্তি

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ বারাসত-বসিরহাট অঞ্চলে 'ঝুটি' শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। ঝুটি কথাটি ঝড়েরই ভাব-বাহক। গ্রীষ্মের দিনে বিশেষ ভাবে দুপুরবেলা মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি হয়। এই ঝড়ে ধূলো-বালি উড়িয়ে এমন কি কখন কখন ঘর-বাড়ীর ক্ষতি সাধন করে। ঘূর্ণি ঝড় বা ঝুটি এতদ্ অঞ্চলের একটি প্রাকৃতিক ঘটনা।

একদিন দুপুরে প্রচণ্ডভাবে এক ঝুটি এল। সে ঝুটিকে সাধারণ লোকে অসাধারণ বা দৈব ঘটনা বলে মনে করে এবং সেই কারণেই যথেষ্ঠ সমীহও করে। কিন্তু, পাথরা দরগাহের সেবায়েত সোব্দল শাহজীর ভাইপো মহম্মদ ইলিয়াস শাহ্‌জী সে ঝুটিকে তাচ্ছিল্য জ্ঞানে বলল,—

ঝুটি এলে মুতে দেবো,
বামন এলে ছড়া দেবো।

এই কটি কথা উচ্চারণের পর 'ঝুটি'র সে কি রণমূর্তি। ধূলো-বালিতে তার সামনে প্রায় অন্ধকার করে ফেল্‌ল। প্রচণ্ডবেগে ঘুরপাক খেতে খেতে সে ঝুটি বাড়ীর সামনের এক মস্ত বড় পাটকাটির গাদার কাছে গেল এবং সে গাদাটি প্রায় পাঁচ-ছয় হাত উপরে উঠিয়ে নিয়ে ইলিয়াসের মাথার ওপর ফেলে আর কি! সোব্দল উপায়ান্তর না দেখে একান্ত মনে বড়খাঁ গাজীর নাম

স্মরণ করে বলল,—"হে গাজী! ইলিয়াসকে তুমি এ বিপদ থেকে রক্ষা কর।" ইত্যাদি।

অল্পক্ষণের মধ্যে ঝুটির বেগ প্রশমিত হল। দেখা গেল সেই পাটকাঠির গাদা ইলিয়াসের মাথার উপর পড়ল না,—ছড়িয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে গেল না,—যেখানকার গাদা সেখানেই এসে পড়ল। ইলিয়াস কোন আঘাত না পাওয়ায় পীর গাজীকে সেলাম জানিয়ে সোন্দল শাহ্‌জী ভাইপোর কাছে এলেন। ভাইপো তার অপরাধের কথা জানাল। সে প্রতিজ্ঞা করল—কখনও এমন কটূক্তি সে করবে না।

৩। ষোলবিঘা পীরোত্তর জমির কথা

পাথরা-গ্রামে পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর নামে একটি 'থান' আজো বিদ্যমান। সেই থান-সংলগ্ন প্রায় ষোল বিঘা জমি পীরের নামে উৎসর্গ করা আছে। কি ভাবে পীরোত্তর হয়েছিল তার চিত্তাকর্ষক এক লোককথা এতদ্‌অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

উক্ত পাথ্‌রা নজরগাহের বর্তমান খাদিম বা সেবায়েতের কোন এক পূর্ব্বপুরুষ এক রাতে স্বপ্ন দেখ্‌লেন যে কে একজন যেন বল্‌ছেন,—"কাল ভোরে ঐ দরগাহে আস্‌বে।" হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল, সমস্ত গা যেন হয়ে গেল পাষাণের মতন ভারী। পরদিন ভোরেই তিনি চলে এলেন আগাছা-পরিবেষ্টিত অশ্বথ গাছের তলায় অবস্থিত তথাকথিত দরগাহের অতি নিকটে। আর এক পাও তাঁর এগোবার উপায় নেই। কি সর্বনাশ! সামনে যে বাঘ। এ বাঘ, কে এক ফকির দরবেশকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছে। ভয়ে তো আগন্তুকের প্রাণ খাঁচা ছাড়া হওয়ার উপক্রম। তিনি পিছু হ'টে এসে পলায়ন করতে উদ্যত হতেই সেই ফকির তাঁকে গম্ভীর গলায় কাছে আসতে বল্‌লেন। আগন্তুকের তখন আর এক পাও ওঠাবার ক্ষমতা নেই। তিনি আস্তে আস্তে সেই ফকিরের কাছে এগিয়ে যেতে লাগলেন। কি আশ্চর্য্য! বাঘ তাঁকে কিছু বল্‌ল না। বাঘ-বেষ্টিত সেই ফকিরই ছিলেন পীর বড়খাঁ গাজী। গাজী সাহেব ঐ ব্যক্তিকে বল্‌লেন,—"এইখানে থান তৈরী করে তুমি ধূপ-বাতি দিয়ে জিয়ারত কর্‌বে। রাজী তো?" সে ব্যক্তি রাজী হলেন।

তৎক্ষণাৎ গাজী সাহেব উক্ত ব্যক্তিকে আপনার বাঘের পিঠে সওয়ার করে নিয়ে পশ্চিম দিকে চল্‌লেন। বেশ কিছু সময় পথ চলার পর তাঁরা কোন এক

জমিদারী সেরেস্তায় উপস্থিত হন। সেই জমিদারী সেরেস্তা থেকে নাকি ঐ ব্যক্তির নামে ষোল বিঘা জমি উক্ত স্থানে পীরোত্তর দেওয়া হয়।

৪। কে সেই ব্যক্তি

পাথরা-দাদপুরের ঘটনা। বড়খাঁ গাজীর নজরগাহের দক্ষিণ গা ঘেঁষে বারাসত—বসিরহাট রেল লাইন বিস্তৃত। নজরগাহের পূর্ব্বপাশে একটি ফটক আছে। ফটক-পাহারাওয়ালার রেলকুঠীও ঐ ফটক সংলগ্ন।

গত ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ফটকের পাহারাওয়ালা রেল কর্মীটির নাম শ্রীমদন মণ্ডল। সে দিন ছিল ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার। রাত্রি দ্বিপ্রহরের শেষের দিকে তাঁর কুঠীর দরজার সামনে এসে কে যেন নাম ধরে ডাকল। মদন মণ্ডল কুঠীরের বাইরে এলেন। এসেই দেখেন ধপধপে সাদা পোষাক পরা দীর্ঘকায় একটি লোক। মদন মণ্ডল কোন প্রশ্ন করার আগেই লোকটি তাঁকে অনুসরণ করতে বল্লেন। মদন মণ্ডলের মুখ থেকে বাক্য নিঃসরণ হল না। পশ্চাত অনুসরণ করে এসে উপস্থিত হলেন অশ্বত্থতলার সেই থানে। দীর্ঘকায় ব্যক্তি একজন দরবেশ বৈ আর কেউ নন। একটি মোমবাতি, একটি ধূপকাঠি এবং একটি দেশলাই বের করে তিনি মদন মণ্ডলের হাতে দিয়ে বল্লেন,—"থানের ওপর জ্বালিয়ে দাও।"

মদন মণ্ডল মন্ত্র মুগ্ধের মতন তাই করলেন। দরবেশ তাঁকে আরো বল্লেন,—"তুমি এখানে রোজ ধূপ-বাতি দেবে। তোমার মঙ্গল হবে।"

এই বলে তিনি অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মদন মণ্ডলের সমস্ত শরীর খুব ভারী বোধ হল। পরক্ষণে মনে মনে তিনি যেন কি এক অবর্ণনীয় মনোবল পেলেন। তিনি নীরবে ফিরে এলেন কুঠীতে। প্রশ্ন জাগ্‌ল মনে,—"কে সেই ব্যক্তি?"

পরদিন সকালে তিনি গ্রামবাসীগণের কাছে রাত্রের ঘটনাগুলি বল্লেন। তিনি সবেমাত্র কয়েক দিন এখানে কাজে যোগ দিয়েছেন,—এখানকার গাজীর থানের কথা তাঁর জানা ছিল না। গ্রামবাসীগণের কাছে শুনে তিনি সব বুঝতে পারলেন।

তিনি যতদিন সেখানে ছিলেন ততদিন নিয়মিতভাবে উক্ত নজরগাহে ধূপবাতি দিতেন। তিনি কয়েক রাতে ঐখানে বাঘের গর্জনও শুনেছিলেন।

৫। **বাঘ-ঘাটা**

ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুট রায়ের কারাগারে বন্দী গাজীর সহচর ভাই কালু। কালুর অপরাধ—তিনি গাজীর পক্ষে পাত্রী হিসাবে মুকুট রাজ-কন্যা চম্পাবতীর জন্য প্রস্তাব এনেছেন। কালুর বন্দী অবস্থা গাজীর গোচরে এসেছে। কালুর মুক্তির জন্য গাজী তখনই যাত্রা করলেন,—সংগে তাঁর বাঘ সৈন্য। পথিমধ্যে পড়ল যমুনা নদী। নদী পার হতে হবে। পাটনী এল। পাছে পাটনী বাঘ দেখে ভয় পায়, তাই আগে থাকৃতেই তিনি বাঘগুলিকে ভেড়ায় রূপান্তরিত করে রেখেছিলেন। পাটনী অবশ্য তাঁদেরকে পার করে দেয় কিন্তু পারানি হিসাবে ভেড়া চায়। পরিপুষ্ট ভেড়া দেখে ওর খুব লোভ হয়েছিল। গাজী তৎক্ষণাৎ দুটি ভেড়ারূপী বাঘ দিয়ে দেন। পাটনী তো মহা খুশী। বাড়ী নিয়ে সে খুব যত্ন করে গোয়ালে রেখে দিল। রাত্রে সে ভেড়াগুলি বাঘ হয়ে যায়।

ভেড়া দুটি দিয়ে কি একটা উপলক্ষ্যে ভাল একটা ভোজ দেবার আনন্দের কল্পনায় পাটনীর তো রাত্রে একরকম ভাল করে ঘুমই হল না। ভোর রাত্রে সে আর একবার ভেড়া দুটি দেখে আবার তৃপ্তি পাওয়ার আশায় গোয়ালের কাছে আসতেই চমকে উঠল। বাপরে এ যে বাঘ! পাটনীকে দেখে বাঘ দুটো গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই পাটনী দিল ছুট। এ্যায়সা ছুট যে পড়ি কি মরি! ভাগ্যে গোয়াল ঘরের দরজা বন্ধ ছিল না,—খোলাই ছিল। বাঘ দুটি দিল দৌড় লেজ পিঠে তুলে। গ্রামবাসীদের যারা ভোরে উঠেছিল তারা দুটো বাঘকে গ্রামের মধ্য দিয়ে ছুটতে দেখে হতভম্ব! দু'চারজন যুবক লাঠি-সোটা হাতে নিয়ে হৈ হৈ করে পিছু ধাওয়া করল। বাঘ দুটি ছুটে যমুনা নদীর ধারে এল এবং সাঁতার কেটে পার হয়ে চলে গেল উত্তর-পূর্বাভিমুখে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নগরের দিকে, যেদিকে গাজী গমন করেছিলেন। যেখান দিয়ে যমুনা নদী পার হয়ে গাজীর বাঘ দুটি গিয়েছিল, সেখানে পরবর্তীকালে মানুষ পারাপারের ঘাট হয়েছে। কিন্তু যেহেতু বাঘ পার হয়েছিল সেই হেতু এই ঘাটের নামকরণ হয়েছে বাঘ-ঘাটা।

———

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বড় পীর

পীর হজরত মহীউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রাজী, হজরত বড়পীর সাহেব নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি সৈয়দ আল্-হাসানী আল্-হোসাইনী নামেও বিখ্যাত। তিনি সকল অলির শ্রেষ্ঠ বলে গওসল আজম্ পীরানে পীর দস্তগীর নামে খ্যাত। তাঁকে কেবলমাত্র জিলানী নামেও অভিহিত করা হয়। ৪৭০ হিজরীর ১লা রমজান[৬৪] (ইংরাজী ১০৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে) মতান্তরে ৪৭১ হিজরীতে[৬৫] তিনি ইরানের জিলান জেলার নীপ নামক গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম হজরত আবু সালেহ্ মুসা জঙ্গী এবং মাতার নাম উম্মুল খায়ের ফাতেমা। তিনি পিতার দিকের ইমাম হাসান এবং মাতার দিকের ইমাম হোসেনের বংশসম্ভূত। ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন ছিলেন হজরত মুহাম্মদের কন্যা হজরত ফাতেমা যোহরার পুত্র। দশ বৎসর বয়সেই তিনি অলির সম্মান পান। আঠারো বছর বয়স পর্য্যন্ত তিনি কঠোর দারিদ্রের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস করে বাগদাদে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন।

হজরত বড়পীর সাহেব কাদেরীয়া তরীকা-পন্থী সুফী মতবাদের প্রবর্ত্তক। কথিত আছে তাঁর প্রভুত শক্তি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অপরিসীম গুণগরিমা ছিল। তাঁর সমগ্র জীবনই অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপে পরিপূর্ণ। তিনি প্রায় একশত বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তাঁর মহান এন্তেকাল বা মৃত্যুর তারিখ ৫৬১ হিজরীর ১১ই রবিউল আউয়াল (ইংরাজী ১১৬৬ খৃষ্টাব্দ)।

হজরত বড়পীর সাহেবের মাজার বোগদাদ শহরে অবস্থিত। তিনি সম্ভবতঃ বঙ্গে আগমন করেন নি। তবু এদেশে কয়েকস্থানে তাঁর নামে কাল্পনিক দরগাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর বংশধর কাদেরীয়া তরিকার সাধক পীর আব্দুল কুদ্দুশ্ ওরফে পীর হজরত শাহ্ মখদুম্ রূপোশ ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ থেকে রাজশাহী জেলায় ইসলাম ধর্মপ্রচার করতে এসেছিলেন।[৬১]

আঠারো বৎসর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদে গমন

করেন এবং সেখানে ভাষাতত্ত্ব ও মুসলিম আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি বাগদাদের তদানীন্তন বিখ্যাত সূফী আবুল খইর মোহাম্মদ বিন্ মুসলিম দরবাসের (মৃত্যু ১১৩১ খৃষ্টাব্দে) নিকট তসাউফের শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর বাগদাদের বিখ্যাত হানবলী মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ কাজী আবু সা'দ মোবারক আল্-মুখররমীর নিকট থেকে 'খিরকা' বা সূফীদের বিশিষ্ট পরিধান লাভ করেন। হযরত আবদুল কাদের জিলানী ধর্ম বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাদের মধ্যে (১) আল্-গুনইয়া-লি-তালিবি তরীক আল্-হক্ক, (২) আল্-ফতহুর রব্বানী, (৩) ফুতুহ-উল-খয়রাত, (৪) জলা-উল-খাতির, (৫) হিজব-বশায়ের-উল-খয়ারাত ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই কিতাবগুলিতে হজরত আবদুল কাদের আইনবিদ্ হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বাগদাদের হানবলী মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদও অলঙ্কৃত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি খানকারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাদ্রাসা এবং খানকাহ উভয়ই ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলগণ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার সময় বিনষ্ট হয়।

কাদেরীয়া তরীকা হযরত আবদুল কাদেরের জীবদ্দশাতেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর শিষ্যরা এই তরীকা সারা মুসলিম জাহানে বিস্তার করে। বর্তমানে আরব, তুরস্ক, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য মুসলিম দেশ এবং পাক-ভারত উপমহাদেশ ইত্যাদি সকল এলাকায় কাদেরীয়া তরীকা অত্যন্ত জনপ্রিয়। কাদেরী তরীকার সুফীরা বাগদাদে হযরত আবদুল কাদের জিলানীর দরগাহের খাদেমকে তাঁদের আধ্যাত্মিক নেতা রূপে মান্য করে। বিভিন্ন স্থানের কাদেরী সূফীরা বিভিন্ন জিনিষকে তাঁদের তরীকার প্রতীকরূপে ব্যবহার করেন। যেমন তুরস্কের সূফীরা সবুজ গোলাপ ফুলকে প্রতীক রূপে গ্রহণ করেন। কোন একজন মুরীদ এই তরীকা গ্রহণ করতে চাইলে এক বৎসর শিষ্যত্ব গ্রহণের পরে তাঁকে একটি ছোট পশমী টুপী আনতে হয়। সূফী বা মুরশীদ এই টুপীর সঙ্গে আঠারো পাপ্ড়ি-বিশিষ্ট একটি সবুজ গোলাপ ফুল যুক্ত করে দেন। এই টুপীকে তাজ বলা হয়। তাঁরা সবুজ রঙকে পছন্দ করলেও অন্যান্য রঙ ব্যবহার করতে তাঁদের বিশেষ আপত্তি নেই। মিশরের কাদেরী সূফীরা সাদা রঙ পছন্দ করেন। পাক-ভারত উপমহাদেশে হযরত আবদুল কাদের জিলানীর স্মরণে রবিউস্-সানি মাসের এগার তারিখে উৎসব পালন করা হয়। পাক-ভারতের বিভিন্ন

স্থানে তাঁর নকল দরগাহ তৈরী করা হয় এবং সেখানে স্থানীয় জনসাধারণ নিয়মিত শিরনী মানত করে থাকে। কাদেরীয়া তরীকার সুফীদের সাধনা পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রচলিত আছে এবং সকলেই দাবী করেন যে, তাঁদের পদ্ধতিই হজরত আবদুল কাদের কর্তৃক আদেশকৃত। হজরত আবদুল কাদের রচিত 'ফুয়ুদত-আল-রব্বাণীয়া'-গ্রন্থে দেখা যায় যে, কোন লোক কাদেরীয়া তরীকা গ্রহণ করতে চাইলে তাঁকে দিনে রোজা রাখতে এবং রাত্রে আল্লাহর উপাসনায় মশগুল থাকতে আদেশ দেওয়া আছে। এই অবস্থায় তাঁকে চল্লিশ দিন থাকতে হয়। এই সময়ে যদি কেউ এসে তাঁকে বলে, "আমি খোদা," তার উত্তর দিতে হবে যে,—"না, তুমি আল্লাহ্‌র মধ্যে।" যদি শিক্ষানবিশের সত্যতা প্রমাণের জন্যই এই মূর্ত্তি এসে থাকে তবে তা অদৃশ্য হয়ে যাবে, আর যদি অদৃশ্য না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, তাঁর শিক্ষানবিশীর কাল শেষ হয়েছে এবং তিনি কাদেরীয়া তরীকার আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত বারাসত থানাধীন খামারপাড়া—খাসপুর গ্রামে অবস্থিত পীর হজরত শফীকুল আলম রাজী মতান্তরে পীর ছেকু দেওয়ান রাজীর যে দরগাহ আছে, স্থানীয় জনসাধারণ তাকে হজরত আবদুল কাদের জিলানী ওরফে হজরত বড়পীর সাহেবের কাল্পনিক দরগাহ বলে মনে করেন। অবশ্য একই জায়গায় দুই পীরের দরগাহ থাকার কথা গৌরমোহন সেন রচিত "হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ্‌ সাহেবের জীবন-চরিতাখ্যান" গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঘুটিয়ারী শরীফে হজরত বড়পীর এবং পীর বড খাঁ গাজীর দরগাহ অবস্থিত আছে। জনসাধারণ খামারপাড়া-খাসপুরের দরগাহের সেবায়েত। প্রতি বৎসর ২১শে মাঘ তারিখে ওরস এবং প্রায় দশ দিনের মেলায় গড়ে হাজার লোকের সমাবেশ হয়। এই দরগাহ সম্পর্কে আরো বিবরণ পীর হজরত শফীকুল আলম রাজী শীর্ষক আলোচনায় প্রদত্ত হয়েছে।

বারাসত মহকুমার আমডাঙ্গা থানার অন্তর্গত জিরাট নামক গ্রামে হজরত বড়পীর সাহেবের নামে একটি কাল্পনিক দরগাহ আছে। এই দরগাহের বর্ত্তমান (১৯৭০) সেবায়েতের নাম মুহম্মদ ক্ষ্যাপাচাঁদ শাহ্‌জী, পিতা মরহুম

পাহাড় শাহ্‌জী। প্রতি বৎসর ২৫শে ফাল্গুন তারিখে ওরস হয় এবং তিন-দিনের মেলা বসে। এই মেলায় গড় জমায়েত প্রায় তিন-চার শত জন। এখানকার পীরোত্তর জমির পরিমাণ প্রায় দুই বিঘা। পূর্ব্বে এই মেলায় পীরের গান, পুতুল নাচ, যাত্রা প্রভৃতি হত বলে জানা যায়। সেবায়েতরা কিছু কিছু অতিথি সৎকার করে থাকেন এবং প্রত্যহ ধূপ-বাতি প্রদান করেন। এখানকার দরগাহে যথারীতি শিরনি, হাজত ও মানত প্রদত্ত হয়ে থাকে।

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামে হজরত বড়পীর সাহেবের একটি কাল্পনিক দরগাহ আছে। বর্ত্তমানে ঐ দরগাহের সেবায়েত হলেন জনসাধারণ। ইতিপূর্ব্বে তার সেবায়েত ছিলেন মরহুম অন্ন ও মরহুম পন্ন নাম্নী দু'জন মুসলমান মহিলা। ঐ দরগাহটি বুড়ীর দরগাহ নামেও পরিচিত। দরগাহ সংলগ্ন জমির পরিমাণ প্রায় ২।৩ বিঘা। মাটির দেওয়াল আর খড়ের চালে প্রস্তুত দরগাহের সামনেব ময়দানে প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর দিনে মেলা বসে। মেলা একাধিক দিন চলে—তাতে কয়েক শত লোকের সমাবেশ হয়। ভক্ত সাধারণ এখানে শিরনি, হাজত ও মানত দিয়ে থাকেন। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয়।

হাড়োয়া থানার শঙ্করপুর গ্রামে অবস্থিত বড় পীরের কাল্পনিক দরগাহে প্রতি বৎসর ২৫শে মাঘ তারিখে ওরস হয় এবং একদিনের মেলা বসে। পূর্ব্বে একাধিক দিনের মেলা বসত। এই দরগাহের সেবায়েত হলেন মরহুম দুদু ফকিরের বংশধরগণ। পূর্ব্বে এখানকার মেলা উপলক্ষ্যে ঘোড়-দৌড়ের প্রতিযোগিতা হত। সেবায়েতগণ প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে ধূপ-বাতি প্রদান করেন।

বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত আটলিয়া গ্রামে একটি কাল্পনিক দরগাহ আছে। এই দরগাহ্‌ সৃষ্টির একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে। ইতিহাসটি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ—

আটলিয়া গ্রামে বিশ্বম্ভরপ্রসন্ন দাস নামে রুহিদাস সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির বসতি ছিল। ফুলমতী দাস তাঁর পত্নী। সরষে ফুল তুলতে গিয়ে সরষে খেতে একবার ফুলমতীর ওপর নাকি দৈব 'ভর' হয়। তিনি সেখানে শ্রীশ্রীতারক-নাথের নামে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করে পূজা করার স্বপ্নাদেশ পান। তিনি সেই আদেশ মতন একটি 'থান' স্থাপন করে সেখানে পূজা দিতে আরম্ভ

করেন। আশ-পাশের অনেক ভক্ত সেই পূজা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে থাকেন। কথিত আছে অনেকে সেখানকার ফুল-মাটি ব্যবহার করে রোগে নিরাময় লাভ করেন। ফুলমতীর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মঙ্গল দাস সেই থানে যথারীতি পূজা দিতেন। মঙ্গল দাসের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী জীবিকা নির্ব্বাহ করতে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং জীবিকার সন্ধানে নাবালক সন্তানগণকে নিয়ে রুদ্রপুর নামক গ্রামে চলে যান। গ্রাম ত্যাগের পূর্বে মঙ্গলের স্ত্রী সেই শ্রীশ্রীতারকনাথের স্থানটি দেখাশুনা করার জন্য মেসিয়া গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ এলাহি বক্স নামক এক সজ্জন ফকিরের হাতে ভার অর্পণ করেন। এলাহি বক্স সাহেব সানন্দে সেই দায়িত্ব নিয়ে পরবর্ত্তীকালে তিনি এই 'থান'-কে বড়পীর সাহেবের থান বলে প্রচার করেন। কালক্রমে সেই থানের উপর ইটের তৈয়ারী সৌধ নির্মিত হয়েছে। এইটিই অধুনা হজরত বড়পীর সাহেবের কাল্পনিক দরগাহ নামে প্রসিদ্ধ।

মোহাম্মদ এলাহি বক্স ফকিরের কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। মোহাম্মদ মেছের আলি নামক পালক পুত্র তাঁর উত্তরাধিকারী হন। এই মেছের আলির বাড়ী ছিল 'বেনা' নামক গ্রামে। মেছের আলির পালক পুত্র হওয়ার একটি গল্প আছে। লোককথা-পর্ব্বে আমরা তার উল্লেখ করব।

আটলিয়া গ্রামের কাল্পনিক দরগাহ্-সৌধটি বর্ত্তমানে (১৩৬৩) মাত্র তিন শতক জমির উপর অবস্থিত। মুহম্মদ মেছের আলি শাহ্‌জীর বংশধরগণ উক্ত দরগাহের সেবায়েত রূপে বিদ্যমান। তাঁরা সেখানে প্রত্যহ ধূপ-বাতি দেন। হজরত বড়পীরের নামে রোগ নিরাময়ের জন্য তেল, ওষুধ ও কবচ তাঁরা ভক্ত সাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। অবশ্য এজন্য দাতা নামমাত্র মূল্যও গ্রহণ করেন। উক্ত দরগাহে প্রতি বৎসর আটাশে কার্ত্তিক তারিখে ওরস এবং পরে দুই সপ্তাহের মেলা বসে। প্রথম দিনের মেলায় প্রথম শিরনি ও হাজত কেবলমাত্র হিন্দু ভক্তগণই প্রদান করেন, দ্বিতীয় দিনে শিরনি ও হাজত কেবলমাত্র মুসলমান ভক্তগণ দেন; তৃতীয় দিন থেকে উক্ত নিয়মের কোন কঠোরতা থাকে না। সেই মেলায় গড়ে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। মেলায় যাদুখেলা, সার্কাস বসে এবং যাত্রাগান হয়। নারিকেল-বেড়িয়ার কচি মণ্ডল পীরালি গান করতেন। কাদপুরের মাদার গাইন নিজে গান রচনা করে মাণিক পীর, মাদার পীর ও পীর ঠাকুরবরের গান গাইতেন।

তাছাড়া কাওয়ালী গান গাওয়া হত। ভক্তগণ মনোবাসনা পূরণের আশায় দরগাহের গায়ে ইট বেঁধে থাকেন।

হজরত বড়পীর সাহেবের জীবনী ও আশ্চর্য্য কেরামত বিষয়ক কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—

১. মৌলভী আবদুল মজিদ রচিত হজরত বড়পীরের জীবনী।

২. মৌলভী আজহার আলীর গ্রন্থের নাম হজরত বড়পীরের জীবনী ও আশ্চর্য্য কেরামত।

৩. কাজী আশ্‌রাফ আলী রচিত গ্রন্থের নাম গওস উল আজম বা হজরত বড়পীরের জীবনী।

৪. মুনশী জোনাব আলী মরহুম রচিত হজরত বড়পীরের গুণাবলী নামক পুস্তকখানি আমার হস্তগত হয়নি। কৃষ্ণহরি দাস বিরচিত বড়সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি নামক কাব্যের কভার পৃষ্ঠায় এই পুস্তকের নামোল্লেখ আছে।

মৌলভী আবদুল মজিদ সাহেবের জীবনী অজ্ঞাত। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে আত্মপরিচয় পাওয়া যায় না। উক্ত গ্রন্থের প্রকাশকের নাম কমরুদ্দিন আহ্‌ম্মদ। তাজমহল বুক ডিপো, ১১ সি, ম্যাকলিওড স্ট্রীট কলিকাতা-১৬ হইতে প্রকাশিত হয়েছিল। মূল্য মাত্র তিন টাকা। ঐ পুস্তকের মুদ্রকের নাম বিভূতিভূষণ কয়োড়ী। কয়োড়ী প্রেস, ২৭ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬।

পুস্তকখানি ৭"×৪½" আকৃতি বিশিষ্ট। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৯। আভাস বা ভূমিকা, সূচীপত্র ও পরিশিষ্ট ব্যতীত বড়পীর সাহেবের জীবনী-অংশ নিম্নলিখিত প্রধান শিরোনামায় বিভক্ত করা হয়েছে ঃ—

১। প্রাথমিক যুগে ইসলাম
২। প্রতিক্রিয়া
৩। পিতৃ ও মাতৃকুলের পরিচয়
৪। ক্ষমার অদ্ভুত নিদর্শন
৫। হজরত বড়পীরের জন্ম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী
৬। ,, ,, বাল্য জীবনের কেরামত

৭। বাল্যের শিক্ষা-দীক্ষা
৮। সুদূরের আহ্বান
৯। দুর্গম পথের যাত্রী
১০। বাগদাদের শিক্ষা-পীঠে
১১। বাগদাদে দুর্ভিক্ষ
১২। বড়পীর সাহেবের মহানুভবতা
১৩। শিক্ষা ও সাধনা
১৪। সাধনা ও সিদ্ধি
১৫। শয়তানের ধোকা
১৬। হজরত আবু সৈয়দ মোকাররমী (রঃ)
১৭। কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ও হজরতের মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া,
১৮। নূতন কর্মক্ষেত্রের নব পরিবেশ
১৯। পথের সন্ধান
২০। খলিফার শিরশ্চেদ
২১। ভক্তের অব্যক্ত মনোভব অনুসরণ
২২। বড়পীর সাহেবের দূর-ভেদী কণ্ঠ
২৩। হজরত বড়পীর সাহেবের মুরীদ ও ছাত্রমণ্ডলী
২৪। ,, ,, ,, নৈমিত্তিক কর্মসূচী
২৫। ,, ,, ,, সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহধারণ
২৬। মুরিদানের প্রতি হজরত বড়পীর সাহেবের স্নেহ-মমতা
২৭। আলি আল্লা দের অবদান
২৮। হজরত বড়পীর সাহেবের বিভিন্ন কেরামত
২৯। সংসার জীবন ও পরিবার-পরিজন
৩০। ওফাত

মৌলভী আবদুল মজিদ সাহেব পুস্তকখানি আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যে রচনা করেছেন। কিছু কিছু আরবী ও ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হলেও গ্রন্থের ভাষা সরল এবং প্রাঞ্জল। গ্রন্থে তার রচনাকাল লিখিত নেই।

এই গ্রন্থে আল্লাহ্‌তালায় অপার মহিমা হজরত বড়পীর সাহেবের মাহাত্ম্যপূর্ণ জীবন-আলেখ্যের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। গ্রন্থকার ভূমিকার একস্থানে লিখেছেন—"বৎসরের পর বৎসর হজরত বড়পীর সাহেব আল্লার

এবাদতে আহার, নিদ্রা, আরাম, আয়েশ ত্যাগ করিয়া যে কঠোর ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে এই অনিবার্য্য সাফল্যের জন্য, কাহারও সে প্রশ্ন করিবারও সুযোগ থাকে না। তাঁহার জীবনই তাঁহার সাফল্যের, শ্রেষ্ঠত্বের, অলৌকিকত্বের স্বাক্ষর। আমাদের লেখা পাঠকগণের জীবনে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়া সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারিলেও শ্রম এবং অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব।"

মৌলবী আজহার আলী সাহেবের নিবাস ছিল খলিসানি নামক গ্রামে। তাঁর আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর পুস্তকের নাম হজরত বড়পীরের জীবনী। মুদ্রিত এই পুস্তকের আকৃতি ৭'×৫" এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৬। আভাস ও সূচীপত্র ব্যতীত হজরত বড়পীর সাহেবের জীবন-কথা ও তাঁর অলৌকিক কীর্ত্তির বিবরণ অনেকগুলি শিরোনামায় বিভক্ত। তার প্রথম প্রকাশ কবে হয়েছিল জানা যায় না। ত্রয়োদশ মুদ্রনকাল সন ১৩৭৩ সাল বলে উল্লেখ আছে। তার দ্বিতীয় সংস্করণ কবিবর শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন সাহেব কর্ত্তৃক সংশোধিত হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। গ্রন্থারম্ভে হজরত মাওলানা শাহ্ সুফী হাজী মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব কর্ত্তৃক সমালোচনা প্রদত্ত হয়েছে। তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পুস্তকের প্রকাশক মদিনা বুক ডিপো। ১৮, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-১। মূল্য ৩ টাকা ৫০ পয়সা। পুস্তকের শিরোনামা পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

আউলিয়া শিরোমনি যিনি বড়পীর
শুন তাঁর কথা যত আমীর ফকীর।

এই গ্রন্থে কিছু আরবী-ফারসী শব্দ থাকা সত্ত্বেও বেশ সরল ও প্রাঞ্জল গদ্যভাষা সুখপাঠ্য হয়েছে। এতে আল্লাহ্তালা-মাহাত্ম্য হজরত বড়পীর মাহাত্ম্য-কথা প্রচারের মাধ্যমে প্রচারিত বলে অনুভব করা যায়। লেখক আভাসে লিখেছেন,—"ইহা পাঠে পাঠক উপকৃত ও পরিতুষ্ট হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।"

কাজী আশরাফ আলীর পরিচয় দুষ্প্রাপ্য। তাঁর পুস্তকের নাম গওসউল আজম বা হজরত বড়পীরের জীবনী। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪। মুখবন্ধ, সূচীপত্র ও জীবনী এই তিনটি প্রধান অঙ্গে বিভক্ত। জীবনী অংশ ৮টি

পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থের শেষে বড়পীর সাহেবের মাহাত্ম্য জ্ঞাপক তিনটি কবিতা আছে। ইহা কবে প্রথম রচিত হয়েছিল তা জানা যায় না। চতুর্থ সংস্করণ খুব সম্ভব ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক মোঃ নুরুল ইসলাম 'ওসমানিয়া' লাইব্রেরী, ৩০ নং মদন-মোহন বর্ম্মন ষ্ট্রীট, মেছুয়া বাজার, কলিকাতা-৭। মূল্য ৩ টাকা ৫০ পয়সা।

আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যে রচিত পুস্তকখানি সুখপাঠ্য। কিছু কিছু আরবী-ফারসী শব্দ থাকা সত্ত্বেও ভাষা বেশ সরল ও প্রাঞ্জল। হজরত বড়পীর সাহেবের মাহাত্ম্য বিবৃত্তির মাধ্যমে আল্লাহ্‌তালার অসীম মাহাত্ম্যকথা প্রচারিত হয়েছে। মুখবন্ধে লেখক লিখেছেন,—"বাজারে হজরত বড়পীর সাহেবের যে সব জীবনী চলতি আছে তাহাতে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, সব সময়ে গ্রন্থকার ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষা করেন নাই এবং মনগড়া কাহিনী দ্বারা উক্ত পুস্তকগুলি ভরিয়া রাখিয়াছেন। ইহা পাঠকদেরকে বিভ্রান্ত করিবে এই ভয়ে আমরা আমাদের পুস্তকখানি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যতার উপর ভিত্তি করিয়া প্রণয়ন করিলাম। ইহা পাঠে পাঠক পরিতুষ্ট এবং উপকৃত হইলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব।"

হজরত বড়পীর সাহেবের জীবতকাল খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দী। তাঁর জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় কবে প্রথম রচিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। আনুমানিক বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে এইরূপ জীবনী-গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়েছে। হজরত বড়পীর সাহেবের অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ বিষয়ক অসংখ্য লোককথা আছে। তার কয়েকটি মাত্র উপরোক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। লোককথাগুলির শিরোনামাসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে প্রদত্ত হল :—

ক। মৌলভী আবদুল মজিদ সাহেব বিরচিত হজরত বড়পীরের জীবনী নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ লোককথা সমূহের তালিকা :—

১। অনিবার্য্য মৃত্যু হইতে রক্ষা

২। তাইগ্রীস নদীর উপর দিয়া পদব্রজে ভ্রমণ

৩। তোড়াবন্দী মুদ্রা হইতে রক্তপাত

৪। যোজনের পথ নিমেষে গমন

৫। রুহানী শক্তিতে ডাকাতদল নিহত

৬। হজরতের প্রার্থনায় বর্ষণ বন্ধ
৭। " " উদরী রোগের উপশম
৮। মোবারক পীরহানের বরকত
৯। নিঃসন্তানের সন্তানলাভ
১০। নিজ সন্তান অপরকে দান
১১। তাইগ্রীসের বন্যা প্রতিরোধ
১২। কেতাব পরিবর্ত্তন
১৩। জেনের হস্ত হইতে বালিকা উদ্ধার
১৪। জ্বর ব্যাধিকে দূরীভূত হইবার আদেশ
১৫। আর একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা
১৬। পায়রা ও কুমীর পাখীর কাহিনী

খ। মৌলবী আজহার আলী প্রণীত হজরত বড়পীরের জীবনী ও আশ্চর্য্য কেরামত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ লোককথাসমূহের শিরোনামা ঃ—

১৭। গর্ভে থাকিয়া ব্যাঘ্ররূপে লম্পট সংহার
১৮। বড়পীর সাহেবের নিকট দস্যুদের দীক্ষাগ্রহণ
১৯। ওয়াজের সভায় জনৈক স্ত্রীলোকের রুমাল অদৃশ্য
২০। স্বপ্নে হজরত আয়েসা সিদ্দিকার স্তন্যদুগ্ধ পান
২১। হজরত রসুল (দঃ)কে স্বপ্নে দর্শন
২২। শূন্যে ভ্রমণকারী এক সাধুপুরুষের শাস্তি
২৩। অলী হইবার নিদর্শন
২৪। ভাজা ডিম হইতে বাচ্চা বাহির
২৫। সর্পরূপে এক দৈত্যের ইসলাম ধর্মগ্রহণ
২৬। এক ব্যক্তির জীবতকাল ঈসা নবীর আগমনকাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত
২৭। চোর হল কোতব
২৮। বড়পীরের কুকুর কর্ত্তৃক তপস্বীর ব্যাঘ্র সংহার
২৯। খৃষ্টান দর্জ্জির ইসলাম গ্রহণ
৩০। ইমনবাসী খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণ
৩১। বড়পীরের প্রস্রাব দর্শনে চারি শত ইহুদীর ইসলাম গ্রহণ
৩২। খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক

৩৩। স্বপ্নযোগে ডাকাতের হাত থেকে সওদাগরের উদ্ধার
৩৪। খড়ম নিক্ষেপে দস্যু সংহার ও সওদাগর রক্ষা
৩৫। রমণীর সতীত্ব রক্ষা
৩৬। বড়পীরের নিকট দোয়া শিখিয়া দৈত্যের প্রাণ বধ
৩৭। কুমরী পাখীর কথা ও পায়রার ডিম
৩৮। স্বর্পরূপী জ্বেন (প্রেতাত্মা) হত্যা করে ভৃত্য বন্দী
৩৯। দৈব কর্ত্তৃক শয়তান প্রহৃত
৪০। নিমজ্জিত তরীর মৃত বরযাত্রী জীবিত
৪১। বড়পীর সাহেবের উপর জ্বেন জাতির আধিপত্য
৪২। নামের তাসিরে জ্বেন ও শায়াতিনের কুদৃষ্টি দূর
৪৩। নজদের বাদশার শাস্তিভোগ
৪৪। পীর শেখ ছানয়ান (রঃ)-এর দুর্ভোগ
৪৫। „ „ „ সুরা পানে ব্যস্ত
৪৬। নামের গুনে বালকের রোগ মুক্তি
৪৭। বাগদাদ শহরের কলেরা বিনাশ
৪৮। জনৈক স্ত্রীলোকের মৃত সাত সন্তান পুনর্জ্জীবিত
৪৯। মোরগ খাইয়া পুনরায় তাহার জীবনদান
৫০। পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ ঘর্ষণে পুত্রলাভ
৫১। হজরত সাহাবুদ্দীনের জীবন বৃত্তান্ত
৫২। বিশ জন স্ত্রীলোকের পুরুষ অঙ্গ প্রাপ্তি
৫৩। জনৈক ব্যক্তিকে সাধুত্ব প্রদান
৫৪। খোদাভক্ত প্রেমোন্মত্ত সাধুপুরুষ
৫৫। ফকিরী কাড়িয়া লওয়া
৫৬। মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি ও বক্তিয়ার কাকীর সামার বিবরণ
৫৭। বাগদাদের বাদশাকে স্বর্গীয় ফল ভক্ষণ করিতে দান
৫৮। স্বর্ণমোহর রক্তময়
৫৯। বড়পীরের দান-বস্ত্র পঞ্চাশ বছরেও অপরিবর্ত্তিত
৬০। শয়তানের চাতুরী
৬১। একদিনে সতেরো স্থানে এফতার
৬২। শুষ্ক বৃক্ষে ফল

৬৩। এবাদত ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ
৬৪। জল-জন্তুগণকে গুপ্ততত্ত্ব শিক্ষাদান
৬৫। বড়পীর সাহেবের আরবী প্রার্থনা
৬৬। ধ্যানযোগে খোদা দর্শন
৬৭। বড়পীর সাহেবের দিকে সকলের অন্তঃকরণ
৬৮। বড়পীরের হাম্বলি মজহাব ত্যাগের ইচ্ছা
৬৯। হাম্বলি এমামের জিয়ারত
৭০। বড়পীরের সহিত এমাম আবু হানিফার সাক্ষাতকার
৭১। বৃক্ষ হইতে আলোক প্রদান
৭২। মদিনায় রসুলের সমাধি জিয়ারত
৭৩। দোজখে পাখীদের শাস্তি দর্শন
৭৪। পীরভক্ত হিন্দুর শব শ্মশানে পুড়িল না
৭৫। মহর্ষি নিজামুদ্দীনের মশায়েখ নাম প্রাপ্তি
৭৬। সভায় হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর আগমন
৭৭। সাধুদিগের স্কন্ধে পীর-পদ স্থাপন
৭৮। জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার প্রবচন
৭৯। গুনের ব্যাখ্যা
৮০। পৃথিবীর চাতুরী
৮১। বড়পীরের পরিচ্ছদের বিবরণ
৮২। „ আহার্য্যের বিবরণ
৮৩। „ তপস্যার বিবরণ
৮৪। মনকের নকির বন্দী
৮৫। কবর হইতে উঠিয়া তিনশত জনকে মুরিদ করণ
৮৬। মহাপাপীর উদ্ধার
৮৭। গুপ্তবিদ্যা বিনষ্ট
৮৮। নবাবের নবাবী নষ্ট
৮৯। শিশুকালে রোজা
৯০। দৈববাণী

উক্ত গ্রন্থের প্রায় সমগ্র রচনাই হজরত বড়পীর সাহেবের অলৌকিক কীর্ত্তি-কথায় পূর্ণ। তার মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে।

কাজী আশরাফ আলী সাহেব প্রণীত পুস্তকে লিখিত অনুরূপ বিশেষ লোককথাগুলির শিরোনামা এখানে প্রদত্ত হল। তবে যে লোককথা অন্যান্য পুস্তকে আছে সেগুলির আর পুনরুল্লেখ কথা হল না। বলা বাহুল্য, লোক-কথাগুলি বারংবার বলাতেও মূল বক্তব্যের কোন পার্থক্য না থাকাই বাঞ্ছনীয়, —কিন্তু সকলে সর্বত্র এ নিয়ম মেনে চলেন না। এখানে আমরা মূল বক্তব্য অপরিবর্ত্তিত আছে বলেই ধরে নিয়েছি।

৯১। বড়পীর সাহেবের মজলিসে অদৃশ্য আত্মার আগমন
৯২। পবিত্র কদম ওলীর গ্রীবাদেশে
৯৩। অসাধারণ বাগ্মী
৯৪। বিজ্ঞান ও তৎকালীন প্রভাব
৯৫। বৃদ্ধ বাদ্যকরের সদ্‌গতি লাভ
৯৬। আল্লাহ্‌র রহমত ধারা
৯৭। নির্ভীক প্রতিবাদ
৯৮। কুচক্রী শয়তান
৯৯। শেষ পরিণাম
১০০। অপূর্ব্ব ক্ষমা
১০১। আগামী মাসের সংবাদাদি
১০২। নামাজ পাঠ
১০৩। খলিফার অত্যাচার লব্ধ অর্থ
১০৪। এক ব্যক্তির সত্য ঘটনা বর্ণনা
১০৫। আজীবনের খাদ্য
১০৬। একটি চিলের কাহিনী
১০৭। অদ্ভুত শিক্ষাদান
১০৮। অজ্ঞাত রহস্যোদ্ঘাটন
১০৯। হাজীর সৌভাগ্য লাভ
১১০। তকদিরের লিখন পরিবর্ত্তন
১১১। জন্মান্ধ ও খঞ্জ বালকের আরোগ্যলাভ
১১২। একদল শিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ
১১৩। কামেল যুবকের ক্ষমা প্রাপ্তি
১১৪। সাধু ব্যক্তিদের বশ্যতা স্বীকার

১১৫। দরবেশের দুর্গতি

১১৬। অধিক রাত্রির বিস্ময়কর ঘটনা

১১৭। বন্যার স্রোতের অদ্ভুত কীর্ত্তি

১১৮। কবুতরের কথায় দিব্যজ্ঞান লাভ

১১৯। অসঙ্গত দাবীদারের মৃত্যু

১২০। স্ত্রীনের ইসলাম ধর্মগ্রহণ

১২১। লাঠি হইতে আলো বিচ্ছুরণ

১২২। দার্শনিক যুবকের ধর্মপথে আগমন

১২৩। হাবসী বৃদ্ধার সহিত বড়পীরের সাক্ষাত

১২৪। খাদেমের দুর্গতি

১২৫। বিদ্যা ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্যই হয় না

১২৬। বহুলোকের প্রাণ রক্ষা

১২৭। মূষিকের শাস্তি

১২৮। দানশীলতার নিদর্শন

১২৯। পাঠ্য জীবনের একটি ঘটনা

১৩০। বৃদ্ধার ক্লেশ লাঘব

১৩১। এক ব্যক্তির পুত্র লাভ

১৩২। বাদশার শাস্তিভোগ

১৩৩। ভৃত্যের কাহিনী

বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত আটলিয়া গ্রামে হজরত বড়পীর সাহেবের যে কাল্পনিক দরগাহ আছে তার উৎপত্তি এবং দরগাহের সেবায়েত ফকির বংশের উৎপত্তি বিষয়ক লোককথা সেই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। দরগাহ উৎপত্তির কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় লোককথাটি লিপিবদ্ধ করা হল।

ক। আটলিয়ার ফকির বংশের উৎপত্তি ঃ—

বালক মেছের আলি। কি এক কঠিন রোগে সে আক্রান্ত হয়েছে। বাঁচবার কোন আশা নেই। কত বৈদ্য কত ডাক্তার দেখানো হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই আরোগ্য হয় নি। মেছের আলির বাড়ী 'বেনা' নামক গ্রামে। তার মা শত চেষ্টাতেও ব্যর্থ হয়ে পাগলিনীর ন্যায় বেনা থেকে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে হাজির হলেন আটলিয়া গ্রামে এবং

হজরত বড়পীর সাহেবের দরগাহের সেবায়েত ফকির এলাহি বক্সের শরণাপন্ন হলেন। অপুত্রক ফকিরের নিকট তিনি পুত্র সমর্পন করে বল্লেন,—"হে ফকির! এই পুত্র আমি তোমাকে দান করলাম। তুমি এর জীবন দান কর।"

ফকির এলাহি বক্স, হজরত বড়পীর সাহেবের 'দোয়ায়' মেছের আলির জীবন রক্ষা করতে সমর্থ হলেন। মেছের আলি সেই সময় থেকে চিরতরে আটলিয়ায় ফকির সাহেবের নিকট রয়ে গেলেন। নিঃসন্তান ফকির সাহেবের মৃত্যুর পর উক্ত দরগাহের সেবা-ভার মেছের আলির হাতে আপনা-আপনিই এসে যায়। আটলিয়ার ফকির বংশ উপরোক্ত মেছের আলি ফকিরের বংশধর। তাঁরা আজিও (১৯৫১) হজরত বড়পীর সাহেবের দরগাহের সেবায়েত নিযুক্ত আছেন।

হজরত বড়পীর সাহেবের কাল্পনিক দরগাহে হিন্দু-মুসলমান সকল ভক্ত শিরনি, হাজত ও মানত প্রদান করেন। সহস্র সহস্র ভক্ত এখান থেকে তেল, ওষুধ ও কবচ ব্যবহার করে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিরাময় লাভ করেন বলে শোনা যায়। এখানে হিন্দু আদর্শে পাঁচু ঠাকুর বা ষষ্ঠীদেবীর মন্দিরে ইট বেঁধে সন্তানলাভ করার মতন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। মুসলমানী আদর্শে ওরসের সময় কাওয়ালী ও ইসলামী ধর্ম সঙ্গীত গাইবার নিয়ম প্রচলিত। তাছাড়া মানিক পীর, মাদার পীর প্রভৃতি পীরের গান; যাত্রা, সার্কাস; মোরগ বা খাসী হাজত দান, দুধ-ফল-মিষ্টি দান প্রভৃতি আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

———

বিংশ পরিচ্ছেদ

বাবন পীর

পীর হজরত বাবুর আলী মোল্লা ওরফে বাবন পীর চব্বিশ পরগণা জেলার বিশেষভাবে দক্ষিণ-অঞ্চলের প্রসিদ্ধ পীর। ভাঙড় থানার অন্তর্গত বাজার-আটি নামক গ্রামে এক কৃষকের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম-তারিখ অজ্ঞাত। উপরোক্ত থানাধীন শাঁকসহর (সাকসার) নামক গ্রামে তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। সেখানে প্রতি বছর ওরস উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে এবং প্রায় দশ বার দিন ব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি প্রায় এক শত বছরের প্রাচীন। এখানে উরস উপলক্ষে যে মেলা পৌষ সংক্রান্তিতে উদ্‌যাপিত হয়, তাতে প্রায় দশ-বারো হাজার নরনারীর সমাগম হয়। এই খানেই তাঁর দরগাহ আছে। তাঁর মৃত্যু-তারিখও অজ্ঞাত।

বাল্যকাল থেকে তিনি ধর্মপরায়ণ ছিলেন। একবার মানিকপীর নাকি তাঁকে রোগ নিরাময়কারী মন্ত্রপূত তেল বিতরণের আদেশ দেন। সেই আদেশ অনুসারে তিনি রোগ নিরাময়ের জন্য সাধারণকে মন্ত্রপূত তেল দিতে আরম্ভ করেন এবং এতদ্ অঞ্চলে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি প্রায় পৌনে একশত বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁর প্রভাব উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাতেও পরিব্যাপ্ত।

বারাসত মহকুমার দেগঙ্গা থানাধীন দিগবেড়িয়া-যাদবপুর নামক গ্রামে বাবন পীরের নামে একটি নজগাহ আছে। এখানকার পীরোত্তর জমির পরিমাণ প্রায় তিন বিঘা। জমির উপর একপাশে একটি বিশাল অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছের নীচে উক্ত নজরগাহ অবস্থিত। নজরগাহটি ইটের তৈরী। ভক্তগণ সেখানে নিয়মিত ধূপ-বাতি দিয়ে থাকেন। পূর্বে মোহাম্মদ মাসেম সরদার এবং পরে মোহাম্মদ শীতল মণ্ডল প্রমুখ এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হন। এখানে প্রতি বৎসর ২৯শে পৌষ তারিখে ওরস আরম্ভ হয় এবং তিন দিন ধরে তা চলে। এই মেলায় গড়ে প্রায় চার হাজার ভক্তের সমাবেশ হয়। সে সময়ে ভক্তগণ এখানে হাজত, মানত ও শিরনি দিয়ে থাকেন। ভক্তিভরে এখান

থেকে ভক্তগণ তেল ব্যবহার করে নাকি নানারকম ব্যাধি থেকে মুক্ত হন। ঈপ্সিত ফল লাভের আশায় অনেকে নজরগাছের গায়ে ইট বাঁধেন, কেউ বা সেখানে লুট দিয়ে থাকেন। মেলার সময় ফকিরগণ মানিক পীরের গান গেয়ে থাকেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁর ভক্ত।

বাবন পীরের নামে রচিত কিছু কিছু গান পাওয়া যায়। ভাঙ্গড় থানার অন্তর্গত মহম্মদ ফয়িম মোল্লা (গ্রাম—মরিচা, বয়স ৩২) এবং মোহাম্মদ আবদুল মোল্লা (গ্রাম—বড়ালী, বয়স ২২) এক জনসমাবেশে গেয়েছিলেন (সাপ্তাহিক সত্যপ্রকাশ, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮/১৬-৫-১৯৭১):—

সাকসারেতে এলেন হুজুর বাবন মোল্লা নুরানী।
কর সেজদা কর সেজদা ওহে মুরিদানী ॥
সাকসারের এই মাটি পবিত্র হল ভাই
আমাদের ভাগ্যগুণে।
আল্লা ও রছুল যাহাতে ভরা
এলেন তিনি এইখানে ॥

এলেন মোদের দয়ালগুরু মুস্কিল-আসানী
বিপদ-নাশিনী।

কর সেজদা কর সেজদা ওগো ও মুরিদানী ॥
বাবুর মোল্লা মোদের হৃদয়মণি
বাবুর মোল্লা মোদের পরশমণি,
উজির নাজির কোথায় ভাই
কোথায় খোদা কোন কাবায়,
সমুদ্র চুমলে সজুদ হয়
পচা ব্যাধি আসান হয়,
সে যে মোদের বাবার দয়ায়।

পাঞ্জাতন কাওয়ালে বলে হে জওয়ান,
গুরু ধরে দেখো ভাই হও আগুয়ান।
পীর খোদা নাহি জুদা কহে কোরাণ
কর সেজদা কর সেজদা হে মুরিদান।

বাবন পীর ছিলেন পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর সমসাময়িক। একটি কাহিনীতে আছে যে পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর পিতা চন্দন সা, ঢাকার বাদসার নিকট থেকে বেলে-আদমপুরের একটি জঙ্গলের পাট্টা পেয়ে সেই স্থানে আসেন এবং সেখানকার "বাবন মোল্লা" নামক এক ব্যক্তির উৎসাহে আবাদ করেন। বাবন মোল্লা তখন চন্দন সা'র বালাখানায় উজিরের পদে নিযুক্ত হয়ে কাজ করেন।[৬৮]

পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর সজ্ঞানে মৃত্যুর ন্যায় বাবন পীরেরও সজ্ঞানে মৃত্যু হয়েছিল। এ সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদটি এইরূপ ঃ—

ফকির বাবন মোল্লার একটি পোষা খাশী ছাগল ছিল। খাশীর নধর চেহারা দেখে গ্রামের ছেলেদের খুব লোভ হয়। ফকির তো তাঁর সংসারের একমাত্র লোক। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর যাতে 'খানা'টি ফসকে না যায় তার জন্য ছেলেরা আব্দার ধরল—বেঁচে থাক্‌তে থাকতে তাদেরকে মরনোত্তর 'খানা' খাওয়াতে হবে।

ফকির বল্‌লেন—"ভয় নেই মৃত্যুর পরে আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়ই 'খানা' খাওয়াব। আমার কথা মিথ্যা হবে না।"

ছেলেরা কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করল না। অগত্যা ফকির সেই 'খানা' খাওয়াবার দিন-ক্ষণ ঠিক করে দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ধূমধাম করে ছেলেরা ভাত-তরকারী রান্না করল,—সেই সঙ্গে ফকিরের সেই নধর খাসীর মাংসও। ফকির বল্‌লেন,—"আমি ঘরে রইলাম। খানা শেষ করে তবে আমাকে ডাক্‌বে, তার আগে নয়, আমার এই কথাটি তোমরা মান্‌বে।"

ছেলেরা তাতে রাজী হল। ফকির তখন অজু করে যথারীতি নামাজ করলেন এবং সকলের অজ্ঞাতসারে ঘরের মধ্যে গিয়ে চাদরে আপাদ-মস্তক ঢেকে শয়ন করলেন।

মহানন্দে গ্রামের ছেলেরা ফকিরের নধর খাশীর মাংসাদি দিয়ে ভোজন পর্ব সমাধান করল। অতঃপর তারা পূর্ব কথামত এসে ডাকাডাকি করতে লাগল ফকির বাবন মোল্লাকে। ফকিরের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অবশেষে তারা কুটীরে প্রবেশ করে ফকিরকে ডেকেও কোন সাড়া পেল না।

ঢাকা-দেওয়া চাদর সরিয়ে তারা বিস্ময়ে দেখ্‌ল ফকির অনেক আগেই এন্তেকাল করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পূজা-পার্বণ (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে আর একটি কিংবদন্তী লিখিত আছে। সেটি এইরূপ :—

বাবন পীরের মৃত্যুর অব্যবহিত পর কলিকাতাবাসী জনৈক ব্যক্তি তেলপড়া সংগ্রহের জন্য তাঁর বাড়ীর উদ্দেশ্যে আসেন। ঐ ব্যক্তি বাবন পীরের মৃত্যু-সংবাদ জানতেন না। পথে বাবন পীর তাঁর বৃদ্ধ ফকিরের বেশে দেখা দিয়ে তাঁর কবর স্থানের নিকট তেলপাত্র রেখে প্রার্থনা জানাতে উপদেশ দেন এবং পরে ঐ তেল ব্যবহার করতে বলেন।

————

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মসনদ আলী

দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুরের হিজলী অঞ্চলের যোদ্ধা পীর মসনদ আলি যুদ্ধে নিহত কোন বীর সৈনিক নন। তাঁর ঐতিহাসিক নাম তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলে হিজলীতে তিনি রাজত্ব করতেন। ধর্মপ্রাণ ও উদার রাজা ছিলেন বলে তিনি পীররূপে সকলের পূজা পান।

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে মুন্‌শী শেখ বিসমিল্লা সাহিবের লেখা ফার্সী ইতিহাসের (পাণ্ডুলিপির) বিষয়-বস্তুর বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে লিখেছেন ;—

"বাংলাদেশে হুসেন শাহের রাজত্বকালে উড়িষ্যার সীমান্তে সমুদ্রের তীরে চণ্ডীভেটি মৌজায় মনসুর ভূঞা নামে একজন ক্ষমতাশালী মুসলমান জমিদার বাস করতেন। তাঁর দুই পুত্র ছিল—জামাল এবং রহমত। জামাল ছিলেন বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন এবং রহমৎ কুস্তী, শিকার ইত্যাদি নিয়ে সময় কাটাতেন। লোকের কুপরামর্শে রহমতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে জামাল তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন। জামাল-পত্নী এই ষড়যন্ত্রের কথা রহমতের কাছে প্রকাশ করে দেন। রহমত গুমগড় পরগণার সমুদ্রতীরের অরণ্য-সঙ্কুল ধীবর পল্লীতে উপস্থিত হন। সেখানে বাঘ-সিংহাদি হিংস্র বন্যজন্তু বিনাশ করে তিনি সেই ধীবর পল্লীতে বাস করতে থাকেন এবং পাঁচশত ধীবরকে লাঠিয়াল করে গড়ে তোলেন। ধীবরদের সাহায্যেই তিনি অরণ্যের কতকাংশ বাসোপযোগী ও আবাদযোগ্য করে ঘরবাড়ী তৈরী করেন। এই সময় চাঁদখাঁ নামক এক বণিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বাণিজ্য-যাত্রাপথে চাঁদখাঁর সঙ্গীরা পানীয় জল সংগ্রহের জন্য হিজলীতে অবতরণ করেন। চাঁদখাঁর কাছ থেকে কিছু ধন লাভ করে তিনি হিজলীর অরণ্য হাসিল করে জনপদ স্থাপন করেন এবং একটি দুর্গও নির্মাণ করেন আত্মরক্ষার জন্য। ভীমসেন মহাপাত্র তাঁর কর্মচারী নিযুক্ত হন। ক্রমে শক্তি ও লোকবল সঞ্চয় করে তিনি ভোগরাই,

পটাশপুরের কতকাংশ, অমর্শি, ভূঞামুঠা, সুজামুঠা প্রভৃতি অঞ্চল দখল করেন। এই স্থানে প্রচুর হিজলগাছ ছিল বলে, তিনি স্থানটির নামকরণ করেন হিজলী। ভীমসেন মহাপাত্র, দ্বারকা দাস ও দিবাকর পাণ্ডা—এই কর্মচারীদের পরামর্শে রহমৎ বাদশাহের কাছ থেকে জমিদারীর সনদ গ্রহণ করতে উদ্যোগী হলেন। বাকর খাঁ তখন উড়িষ্যার সুবাদার। রহমৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করে সনদ পান এবং ইখ্‌তিয়ার খাঁ উপাধি গ্রহণ করেন। ইখ্‌তিয়ার খাঁর পুত্র দাউদ খাঁ পরে হিজলীর অধিপতি হন। দাউদ খাঁর বহু পুত্র সন্তানের মধ্যে তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা একজন।

আদিনাথ গুরু মৎস্যেন্দ্র ও স্থানীয় যোদ্ধা পীর মসনদ আলি মিলিত হয়ে মছন্দলী বা মোছরা পীরে পরিণত হয়েছেন।[৪১]

এখানে আদি নাথ গুরু মৎস্যেন্দ্র প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

হিজলী অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে মছন্দলীর যে গীত প্রচলিত আছে, তাতে অমিত বিক্রম সিকন্দরের ভাই তাজ খাঁ-ই মসনদ-ই-আলারূপে বর্ণিত হয়েছেন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁর রাজত্বকাল বলা যায়।

মসনদ-ই-আলা উপাধি পাঠান আমলের উপাধি। এর অর্থ "যার আসন উচ্চ।" মোগল যুগে তাজ খাঁর নামের সঙ্গে এই উপাধি তাঁর গুণগ্রাহীরা ব্যবহার করতেন। তাঁর ধর্মপ্রাণতা ও উদারতার কথা আজো হিজলী অঞ্চলের সর্বসাধারণের মুখে মুখে শোনা যায়। আরো শোনা যায়, পটাশপুরের বিখ্যাত পীর মখদুম শাহের কাছে দীক্ষা নিয়ে মসনদ-ই-আলা ফকিরি ধর্ম গ্রহণ করেন। হিজলীর মসজিদ স্থাপন করে তাজ খাঁ তার সেবা-কার্য্যের জন্য সেবায়েতকে প্রয়োজনীয় জমি লাখেরাজ দান করেছিলেন। তাঁদের অনেকে আজো সেই লাখেরাজ ভোগ করছেন।[৬৯]

মছন্দলী পীরের মাহাত্ম্যকথা কয়েকটি পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে। হিজলীর মসনদ-ই-আলা গ্রন্থে মহেন্দ্রনাথ করণ লিখেছেন যে, মসনদ-ই-আলার গীত রচয়িতা জয়নুদ্দিন বা জৈন-উদ্দিনের কোন পরিচয় জানবার উপায় নেই। এই গীতটি প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে নন্দিগ্রাম থানার অন্তর্গত জনৈক অধিবাসী কর্তৃক 'মসন্দলীর গীত' নামে মুদ্রিত

হয়েছিল। তাতে প্রকাশকের কল্পনা, হরি সাউ-এর কন্যার নাম 'রূপবতী' স্থলে 'সত্যবতী'তে পরিবর্তিত করা হয়েছিল। পরে নন্দিগ্রাম থানার অন্তর্গত শেখ বসিরউদ্দিন নামক জনৈক গ্রাম্য কবি সেই গীত রূপান্তরিত করে 'মছন্দলী পুথি' নামক মুসলমানি পুথির আকারে প্রকাশ করেন।[৭০]

মহেন্দ্রনাথ করণ, গায়ক ফকিরগণের নিকট শুনে অবিকলভাবে 'মছন্দলীর যে গীত তাঁর পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত কাহিনী নিম্নরূপ :—

সমুদ্র-বেষ্টিত হিজলীর বাদশাহ্ বাবা মছন্দলী। সেখানে বসেছে নূতন বাজার। কুলাপাড়ার তেলী হরি সাউ খবর পেয়ে প্রস্তুত হল সেখানে যাবার জন্য। আশা প্রচুর বেচা-কেনা হবে।

হরি সাউ-এর কন্যা রূপবতীর খুব সাধ হিজলীর বাজার দেখতে যায়। সে বাবার কাছে বায়না ধরল। বাপের মানা সে শুনল না ; পিছনে পিছনে চলল। তাকে 'তক্তে বসি মছন্দলী দেখিবারে পায়।'

পীর তার নাম জিজ্ঞাসা করল, জানতে চাইল তার সাথীর পরিচয়। পরিচয় পেয়ে পীর তাকে বাজারের পূর্বদিকে দোকান বসাতে অনুমতি দিলেন। হরি সাউ দোকান খুলল। পীর বললেন,—

এতদিন মোর বাজার অন্ধকার ছিল,
হরি সাউ-এর বেটি এসে করিয়াছে আলো।

ভাই সেকেন্দার, পীরের আদেশ মত কামাল ও জামাল নামক দুই জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে হরি সাউ-এর নিকট গিয়ে বলল—'তোমারে লইয়া যাব বাদশার হুজুরে।'

হরি সাউ দুঃখিত হল। রূপবতীই যে এর কারণ সে বুঝতে পারল। এবার বুঝি তার জাত-কুল যায়। হরি সাউ চলল হুজুর-সমীপে, সাথে চলল কন্যা রূপবতী।

পীর খুসী হয়ে রূপবতীকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে হরি সাউ জাতি যাওয়ার আশঙ্কায় দ্বিধাচিত্ত হল। পীর বললেন,—

...............তোর জাতি নাহি যাবে,
যবনেরে বিভা দিলে আগে জাতি পাবে।

রূপবতীর সহিত পীর মছন্দলীর বিবাহ হল। হরি সাউ পেল প্রচুর টাকা। রাধু সাউ তা দেখে হরি সাউকে নিন্দা করল।

ধনশালী হয়ে হরি সাউ প্রতিবেশী সাতশ' তেলীর কাছে নিমন্ত্রণ পাঠালো, কিন্তু প্রতিবেশীগণ সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল না। হরি সাউ সে ঘটনা মছন্দলী পীরের গোচরে আনল। পীর বল্‌লেন ;—

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন তুমি রসুই করিবে,
সাত দিনের পচা ভাত তেলীরে খাওয়াব,
তবে তো বাদশাহী করি হিজলী বলাব।

আহারের সামগ্রী পীরের নির্দেশ মত প্রস্তুত হল। মিয়াঁ আশী হাজার বাঘ সৈন্য নিয়ে অভিযান করলেন। তারা ঘিরে ফেল্‌ল তেলী পাড়া। রাধু সাউ, ছকু সাউ পড়ল বাঘের কবলে। মাডিয়া, ঘোঙ্গা, নাগেশ্বর প্রভৃতি নামধারী বাঘের দৌরাত্ম্যে ভীত হয়ে হরি সাউ-এর প্রতিবেশী তেলীগণ আত্মসমর্পণ করল। তারা হরি সাউকে মাঝখানে বসিয়ে আপন আপন বাড়ী থেকে আনা পাত্রে মুষ্টি মুষ্টি পান্তা ভাত আহার করল।

হরি সাউ জাতি ফিরে পেল। মসন্দলী পীর তখন বাঘ সৈন্যসহ প্রত্যাবর্তন করলেন।

মসনদ্‌-ই-আলার গীত রচয়িতা জয়নুদ্দিনের ভণিতা এইরূপ ঃ—

বন্দি বাবা মসন্দলী না করিও বাম।
কদমেতে লিখে রাখ অভাগার নাম॥
আমি জানি তোমারে আমারে জানে কে।
মরিয়া না মরে তোমার নাম জপে যে॥

গীতের শেষে আছে ঃ—

পীরের কদম তলে মজাইয়া চিত।
গাহেন জয়নুদ্দী কবি মসন্দলীর গীত॥

মহেন্দ্রনাথ করণও লিখেছেন যে জয়নুদ্দির কোনও পরিচয় জানবার উপায় নেই।

জয়নুদ্দি যে কাহিনী পরিবেশন করেছেন তা সহজ বোধ্য। কিছু কিছু ফারসী শব্দ থাকা সত্বেও পাঁচালীর ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। স্বল্প সংখ্যক চরিত্রে

মূল গল্পটি সন্নিবেশিত হয়েছে। মসন্দলী পীরের মাহাত্ম্য প্রকাশের মধ্যে তৎকালীন রাজা বাদশাহের কি অসাধারণ প্রভাব ছিল তার প্রকৃষ্ট পরিচয় এতে পাওয়া যায়।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হিজলীর মসনদ-ই আলা বা মসনদ-আলী গীত নামে একখানি পুস্তিকা (পঞ্চম সংস্করণ) পাওয়া গেছে। পুস্তিকার রচয়িতা শ্রীঅবন্তী কুমার মণ্ডল। প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ পাত্র। সাং ও পোঃ সফিয়াবাদ, কাঁথি, মেদিনীপুর। মূল্য ২৫ পয়সা। লাইসেন্স নং ১০৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২। মোট ২৪২ পংক্তিতে রচিত।

কবি কর্তৃক বিবৃত মূল কাহিনী জয়নুদ্দি রচিত পাঁচালীর কাহিনীর অনুরূপ। বারো পংক্তি পর্যন্ত পীরের বন্দনা, তারপর বিয়াল্লিশ পংক্তি পর্যন্ত পীরের অলৌকিক শক্তি পরিচায়ক ক্ষুদ্র কাহিনীতে বলা হয়েছে,—

মেঘ শূন্য আকাশ দেখে মাঝি চলেছে মাঝদরিয়া বয়ে। পীরের খেয়ালে অকস্মাৎ মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ, উঠল প্রচণ্ড ঝড়। মাঝি বিপদ বুঝে শরণ নিল বাবা মসনদ আলীর। তখন পীরের ইচ্ছায় নিমেষে নির্মল হল আকাশ। পীরের নির্দেশে মাঝি পরদিন তাঁর কাছে গিয়ে হাজির করল শিরনি।

সেই হেতু দূর দেশে যবে যায় তরী।
পীরের শিরনি হেতু আগে বাঁধে কড়ি॥

পাঁচালিকার ফারসী শব্দ সব বাদ দিয়েছেন। মূল ভাব অবিকল রেখে ভাষায় আরো সরলতা দান করেছেন। মাঝে মাঝে কবিত্ব প্রকাশের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এক স্থানের বর্ণনা এইরূপ ঃ—

গজরাজ গতি কন্যা পশ্চাতে চলিল॥
আহা কিবা শোভা করে নীল নভঃতলে।
স্থান্ ত্যজি বিধু বুঝি নেমেছে ভূতলে॥

মসনদ আলীর গীত সমাপ্ত করে পাঁচালীকার গাইলেন,—

এই গ্রন্থ যেবা পড়ে সকাল ও সন্ধ্যায়।
রোগ-শোক দূরে যায় আল্লার দোয়ায়॥
পীরের চরণ তলে মজাইয়া চিত।
অধম পামর গাহে মসনদ আলীর গীত॥

পাঁচালীর শেষাংশে গিয়ে তিনি আর একটি ক্ষুদ্র কাহিনীতে বিবৃত করেছেন—কেন হিন্দু-মুসলমান সকলে পীরকে ভক্তি করে। তিনি লিখেছেন —হরি সাউ-এর কন্যার বিবাহের পর কিছু কাল অতিবাহিত হলে দেখা গেল কোন হিন্দু আর হিজলী বাজারে আসে না। সরেজমিনে কারণ জানবার জন্য পীর স্বয়ং এক ভিক্ষুকের পোষাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরতে লাগলেন। দৈবাৎ একস্থানে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনে তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলেন। ব্যাপারখানা এই—

জনৈক হিন্দুবালা মিঠাপানি আনতে গেলে মগদস্যুরা তাকে হরণ করে নিয়ে যায়। সংগে সংগে 'রে রে রে রে' ধ্বনি ওঠে। দূরে দাঁড়িয়ে পীর তা অবলোকন করে ভীষণ ভাবে মগ দস্যুদের উপর ক্রুদ্ধ হন। তাঁর অলৌকিক শক্তিতে মগ দস্যুগণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। তখন সেই কন্যা পানি-ভরা কলস নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

সেইদিন হৈতে পীর পুরী মাঝখান
খিল দিয়া কপাটেতে হইল অন্তর্দ্ধান ॥
সিদ্ধিগুণে সিদ্ধ পুরুষ হৈল সিদ্ধিদাতা।
মুসলমানে বলে পীর হিন্দুরা দেবতা ॥

মছন্দলী পীর পাঁচালীতে রায় মঙ্গল বা গাজি-কালু-চম্পাবতী কাব্যের প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয়। বিশেষ ভাবে বন্দনা, কাহিনী ও উপসংহারে সাদৃশ্য আছে। তাছাড়া বাঘ সৈন্য সমাবেশ, বাঘগণের নামের তালিকা প্রভৃতি ঐ সব কাব্য ছাড়াও একদিল শাহ কাব্যের সঙ্গে তুলনীয়।

প্রত্যক্ষভাবে মছন্দলী পীরের কাহিনী পীর মসনদ আলীর মাহাত্ম্যকথা হলেও পরোক্ষভাবে তা ইসলাম ধর্ম প্রচার সহায়ক। বস্তুতঃ পীর মসনদ আলীর অসাধারণ প্রভাব হিন্দুগণকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। অবন্তী কুমার মণ্ডলের পাঁচালীর শেষাংশ তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পীর মছন্দলীর প্রতি হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ প্রদত্ত শিরনি প্রদান হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয় বা পীর সংস্কৃতি অনুসরণের অন্যতম দৃষ্টান্ত।

———

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

মাদার পীর

মাদার পীর বা মাদার শাহের প্রকৃত নাম পীর হজরত বদিউদ্দীন শাহ মাদার। ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ায় তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম আবু ইসহাক সামী। কথিত আছে যে, তিনি হজরত মুসার ভাই হজরত হারুনের বংশধর। তিনি এমন সুন্দর ছিলেন যে তাঁকে দেখলে লোক বিচলিত হৃদয়ে ভূলুণ্ঠিত হত। তাই তিনি বোরখায় মুখ আবৃত করে চলাফেরা করতেন। আখবার-উল-আখইয়ারের লেখক শেখ আব্দুল হক দেহলভীর মতে মাদার শাহ বারো বছর পর্য্যন্ত অনাহারে এবং একবস্ত্রে আধ্যাত্মিক সাধনায় মসগুল ছিলেন।

মাদার পীর গুজরাট, আজমীর, কনৌজ, কান্দি, জৌনপুর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। শূন্য পুরাণে উল্লিখিত দম্বদার [বা দম্‌মাদার] শব্দ থেকে আধুনিক পণ্ডিতের কেহ কেহ মনে করেন যে মাদার পীর বঙ্গদেশেও এসেছিলেন।

মাদার পীর সুফী তরীকার অন্যতম বিভাগ মদারীয়া তরীকার প্রবর্ত্তক। সম্ভবতঃ তিনি বঙ্গদেশে আগমন করার পর এদেশে তাঁর তরীকা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। উত্তরবঙ্গে "মাদারের বাঁশতোলা" নামক একটি অনুষ্ঠান আড়ম্বরের সহিত পালিত হয়। বিভিন্ন দরগাহের পুকুরের মাছ বা কচ্ছপ মাদারীরূপে এখনও সম্মান পায়। ডঃ এনামুল হক্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর, চট্টগ্রাম জেলার মাদারবাড়ী এবং মাদারশা ইত্যাদি এলাকা মাদার পীরের স্মৃতি বহন করছে। ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কানপুর জেলার মকনপুরে (জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কীর রাজত্বকালে) প্রায় একশত বিশ বছর বয়সে এন্তেকাল করেন।

[সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ : শেখ শরফুদ্দীনের প্রবন্ধ]

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত "শাসন" নামক গ্রামের হাটখোলায় মাদার পীরের একটি কল্পিত দরগাহ আছে। প্রায় তিন

বিঘা পীরোত্তর জমির একস্থানে পাঁচিল-বেষ্টিত দরগাহটি ইটের তৈরী। সমাধির উপরে একটি অশ্বত্থ গাছ আছে। সেবায়েতের নাম ভুলু মণ্ডল ও মোহাম্মদ মুজিদ আলি। তাঁরা প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেখানে ভক্তিভরে ধূপ-বাতি দেন। স্থানীয় জনৈক পরিতোষ পাল উক্ত দরগাহের এক অংশ পাকা করে দেন। হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ মাদার পীরের দরগাহে শিরনি দেন, মোরগ হাজত দেন এবং ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি মানত দেন। দরগাহ-সীমার মধ্যে জনৈক ফকিরের সমাধি আছে। ভক্ত জনসাধারণ তাঁকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ধূপ-বাতি জ্বালিয়ে। তিনি নাকি মাদার পীরের নাম করে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী থেকে গ্রামকে রক্ষা করতেন। পীরের দরগাহে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে বিশেষ অনুষ্ঠান "মিলাদ" হয়।

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত হরিপুর নামক গ্রামেও মাদার শাহের একটি কল্পিত দরগাহ আছে বলে শোনা যায়। দরগাহ স্থানটি বাব্‌লা এবং নানা গাছে ভর্তি। সেখানকার সেবায়েতের নাম মহম্মদ পাগল গাজী, পিতা মরহুম রহমান গাজী। মতান্তরে মোসাম্মৎ আদুরী বিবি, স্বামী মহম্মদ তাহের। এখানে শিরনি, হাজত, মানত এবং ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয়। তবে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান অধুনা (১৯৫১) হয় না। তা ছাড়া বসিরহাট মহকুমায় মালঞ্চ নামক গ্রামেও একটি কল্পিত দবগাহ আছে।

মাদার পীর বা শাহ মাদারের এক আকর্ষণীয় কাহিনীর কথা জানা যায় ডঃ সুকুমার সেন রচিত 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' নামক গ্রন্থে। শাহ মাদারের সে কাহিনী সংগ্রহ করে ১৩১৭ সালে লিখেছেন ছায়াদ আলী খোন্দকার। ডঃ সেন সংক্ষেপে সেই কাহিনীর বিবরণ এইভাবে দিয়েছেন :—

আল্লার প্রিয় ফেরেস্তা ছিল হারুত আর মারুত। এরা "যত কিছু ভেদ কথা ভাল আর বুরা" আল্লার দরগায় নিবেদন করত। একদা এদের খেয়াল হল, আদম ও হাওয়ার সম্পর্ক কেমন জান্‌তে। এ কৌতুহলের প্রশ্রয় দিতে আল্লা তাদেরকে নিষেধ করলেন। তারা আবদার ছাড়লো না। অবশেষে আল্লার ফরমানে ফেরেস্তা দু'জন আশমান থেকে জমিনে পড়ল।

হারুত হইল মরদ মারুত আওরত
দুই জনা জরু খছম হইল খুবছুরত।
আওরত মরদের যেমন বেভার পুসিদার
সেইরূপ বেভার করেন দু জনায়।

আল্লার হুকুমে মারুতের গর্ভ হল কিন্তু তা মোচন আর হয় না। তারা মুস্কিলে পড়ে আল্লার নাম করে গড়াগড়ি দিতে দিতে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

খারাব হইনু মোরা আপনার দোষেতে
দোজখে পড়িয়া মোদের হইল জ্বলিতে।

তখন আল্লার দয়া হল।

মগরবের ওক্তে হুকুম হৈল ফেরেস্তায়
আচ্ছা করে বান্ধ কসে মজবুত দোহায়।
তামাম মুছল্লিগণ নামাজ পড়িলে
সেই ওক্তে বান্ধিবে সে রসি দিয়া গলে।
মজবুত করিয়া জিঞ্জির হাতে পায়ে দিবে
দুইজনে একসাতে মড়ন্না করিবে।

বাঁধবার হুকুম শুনে ভয়ে মারুতের গর্ভপাত হল। নবজাত শিশুকে নিয়ে মাদার গাছের তলায় ফেলে রেখে হারুত ও মারুত গায়েব হল।

হজরত আলী শিকারে এসে গাছতলায় রূপবান ছেলেটিকে পেলেন। তিনি তাকে নিয়ে গিয়ে বিবি ফাতেমাকে মানুষ করতে দিলেন। মাদার তলায় কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে বলে তার নাম হল মাদার দেওয়ান বা শাহ্ মাদার।

মাদার শাহের পাঁচ সাত বছব বয়স হল। তিনি রাখাল বালকগণের সাথে খেলা করে বেড়ান। একদিন রাখাল ছেলেরা বল্‌ল যে সেদিন বড়পীরের শির্নি হবে। মাদার জিজ্ঞাসা কবলেন যে, বড়পীর কে। রাখাল ছেলেরা বল্‌লে,—তার নাম করতে নেই।

লেওা মাত্রে নাম গর্দ্দান জুদা যে হইবে।

মাদার, বড়পীরের কাছে গিয়ে বল্‌লেন ;—এস, তুমি বড় কি আমি বড় পরীক্ষা হোক।

আচ্ছা ভাই এইখানে সিরনি রাখিয়া
আমরা তকরির করি একত্রে মিলিয়া।
সত্ত একবার তুমি কর মোর সাতে
হারিলে গর্দ্দান জুদা নাহি হবে তাতে।

বড়পীর বল্লেন ;—

বেশ কি কাম করিবে তুমি বল বোঝাইয়া।
মাদার বলেন ভাই লুকোচুরি খেল
বোঝা যাবে এইবার হইলে কামেল।

বড়পীরের আগে লুকোবার পালা।

বড়পীর আখেরেতে আজিজ হইয়া
নজর হইতে কোথা গেল ছেপাইয়া।
দরিয়াতে মাছের যে আণ্ডার ভিতরে
কুসুমের ভিতরেতে ছেপায় জহুরে।

মাদার ধ্যানে জেনে বড়পীরকে ধরে ফেললেন। তারপর মাদারের পালা। মাদার চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে বড়পীরের শ্বাসে ঢুকে গেলেন। পাহাড়-পর্বত অনুসন্ধান করে মাদারের সন্ধান না পেয়ে বড়পীর বল্লেন ;—

হারিনু তোমার কাছে কোথা আছ বল।

অশরীরী মাদার বল্লেন,—

হাওা ভরে ছেপাইনু নিঃশ্বাস টানিতে
হাওয়ায় সামিলে আছি তোমার দমেতে।

তারপর বড়পীরের মূর্দ্ধা ভেঁদ করে মাদার বাইরে এলেন।

আখেরেতে মস্তক হৈতে খেচিয়া উঠিল
আজ তক সেই জায়গা খালি যে রহিল।
ছেরের মর্দ্ধিখানে যাকে ব্রহ্মতালু বলে
দেখিবে খেয়াল করে বলিনু সকলে।
লাড়কার মালুম হয় হাড় নাই তায়
ধুকধুক করে সেথা সদা সর্বদায়।

খেঁচিয়ে উঠিল মাদার ব্রহ্মতালু হৈতে
দম মাদার বলিয়া নাম রহিল দুনিয়াতে।
দমেতে খেচিয়া মাদার দম মাদার হৈল
কালে কালে সেই নাম জাহের রহিল।

লুকোচুরি খেলায় বড়পীর হেরে গেলে মাদার বললেন ;—

আচ্ছা ভাই এই তক হাসেল কালাম
ঝগড়া মিটিয়ে সিন্নি কর হে তামাম।
না পাকিতে যে জন নাম লইবে তোমার
গরদানের পশম এক কাটিবে তাহার।

কবি বলেছেন যে, এই থেকে দুনিয়াতে লুকোচুরি খেলার চল হল।

লাড়কারা আজ তক খেলে লুকোচুরি
লাড়কার মজলেছে ভাই আছে ত মাসুরি।

একদিন বাড়ীর বাইরে মাদার খেলা করছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলের বিকটাকার যমদূতকে (মালেকল মওত)। মাদার তাকে নাস্তানাবুদ করে এক মৃতের জান কেড়ে নিলেন। মালেকল মওত তখন জীবরিলের কাছে গিয়ে মাদারের অত্যাচারের কথা জানালেন। জীবরিল এবারে এজরাফিলকে পাঠালেন মাদারের কাছে তাকে বুঝিয়ে বল্‌তে।

তরস্থ যাইবে তুমি না করিবে হেলা
বুঝাইয়া বলিবে তুমি বসিয়া নিরালা।

এজরাফিল ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে আল্লাহেব নিকট নিবেদন করলেন। তখন মেকাইল ফেরেস্তাকে পাঠানো হল। তাঁকে দেখে মাদার আগুনের মত জ্বলে উঠে বল্‌লেন,—

যাও যাও মেকাইল না শুনিব কথা
তোমার কি ধার ধারি কাম নাহি হেথা।
ছামনেতে নাহি কহো বলিনু তোমারে
যাহার লিয়েছি জান সে বুঝিবে মোরে।

তারপর গেলেন আজরাইল। তাঁর দৌত্যও ব্যর্থ হল। তারপরে গেলেন বিবি ফাতেমা, দুই ইমাম যথাক্রমে হাসান ও হোসেন, হজরত আলী ও হজরত নবী।

তারপরে আইল দেখ আপনি ছোবহান।

তখন মাদার তাঁর মনের সংশয় আল্লাকে জানালেন,—

আবদুল্লা আমিনা কেন দোজখ মাঝারে।

আল্লা মাদারকে তত্ত্বকথা শোনাতে লাগলেন,—

এক এক করিয়া কত বোঝায় খোদায়
কিঞ্চিত বুঝিল মাদার বসিয়া তথায়।
মাদার বুঝিয়া তখন খামস হইয়া
জান লিয়া দিল তখন হাতেতে সুপিয়া।
দুই হাত জুড়ে করে আরজ হুজুরে
বড়ই করেছি গোনা নাহি চিনে তোরে।

আল্লা খুশী হয়ে বল্লেন,—

তোমার কথায় জেদ বাহাল রাখিয়ে,
গোনাগার বান্দা সবে খালাছ করিয়া,
আবদুল্লা আমেনা বাকী যেবা যত আছে
উম্মতের মধ্যে গোনা যে জন করেছে,
সকলকে মাফ দিলাম তোমার কথায়
বেহেস্তে দাখিল আমি করিব নিশ্চয়।

এই কাহিনীর বর্ণনা অনুযায়ী বোঝা যায়,—মাদার পুরুষও নন, স্ত্রীও নন।

না মরদ আছে না আওরাতের নেসানি।

মাদারের আহার নেই, নিদ্রাও নেই। তিনি জিন্দা শাহ্ মাদার, 'দমের মাদার।'

মাদার পীরের এই কাহিনী সাধারণ মানুষের নিকট খুব আকর্ষণীয়। দুই পীরের ক্ষমতার লড়াই, শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই এমন কি স্বয়ং আল্লাহতালার সঙ্গে জেদের দৃঢ়তার কথা উৎসাহ-ব্যঞ্জক বটে। এমন চিত্তাকর্ষক কাহিনী রসালো করে গ্রামের সাধারণ মানুষের নিকট আজো (১৯৫১) পরিবেশিত হয়। গ্রামে এইরূপ পীরের গানকে 'মাদার পীরের গান' বলে। মূল গায়ক ছাড়া এতে দুই তিন জন দোহার থাকে। একজন হারমোনিয়ম, একজন ঢোলক, একজন খঞ্জনী বা জুডী বাজায়। এই দলে হিন্দু মুসলিম সকলেই থাকে। মূল গায়কের পরনে আলখাল্লা, মাথায় টুপী, পায়ে নুপুর এবং হাতে হাত ঘুঙুর ও চামর থাকে। তিনি নেচে এবং বিভিন্ন ভঙ্গীমায় অনেক কথা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে দর্শকগণের মধ্যে রসোৎসাহ সৃষ্টি

করেন। গানের বন্দনায় হিন্দুর দেব–দেবীগণের কথাও উল্লিখিত হয়, মাঝে মাঝে অন্যান্য পীরগণের মাহাত্ম্য-কথাও এসে পড়ে। এমন কি শ্যামা সংগীতের সুর এবং কিছু কিছু কথাও ব্যবহৃত হয়।

মাদার পীরের নামে কিছু লোক কথা প্রচলিত। তাদের মধ্যকার একটা চিত্তাকর্ষক লোক-কথা সংক্ষেপে এইরূপ ঃ—

বসিরহাট মহকুমার মালঞ্চ গ্রামের সাধারণ ভক্তগণ জনৈক মৌলভী সাহেবের পরামর্শে পীর মাদার শাহের প্রতি কোন এক প্রকারে অসম্মান প্রদর্শন করেন। পরের ঘটনা এই যে, মালঞ্চ গ্রামের পার্শ্ববর্তী নদীর তীরে তীব্র আকারে ভাঙন দেখা দেয়। শেষে উক্ত গ্রামের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। গ্রামের অধিবাসীগণ এই বিপদের কারণ অনুসন্ধান করে নাকি সিদ্ধান্তে আসেন যে মাদার পীরের দরগাহে যথারীতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা দরকার এবং তা করলেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। গ্রামবাসী মিলিতভাবে উৎসাহের সহিত পীরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শুরু করেন। ফলে পরবর্তীকালে গ্রামের ভাঙা অংশ পূরণ হয়ে যায়।

———

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রওশন বিবি

হজরত সৈয়েদা জয়নাব খাতুন ওরফে রওশন বিবি, আরবের মক্কা নিবাসী হজরত সৈয়দ করিম উল্লাহের একমাত্র কন্যা। তাঁর মাতার নাম বিবি মায়মুনা সিদ্দিকা।[৪০] মতান্তরে মেহেরুন্নেসা।[২৪] তিনি বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজীর কনিষ্ঠা সহোদরা। তিনি তাঁর অন্যতম সহোদর সৈয়দ শাহাদালির সহিত ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে আগমন করেছিলেন। বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত তারাগুনিয়া নামক গ্রামে ইছামতী নদীর পশ্চিম তীরে তাঁর সমাধি আছে। এতদ অঞ্চলে তিনি রওশনারা নামেও প্রসিদ্ধ। স্থানীয় জনসাধারণ তাঁকে রওশন বিবি নামে অভিহিত করেন।[৪০]

রওশন বিবির মক্কায় জন্ম হয় ১২৭৯ খৃস্টাব্দে এবং চৌষট্টি বৎসর বয়সে ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে এদেশেই তাঁর মৃত্যু হয়।[৩২]

তিনি চিরকুমারী ছিলেন। কারো মতে তিতু মিঞার পূর্ব্ব পুরুষ সৈয়দ সাদাউল্লার সঙ্গে গোরা গাজি নিজ ভগিনী রৌশন বিবির বিবাহ দিয়েছিলেন।[৫] তিনি হজরত সৈয়দ শাহ্ কবীর রাজীর মুরিদ ও খলিফাহ্ হজরত সৈয়দ শাহ হাসান রাজীর নিকট বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। হজরত শাহ কবীর রাজীর আদেশে হজরত সৈয়দ শাহ্ হাসান যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন তিনশত ষাট জনের সেই কাফেলার অন্যতম হিসাবে তিনিও এদেশে আগমন করেছিলেন। তাঁর বংশ পরিচয় সংক্ষেপে এইরূপ :—
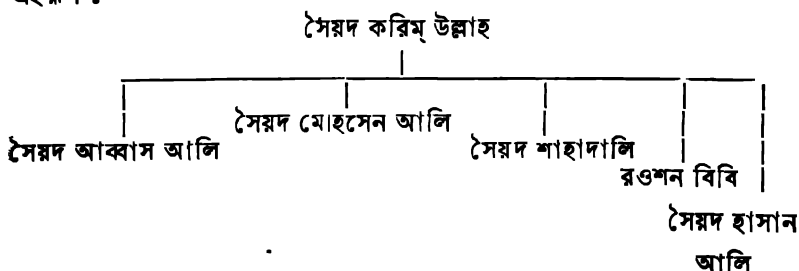
রওশন বিবির ভক্তগণ ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তাঁর সমাধির উপর এক সুরম্য-দরগাহগৃহ নির্মাণ করেছেন। সেই দরগাহের শরিকদার সেবায়েতগণ প্রতিদিন পালাক্রমে দরগাহ-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সমাধির উপর ধূপ-বাতি প্রদান করেন। তাঁর ভক্তগণ কখন কখন মানত হিসাবে রওশন বিবির দরগাহে ফুল, ফল, বাতাসা প্রভৃতি দিয়ে থাকেন। অনেকে এখানে বনভোজনের ন্যায় সাময়িক আনন্দ-উৎসব করে থাকেন। কেহ বা হাজত, শিরনি এবং মানত দিয়ে থাকেন। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে ওরস উপলক্ষে দশ-বারো দিন ধরে বিরাট মেলা দরগাহ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। মেলায় ব্যাণ্ড-পার্টি বাজনা বাজায়, বাজি পোড়ানো হয়, কাওয়ালী গায়কগণ এসে গান করেন।

উক্ত দরগাহের বর্তমান (১৯৫১ খৃষ্টাব্দে) বয়োজ্যেষ্ঠ সেবায়েতের নাম সোকর আলি। তাঁর জন্ম তারিখ বাংলা ১২৬৬ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ, অর্থাৎ তাঁর এখনকার বয়স একশত দশ বৎসর। তিনি বলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নাকি পীরানী রওশনারার নামে তিনশত পঁয়ষট্টি বিঘা জমি পীরোত্তর দান করেছিলেন। তার মধ্যকার সামান্য অংশ খাদিমদারগণের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

প্রতি বছর বারোই ফাল্গুন তারিখে হাড়োয়ায় পীর গোরাচাঁদের দরগাহে ওরসের সময়ে যে অনুষ্ঠান হয়, সেই সমসাময়িককালে তারাগুনিয়ার এই দরগাহেও মেলা বসে। হাড়োয়ায় ওরসের পর সেখানকার খাদিমদার কর্তৃক এই স্থানে ফুলের মালা, মিষ্ট দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। দরগাহে আরাধনার পর পূতবারি ও ফলাদি ভক্তগণের মধ্যে বিতরিত হয়। বহু রমনী সন্তান লাভের আশায় মানত করে দরগাহের গায়ে ইট ঝুলিয়ে রাখেন।

প্রথমে আরোশোল্লাহ গ্রামের চাঁদ মণ্ডল দরগাহের খড়ের চালের বদলে করোগেটের চাল করে দেন। মাগুরতি-তারাগুনিয়ার পীরজান মোল্লা সাহেব বর্তমানের সুরম্য দরগাহ-গৃহটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

রওশন বিবির নামে রচিত কোন সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় যথাক্রমে বাংলা ১৩২৩ এবং ১৩২৫ বর্ষ সংখ্যায় দুইটি প্রবন্ধ তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন।

তাছাড়া "তারাগুনিয়া" গ্রাম নিবাসী রাখালদাস নাগ মহাশয় যে পত্র লিখেছিলেন, তা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বাংলা ১৩২৫ বর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া আর কোন স্থানে তাঁর সম্পর্কে কোন লেখা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় নি।

আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেব তাঁর পুঁথি পরিচিতি গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বলে যে 'গোল রওশন বিবির পুঁথি' নামক পুস্তকের উল্লেখ করেছেন সেই 'রওশন বিবি' ও আমাদের আলোচ্য রওশন বিবি একই ব্যক্তি কিনা তা জানা যায় নি। আপাততঃ পুস্তকখানি আমাদের হস্তগত হয় নি বলে সে আলোচনা এখানে অসমাপ্ত রইল।

রওশন বিবির জন্মকাল ১২৭৯ খৃষ্টাব্দ এবং মৃত্যুকাল ১৩৪২ খৃষ্টাব্দ। পীর গোরাচাঁদের জন্মকাল ১২৯২/'৯৩ খৃষ্টাব্দ। প্রথমে পীর গোরাচাঁদ ও পরে আবেদা রওশনারা এদেশে ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। তবে এদেশে ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে সাক্ষাতকার হয়েছিল কিনা তার কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কেহ বলেন,—"পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈয়দ হুসেন শাহ গৌড়ের বাদশাহ হলেন।.. গোরাগাজী বা পীর গোরাচাঁদ, হিজলীর মুসলমান সেনাপতির পুত্র।...ইছামতী তীরে তারাগুনিয়া গ্রামে তিতুমিঞার পূর্ব্বপুরুষ সৈয়দ সাদাউল্লার নিকট আশ্রয় নিয়ে সে যাত্রা রক্ষা পান। পরে গোরাগাজী উক্ত সাদাউল্লা ফকিরের সহিত নিজ ভগিনী রৌশন বিবির বিবাহ দিয়েছিলেন।" [কুশদহ পত্রিকা : ১৩১৮ : ৩য় বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : পৃষ্ঠা ১১১]

কেহ বলেছেন,—সৈয়দ নিসার আলি ওরফে তিতুমীর ছিলেন পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজীর একত্রিংশ অধঃস্তন পুরুষ। [৫৬]

উপরোক্ত মত সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকার বাংলা যথাক্রমে ১৩২৩ ও ১৩২৫ সালের সংখ্যায় আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব যে দুইটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার প্রতিবাদে তারাগুনিয়া নিবাসী রাখাল দাস নাগ মহাশয় একটি পত্র লিখেছিলেন এবং সে পত্র বাংলা ১৩২৫ সালের সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার উত্তরে আব্দুল গফুর সাহেব লিখেছিলেন,—"মৌলভী সৈয়দ শাহ্ মোহাম্মদ কবীর সাহেবের লিখিত বিখ্যাত 'তাজ কেরাতল কেরাম' এবং 'তারিখ খেলাফায়ে আরব ও ইসলাম' নামক পারস্য ভাষায় লিখিত দুইখানি ঐতিহাসিক পুস্তক

থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে লিখেছি।" এই উত্তরটিও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় বাংলা ১৩২৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই জবাবের উপর প্রত্যুত্তরে কোন লেখা প্রকাশিত হয় নি।

তারাগুনিয়া অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি লোককথা আছে। সেগুলি এইরূপ :—

১। বিচারকের রায়

বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানাধীন শ্রীরামপুর নামক গ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ হবিবর রহমান মণ্ডল (৪০) আজ (১৯৫১) থেকে বছর দশেক পূর্ব্বে এক মিথ্যা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েন। মামলার গতি বরাবর তাঁর বিরুদ্ধে চল্‌ল। আলিপুর সদরে মামলা শেষ পর্য্যন্ত এমন পর্য্যায়ে এসে গেল যাতে তাঁর অবশ্য শাস্তি পেতে হবে। তাঁর উকিল অনেক দিন ভরসা দিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এক দিন এমন অবস্থায় এলেন যাতে তিনিও হতাশ হয়ে বল্‌লেন,—"মামলায় রায়ে কি হবে বলা শক্ত। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, দেখি কতদূর কি হয়। তুমি তোমার মতন যথাসাধ্য প্রার্থনাদি করে এসো।" অর্থাৎ সে মামলায় তাঁর দণ্ড হওয়ারই কথা।

হবিবর রহমান এতে হতাশ্বাস হয়ে আত্মীয় পরিজনদের নিকট শেষ সাক্ষাত করবার জন্য মনস্থ করলেন। তাঁর আত্মীয় পরিজনদের একজনের বাড়ী যাবার পথে একদিন তিনি ইছামতী নদী-তীরস্থ রওশন বিবির দরগাহের সামনে এসে হাজির হন। বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায়, নদীর জল ছোঁয়া ঠাণ্ডা হাওয়ায়, দাঁড়িয়ে রওশন বিবির দরগাহের দিকে তাকিয়ে তাঁর যেন ভাবান্তর এল। জননীর নির্ভয় স্নেহ স্পর্শ তাঁর সর্ব্বাঙ্গে যেন মৃদুভাবে শিহরণ জাগিয়ে গেল। তিনি অস্ফুট স্বরে দীর্ঘশ্বাসের সংগে আপন মনে বলে উঠলেন—"মা।" আস্তে আস্তে তাঁর সর্ব্বাঙ্গে যেন নেমে এল এক গভীর প্রশান্তি। তিনি রওশন বিবির দরগাহে মানত করলেন,—"আমি যদি এই মামলা থেকে রেহাই পাই, তোমার দরগাহে আমি প্রাণ ভরে মানত দেব।"

কয়েকদিনের মধ্যে মামলার দিন এসে গেল। খানা খেয়ে তিনি বিদায় নিলেন বাড়ীর সকলের কাছ থেকে। কি জানি যদি মামলায় মুক্তি না ঘটে। বিদায় নিয়ে তিনি একমাত্র স্মরণ করতে লাগলেন রওশন বিবির নাম।

আলিপুরের আদালত প্রাঙ্গণে অন্যান্য লোক ছাড়া কয়েকজন আত্মীয় স্বজনও উপস্থিত হয়েছিলেন। সকলে "বিচারকের রায়" শুনবার জন্য রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছিল। অবশেষে বিচারপতি রায় দিলেন যাতে হবিবর রহমান হলেন বে-কসুর খালাস। সকলে হাসি মুখে আদালত গৃহ থেকে বাইরে এলেন। হবিবর রহমান বল্লেন যে রওশন বিবির দোয়ায় বিচারপতির রায় বদল হয়েছে,—তাঁর বে-কসুর খালাস পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

উপস্থিত জনতা তখন রওশন বিবির নামে ধন্য ধন্য করে উঠ্‌ল। হবিবর রহমান নিজে বার বার রওশন বিবির নাম উচ্চারণ কর্‌তে কর্‌তে কপালে হাত ঠেকাতে লাগলেন।

২। দিবসে তারকা দর্শন

রওশন বিবি তাঁর ভাই হজরত হাসান রাজীর সঙ্গে এদেশে অন্যান্য সাধকগণের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে ঘুরতে অনেকদিন অতিবাহিত হল। অবশেষে এগিয়ে এল তাঁর শেষ দিন। তিনি সাথীদের জানালেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যেন সমাধি প্রদান করা হয়। তাঁর বাসনা এই যে, যে স্থান থেকে তাঁর সাথীগণ দিনের বেলায় তারকা দেখতে পাবে, সেইখানেই যেন তাঁর মৃতদেহকে কবর দেওয়া হয়।

প্রবাদ এই যে রওশন বিবির মৃত্যুর পর তাঁর সাথীগণ নাকি তাঁর নির্দ্দেশমত 'তারাগুনিয়' গ্রামের যে স্থান থেকে দিনের বেলায় তারকা দেখ্‌তে পেয়েছিলন, সেইখানেই তাঁর মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়েছিল। রওশন বিবির দরগাহ-স্থানই সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান।

৩। ভাই-ভগিনী সাক্ষাতকার

বহু বৎসর পূর্ব্বেই পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী ও আবেদা রওশনারা মৃত্যুবরণ করেছেন। তবুও বৎসরের কোন কোন সময়ে নাকি উক্ত ভাই ভগিনীর মধ্যে সাক্ষাতকার ঘটে। বিশেষ বিশেষ সময়ে পীর গোরাচাঁদ নিজেই রওশন বিবির দরগাহে আসেন এবং উভয়ের মধ্যে কথোপকথন চলে। স্থানীয় কোন কোন্ ব্যক্তি নাকি কয়েক বছর পূর্ব্বেও গভীর রাত্রে কথোপকথনের আওয়াজ শুনেছিলেন।

পীরানী হজরত রওশন বিবির দরগাহে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ ভক্তিভরে শিরনি, হাজত ও মানত দিয়ে থাকেন। দরগাহ হতে ওরসের পর হিন্দুসংস্কারের ন্যায় পূত বারি অর্থাৎ দুধ-পানি ভক্তগণ গ্রহণ করেন। ষষ্ঠী ঠাকুরের বা কালী মন্দিরে যেমন রমনীগণ সন্তান লাভের আশায় ইট বাঁধেন, রওশন বিবির দরগাহেও অনুরূপ ইট বাঁধবার প্রথা প্রচলিত আছে। মুসলমান সংস্কার অনুযায়ী সেখানে শিরনি, হাজত ও মানত দেওয়া হয় এবং ধূপ-বাতি তো প্রদত্ত হয়ই। দরগাহের প্রবেশ দ্বারে কোথাও জরির কাগজে মোড়া বেলের কাঠ, কোথাও বা তৃতীয়ার চাঁদ-বেষ্টিত তারকার ছাপ।

চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশীতে যে দীর্ঘ দিনের মেলা বসে সেই সময়ে দরগাহের উত্তর সীমায় অবস্থিত কালীমন্দিরে পূজাও হয়! তার জন্যও বহু লোকের সমাগম হয়। এই সময়ে হিন্দুর পূজা ও মুসলমানের শিরনি-হাজত-মানত দিবার অনুষ্ঠানের মধ্যে ভক্তির উৎসধারা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। দলে দলে জনসাধারণ সর্ব্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ঘুরে বেড়ায়; তখন আর হিন্দু মুসলমানের কোন বিভেদের কথা কারো মনে থাকে না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

লালন শাহ্

পীরগণ মূলতঃ সুফী—একথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম গবেষক মুহম্মদ আবু তালিব তাঁর "লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "মুসলিম বাউলরাও আসলে সুফী। ...ভালো করে দেখ্‌তে গেলে এঁরা ইসলামি সুফীবাদেরই অনুসারী। ... তাঁরা নিজেদেরকে যেমন বাউল বলেছেন তেমনি তালিবুল মাওলা বলেছেন। তালিব অর্থে সন্ধানী, তালিবুল মাওলা অর্থে খুদা সন্ধানী। .. সুফীদের মতই তাঁরা বিশ্বাস করেন—আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান বটে তবে তিনি সর্বত্র ব্যাপ্তও বটে। কুল্লে শাইইন কাদির: কুল্লে শাইইন মুহিত। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, শুধু তাই নয়, সব কিছুই তাঁর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।"[৭৩]

রবীন্দ্রনাথ একালের কবিগুরু, লালন শাহ্ বাউল কবিগুরু। লালন ফকিরকে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন বাউল-কবি।

অবশ্য অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর বক্তব্যে প্রকাশিত যে এঁরা বেশরা অর্থাৎ খান্দানী সুফী নন। এঁরা আদর্শ সুফীর লৌকিক সংস্করণ। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা: ৩য় বর্ষ, ১৯৭৫)।

মুহম্মদ আবু তালিব বলেন,—লালনের বা তাঁর সাক্ষাত অনুসারীদের গানে (যথা পাঞ্জু শাহ্, দুদ্দু শাহ্, পাঁচু সাঁই প্রমুখ) আমি অন্ততঃ এমন কিছু পাই নি যাতে তাঁকে বেশরা, তান্ত্রিক বা বাউল মতবাদী বলা যেতে পারে। তাঁরা ছিলেন বিশুদ্ধ সুফীবাদের অনুসারী।"[৭৩]

নাট্যকার শ্রীদেবেন নাথ তাঁর সাঁই সিরাজ বা লালন ফকির নাটকে সিরাজ সাঁইকে পীর বলে অভিহিত করেছেন। এক্ষেত্রে বহু শিষ্যের মোর্শেদ লালন ফকির, পীর লালন শাহ্ নামে পরিগণিত হবেন এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বাংলা ১৩৭৯ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত "বাউল রাজার প্রেম" নামক এক আখ্যান-গ্রন্থে শ্রীপরেশ ভট্টাচার্য্য কয়েকটি কথায় যে লালন ফকিরের পরিচয়ের কিছুটা প্রকাশ করেছেন, সেখানে লালনকে দেখি পীরের শিরনী প্রদান মানসিকতায় আচ্ছন্ন। নিম্নে বর্ণিত কথোপকথনটি লক্ষ্য করবার মতন ;—

"লালন বলে,—ভাব্‌ছি কালই শিরণী দেই। কি বলো ?

সাকিনা বলে,—না, না, দুদিন সময় না থাকলে যোগাড়-যন্তর হবে কি করে ?"

" ·একটু বাদেই চরমোহনপুরের মোড়ল বাড়ির লোক জনেরা এসে পৌঁছায়। তাদের মুখ থেকেই শুন্‌লো লালন,—মোড়ল বাড়িব ছোট ছেলের অসুখ করেছিল, মানত ছিল। মানত ছিল, অসুখ ভালো হলে আসান-পীরের শিরনি দেবে। আজই সন্ধ্যায় শিরণী দেবার কথা।"

"গতরাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছে মোড়লবাড়ির কর্তা। কে একজন যেন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌ছে, ওরে—তুই শিরনী দিতে যা লালন সাঁই-এর আখড়ায়।"

"···শিরনী প্রসাদ গ্রহণ করতে আখড়া অঙ্গন-প্রাঙ্গণ জুড়ে বসেছে সবাই।"

"হিন্দু-মুসলমান, নর-নারী, কোন তফাৎ নেই। শীতল, ভোলাই, পাঁচু সা—এরা সব প্রসাদ বিতরণ করছে। তদারক করছে লালন আর কাঙাল হরিনাথ।"

পীরগণের সহিত বাউলগণের কয়েকট সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পীরগণের ন্যায় বাউলগণ তাঁদের সহজ মতবাদের কথা প্রচার করেন। সুফী বা পীরগণের কথায় আছে মানবতাবাদ,—বাউলগণের কথায় আছে মানবতাবাদ। পীরগণ তদীয় মুর্শেদগণের অনুগামী মুরিদ,—বাউলগণ তাঁদের প্রকাশধারায় তদীয় মোর্শেদগণের অনুগামী শিষ্য। পীরগণ সংসার-জীবনযাপন অপেক্ষা পরার্থে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন—বাউলগণও সংসার-জীবনযাপনকে গুরুত্ব দেন না যতখানি গুরুত্ব দেন পরের আধ্যাত্মিক জগতের ভাবরস তৃপ্তি লাভ করতে সহযোগিতা করার। পীরগণের শিষ্য হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় থেকে

এসেছেন,—বাউলগণের ক্ষেত্রেও তাই। কারো কারো মত যে পীর যেমন হজরত রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর থেকে প্রকাশিত,—বাউলও তেমন একই ধারায় প্রকাশিত। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আবু তালিব সাহেব লিখেছেন যে, পীরগণের মত লালন ফকির ও তাঁর সম্প্রদায়ের ধর্মমত এবং আচার-ব্যবহার শরীয়ত পন্থী মুসলিমদের সঙ্গে সর্বাংশে এক রকম না হলেও তাঁদের ধর্মমত ও আচার-ব্যবহার বেশ উদার ও উন্নত। কোন কোন ক্ষেত্রে ভক্তগণ কর্তৃক পীরের ন্যায় বাউলের মাজারে ধূপ-বাতি জ্বালানো হয়ে থাকে। পীরের পাঁচালী বা অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বাউল-জীবনীও রচিত হয়েছে।

বঙ্গের অধিকাংশ মুসলিম ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ বা হিন্দু। মুসলিম বাউলগণ মূলতঃ মুসলিমই। বঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু নিম্নবর্গীয়,—পীরভক্ত হিন্দু বা বাউলভক্ত হিন্দুগণ প্রধানতঃ নিম্নবর্গীয় এবং মূলতঃ হিন্দুই। পীরগণ প্রচার করেছিলেন ইসলামের আদর্শ,—বাউলগণও প্রচার করেছিলেন ইসলামেরই আদর্শ। এই সব মৌলিক কয়েকটি সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে লালন ফকির তথা বাউল সম্প্রদায়কে সুফী বা পীর পর্য্যায়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। লালন ফকির সম্পর্কে বেশ কয়েকখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো কাজ চলছে। সুতরাং বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে বাউলগুরু লালন ফকির সম্বন্ধে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পীরগণের সহিত বাউলগণের কয়েকটি বৈসাদৃশ্যও আছে। পীরগণ মানব কল্যাণের জন্য সচেষ্ট; বিশেষতঃ ঐতিহাসিক পীরগণের অনেকে তাঁদের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করে শহীদ হয়েছেন কিন্তু বাউলগণের লক্ষ্য মনের-মানুষ খুঁজে ফেরার আনন্দের সন্ধান দেওয়া এবং এর জন্য তাঁদের শহীদ হওয়ার কোন প্রশ্ন এতে জড়িত নেই। পীরগণ মহৎ কাজের পরিচয় রেখেছেন তাঁদের কাজের মধ্যে,—বাউলগণের পরিচয় তাঁদের রচিত বা গীত গানের মাধ্যমে যতখানি তাঁদের কাজের মাধ্যমে ততখানি নয়। পীরের ন্যায় বাউলের মাজারে হাজত, মানত এবং শিরনী দিবার রীতি প্রচলিত নেই। পীরের ন্যায় বাউলের নামে কোন দরগাহ্ বা নজরগাহ্ থাকে না।

এক কালে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বৌদ্ধ ধর্মাদর্শের নিকট পরাভূত হওয়ার পর পুনরায় যখন বৌদ্ধগণের অস্তিত্ব ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল এবং ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য প্রবল হচ্ছিল তখন মুসলিম মিশনারীর সাম্যাদর্শ বিশেষতঃ সুফী বা পীরদের মহত্ত্ব এবং মরমী হৃদয়ের সংস্পর্শ ও সেই সাথে তুর্কীগণের বিজয় অভিযান বৌদ্ধগণকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করে। ফলে এ দেশের মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নেড়ে (নেড়া থেকে) মুসলমান নামে অভিহিত হন। এই মুসলিমগণই ইসলামের কঠোর আচার-বিচারের অনুশাসন সঠিকভাবে অনুসরণ না করায় আজন্ম-লালিত সহজ ধর্মের গড্ডালিকা প্রবাহে বেশ কিছুটা ভেসে যান। সুফীবাদ এদিকে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ থেকে সরে আসা সাধারণ মানুষের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করল। তাতে মুসলিম ও হিন্দুর মধ্যে সংযোগ ও মিশ্রণের সেতু গড়ে উঠল।

In fact it was through Sufism that Islam really found a point of contact with Hinduism and an effective entrance to Hindu hearts.[৭৫]

রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অভ্যুদয় হয় যে বৌদ্ধ ধর্মের, সেখানেও দেখা যায় সুফী গুরুবাদের সঙ্গে সহজিয়া বৌদ্ধদের গুরুবাদের মিল রয়েছে। সহজিয়া বৌদ্ধদের মত সরহপাদের দোহায় আছে—তিনি চিন্তামণি, তাঁকে প্রণাম কর। তিনি ইচ্ছ ফল প্রদান করেন। চর্য্যায় আছে—

দিঢ় করিঅ মহাসুহপরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান॥—লুইপাদ।

বাংলা তর্জ্জমা :— দৃঢ় করি মহাসুখ কর পরিমাণ
লুই ভণে গুরুকে পুছিয়া ইহা জান॥

অর্থাৎ সোজা কথায় গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।

সুফীদেরও মতে :—

The first requirement for one desiring to follow the life of a Sufi, is to place himself under a guide who is called a Shykh or Pir, both words mean an 'elder' or a Murshid i.e., leader.[৭৬]

বাউলদের কাছে কায়া-সাধন এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রক্রিয়া। কবি আলাওল বলছেন ;—

"কোরাণে কহিছে প্রভু জপ মোর নাম"

মূল ইসলামে 'জিকির' অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার বিধান আছে। সূফীদের কাছেও আল্লাহের নাম জপের বিচিত্র রূপ দেখা যায়। তাঁরা মনে করেন যে প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে আল্লাহের নাম জপ চলছে। বাংলার বাউলদের সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থে লিখেছেন,—

"প্রতি প্রশ্বাসের সঙ্গে লা-ইলাহা এবং প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে 'ইল্লা-লা' জপ চলে।"[৭৬]

বাউলগুরু লালন ফকিরের প্রতি বাউলগণের ভক্তির পরাকাষ্ঠা অতুলনীয়। সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর স্থান হয়ত পীরের সমতুল নয়। তবে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব পরিলক্ষিত হয় না। বিশেষ করে বাউলগণের ভাবদ্যোতক গান বা দেশাত্মবোধক গান, রচয়িতা বা গায়কের প্রতি আপনা আপনিই সমীহভাব জাগিয়ে তোলে।

পীরগণ যেভাবে মানুষের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, বাউলের তুলনায় সেই ভাববোধক ধারার প্রকাশ যেন অন্যরূপ।

পীরগণ সামাজিক ভাবে নির্য্যাতিত মানুষের মুক্তি দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। বাউলগণ মানুষের মধ্যে বিভেদের প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করতে এসেছিলেন। লালন গাইলেন,—

আমি কোন জন জানি না সন্ধান।
সব লোকে কয় লালন ফকির
হিন্দু কি মুসলমান।
লালন বলে আমার আমি
না জানি সন্ধান॥

একই ঘাটে যাওয়া আসা
একই পাটনী দিচ্ছে খেয়া
কেউ খায় না কারো ছোঁয়া
বিভিন্ন জল কে কোথায় পান॥

লালন ফকিরের জন্ম ও বংশাদির পরিচয় দিয়ে এক গবেষক লিখেছেন যে,—লালন ফকির, লালন শাহ নামেও প্রসিদ্ধ। তাঁর বাড়ী ছিল যশোহর

জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত হরিনাকুণ্ডু থানার অধীন হরিষপুর নামক গ্রামে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মতান্তরে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম দরীবুল্লাহ দেওয়ান, মাতার নাম আমিনা খাতুন এবং দাদার নাম গোলাম কাদির। তাঁরা চার ভাই যথাক্রমে—কলম, আলম, লালন এবং চলম। তাঁর মোর্শেদ বা গুরুর নাম পীর সিরাজ শাহ। লালন ফকির অল্প বয়সেই বাপ-মা হারান। ভাইদের সংসারের স্বচ্ছলতা ছিল না। লেখাপড়া শেখার তেমন সুযোগ তাঁর হয় নি। গরু চরানো নিয়ে মাঠে মাঠে তাঁর ছোটবেলার দিনগুলি কেটেছে। এই সময়ে গ্রামবাসী সিরাজ সাঁই (সিরাজ বেহারা)-এর সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। উক্ত সিরাজ বেহারাই ছিলেন প্রসিদ্ধ পীর সিরাজ সাঁই বা সিরাজ শাহ। লালন তাঁর কাছেই দীক্ষা নেন। লালন তাঁর গুরুর এত অনুগত ছিলেন যে তিনি গুরুর পাল্কী-বহন পেশাও গ্রহণ করেছিলন। তিনি যে ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন এবং পরে মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন এরূপ ধারণা কল্পনা-প্রসূত।[৭৬]

লালন ফকির ছিলেন পীর সিরাজ সাঁই-এর প্রত্যক্ষ শিষ্য এবং সিরাজ সাঁই ছিলেন—ভারত তথা পৃথিবী বিখ্যাত পীর নিজামুদ্দীন আউলিয়ার নবম-স্থানীয় শিষ্য।

লালন শাহ ছিলেন তাত্ত্বিক কবি। গান হল তাঁর তত্ত্ব প্রচারের বাহন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন জীবন রসের রসিক। সুফী লালন ফকির বুঝি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যের রুমী ছিলেন। তাঁর বাউল গান মূলতঃ 'সিমা' নামক সংগীতের বিকৃত বা বিকল্প। সিল-সিলা অর্থাৎ নিষামী ফকিরগণের গজল গান ছিল তাঁদের অধ্যাত্ম সাধনার অঙ্গ বিশেষ। বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি অ-মুসলিম সাধকগণ বাউল গানে আকৃষ্ট হয়ে গানকে ধর্ম সাধনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। তাই কেউ কেউ এইরূপ বাউল বা বিকৃত 'সিমা' সংগীতকে বাউল গান না বলে ভাবগান বা মারেফতী গান নামে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে লালন ফকিরের গান হল বিশুদ্ধ সুফীবাদ অনুসারী গান।[৭৬]

তাত্ত্বিক কবি, জীবন রসের রসিক কবি, পল্লী বাংলার সাধারণ মানুষের মরমিয়া গায়ক এবং সুফী ফকির পীর লালন শাহ জীবনের শেষ দিকে কুষ্টিয়ার অন্তর্গত ছেঁউড়ে নামক গ্রামে আখড়া নির্মাণ করে বহু শিষ্যসহ দিনাতিপাত

করেন এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মতান্তরে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

১। বাউল রাজার প্রেম

'বাউল রাজার প্রেম' নামক আখ্যায়িকা গ্রন্থের রচয়িতার নাম শ্রীপরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তাঁর নিবাস বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রামে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১২ই জ্যৈষ্ঠ। পৃষ্ঠা সংখ্যা—১১২। খড়্গপুর মিলন মন্দির পুস্তক নম্বর ৪৬৩৫ ক্রমিক নম্বর ১৩৬৭।

লেখক এই গ্রন্থে লালন ফকিরের সরস কাহিনী বিবৃত করেছেন। ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, প্রকাশভঙ্গী তেমনি চিত্তাকর্ষক। তবে লেখক মুখবন্ধে বলেছেন ;—

"লালন ফকির এমন একজন মানুষ, যাঁর তুলনা তিনি নিজে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন-কথা কোথাও পাওয়া যায় না। কিংবদন্তীর মতই নানা কাহিনী তাঁর জীবন নিয়ে। আমার এ কাহিনীকে কেউ যেন তথ্যবহুল জীবন-কথা বলে গ্রহণ না করেন। এ কাহিনী এক কিংবদন্তী-নির্ভর রেখা চিত্র—যার মধ্যে আমি সেই বাউল রাজার জীবনকে দেখতে চেয়েছি।"

লেখকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই গ্রন্থ ঐতিহাসিক নীরস-সরস তথ্য দিয়ে মস্তিষ্ক-শ্রমের উপযোগী নয়,—একটা ঘটনা-ভিত্তিক আকর্ষণীয় জীবন কাহিনী,—অতএব তা রস-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

২। সাঁই সিরাজ বা লালন ফকির

সাঁই সিরাজ বা লালন ফকির নামক গ্রন্থখানি একটি নাটক। নাট্যকারের নাম শ্রীদেবেন নাথ। নাট্যকারের বসতি বসিরহাটে। তিনি আরো নাটকের রচয়িতা এবং একজন সু-অভিনেতাও বটে। নাটকের কভার পৃষ্ঠায় সিরাজ সাঁই এর নাম বড় হরফে এবং লালন ফকিরের নাম ছোট হরফে থাকলেও নাটকখানি পাঠকালে সহজেই বোঝা যায় যে মূলতঃ তাতে লালন ফকিরের কথাই বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে। শ্রীপরেশ ভট্টাচার্য্যের বাউল-রাজার প্রেম গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বনে যে এই নাটক লেখা হয়েছে তা নাট্যকারের দেওয়া ভূমিকা থেকে বোঝা যায়। নাট্যকার এই নাটকখানিকে উৎসর্গও করেছেন 'বাউল রাজার প্রেম' রচয়িতাকে। নাটকটির প্রকাশকাল ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।

ইহা কলিকাতার নট্ট কোম্পানী কর্তৃক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতও হয়েছে। মহেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ এর অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সাঁই সিরাজ নাটকখানি পঞ্চ অঙ্কে রচিত। প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে চারটি করে, তৃতীয় অঙ্কে পাঁচটি এবং পঞ্চম অঙ্কে একটি দৃশ্য আছে।

হিন্দু-মুসলিম মিলিয়ে প্রায় বিশটি চরিত্র এতে স্থান পেয়েছে। চারটি নারী চরিত্রের দুইটি মুসলিম রমণীর।

সাকিনা নাম্নী মুসলিম রমণী কর্তৃক গাওয়া একটি গীত, লালন ফকিরের বিখ্যাত দু খানি গীত এ নাটকের ভূষণ-স্বরূপ।

লালন ফকিরের নামে বহুল প্রচারিত এবং বহুজনের জানা জীবন-কথা বিবৃত করার প্রয়োজন আপাততঃ নেই। তবে এতে সাঁই সিরাজ বা লালন ফকিরের মাহাত্ম্য কথা যত প্রচারিত তার চেয়ে অনেক বেশী প্রচারিত হয়েছে —'মানবতা'র কথা। সেখানে হিন্দুর কথা নেই, নেই শুধু মুসলমান নামধারীর কথা। ধর্মের নাম করে অধর্মের কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে বুঝি বিক্ষুব্ধ হয়ে লালনের প্রতিবেশী দীনু বলেছে,—(আসছে) বিদ্রোহীর দল। যারা এই গোটা জাতকে চাবুক মেরে বুঝিয়ে দেবে, ধর্ম বড় নয়—জাত বড় নয়, সকলের চেয়ে বড় হল মানুষ।

সিরাজ সাঁই তাই স্বার্থান্বেষীকে তিরস্কার করে বলেছেন,—মানুষ জাতটা যে কত বড়—শালাদের তা বোঝান হয় নি রে। মোল্লা আর সমাজপতিরা এদের ঠকিয়ে এতকাল শুধু নিজেদের কাজ গুছিয়েছে.........। শ্রীচৈতন্য,—জগাই-মাধাইকে কোল দিল, হজরত মহম্মদ—আল্লাহ্‌তালার দূত হয়ে কত শিক্ষার বাণী ছড়াল, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ছোট জাতের মানুষগুলোকে নিয়ে মাথায় তুলে নাচল—তবু শালার জাতের চোখ ফুটল না।

নাট্যকারও নিজে বলেছেন তাঁর ভূমিকাতে—মানুষ কোথায় ?......ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে মানুষ। শুকনো গাছে ফুল ফোটাতে চায়। মরা সাহারায় আনতে চায় জীবনের জোয়ার। কিন্তু ? পায়ে পায়ে কাঁটা। মানুষ জানোয়ারের বিষাক্ত নখ চলার পথকে করে দেয় ক্ষত-বিক্ষত। তাই জাত-ধর্মের গণ্ডী ভেঙে ক্ষ্যাপা চায় শুধু অবক্ষয়ী সমাজের অবহেলিত কয়েকটি মানুষ, যারা মাটিকে সাজাবে মা—স্বর্গ আর বেহস্তকে টেনে আনবে এই মাটির বুকে।

তবে কি ধর্মে-কর্মে লালন ফকিরের কোন আস্থা ছিল না! এ সম্পর্কে লালন এক স্থানে গেয়েছেন ;—

না হলে মন সরলা কি ফল ফলে কোথা খুঁড়ে
হাটে হাটে বেড়াই মিছে তওবা পড়ে।
মক্কা-মদিনা যাবি ধাক্কা খাবি মন না মুড়ে।
হাজি নাম পড়ছে লোকে তাই দেখি রে ॥
মুখে যে পড়ে কালাম তাইরি সুনাম হুজুর বাড়ে
মন খাঁটি নয় বল্‌লে কি হয় নামায পড়ে।
খোদা তাতে নারাজ নয় রে লালন ভেড়ে ॥

পীর-সাহিত্যের কথা প্রসঙ্গে লালন ফকিরের কথা কিছু আলোচনা করা হল মাত্র। বাউল সম্প্রদায়ের সংখ্যা বঙ্গে নগণ্য নয়। তাঁদের গুরু লালন ফকিরসহ অন্যান্যের কথা ও তাঁদের সকলের গান বিষয়ে বিস্তৃততর গবেষণার অপেক্ষা রাখে। সুতরাং এখানে আরো অধিক কিছু আলোচিত হওয়ার প্রয়োজন আপাততঃ নেই।

————

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

শফীকুল আলম

পীর হজরত শফীকুল আলম্ রাজী এ দেশে বিশেষতঃ উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসত অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে হজরত শফীকুল আলম রাজীর পবিত্র রওজা শরীফ বারাসত থানার কেমিয়া-খামারপাড়া নামক গ্রামে বিদ্যমান। হজরত শফীকুল আলম অনেকের নিকট "ছেকু দেওয়ান" নামে অভিহিত।

কবি মহম্মদ এবাদুল্লাহ্ একস্থানে লিখেছেন,—

এইরূপে গোরাচাঁদ আসিল চলিয়া,
কিছু দিনে হিন্দুস্তানে পৌছিল আসিয়া।
ছোন্দলের সহ গোরা চলিতে চলিতে,
একদল পীর সঙ্গে দেখা দিল পথে।...
...গোরাই জিজ্ঞাসা করে সকলের তরে,
কোথায় চলেছ ভাই কহ দেখি মোরে।...
...ছেকু দেওয়ান কহে মোর জাইগীর,
খামারপাড়া নগরে দিয়াছে কাদির।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে হজরত শাহজালাল রাজী ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে কয়েকটি ধর্ম প্রচারক দল বঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তাদের মধ্য হতে বাইশ জন আউলিয়ার একটি দল দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় ইসলাম প্রচারের ভার পান। গফুর সিদ্দিকী সাহেব আরো লিখেছেন যে, হজরত শাহ জালাল রাজী নিজে ৩০১ জনের এক কাফেলা বা ধর্মপ্রচারক দল সহ মক্কা থেকে দিল্লীতে উপনীত হওয়ার পর তাতে আরো ৯ জন মুজাহিদ যোগদান করেন। পরে আসামের শ্রীহট্টে আগমনের পথে আরো ৫১ জন মুজাহিদ যোগদান করেন। তিনি উক্ত মোট ৩৬১ জনের দলকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ

করেন। তাদের মধ্যকার একটি দল হজরত গোরাচাঁদ রাজীর নেতৃত্বে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে আসেন, যে দলে উক্ত শফীকুল আলমও ছিলেন।

কেমিয়া-খামারপাড়া গ্রাম-সংলগ্ন মাঠে উক্ত শফীকুল আলম রাজীর দরগাহটিকে স্থানীয় অধিবাসীগণের অনেকেই হজরত বড়পীর সাহেবের দরগাহ বলে অভিহিত করেন।

কেমিয়া-খামারপাড়ার দরগাহ্-গৃহটি ইটের তৈরী, ছাউনী টালীর। দরগাহ-স্থানের জমির পরিমাণ প্রায় দুই বিঘা। এই জমির মধ্যে কয়েকটি গাছ-গাছালি আছে, আছে ছোট একটি পুকুর। পুকুরটি পীর-পুকুর নামে অভিহিত। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নবাবপুরের অধিবাসী মোহম্মদ আমীর আলী শাহজী উক্ত দরগাহের বর্তমান সেবায়েত। তাঁর বয়স প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর। তাঁর পিতার নাম মরহুম বিলায়েত আলি শাহ্জী। বংশানুক্রমে তাঁরা এই দরগাহের সেবায়েত।

ভক্ত জনসাধারণ এই দরগাহে হজরত বড়পীরের নামে হাজত, মানত ও শিরনি দিয়ে থাকেন। প্রতি বৎসর একুশে মাঘ তারিখে উরস আরম্ভ হয় এবং সেই উপলক্ষ্যে মেলা বসে। সাত-আটদিন ধরে মেলা চলে। মেলায় গড়ে প্রতিদিন প্রায় তিন-চারি হাজার লোকের সমাবেশ হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল ভক্ত নর-নারীর মিলনস্থল বলে এই দরগাহ্ স্থানটিও বিশেষত্ব অর্জ্জন করেছে।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব, কবি মহম্মদ এবাদোল্লা এবং স্থানীয় জনমতের মধ্যে পীর হজরত শফীকুল আলম রাজী সম্পর্কিত বক্তব্যে যে বৈসাদৃশ্য দেখা যায় সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে শফীকুল আলম্ এসেছিলেন আসামের শ্রীহট্ট থেকে পীর গোরচাঁদের নেতৃত্বাধীন কাফেলার সঙ্গে। কবি এবাদোল্লা সাহেব লিখেছেন যে বালাণ্ডা পরগনায় আগমনের পথে পীর গোরাচাঁদ দেখ্‌তে পান (ছেকু দেওয়ান) শফীকুল আলমকে।

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব একাদশখানি প্রাচীন পুঁথির প্রামাণ্য সূত্র ধরে তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। কবি মহম্মদ এবাদোল্লা পারশী ভাষায় লিখিত পুঁথির অনুবাদের নকল

থেকে নিজে কাব্যখানি লিখেছেন। অনুবাদের নকল থেকে গৃহীত কাহিনীর নির্দ্দিষ্ট উক্ত শফীকুল আলম (ছেকু দেওয়ান) সম্পর্কিত বক্তব্যকে সঠিক বলে কতখানি গ্রহণীয় সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে বোঝা যায় আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী তথা পীর হজরত শফীকুল আলম্ রাজী দক্ষিণ–পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। আর পীর মোবারক বড়খাঁ গাজী উক্ত অঞ্চলে আগমন করেছিলেন আনুমানিক ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে। বড়খাঁ গাজীর পবিত্র মাজার শরীফ ঘুটিয়ারী গ্রামে অবস্থিত। স্বয়ং বড়খাঁ গাজী, হজরত বড়পীর সাহেবের নজরগাহ প্রতিষ্ঠা করে ভক্তগণকে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করার উৎসাহ সৃষ্টি করে গেছেন। স্বাভাবিকভাবে প্রায় দুই-তিন শত বৎসর পরে শফীকুল আলম রাজীর নিষ্প্রভ অবস্থিতির উপর বড় খাঁ গাজী দ্বারা অনুসৃত হজরত বড়পীর সাহেবের প্রভাব বিস্তৃত হয়ে থাকতে পারে।

———

ষট্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

শাহ্‌ সুফী সুলতান

হজরত শাহ্‌সুফী সুলতান রাজীর কথা স্মরণ করেছেন ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা রূপরাম চক্রবর্তী। পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়ায় শুভি খাঁ বা শাহ্‌ সুফি ত্রিপর্নী বা ত্রিবেনীর দরাপ খাঁ বা দফর খাঁ গাজীর ভাগিনেয় বলে কথিত।[৫৯] ৭৯৬ হিজরীতে সুলতান গিয়াসুদ্দীন প্রেরিত ওলিগনের অন্যতম শাহ্‌ সুফি সুলতান এক দল পরাক্রমশালী সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডুয়াতে আধিপত্য বিস্তার-কল্পে আগমন করেন। মতান্তরে শাহ্‌ সুফী সুলতান ১২৯০ খৃষ্টাব্দে আগমন করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত অলি-আল্লাহ্‌ বুআলী কলন্দরের অন্যতম প্রধান শিষ্য। কথিত তিনি বাঙলায় সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের আত্মীয় ছিলেন।[২৪] "দিল্লীর তখতে তখন ফীরোজ-শাহ আসীন। অভিযোগ শুনে তার ভাইপো শাহ সুফীকে পাঠালেন ফৌজ দিয়ে পাণ্ডুয়ায়।"[২] পাণ্ডু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি পাণ্ডুয়াতে আজীবন ছিলেন। শামসুর রহমান চৌধুরী লিখেছেন যে ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামের রাজা ভূদেবের সহিত যুদ্ধে মুসলমানর বিজয়ী হলেও শাহ্‌ সুফী সুলতান রণাঙ্গনেই শাহাদাৎ বরণ করেন।[২৪]

হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ায় পীর হজরত শাহ্‌ সুফী সুলতানের মাজার বিদ্যমান। মাজারটি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড-এর ধারে অবস্থিত। ইট-নির্মিত গৃহের মধ্যে রঙীন বস্ত্র-দ্বারা আবৃত সে মাজার। এটাই শাহ্‌ সুফী সুলতানের দরগাহ। দরগাহের সামনে মসজিদ—টালি দিয়ে ছাওয়া। তার বাম দিকে ঈষৎ জঙ্গল, সামনে বাম দিকে হজরত শাহ্‌ সুফী সুলতান হিফ্‌জ মাদ্রাসা। উক্ত মাদ্রাসা ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এখানেই আছে আঞ্জুমানে খেদ্‌মাতুল ইসলাম। প্রধান কার্য্যালয়—সিনেমাতলা, পাণ্ডুয়া। স্থাপিত ১৩৭৪ বাংলা সাল। দরগাহ্‌ ও মসজিদ সংলগ্ন স্থানে রয়েছে কবরখানা। আম ও অন্যান্য গাছে ছায়াচ্ছন্ন স্থানটি বেশ মনোরম।

শাহ্ সুফী সুলতানের দরগাহের বর্তমান সেবায়েত জানাচ্ছেন যে,—তাঁর নাম সৈয়দ আমীর আলি। তাঁর পিতার নাম মরহুম খোদা নেওয়াজ। তার বয়স আনুমানিক ৫৫ বৎসর (১৯৫১ খৃষ্টাব্দে)। তাঁরা স্থানীয় লোক। শাহ্ সুফী সুলতান এতদ্ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে এলে তাঁদের পূর্ব পুরুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা সেই সময় থেকেই পীর শাহ্ সুফী সুলতানের দরগাহের খাদিম বা সেবায়েত হয়ে আছেন।

প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ থেকে এখানে এক মাসের মেলা আরম্ভ হয়। সতেরই মাঘ পীরের এন্তেকালের দিন। ঐ দিনে উরুস অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে মিলাদ হয়, কোরান শরীফ থেকে পাঠ হয় এবং অতিথি সেবা হয়। এখানে রোজ সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি দিয়ে জিয়ারত করা হয়ে থাকে।

হিন্দু ও মুসলিম ভক্তগণ পীর শাহ্ সুফী সুলতানের দরগাহে হাজত দিয়ে থাকেন। এখানে মোরগ এবং ছাগল হাজত দেওয়া হয়। ভক্তগণ মানত হিসাবে দুধ, বাতাসা, ফল, পয়সা ইত্যাদি দেন। তাছাড়া শিরনিও প্রদত্ত হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে এখানে কোন প্রকারে গোমাংস ব্যবহার নিষিদ্ধ।

পীর শাহ্ সুফী সুলতান, ভক্তগণের নিকট পীরবাবা নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ। সভক্তি বিশ্বাসে ভক্তগণ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে বাবার মাকবারা ধৌত করতঃ অর্থাৎ সমাধি স্নান করিয়ে সেই 'পানি' গ্রহণ করেন। তাতে নাকি বহু ভক্তের নানাবিধ রোগ নিরাময় হয়ে থাকে। ভক্তগণ ব্যথা বেদনা, কান পাকা ইত্যাদি নানাবিধ রোগ নিরাময়ের কারণেও এই দরগাহ্ থেকে তেল-পড়া নিয়ে ব্যবহার করেন। মুসলিমগণ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক হিন্দু পীরবাবাকে ভক্তি করেন।

রাজপথের অপর পার্শ্বে রয়েছে সুউচ্চ মিনার। উহা শাহ সুফী সুলতানের বিজয়-স্তম্ভ। তার ভিতরে কোন খোদিত মূর্ত্তি চিহ্ন নেই। পাশের মাঠেই আছে পাণ্ডু রাজার প্রাসাদ ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ। উক্ত মিনারের কালো রঙের বিরাট আকারের স্তম্ভ এবং দেওয়ালের অবস্থিতি দেখে তার বিশালত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার সুযোগ থাকে না। মিনার এবং অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত। এর অভ্যন্তরে প্রবেশের মুখে বাম দিকে একটি বিরাটাকার পাথরের স্তম্ভ আছে। তাতে মূর্ত্তি খোদিত ছিল বলে অনুমিত হয়। তার বিশেষ বিশেষ স্থান এমনভাবে

ভেঙেছে, যা থেকে কোনটির মূর্ত্তিচিহ্ন নির্দিষ্টকরণ দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। অনুরূপ স্তম্ভ পাশে মাঠে পড়ে থাকৃতে দেখা যায়। পীরবাবার দরগাহের সেবায়েত সৈয়দ আমীর আলী জানান যে, তিনি যখন কিশোর বয়সী, সেই সময় ওই স্তম্ভটি মিনারের অভ্যন্তর মুখে এনে বসানো হয়েছিল।

সাগুফি সুলতান বা পাড়ুয়ার কেচ্ছা

মহীউদ্দিন ওস্তাগর বিরচিত পাঁড়ুয়ার কেচ্ছা সম্পর্কে আচার্য্য ডঃ সুকুমার সেন যা লিখেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন যে,—ত্রিবেণী অঞ্চলের মুসলমান-আধিপত্য বিষয়ক জনশ্রুতির উপর জোব্ড়া রঙ বুলিয়ে শান্তিপুর নিবাসী মহীউদ্দীন ওস্তাগর কর্তৃক এই কেচ্ছা রচিত, যার মূলে কোন হিন্দী বা উর্দ্দু কেতাবের প্রভাব আছে।

শান্তিপুর নিবাসী মহীউদ্দীন ওস্তাগর রচিত পাচাঁলীর যে কাহিনী পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত রূপ ;—

পাণ্ডুয়া নগরের রাজা পাণ্ডু। রাজবাটীর অভ্যন্তরে ছিল পবিত্র জলের কুণ্ড, যাতে তেত্রিশ কোটি দেবতার অধিষ্ঠান। সে কুণ্ডের জলস্পর্শে মৃত ব্যক্তি জীবিত হত।

তাঁর রাজত্বে পাণ্ডুয়ায় ছিল মাত্র পাঁচ ঘর মুসলমান।

কাফেরের কাছেতে মোমিন মোছলমান
বাঘের নিকটে রইত বকরির সমান।
এছলামের কারবার করিতে নারিত
করিলে পাণ্ডব-রাজা সাজা দেলাইত।

দারুণ দুঃখিত হয়ে মুসলমানগণ পাণ্ডু রাজের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গোপনে আল্লার নিকট প্রার্থনা জানালেন।

একদিন এক মুসলিম-প্রজা তদীয় পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গোবধ করলেন। প্রতিবেশী হিন্দুরা এই ঘটনার কথা জানৃতে পেরে ঐ মুসলিমের পুত্রকে হত্যা করলেন। তিনি রাজার নিকট অভিযোগ করলেন। রাজা সে অভিযোগ গ্রাহ্য করলেন না। তিনি তখন চলৃলেন দিল্লীতে পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে। ইচ্ছা এই যে,—

আনিব সঙ্গেতে করি পাণ্ডব-শহরে
লড়িয়া পাণ্ডব-রাজে দিব ছারখারে।

দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ্ অভিযোগ শুনে ভাইপো শাহ সুফীকে ফৌজ দিয়ে পাঠালেন পাণ্ডুয়ায়। সফৌজ শাহ সুফী বালুহাটায় এসে তাঁবু ফেল্লেন। আরম্ভ হল যুদ্ধ। যুদ্ধ আর শেষ হয় না। জীয়ত-কুণ্ডের প্রভাবে রাজার সব নিহত সৈন্য জীবন ফিরে পায়। শাহ্ সুফী রাজার সঙ্গে পেরে ওঠেন না। এক বছর যুদ্ধ করে শাহ্ সুফী হতাশ হয়ে দিল্লীতে ফিরবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় নগর ঘোষ নামক এক গোয়ালা-প্রজা তাঁর কাছে এসে জীয়ত-কুণ্ডের রহস্য প্রকাশ করল। নগর ঘোষ নিজে মুসলমান হল এবং যোগীর ছদ্মবেশে রাজার অন্দর মহলে গোপনে গিয়ে জীয়ত-কুণ্ডে গোমাংস নিক্ষেপ করল। এবার জীয়ত-কুণ্ডের জীবন প্রত্যার্পন-মাহাত্ম্য বিনষ্ট হয়ে গেল। রাজসৈন্য নিহত হলে সে আর জীবন ফিরে না পাওয়ায় রাজা প্রমাদ গণলেন। কোন উপায় না দেখে রাজা এবং রাজমন্ত্রীরা সপরিবারে ত্রিবেণীতে গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু বরণ করলেন। পাণ্ডুয়া মুসলিম ফৌজের অধিকারে এল। শাহ্ সুফী এক বিরাট মসজিদ নির্মান করে সেখানেই রয়ে গেলেন আজীবন।

কাহিনী দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যায় যে এতে ইসলাম ধর্মের অভিযানের জয়গৌরব প্রকাশিত হয়েছে। এই অভিযানের স্থানীয় পরিচালক শাহ্ সুফী সুলতানের মাহাত্ম্য-কথাও প্রচারিত হয়েছে।

পাঁড়ুয়ার কেচ্ছায় বর্ণিত জীয়ত-কুণ্ডের অলৌকিক ক্ষমতার তুলনা যথাক্রমে গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্য ও পীর গোরাচাঁদ কাব্যে পাওয়া যায়। পাণ্ডুয়ার রাজা ও রাজমন্ত্রীগণের সপরিবারে জলে ডুবে আত্মহত্যা করার ঘটনার তুলনা পাওয়া যায় পীর গোরাচাঁদ কাব্যে, ঠাকুরবর সাহেবের কাহিনীতে, শাহ্ সুলতান বল্‌খীর কাহিনী এবং আরো কয়েকটি কাহিনীতে।

মহীউদ্দিন ওস্তাগর পাণ্ডুয়ার রাজা পাণ্ডুর নাম উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে শামসুর রহমান চৌধুরী লিখেছেন ভুদেব নামক রাজার নাম।[২৪] অথচ রাজা ভুদেবের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল জাফর খাঁর পুত্র অগওয়ান খাঁর ;—তাতে ভুদেব নিহত হন।[৫৯] আমরা দুইটি পাণ্ডুয়ার কথা ইতিহাসে পাচ্ছি। তারা যথাক্রমে ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া এবং ভুরশুট-পাণ্ডুয়া। এখানে ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া বা ছোট পেঁড়োর কথা বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি নামক গ্রন্থে বিনয় ঘোষ লিখেছেন ;—"ভুরশুটে পাণ্ডু নামে এক রাজা ছিলেন—ইনি ছিলেন

কায়স্থ রাজা পাণ্ডু দাস। এই কায়স্থ রাজা ও ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়ার পাণ্ডু রাজার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।" আবার ফুরফুরার ইতিহাস ও আদর্শ-জীবনী গ্রন্থে গোলাম ইয়াছিন লিখেছেন,—"হজরত শাহ্ ছুফি সোলতান সাহেব সৈন্যদলকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন, তিনি স্বয়ং একদল সৈন্যসহ পাণ্ডুয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। অন্যদলকে সেনাপতি হজরত শাহ্ হোছেন বোখারির নেতৃত্বে "বালিয়া-বাসন্তী" অভিমুখে প্রেরণ করেন।" উক্ত হোছেন বোখারির সঙ্গে বাগদী রাজার সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এখানেও বাগদী রাজার 'জীয়ত-কুণ্ডের' কথা আছে। অতএব মহীউদ্দিন ওস্তাগর উল্লিখিত ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়ার রাজার অস্তিত্ব ঐতিহাসিক হলেও সেই রাজার নাম বিষয়ে প্রশ্নের সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না।

পাঁড়ুয়ার কেচ্ছা প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,—"উত্তরবঙ্গে মহাস্থানের ঐতিহ্য নিয়ে আবদুল মজিদ লিখেছিলেন 'ছোলতান বলখি'।[২] বলা বাহুল্য, শাহ্ সুফী সুলতান এবং শাহ্ সুলতান বলখি এক ব্যক্তি নন। ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস অংশে দেখা যায় তিনি সুলতান গিয়াসুদ্দীনের অভিলাষ-ক্রমে শাহ্ সুফী সুলতানের সহিত এতদ্অঞ্চলে আগমন করেন এবং বালিয়া-বাসন্তীপুরের বাগদী রাজার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন। আবার শামসুর রহমান চৌধুরীর বক্তব্যে শাহ্ সুলতান বলখি প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের রাজধানী পৌণ্ড্রনগর (বর্তমান নাম মহাস্থান) নামক জায়গায় কিংবদন্তী অনুযায়ী বলাখের রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করে সাধকের জীবন গ্রহণ করেন।

আবদুল মজিদ সাহেবের গ্রন্থ 'ছোলতান বল্খি' দুষ্প্রাপ্য।

———

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

শাহ চাঁদ

পীর হজরত ইলিয়াস রাজী ওরফে পীর শাহ চাঁদ রাজী এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। তিনি পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজীর নেতৃত্বাধীন কাফেলার সহিত সিলহটের দেশ বিখ্যাত পীর হজরত শাহ্ জালাল রাজীর অনুমতিক্রমে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বাদুড়িয়া থানাধীন আঁধারমানিক গ্রামে জায়গীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[৪০]

পীর হজরত ইলিয়াস রাজী কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায় না; তাঁর বংশেরও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী মনে হয় তিনি আরব বা পারশ্য বা ঐ অঞ্চলের কোন স্থান থেকে আগমন করেছিলেন। আঁধারমানিক গ্রামেই তিনি এন্তেকাল বা মৃত্যুবরণ করেন। এই গ্রামেই তাঁর রওজা শরীফ বিদ্যমান। তাঁর সেই সমাধির উপর ভক্তগণ এক সুরম্য সৌধ নির্মাণ করেছেন। সেই দরগাহের সেবায়েতগণের অন্যতম কাজী গোলাম রহমান সাহেবের কাছ থেকে জানা যায় যে উক্ত পীর এতদ্ অঞ্চলে পীর হজরত শাহ চাঁদ রাজী নামেই প্রসিদ্ধ। বাদুড়িয়া, হাবড়া, বসিরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত। পৌষ সংক্রান্তিতে তাঁর স্মৃতি উপলক্ষে ওরস হয়। এতে মনে হয় ঐ দিনই তাঁর মৃত্যুর দিন; কিন্তু কোন্ সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল তা জানা যায় না।

পীর হজরত শাহ চাঁদ রাজীর পবিত্র রওজা শরীফের উপর সেবায়েত ও অন্যান্য ভক্তগণ ইষ্টক নির্মিত যে সুদৃশ্য দরগাহ-গৃহটি নির্মান করেছেন তা প্রায় দশ বিঘা পীরোত্তর জমির মধ্যকার একস্থানে অবস্থিত। সেবায়েতগণ প্রতিদিন দরগাহে ধূপ-বাতি দিয়ে থাকেন। প্রতি শুক্রবার সেখানে বহু ভক্ত-যাত্রীর সমাগম হয়। তাঁরা শিরনি হাজত ও মানত দিয়ে থাকেন। ভক্তগণ রোগমুক্তির আশায় ফুল, তেল, মাটি ও পানি গ্রহণ করেন। তাঁরা গাছের প্রথম ফল, গাভীর প্রথম দুধ, মিষ্টি প্রভৃতি পীরের দরগাহে দান করেন। প্রতি

পৌষ সংক্রান্তিতে ওরসের সময় দশ-বারো দিন ধরে প্রায় দুই হাজার জনসমাবেশ হয়। এই সময়ে এখানে মেলা হয়। সেই মেলায় অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে কাওয়ালী গান হয়। উৎসবের এই সময়েও বহু ভক্ত লুট দেন। বহু বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভের আশায় দরগাহের গায়ে ইট ঝুলিয়ে থাকেন এবং ইপ্সিত ফল লাভের পর জাঁক-জমকের সাথে দরগাহে এসে মানত দান করেন এবং সেই ঝুলানো ইট খুলে দিয়ে যান।

পীর হজরত শাহ্ চাঁদ রাজীর জীবনী ভিত্তিক কোন সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

পীর শাহচাঁদ রাজী যেহেতু পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজীর সঙ্গে এই অঞ্চলে এসেছিলেন, তাতে অনুমান করা যেতে পারে যে তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ধর্মপ্রচারক।

আঁধারমানিক গ্রামে মাটির নীচে বহু পুরানো কালের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এই ভগ্নাবশেষ থেকে অনুমিত হয় যে এখানে কোন ঐতিহাসিক তথ্য অবশ্যই নিহিত আছে।

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামের পীর হজরত হাসান রাজীর নামের অপভ্রংশে ব্যবহৃত 'সাসান' বা শাহচাঁদ আর আঁধারমানিক গ্রামের শাহচাঁদ যে একই ব্যক্তি তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব তাঁর গ্রন্থে ঐ দুই স্থানের দুই পীরকে একই ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেন নি।

শাহ চাঁদ নামধারী আর একজন বিখ্যাত আউলিয়ার নাম পাওয়া যায়। তাঁর মাজার শরীফ আছে চট্টগ্রাম জেলার 'পটিয়া' থানার নিকটবর্তী শ্রীমতি খালের তীরে। কথিত আছে যে, তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং দিল্লীতে আত্মগোপন করে বাস করতেন। ঘটনাক্রমে তাঁর কেরামত বা অলৌকিক শক্তির কথা প্রকাশ পায়। জনৈক শাহজাদী তাঁকে বিয়ে করতে চান। তখন দরবেশ শাহচাঁদ পালিয়ে চট্টগ্রামে আসেন। কিছুদিন পরে শাহজাদীও লোকজনসহ চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। তারপর হঠাৎ একদিন সেই দরবেশ ইন্তেকাল করেন। তিনি ষোল শতকে জীবিত ছিলেন।[৬১]

শাহচাঁদ দিল্লী থেকে চট্টগ্রামে যাবার পথে আঁধারমানিক নামক গ্রামে অবস্থিতি করেছিলেন কিনা জানা যায় না। অথবা উক্ত দুই শাহ চাঁদ একই

ব্যক্তি কিনা তারও কোন প্রমাণ নেই। শেষোক্ত শাহ চাঁদের সমাধি এই গ্রামে আছে বলে মনে হয় না। চট্টগ্রামের পীর শাহ চাঁদ ষোড়শ শতাব্দীর লোক হওয়ায় পীর গোরাচাঁদ ও সমকালীন পীর শাহ চাঁদের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যকার ব্যবধানকে উপেক্ষা করা যায় না। অতএব কেবলমাত্র নামের মিলগত ভিত্তিতে উক্ত দুই পীরকে একই ব্যক্তি বলে মনে করার কোন কারণ নেই। তবে যদি চট্টগ্রাম বা বসিরহাটের আঁধারমাণিক গ্রামের যে কোন একটি পীরস্থানের পক্ষে কাল্পনিক পীরস্থান বলে প্রমাণিত হওয়ার মত তথ্য পাওয়া যায়, তবে উভয় পীরকে এক ব্যক্তি বলে মনে করার কোন বাধা নেই।

নোয়াখালি জেলার উত্তর হাতিয়াতে জনৈক হজরত চাঁদশাহ্ সাহেবের মাজার শরীফ আছে বলেও জানা যায়।[৬১]

পীর হজরত শাহ্‌চাঁদ রাজীর কীর্তিকলাপ বিষয়ক জাবনী ন পাওয়া গেলেও এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি লোককথা থেকে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। সে লোককথাগুলি নিম্নরূপ :—

১। **রায়মনির দহ**

আঁধারমাণিক নামক গ্রামের পাশ দিয়ে স্রোতস্বিনী ইচ্ছামতী প্রবাহিতা। গ্রাম সংলগ্ন ইচ্ছামতীর এক শাখা এই স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে। এই গ্রামে বাস করতেন এক ব্রাহ্মণ রাজা। এই অঞ্চলে পীর শাহ চাঁদ ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে আগমন করলে রাজা তাঁকে সুনজরে দেখেন নি। ক্রমান্বয়ে প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে উক্ত রাজার সঙ্গে পীর শাহচাঁদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আঁধারমাণিক অঞ্চলের রাজা ছিলেন দক্ষিণের আঠারো ভাটির রাজা দক্ষিণ রায়ের ভক্ত। তিনি দক্ষিণ রায়ের সহায়তায় ভূত-প্রেতকে পীরের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেন। পীরের পক্ষেও ছিল তাঁর বাহন বাঘ ও কুমীর। বাঘ ও কুমীর সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। কিন্তু পীরের অলৌকিক শক্তিবলে রাজার পরাজয় ঘটে। রাজা তখন আত্মসম্মান রক্ষার্থে সপরিবারে গ্রামসংলগ্ন ইচ্ছামতীর শাখা নদীর মধ্যস্থ বাওড়ের জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন। রায় উপাধিধারী সেই রাজার নাম অনুসারে ঐ বাঁওড়ের দহের নামকরণ হয়েছে রায়মণির দহ।

২। নাটাম ফাটাম

পীর শাহ্চাঁদ একজন সাধারণ ফকিরের রূপ ধরে এতদ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন প্রাতঃকালে তিনি আঁধারমাণিক গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। চল্‌তে চল্‌তে দেখতে পান যে একজন চাষী তার ক্ষেতে চাষ কাজে ব্যস্ত আছে। সেই চাষী সেখানকার জমিতে কি ফসল করবে পীরের তা জানবার কৌতূহল হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—"কিসের বীজ বুন্‌ছ ভাই ?"

কৃষকটি ফকির সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল। সামান্য একটা ফকিরের এত খোঁজ নেওয়া কেন। সে তাচ্ছিল্য ভরে বলল,—"নাটাম-ফাটাম"।

'নাটাম-ফাটাম' হল একজাতীয় বন্য কাঁটা-গুল্ম,—যা মানুষের কোন কাজে লাগে না,—বরং ফসল করার সময় এগুলি উৎখাত করতে বড়ই কষ্ট হয়।

তাঁকে অবহেলার ভাব পীর শাহ চাঁদ বুঝ্‌তে পার্‌লেন। তিনি কোন বিরক্তির ভাব প্রকাশ কর্‌লেন না। মনে মনে ঈষৎ হেসে বললেন,—"তাই হোক!" এই বলে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

যথা সময়ে বীজ থেকে যখন চারা বের হল, ছোট ছোট চারা দেখে সেই চাষী তখনও বুঝতে পারে নি ব্যাপারখানা কি। কয়েকদিন পরে সে দেখল যে, সে চারাগুলি 'নাটাম-ফাটামে'র চারা ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং সমস্ত জমিতে তা নিবিড়ভাবে ছেয়ে ফেলেছে।

৩। আঁধার মাণিক

আঁধারমাণিক গ্রামের রায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণ রাজার সঙ্গে পীর শাহ্ চাঁদ রাজীর দ্বন্দ্ব দেখা দিলে প্রথম অবস্থায় রাজা পীর সাহেবকে কারাগারের যে কক্ষে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন তা ছিল অন্ধকার-আচ্ছন্ন। প্রবাদ,—পীর অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ থাকায় অনুরূপ অন্ধকার নেমে এসেছিল এই গ্রামে। অকস্মাৎ গ্রাম অন্ধকার-আচ্ছন্ন হওয়ায় গ্রামবাসী বিস্মিত হল। কোন কারণ বুঝতে না পেরে তারা হায় হায় করে উঠ্‌ল। সাতদিন ধরে গ্রামখানি আঁধারে ঢেকে রইল।

পীর শাহ্ চাঁদের ভক্তগণ তখন স্মরণ করলেন তাঁকে। সেই আকুতিতে

সাড়া দিয়ে পীর সাহেব জনৈক ভক্তকে স্বপ্নে বল্‌লেন,—"আল্লাহ্ তালার নাম স্মরণ করে ফু দাও, আলো ফুটে উঠ্‌বে।"

নিদ্রাভঙ্গে সেই ভক্ত, ঘটনাটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। জনসাধারণ অবহিত হলেন এবং পীরের নির্দেশ মত ফু দিতেই দেখা গেল পীর যে আঁধার কারাগারে অবরুদ্ধ আছেন সেখানকার সামান্য একটা ছিদ্র পথ বেয়ে উজ্জ্বল আলোর রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই আলোর রশ্মির আভাসে গ্রামে যেন ভোর এগিয়ে এসেছে।

সেই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার কথায় সকলে বিস্মিত হলেন। রাণীও রাজপ্রাসাদের ছাদ্ থেকে সেই বিচ্ছুরিত আলোর রশ্মি দেখে বিমুগ্ধ হয়ে যান। পীরের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে রাণী তৎক্ষণাৎ পীর সাহেবকে কারাগার থেকে মুক্ত করার আদেশ দিলেন। প্রহরা ছুটে গিয়ে কারাগারের দ্বার মুক্ত করে দিল; কিন্তু হায়! পীর তো সেখানে নেই,—তিনি অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছেন।

পীর শাহ্ চাঁদের আঁধার কারাগৃহে অবস্থানকালে সেখানে মাণিকের ন্যায় উজ্বল আলো দেখা গিয়েছিল বলে এই গ্রামের নামকরণ হয়েছিল 'আঁধার মানিক'।

পীর হজরত শাহ্ চাঁদ রাজীর নামে হিন্দু-মুসলমান সকলেই অসীম শ্রদ্ধাসহকারে দরগাহে শিরনি, হাজত এবং মানত দিয়ে থাকেন। এখানে হরিলুটের ন্যায় পীরের লুট প্রদত্ত হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সন্তান কামনায় ভক্তিসহকারে তাঁর দরগাহে ইট ঝুলিয়ে দেন এবং ঈপ্সিত ফললাভের পর সেই দরগাহে এসে সাড়ম্বরে মানত প্রদান করে যান।

———

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

সাভরন পীর

পীর হজরত সাভরন রাজীর মাজার বা দরগাহ উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ নামক গ্রামে অবস্থিত। তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না। আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে হিঙুলগঞ্জ (ঙ্গ নহে, ঙু) নামক স্থানে হজরত মোহাম্মদ ফাজিল রাজী নামক এক দরবেশ ইসলাম ধর্ম প্রচারকল্পে আগমন করেছিলেন। হিঙ্গলগঞ্জ নামটি হিঙুলগঞ্জ নামের অপভ্রংশ কিনা প্রমাণ সাপেক্ষ।

পীর হজরত সাভরন রাজীর দরগাহটি ইটের তৈয়ারী। দরগাহটি প্রাচীর বেষ্টিত। চারিপাশে গুল্মলতায় সমাকীর্ণ। দরগাহ-সংলগ্ন জমির পরিমাণ প্রায় দুই-তিন বিঘা। দরগাহের পাশে পুকুরে এবং পতিত জমিতে বিরাটাকার কয়েকটি গম্বুজাকৃতি পাথর আছে। পাথরের রঙ কালো এবং তাতে কারুকার্য্য করা। দরগাহের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন ইটের তৈরী ধ্বংসাবশেষ। ধ্বংসাবশেষটিকে মন্দির বলে অনুভূত হয়। এর গায়ে কিছু কিছু কারুকার্য্য দৃষ্ট হয়। লতা পাতা ফুল অঙ্কিত কারুকার্য্য দেখে মন্দিরের গায়ে ইসলামি আদর্শে মূর্ত্তিবিহীন উক্ত প্রতীক চিত্রের সন্নিবেশ হয়েছিল বলে মনে হয়। স্থানটি গবেষণা সাপেক্ষ।

উক্ত দরগাহের সেবায়েত মহম্মদ হারাণ আলি শাহজী (৬০) জানান যে, তাঁরা বংশ পরম্পরায় পীর হজরত সাভরন রাজীর উক্ত মাজার-শরীফে ধূপ-বাতি দিয়ে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জিয়ারত করে আসছেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শেষ শুক্রবারে সেখানে এক দিনের বিশেষ উৎসব হয় এবং মেলা বসে। সে মেলায় প্রায় হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। তাছাড়া প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে উরসের সময়ও হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ হাজত, মানত ও শিরনি দিবার প্রতীক-প্রতিজ্ঞা স্বরূপ ইট বাঁধেন।

পীর হজরত সাভরন রাজীর অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ সম্পর্কিত কয়েকটি লোক কথা হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

১। বালক সে নয় সামান্য

হিঙ্গলগঞ্জের পূর্ব্ব সীমান্ত দিয়ে স্রোতস্বতী ইছামতী মতান্তরে কালিন্দী প্রবাহিতা। পীর সাভরন একদিন ভ্রমণ করতে করতে নদীর তীরে উপবেশন করেন। তখন তাঁকে একজন সাধারণ বালকরূপে দেখা গেল। তিনি বসে বসে নৌকার আনাগোনা লক্ষ্য করেছিলেন।

এক সাওদাগর তাঁর সওদা বোঝাই বজরা নিয়ে যাচ্ছিলেন উত্তরাভিমুখে। বজরাটি তাঁর কাছাকাছি এল। বালক পীর সাভরন হেঁকে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"মাঝি ভাই! তোমার নৌকায় কি আছে?"

মাঝি অবহেলা ভরে বালককে প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। বালক আবার প্রশ্ন করলেন। সওদাগর বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন,—"লতা-পাতা আছে।"

সওদা বোঝাই বজরা সেই বালককে অবজ্ঞা করে এগিয়ে চলল। কিয়দ্দূর যাওয়ার পর জনৈক মাঝির নজরে পড়ল যে নৌকায় যে সব মাল-পত্র ছিল তা নেই,—সেই সব জায়গায় আছে শুধু লতা-পাতা। সংবাদ গেল সওদাগরের কানে। সওদাগর হলেন বিস্মিত, হলেন নির্ব্বাক। তিনি বুঝতে পারলেন, প্রশ্নকর্তা সেই বালক সাধারণ বালক নয়। সওদাগর বজরা ফেরাতে নির্দ্দেশ দিলেন। ফিরে এল নৌকা হিঙ্গলগঞ্জে। নদীর তীরে অনুসন্ধান করলেন সেই বালককে। কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। সওদাগর বজরা থেকে নেমে প্রবেশ করলেন গ্রামে,—জিজ্ঞাসা করলেন সামনের গ্রামবাসীকে। গ্রামবাসী অনুমান করলেন—এ বালক নিশ্চয় জাগ্রত পীর সাভরন। লোকের পরামর্শক্রমে সওদাগর গেলেন পীরের আস্তানায়। পীরকে প্রণতি জানালেন, প্রার্থনা করলেন মার্জ্জনা। প্রতিজ্ঞা করলেন,—আর কখনও সামান্যকে সামান্য-জ্ঞান করবেন না,—অসামান্যরূপেই সম্মান করবেন। পীর সাভরন আশুতোষ। সওদাগরকে তিনি মার্জ্জনা করলেন। বজরার লতা-পাতা রূপান্তরিত হল যথাযথ পণ্যসম্ভারে। সওদাগর পুনরায় পীরকে প্রণতি জানিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

২। হীরা-জিরা

হিঙ্গলগঞ্জে নাকি এক কালে বাস করত দুই জন বারবণিতা। নাম তাদের যথাক্রমে হীরা ও জিরা। তারা বড় দাম্ভিক। সাধারণতঃ তারা পুরুষ

মানুষকে অবজ্ঞা করত। ফকির বেশধারী আত্মভোলা পীর সাভরনকেও তারা মান্য করত না।

একবার পীর সাহেব আপন মনে রাস্তার ধারে বসেছিলেন। হীরা ও জিরা সেই পথে কোথায় যেন যাচ্ছিল। পীরের দিকে ফিরে তারা নানরূপ কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গী করছিল। ওদের মধ্যে একজন মন্তব্য করল পীর সাভরনকে লক্ষ্য করে,—"হিজড়ে" অর্থাৎ নপুংশক।

পীর সাহেব তাদের দিকে তাকালেন না কিন্তু অবজ্ঞা-সূচক মন্তব্য শুনে ক্ষুব্ধ হলেন এবং দৃঢ়চরিত্রের পুরুষ হিসাবে তাদের পথ এমন ভাবে অবরোধ করলেন যাতে তারা তাদের গুরুতর অপরাধের কথা বুঝতে পেরে লজ্জিত হল। তারা তৎক্ষণাৎ পীরের নিকট অবনত মস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

পীর সাভরন আশুতোষ। তিনি ক্ষোভ সংবরণ করলেন এবং ক্ষমা করলেন।

পরবর্ত্তী জীবনে হীরা ও জিরা তাদের জীবনধারা পরিবর্তন করে এবং আজীবন পীরের সন্নিধানে পবিত্রভাবে জীবন যাপনের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে।

হীরা ও জিরার কবর স্থান আজো এই গ্রামেই পরিদৃষ্ট হয়।

৩। পীরের তৈজস পত্র

হিঙ্গলগঞ্জ গ্রামে সাভরনের নামে একটি পুকুর আছে। অনেক দিন আগের কথা। পুকুরে নাকি অনেক তৈজসপত্র, যেমন—থালা, বাসন, হাঁড়ি, কড়াই, হাতা, খুন্তি, জগ, ডেকচি প্রভৃতি ছিল। পুকুরের কোন এক গুপ্তস্থানে সে সব থাকত।

গ্রামবাসী কারো বাড়ীতে বা বারোয়ারী কোন অনুষ্ঠানে যখন উক্তরূপ তৈজসপত্রের প্রয়োজন হত তখন গৃহকর্তা অথবা পাড়ার মোড়ল বা নেতা শুদ্ধ বসনে, শুদ্ধ মনে সন্ধ্যায় পীরপুকুরের ধারে একাকী আসতেন এবং পীরকে উক্ত অনুষ্ঠানের সফলতার আশীর্বাদ লাভের জন্য ভক্তিপূর্ণ নিমন্ত্রণ জানাতেন। সেই সাথে তিনি অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রের প্রার্থনা করতেন।

পর দিন প্রাতঃকালে শুচি-স্নিগ্ধ হয়ে কিছু লোক পুকুরের ধারে যেত এবং তারা সেখানে প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র প্রাপ্ত হত। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে সে সব তৈজসপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সন্ধ্যাকালে পীর পুকুরের জলে ডুবিয়ে রেখে আসতে হত।

পরবর্ত্তীকালে কোন্ এক ব্যক্তির অশৌচ আচরণের কারণে সে সব তৈজসপত্র নাকি আর পাওয়া যায় না।

৪। একের পাপে দশের সাজা

এক মদ্যপায়ী উন্মত্ত অবস্থায় একটা খালি মদের বোতল নিক্ষেপ করে হিঙ্গলগঞ্জের পীরপুকুরে। পুকুরের পানি হয়ে যায় অপবিত্র। গ্রামের লোক অজান্তে সেই পুকুরের পানি ব্যবহার করে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয় কলেরা রোগে। তেরো জন লোকের মৃত্যুও ঘটে তাতে।

গ্রামবাসী হতচকিত হল। তারা অসহায়বোধে পীরের নিকট গেল। পীর জানালেন সেই মদ্যপায়ী কর্তৃক পুকুরের পানিতে নিক্ষিপ্ত মদের খালি বোতলের কথা।

তখন মদ্যপায়ী গ্রামবাসী কর্তৃক ভৎ‘সিত হল। তারা শরণ নিল পীরের। তারা এরূপ গর্হিত কাজ আর না করার প্রতিশ্রুতি দিলে পীর আপনার অলৌকিক শক্তিতে পুকুরের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনেন,—ফিরে আসে গ্রামের শান্তি।

———

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সাহান্দী সাহেব

পীর হজরত সাহান্দী রাজীর আস্তানা উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাঁকড়া নামক গ্রামে। তাঁর জন্ম তারিখ, জন্মস্থান, মৃত্যু তারিখ প্রভৃতি অজ্ঞাত। তাঁর কর্মধারার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁর প্রভাবাধীন এলাকা বেশ অনেকদূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

পীরের দরগাহ-গৃহের দেওয়াল ইটের তৈরী, উপরে খড়ের চালের আচ্ছাদন। স্থানটি দেখতে একটি ছোট তপোবনের মতন। ছোট কয়েকটি বাঁশ ঝাড় রয়েছে এক পাশে। দরগাহটি বজ্রবাটুল, অশ্বত্থ, জাম, গাব, শিরিষ প্রভৃতি গাছের ছায়ায় আচ্ছন্ন। দরগাহ সংলগ্ন পীরোত্তর বলে কথিত জমির পরিমাণ প্রায় তিন-চার বিঘা। দরগাহের সমাধি বলে চিহ্নিত বিস্তৃত স্তম্ভের গায়ে বেশ কয়েকটি গর্ত রয়েছে। তার মধ্যে নাকি আছে বিষধর সাপ। দরগাহের দক্ষিণাংশে রয়েছে বনবিবির 'থান' এবং উত্তরাংশের মাজারটি পীর হজরত সাহান্দী রাজীর ছোট ভাই-এর মাজার বলে কথিত। এখানেই আছে সাহান্দী পীরের নামে একটি পুকুরও।

দরগাহের অন্যতম সেবায়েত মোহাম্মদ হাবিল সরদারের (৬০) কাছ থেকে জানা যায় তাঁর বহুপুরুষ পূর্বের 'ভ্রমর' কিংবা 'সদাই' নামক জনৈক ব্যক্তি বাঁকড়া নামক উক্ত গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তখন এখানে ছিল গভীর জঙ্গল। তিনি জঙ্গল কেটে আবাদ করতে গিয়ে এই মাজার বা কবরস্থান দেখতে পান। সেই দিন শেষে রাত্রে স্বপ্নে পীরের পরিচয় পেয়ে পরের দিন থেকে দরগাহের সেবার ভার গ্রহণ করেন। তাঁদের বংশ তালিকায় সদাই সরদার, দুর্লভ সরদার প্রভৃতি নাম থেকে অনুমিত হয় যে এঁরা মূলতঃ হিন্দু ছিলেন। কবে কিভাবে তাঁরা মুসলিম হয়েছিলেন তা জানা যায় না। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর সত্তর শতকে এই বাঁকড়া গ্রামে তাঁদের নবম পুরুষ চলছে। অতএব পীর সাহান্দী সাহেবের মাজার শরীফটি যে প্রায়

দুই শত বছরের বেশী প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। সেবায়েতগণ প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পীরের মাজারে ধূপ-বাতি দিয়ে জিয়ারত করেন। হিন্দু-মুসলমান ভক্তগণ পীরের দরগাহে দুধ, ডাব, ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি মানত প্রদান করেন। রোগমুক্তি বা মঙ্গল কামনায় ভক্তগণ ঐ সব মানত করে থাকেন। তাছাড়া হাজত এবং শিরনিও প্রদত্ত হয়ে থাকে। অনেক রমণী সন্তান কামনা করে দরগাহের চালে ইঁট বাঁধেন। অনেকে ইপ্সিত ফল লাভ করে পীরের 'থানে' "হত্যা"—দিয়ে থাকেন। হত্যা-দানকারীগণকে সেবায়েতগণ সেবা শুশ্রূষা করেন।

প্রতি শুক্রবারে সাহান্দী সাহেবের দরগাহে বহু ভক্তের সমাগম হয়। ঐ দিন তাঁরা হাজত, মানত বা শিরনি প্রদান করেন। ইদুজ্জোহা, বকরূঈদ, ফাতেহা ইয়াজদহম্ প্রভৃতি অনুষ্ঠান এখানে যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। তখন প্রতি অনুষ্ঠানে প্রায় চার-পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। তাছাড়া প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ তারিখে পীরের উরস উপলক্ষ্যে বিশেষ উৎসব ও মেলা হয়। বিশেষ অনুষ্ঠানে মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন।

পীর সাহান্দী সাহেবের দরগাহে যে সব উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান-রীতিটি উল্লেখযোগ্য ঃ—

১। ফুলের পতন—পীরের দয়া

পীরের দয়া যে লাভ করবে তার মতন ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী আর কে আছে! ঈপ্সিত ফল লাভ করতে তাই পীরের দয়া আগে চাই। পীরের দয়া পাওয়া গেল কিনা আগে বুঝতে গেলে দয়াপ্রার্থীকে কিছু কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়।

প্রতি শুক্রবার একটি বিশেষ দিন। দয়াপ্রার্থী ভক্ত ঐ দিন দরগাহে উপস্থিত হয়ে তার মনোবাসনা সেবায়েতের নিকট ব্যক্ত করেন। ভক্তকে ফুল ও পরিচ্ছন্ন কলা-পাতা আনতে হয়। দুপুরের দিকে বহু ভক্তের সমাগম হয়। ভক্তগণকে সাধারণতঃ 'যাত্রী' বলে। সেবায়েত দুপুরে উপস্থিত হয়ে পীরের সমাধিস্থানের একপাশে একটি ইটের উপর কলা-পাতা রাখেন। সেই কলা-পাতার উপর রাখেন যাত্রীর দেওয়া ফুল। সে ফুলের ওপর আবার একটা কলা-পাতা দেওয়া হয়। সর্বশেষে সে পাতাটিও আর একখানি ইটের দ্বারা চাপা দেন। পাশেই যাত্রী আপনার কাপড়ের আঁচল বিছিয়ে বসে থাকেন

পীরের দয়ার প্রতীক চিহ্ন সেই চাপা দেওয়া ফুল পাওয়ার জন্য। এব র যাত্রীকে ধৈর্য্য পরীক্ষা দিতে হয়।

যার ভাগ্য সত্বর সুপ্রসন্ন হয় তার ফুল তাড়াতাড়িই পড়ে। কখন বা দু'তিন ঘণ্টাও দেরী হয়। পীরের আলৌকিক শক্তিতে সেই চাপা-দেওয়া ফুল ইটের ওপর থেকে গড়িয়ে নীচে এসে পড়ে। যাত্রীগণ তখন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সেবায়েত ফুলটি যাত্রীর আঁচলে দিয়ে দেন। যাত্রী ফুলটি তখন পরম ভক্তিভরে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে আঁচলে বেঁধে নেয়। ফুল ধুয়ে সেই পানি গ্রহণ করলে ঈপ্সিত ফল যথা,—রোগমুক্তি, সন্তানলাভ প্রভৃতি লাভ হয় বলে অনেকের বিশ্বাস। প্রথম দিন ফুল না পড়লে যাত্রীকে পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান-দিবসে ঠিক একই ভাবে অপেক্ষা করতে হয়।

পীর সাহান্দী সাহেব সম্পর্কিত কয়েকটি আশ্চর্য্য লোককথা বাঁকড়া-হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

১। ফকিরের গাছতলা

স্থানীয় এক ধনবান ব্যক্তি। নাম তাঁর গোলাম রহমান। জীবনে তিনি অনেক কাজ করেছেন। যে ভাবেই হোক লোকে তাঁর নাম করে। সুতরাং পীর সাহান্দী সাহেবের নামে কিছু খয়রাতি তো করা চাই। তাই তিনি ঘোষণা করলেন যে পীরের সমাধি সংস্কার করে দেবেন।

পীরের সমাধিটি আছে গাছের তলায়। সামান্য খুঁটির ওপর খড়ের চালের নামমাত্র আচ্ছাদন। গোলাম রহমান স্থির করলেন যে দরগাহটি পাকা করে প্রাসাদের মতন করে দেবেন।

রাজমিস্ত্রী নির্দ্দিষ্ট করা হল। ঠিক করা হল তার সহযোগী মজুর। যথোপযোগী ইট সংগৃহীত হল। ঘটনাটি গ্রামে গ্রামে রটনা হয়ে গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজমিস্ত্রী এল, এল তার সহযোগী আর এল গ্রামের অনেক ভক্ত সেই কাজে সহায়তা করতে। কাজ আরম্ভ করার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ঘটে গেল আর একটি অদ্ভুত ঘটনা।

গোলাম রহমান ছুটতে ছুটতে দরগাহে এসে প্রথম কথা বললেন,—"বন্ধ কর কাজ।"

কি ব্যাপার। গোলাম রহমান গতরাত্রে স্বপ্নে দেখা বৃত্তান্ত সকলকে শোনালেন। পীর স্বপ্নে তাঁকে বলেছেন,—"আমি খোদার সেবক, আমি ফকির, ঐশ্বর্য্য আমার জন্য নয়। কুঁড়ে ঘর গাছের তলাই আমার উপযুক্ত স্থান।"

পীরের কথা গোলাম রহমানের কাছে শুনে সকলে বিস্মিত হল। সত্যই তো, পীর কত মহান।

পীর সাহান্দী সাহেবের দরগাহ তাই গাছতলায় কুঁড়ে ঘরেই আছে,—প্রাসাদ আর হল না।

২। সওগত গাজী

বাঁকড়া গ্রামের সওগত গাজীকে ঐ গ্রামের লোক ব্যতীত কয়জনে চিন্‌ত। সে চেনা হয়ে গেল একটা ঘটনায়।

সওগত গাজী তার মাকে মোটেই শ্রদ্ধা করত না। এমন কি মাঝে মাঝে মাকে প্রহার করত। একদিন কি একটা ঘটনায় তার মাথায় খুন চেপে যায়। মার্‌তে মার্‌তে শেষ পর্য্যন্ত সে তার মাকে মেরেই ফেলে। চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল।

কিছুদিন যেতে না যেতে সওগত কি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হল। কত কবিরাজ, কত ডাক্তারের শরণ নিল সে। সবাই জবাব দিয়ে দিলেন,—অন্য জায়গায় দেখ, দেখ তোমার ভাগ্য।

সওগতের মন বল্‌ছে, এ তার মাতৃ-হত্যার শাস্তি। লোকে বল্‌ছে—পীর সাহান্দী সাহেবের জায়গীরের মধ্যে এত বড় অন্যায় কাজ। এ শাস্তির ক্ষমা নেই।

রোগ যন্ত্রণায় সওগত কাতর। উঃ! এ যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যুও ভাল। পীরের কাছে সে কোন্ মুখে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌বে।

না, আর পারা যায় না, আর সহ্য করা যায় না। সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে, চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে ছুটে দরগায় এসে আছাড় খেয়ে বল্‌ল,—'হে পীর, আমার মৃত্যু দাও, আমায় ক্ষমা কর, আমায় মার্জনা কর, ইত্যাদি।

দিন গেল, রাত গেল, আবার দিন গেল, রাত গেল। কত কাকুতি-মিনতির পর পীর স্বপ্নযোগে বললেন,—"তোর মায়ের কবর ধৌত করে সেই পানি কিছু খাবি।"

সওগত গাজী ভক্তি ভরে তাই করল। কিছুদিন পরে সে রোগমুক্ত হল বটে কিন্তু সে অল্পদিনেই মৃত্যুমুখে পতিত হল।

৩। সাপ, না মাগুর মাছ

কে একজন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। পীরের প্রতি তার বিশ্বাস তেমন নয়। ডাক্তার, কবিরাজের শরণাপন্ন হল সে। কিছু তো তাতে হল না। গেল হাসপাতালে এবং তেমন কিছু উপকার হচ্ছে না দেখে এল পালিয়ে। এবার শুধু পীরের দরগায় যেতে বাকী।

পীরের দরগাহের কোন ঔষধ একবার খেয়ে দেখলে হত। কত লোক নাকি উপকার লাভ করে। একবার দেখা-ই যাক না কেন,—সে মনে মনে বল্‌ল।

একদিন ভোরে, তখনও কিছু আঁধার আছে। ঐ ব্যক্তি পীরের নাম স্মরণ করে একাগ্র মনে গেল দরগাহে। তখন তার মনে কি এক অলৌকিক শক্তি ভর করেছে। দরগাহে যা পাবে তা এনে সে পীরের নাম স্মরণ করে খেলে তার রোগ সেরে যাবেই যাবে—এমন দৃঢ় ধারণা হল।

সে কি! দরগাহের উপর একটা ছোট সাপ ঘোরাঘুরি করছে। দোহাই পীর সাহেব! যা থাকে কপালে। তীব্র মনোবল নিয়ে সে ধরে ফেল্‌ল সাপটি। তাকে আন্‌ল বাড়ীতে। ঐটিই সে রান্না করে খাবে। চাপা দিয়ে রাখ্‌ল চুপড়ীর দ্বারা।

দুপুরে সেই সাপ কাট্‌বার জন্য চুপড়ী খুলে তো অবাক! কোথায় গেল সাপ! এ যে মাগুর মাছ।

উক্ত ব্যক্তি সেই মাগুর মাছ তরকারিরূপে ভাতের সঙ্গে খেয়ে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়েছিল।

পীর সাহান্দী সাহেবের দরগাহে শ্রদ্ধা নিবেদন পদ্ধতিতে হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণ কিভাবে হয়েছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে। যথা ;—

১। গাজনের সময় শিবের মাথায় ফুল দান করার ন্যায় দরগাহে ফুল দানের প্রথা আছে। শিব-ভক্তগণের ন্যায় পীর ভক্তগণ ভক্তিভরে ফুলধোয়া জল ব্যবহার করেন।

২। তারকেশ্বর-শিব বা অন্যান্য হিন্দু সংস্কৃতির ন্যায় পীরের দরগাহে 'হত্যা' বা 'ধর্ণা' দিবার প্রথা প্রচলিত।

৩। কালী মন্দিরের বা শীতলা মন্দিরের ন্যায় এই দরগাহে ইট বা ঢেলা বাঁধার প্রথা আছে। সাধারণতঃ সন্তান কামনায় ঐরূপ করা হয়ে থাকে।

————

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হাসান পীর

পীর হজরত হাসান রাজী বাইশ আউলিয়ার একজন হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। পীর গোরাচাঁদ এই ধর্মপ্রচারক দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পীর হাসান ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পান বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ অঞ্চলে। হাসনাবাদ গ্রাম সংলগ্ন হরিপুর নামক গ্রামেই রয়েছে তাঁর মাজার বা দরগাহ। তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

হরিপুর গ্রামে অবস্থিত পীর হাসান রাজীর দরগাহের অন্যতম সেবায়েত মোহাম্মদ আজিবর মোল্লা জানালেন যে সেখানকার পীরের নাম "সাসান পীর"। কেহ মন্তব্য করলেন 'শাহ্ চাঁদ' পীর। মনে হয় 'হাসান' শব্দটি উচ্চারণ-ভ্রংশে 'সাসান' হয়েছে। তিনিই এতদ্ অঞ্চলে পীর ঠাকুর নামে সমধিক পরিচিত।

পীর ঠাকুরের মাজার সংলগ্ন প্রায় আট বিঘা জমি পীরোত্তর আছে। সমাধির উপর ইটের তৈরী দরগাহ-গৃহ। মোহাম্মদ আবেদ মোল্লা প্রমুখ দরগাহের সেবায়েত কর্তৃক এখানে নিয়মিত ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয়। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের প্রথম দিকে উরস উপলক্ষ্যে মেলা বসে। পীরোত্তর জমির উৎপন্ন ফসলের অর্থে জনসাধারণের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ পীর ঠাকুরের দরগাহে হাজত, মানত ও শিরনি দিয়ে থাকেন। পীরের নামে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে।

পীর হাসান, কি পীর সাসান, কি পীর শাহ্ চাঁদ, কি পীর ঠাকুর— এ নিয়ে অনেক মতের মধ্যে আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্য নিয়ে কিছু আলোচনা করা যায়। সিদ্দিকী সাহেব, পীর হাসানকে হাসনাবাদের পীর বলেছেন। অনেক অনুসন্ধানেও হাসনাবাদে পীর হাসানের কোন স্মৃতি চিহ্ন পাওয়া গেল না। হরিপুর গ্রামটি একেবারেই হাসনাবাদ গ্রাম সংলগ্ন। এককালে যে হরিপুর ছিল হাসনাবাদেরই অংশ এমন অনুমান একেবারে

ভ্রান্ত নয়। তা ছাড়া হরিপুর তো হাসনাবাদ থানারই অন্তর্ভুক্ত। সিদ্দিকী সাহেব যখন ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করছেন বলে দাবী করেন তখন তাঁর ঐতিহাসিক পুস্তককে নস্যাৎ করা যায় না।

পীর ঠাকুর সম্পর্কে কয়েকটি লোক কথা উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। তাদের মধ্যে দুটি লোককথা এইরূপ ;—

১। বাঁকা মুখী

একবার একদল 'বেদে' অর্থাৎ যাযাবর এল হরিপুর গ্রামে। তারা তাঁবু ফেল্‌লে দরগাহের অশ্বত্থ তলায়। সেখানে তাদের দ্বারা অশৌচ আচরণও হয়। পীর তা সহ্য করেন। কোন ভক্ত তাদেরকে সেরূপ করতে মানা করেছিল। বেদের মানা তারা শোনেনি। ফলে একবার একটা গুরুতর ঘটনা ঘটল।

এক বেদেনীর খুব নেশা তামাক পোড়ার গুড়া মুখে নেওয়া। তামাক পুড়িয়ে এবং সেই সাথে অন্য গাছের পাতা পুড়িয়ে দুটো এক সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। বেদেনীর তামাকপোড়া রাখার পাত্রটি ছোট। তার তামাক পোড়ার গুড়া কিছু বেশী হয়েছে। বেশী গুড়া রাখার জন্য অশ্বত্থ গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ল সেই বেদেনী। আর যাবে কোথায়। পীরের কোপ পড়ল তার ওপর। সেই পাতার গুড়া নিয়ে যেই সে মুখে দিল অমনি বেঁকে গেল তার মুখ। তার সে কি নিদারুণ কষ্ট! ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াতে লাগল সে।

গ্রামবাসী একজন এসে শুনলেন সব বৃত্তান্ত। তিনি বল্‌লেন,—"কেন, তোমরা তো পীরকে গ্রাহ্য কর না। এবার বোঝ ঠ্যালাখানা!"

বেদেনী, বেদেনীর স্বামী, বেদেদের সরদার আছাড় খেয়ে পড়ল পীরের দরগায়। অনেক কান্নাকাটি করল, ক্ষমা প্রার্থনা করল তারা। মাপ চাইল তারা সকলের কাছে।

পীরের দয়া হল তাদের ওপর। কয়েক দিনের মধ্যে বেদিনী নিরাময় হল। তারা পীরের থানে শিরনি দিয়ে সদলে স্থানান্তরে চলে গেল। তাই সেই বেদিনী সকলের নিকট 'বাঁকা মুখী' নামে সমধিক পরিচিত।

শুধু উক্ত বেদিনী নয়। হরিপুর গ্রামের জনৈক মহম্মদ আক্কাজ আলি ঐ ধরণের অপরাধের জন্য শাস্তি পায় এবং শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করায় পীরের দয়ায় নিষ্কৃতি লাভ করে।

২। কবরের কলিকায় আগুনের শিখা

পীর ঠাকুরের দরগায় ধূপ বাতি দিয়ে প্রতিদিন জিয়ারত করা হয়। এখানে বাতি জ্বালাবার একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। ভক্তগণ প্রদীপ জ্বালিয়ে বাতি দেন। জ্বলন্ত প্রদীপ মাজারের উপর রাখা নিষেধ। শুধু কলিকার উপর প্রদীপ বসিয়ে সেটি সবশুদ্ধ কবরের উপর বসানো যেতে পারে।

ভক্তগণ প্রদত্ত সেইরূপ অনেক প্রদীপ সেখানে জমা হয়। আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে মাঝে মাঝে পড়ে থাকা সেই কলিকায় আকস্মিকভাবে আপনিই আগুন জ্বলে ওঠে। এইরূপ আগুন জ্বলে ওঠাব অর্থ নাকি জাগ্রত পীরেব নিদর্শন শিখা।

———

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হায়দর পীর

পীর হজরত হায়দর রাজীর আস্তানা ছিল উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার হাবড়া থানাধীন একটি গ্রামে। খাঁটুরা-গোবরডাঙ্গার নিকটবর্তী উক্ত গ্রামের নাম হায়দাদপুর। মেদিয়া নামক গ্রাম-বেষ্টিত কঙ্কনা-বাঁওড়ের দক্ষিণ-পূর্ব্বে হায়দাদপুরে পীর হায়দরের দরগাহ চিহ্নিত স্থান আজো বিদ্যমান।

পীরের দরগাহ-স্থানে কয়েকটি গুল্মলতা আছে। পতিত জায়গার পরিমাণ প্রায় বিঘাখানেক। অনেক ভক্ত সেখানে হাজত, মানত ও শিরনি দেন। উক্ত পীরের দরগাহে নাকি পূর্বে ধূপ-বাতি প্রদত্ত হত।

কঙ্কনা-বাঁওড় মূলতঃ যমুনা নদীর অবরুদ্ধ অংশ বিশেষ। কঙ্কনা-বেষ্টিত ভূভাগের রাজা ছিলেন রত্নেশ্বর রায়। পীর হায়দর ইসলামের আদর্শ প্রচারের সময় রাজা রত্নেশ্বর রায় কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষের শেষ পরিণতিতে রাজা রত্নেশ্বর পরাজিত হন। পলায়ন ব্যতীত উপায় নেই দেখে রাজা যতদূর সম্ভব ধনরত্ন নিয়ে জলপথে রাজ্য ত্যাগে মনস্থ করেন। কিন্তু কঙ্কনার সঙ্গে তখন কোন নদীর যোগ ছিল না। উপায় না দেখে রাজা বিলম্ব না করে কঙ্কনা থেকে যমুনা পর্য্যন্ত খাল কাটিয়ে নিলেন এবং সেই পথেই নৌকাযোগে প্রস্থান করলেন। শোনা যায় তিনি নাকি সপরিবারে জগন্নাথ ক্ষেত্রেই গিয়েছিলেন। রাজা রত্নেশ্বর রায় কাটিয়েছিলেন বলে উক্ত খালের নাম হয়েছিল রত্নাখালির খাল। কারো মতে রাজা রত্নেশ্বর কঙ্কনা-বেষ্টিত রাজ্যের রত্নসম্ভার শূন্য করে নিয়ে যে খাল দিয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন সে খালের নাম হয়েছে রত্নাখালির খাল।

কঙ্কনা নামকরণের অনুরূপ আরো প্রবাদ প্রচলিত আছে। রাজ্যের রাণীর হাতের কঙ্কন স্নানকালে বা নৌ-বিহারকালে ঐ জলাশয়ে পড়ার জন্য কঙ্কনা

—২৪

নাম হয়েছে। মতান্তরে কঙ্কনের ন্যায় বাঁওড়টি গোলাকৃতি বলে তার নাম হয়েছে কঙ্কনা।

পীর হায়দর কোথা থেকে আগমন করেছিলেন তা নিশ্চিত করে কোথাও বলা হয়নি। কারো কারো বক্তব্যে মনে হয় বর্গীদলের অত্যাচারে রাজা রত্নেশ্বর দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। পীর হায়দর নাকি রাজার দেশত্যাগের কথা শুনে তাঁকে দেশত্যাগ না করতে অনুরোধ জানান এবং যাত্রাপথ পরিবর্তন করে স্বদেশে ফিরে আসতে বলেন।

পীর হায়দর বা হৈদর প্রসঙ্গে একস্থানে বলা হয়েছে ; রাজা রত্নেশ্বরকে উপলক্ষ করে পীর হৈদর আপন ক্ষমতা জাহির করেন। জনশ্রুতি যে,—কঙ্কনা হ্রদ বেষ্টিত 'মেদিয়া' গ্রামের রাজার নাম ছিল রত্নেশ্বর রায়। সম্ভবতঃ রাজা রত্নেশ্বর ও পীর হৈদারের মধ্যে কোন বিষয়ে মতান্তর ও বাদ-বিসম্বাদ হয় যে জন্য ঐ পীরের সঙ্গে রত্নেশ্বর আপোষে মীমাংসা করার পক্ষপাতী হন নাই এবং গোপনে যমুনা নদীর সঙ্গে কঙ্কনার যোগাযোগের জন্য খাল কাটিয়ে ঐ জলপথে মেদিয়া পরিত্যাগ করেন। [৯]

———

বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা

দ্বিতীয় ভাগ

[কাল্পনিক পীর]

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ওলাবিবি

ওলাবিবি এক কাল্পনিক পীরানী। হিন্দু-মুসলিম সকল ভক্ত তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, অর্ঘ্য নিবেদন করেন। পীরগণকে যে ভাবে সাধারণ মানুষ মান্য করেন ; হাজত, মানত বা শিরনি প্রদান করেন ; ওলাবিবিও অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষের মানসিক অন্তঃস্থল থেকে ভক্তি-অর্ঘ্য পেয়ে থাকেন। ওলাবিবি তাই পীরানী বিশেষ।

ওলাবিবি হিন্দুদের নিকট এক লৌকিক দেবী বিশেষ। শুধু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় নয়, উত্তর চব্বিশ পরগণা, কলিকাতা, নদীয়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, বীরভূম প্রভৃতি স্থানেও ওলাবিবি পূজিতা হন। আহমদ শরীফ বলেন যে ওলাবিবি মূলতঃ হিন্দু দেবতারই প্রতিরূপ। তাঁর মতে ওলাদেবী থেকে ওলাবিবি হয়েছে। শাসক-শাসিতের তথা হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলন, সদ্ভাব ও প্রীতির ভিত্তিতে এ সব লৌকিক তথা কাল্পনিক পীর সৃষ্ট। জীবন ও জীবিকার এবং পীড়ন ও নিরাপত্তার অভিন্নতাবোধ থেকেই এই প্রীতি ও মিলন প্রয়াসের জন্ম।[২৬]

যিনি ওলাবিবি তিনিই ওলাইচণ্ডী নামে অভিহিত। ওলাবিবি মুসলিম সংস্করণ এবং ওলাইচণ্ডী হিন্দু সংস্করণ মাত্র। গ্রামের সাধারণ ভক্তগণ তাঁকে বিবিমা নামেও অভিহিত করেন। ওলাবিবি নামটির প্রচলন সর্বাধিক। তাঁর পূরা নাম ওলাউঠা চণ্ডী বা ওলাউঠা বিবি হতে পারে কিন্তু ঐ নামে কেউ তাঁকে অভিহিত করেন না। ওলা অর্থে নামা বা দাস্ত হওয়া এবং উঠা অর্থে বমি হওয়া থেকে এই শব্দ-সংযোগ হয়ে থাক্‌বে। ওলাবিবি বলতে তাই ওলাউঠা বা কলেরার অধিষ্ঠাত্রীকে বুঝায়।

ওলাবিবির মূর্তি আছে। মূর্তি দুই প্রকার। সুদর্শনা ওলাবিবির মূর্তি হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে একরূপ, মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ভিন্নরূপ। হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে এঁর আকৃতি একেবারে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মত। তাঁর রং ঘন হলুদ,

চোখ দুটি (কোন কোন জায়গায় তিনটি) টানা টানা, নাক, কান, ঠোঁট বেশ সুন্দর, হাত দুটি প্রসারিত (মুদ্রার স্থিরতা নেই), কখনও দণ্ডায়মান, কখন শিশু সন্তান কোলে কোরে আসনে উপবিষ্ট। সারা দেহে নানা রকম গহনা,—বাজু, গোট, মাকড়ি, চুড়ি, নথ, হার, চিক ইত্যাদি। কোথাও মাথায় মুকুট পরেন, অন্যত্র এলোকেশী। বাহন বা প্রহরণ কিছু নেই। সাধারণতঃ নীল শাড়ী পরেন।

মুসলিম প্রধান অঞ্চলে ওলাবিবির মূর্তি খানদানী ঘরের মুসলমান কিশোরীর মতন। গায়ে পিরান, পাজামা, টুপি, ওড়না নানা রকম গহনা।—টিকরি, ঝুমকো, টায়রা, হাঁসুলি, নাকচাবি, বাউটি, গোট প্রভৃতি; পায়ে নাগরা জুতো, কোন কোন ক্ষেত্রে মোজাও পরেন; এক হাতে আশাদণ্ড।[৩৮]

পল্লীর নানা জায়গায় ওলাবিবির স্থান বা থান আছে। ওলাবিবি সাধারণতঃ গৃহদেবী নন। গ্রামের মধ্যে বা গ্রাম সমীপবর্তী স্থানের বৃক্ষতলে এঁর থান দৃষ্ট হয়। অশ্বত্থ, বট, নিম প্রভৃতি বৃক্ষতলে পল্লীবাসীগণ ওলাবিবির থান-কল্পনায় হাজত-মানতাদি দিয়ে থাকেন। কোথাও ঈষৎ উচ্চ মাটির ঢিপি কোথাও বা মাটির তৈরী বা ইটের দ্বারা অনুচ্চ আসনটিকে থান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কেহ বা মূর্তি স্থাপন করে পূজা দেন, কেহ বা মূর্তি স্থাপন না করে হাজত-মানত-শিরনি দিয়ে থাকেন। ইষ্টক নির্মিত মন্দিরে ইনি প্রতিষ্ঠিত হন না-বলে অনেকে মনে করেন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এইরূপ দেখা যায় না। ইষ্টক নির্মিত মন্দিরেও ওলাবিবি পূজিত হন। আমি এ প্রসঙ্গে এখানে আরো আলোচনা করেছি।

বহু পল্লীতে ওলাবিবির স্থান আছে। অন্যান্য অনেক স্থানে তিনি তাঁর ভগিনীদের সঙ্গে থাকেন বলে সেখানে তিনি একক নন। তাঁর সাত ভগিনী আছে বলে কথিত। "এঁদের সকলের নাম যথাক্রমে—ওলাবিবি, আসানবিবি, ঝোলাবিবি, আজগৈবিবি, চাঁদবিবি, বাহড়বিবি ও ঝেটুনেবিবি। কোন কোন গবেষকের মত যে, এই সাত বিবি সম্ভবতঃ শাস্ত্রীয় মতে পূজিতা সপ্ত-মাতৃকা—ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বরাহী, ইন্দ্রানী প্রভৃতি। সপ্ত-মাতৃকার সঙ্গে উক্ত সাত বিবির কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না; কিন্তু বাঁকুড়া ও বীরভূম অঞ্চলের সাত-বউনী বা সাত বনদেবী যথাক্রমে,—চমকিনী, সাতকিনী, -ব্রহ্মিনী প্রভৃতি এবং জঙ্গল-মহলের জামমালা দেবীর সাত ভগিনী যথাক্রমে,—

বিলাসিনী, কাজিজাম, বাশুলি, চণ্ডী প্রভৃতির সঙ্গে আকৃতি ও পূজা-পদ্ধতিতে সাদৃশ্য দেখা যায়।[৩৮]

উপরোক্ত বনদেবীগণ দক্ষিণ-বঙ্গে মুসলমান আমলে সাতবিবি নামে অভিহিত হন বলে শ্রীবিনয় ঘোষ অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেখানে ওলাবিবি তাঁর অপর ছয় ভগিনীর সঙ্গে অবস্থান করেন বলে লোকের কল্পনা সেই স্থানকে সাতবিবির থান বলা হয়। সেখানে ওলাবিবি প্রধান। তিনি পূজা পান এবং অপর ভগিনীগণ সে পূজায় ভাগ পান। তবে ঐ ভগিনীগণের মর্য্যাদা ওলাবিবি হতে কোন অংশে কম নয় বলে ভক্তগণের বিশ্বাস। ওলাবিবি প্রসঙ্গে সাত বিবির সঙ্গে অনেক দেবীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়ে লিখেছেন,—দক্ষিণ ভারতের গ্রাম্য দেবী সপ্তকানিংগেস এবং মীনাক্ষী ও তাঁর ছয় ভগ্নীর কয়েকটি দিক থেকে উক্ত সাত বিবির মিল দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের মারাম্মা আনকাম্মা ও উড়িষ্যার যোগিনী দেবী কলেরার দেবীরূপে পূজিতা। তাঁদের পূজ-পদ্ধতিও ওলাবিবির অনুরূপ। মধ্যযুগে সাতবিবির মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে 'সাতবিবির গান' নামে কাব্য রচিত হয়েছিল।[৩৮]

কারো মতে সপ্তমাতৃকা পরবর্ত্তীকালে সাত-বউনী ও মুসলিম আমলে সাতবিবি হয়েছেন। সাতবিবির পূজা-প্রথা প্রাগৈতিহাসিক যুগেও প্রচলিত ছিল বলে শ্রীবসু মনে করেন। মহেঞ্জোদাড়ো থেকে প্রাপ্ত মৃন্ময় ফলকে দণ্ডায়মান সাতটি নারী মূর্ত্তিকে Mr. Earnest Makay শীতলা ও তাঁর ছয় ভগিনীর দেবী মূর্ত্তি বলে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে Sunderlal Hora-এর বক্তব্য স্মরণীয়। Sunderlal Hora লিখেছেন:—

Ola and Jhola are believed to be two sisters, the former presides over the disease of cholera and the latter that of small pox.

ওলাবিবির কোন কোন থানে নিত্য পূজা হয়। আবার কোন কোন থানে নিত্য পূজা হয় না। নিত্য পূজায় আড়ম্বর নেই। ভক্ত নিজে বা পুরোহিত দিয়ে অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ঐ সব থানের পুরোহিত ব্রাহ্মণেতর জাতি। পূজান্তে ভক্তগণ নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন।

অনেকে রোগমুক্তি কামনায় বা বিশেষ মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ার আশায় ওলাবিবির মন্দিরের জানালায় বা পার্শ্বস্থ বৃক্ষে ইটের টুক্‌রা বেঁধে দেন এবং মনস্কামনা সিদ্ধ হলে ভক্ত তা বিশেষ পূজা দিবার পর খুলে দিয়ে যান। অনেকে ওলাবিবির পূজায় ছলন অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকৃতি মৃত্তি যথা ওলাবিবির মূর্ত্তি, ঘোড়া বা হাতীর মূর্ত্তি থানে বা থানের পাশে বা কক্ষের বাহিরে স্থাপন করেন। অনেক স্থানে পল্লীর গায়েনগণ ওলাবিবির মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক গান সারা রাত্রি ব্যাপী করে থাকেন। ওলাবিবির পূজায় আতপ চাউল, পাটালী, পান-সুপারি, সন্দেশ, বাতাসা প্রভৃতি নৈবেদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ফুল, ফল, দুধ, চাল, পয়সা প্রভৃতি ভক্তি-অর্ঘ্যরূপে প্রদত্ত হতে দেখা যায়। ধূপ-বাতি আনুষঙ্গিক হিসাবেও অনেকেই দিয়ে থাকেন। গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব হলে গ্রামবাসীগণ বিশেষভাবে ওলাবিবির পূজা দেন। গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাবকে গ্রাম্যভাষায় 'গ্রাম গরম হাওয়া' বলে। প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে নির্দ্দিষ্ট দিনে বিশেষ পূজা, মেলা, গান-বাজনা প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠান বারাসত মহকুমার হাবড়া থানাধীন গৈপুর গ্রামের খালের ধারের ওলাবিবির মন্দিরে উদ্‌যাপিত হত। একটি মাঝারি ধরণের অচেনা গাছের নীচে অবস্থিত ওলাবিবির এই ইষ্টক-নির্মিত মন্দিরের মধ্যে তিনটি অনুচ্চ মাটির ঢিপি ছিল; কোন মূর্ত্তি ছিল না। প্রতি বৎসর পয়লা চৈত্র হিন্দু-মুসলিম ভক্তদের মধ্য থেকে সেখানে বিশেষ ভক্তি নিবেদন করা হত। এতদ্ উপলক্ষে সেখানে তিন দিনের মেলা বসত এবং তাঁতে শত শত ভক্ত সমবেত হতেন। হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ হাজত, মানত ও শিরনি প্রদান করতেন। উক্ত মন্দিরের শেষ মুসলিম সেবায়েত ছিলেন ভদ্র ফকির ওরফে ভদু ফকির। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পর অর্থাৎ দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে ঐ অঞ্চল থেকে বহু মুসলিম স্থানান্তরে যাওয়ায় ওলাবিবির থানের কোন তত্ত্বাবধায়ক ছিল না। হিন্দু বাস্তুহারাগণ কর্তৃক অধ্যুষিত হওয়ার প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আগত শ্রীমতী ঠাণ্ডাবালা রায় নাম্নী এক মহিলা স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উক্ত ওলাবিবির থানটির তিনটি অনুচ্চ ঢিপির স্থলে ঘট স্থাপনা করে ওলাইচণ্ডীর পূজা-আর্চ্চনার সূত্রপাত করেন। সেইদিন থেকে গৈপুরের ওলাবিবির কল্পিত দরগাহ্ ওলাইচণ্ডীর মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে।

ওলাবিবি সাধারণতঃ সর্ব্বসাধারণের পিরানী বা দেবী। তবে কোন কোন

মন্দিরের নির্দ্দিষ্ট সেবায়েত থাকেন কিন্তু পূজা দানের সময়ে সাধারণে সমান অধিকারে অংশ গ্রহণ করেন। গ্রামের সকলে মিলে ওলাবিবির পূজার সমস্ত ব্যবস্থা করেন। কোন গ্রামে সেই গ্রামের মোড়লের নেতৃত্বে পূজা-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মোড়ল গ্রামের প্রতিনিধিরূপে পূজাও করেন। কোথাও বা নারীগণ পূজা করেন। বিশেষ পূজার সময় গ্রামের মোড়ল সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে পূজা-উপচার এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে গ্রামবাসীগণের পক্ষে ওলাবিবির পূজা সম্পাদন করিয়ে 'গ্রাম ঠাণ্ডা' করায় দায়িত্ব পালন করেন। গ্রামের ফকির গ্রাম গরম হলে ঠাণ্ডা করার জন্য গ্রামবন্ধন করেন গ্রামের অধিবাসীদের অনুরোধে। তাঁরা গ্রামের চারি কোনে চারটি খুঁটি পুঁতে তার মাথায় বয়েৎ-লেখা মাটির নতুন ছোট সরা-দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেন। কেউ কেউ পথের ত্রিমোহনায় ঐরূপ করেন।

ধর্মীয় আচার-আচরণের ওপর সংস্কৃতির প্রভাব যে কতখানি প্রবল হতে পারে তার এক অত্যাশ্চার্য্য নিদর্শন পাওয়া যায় জয়নগরের রক্তাখাঁ পল্লীর ওলাবিবির বিবরণে। শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখেছেন যে,—ঐ থানে ওলাবিবির কোন মূর্ত্তি নেই। পূজা কক্ষের মধ্যে দুটি ক্ষুদ্রাকৃতি সমাধি আছে। তন্মধ্যে একটি ওলাবিবির প্রতীকরূপে পূজিত হয়; অপর সমাধিটি ওয়াহাবী আন্দোলনের অন্যতম রক্তাখাঁ গাজীর বলে অনুমিত হয়।[৩৮]

ওলাবিবির থানে পূজা দিতে গিয়ে, কে জানে, কেউ ভক্তির আধিক্যে উক্ত রক্তাখাঁ গাজীর সমাধিতেও পূজার্ঘ অর্পণ করেন কিনা।

————

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

খুঁড়ি বিবি

খুঁড়ি বিবি এক কাল্পনিক পীরানী। খুঁড়ি বিবি নামটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। খোঁড়া বাঘ, খোঁড়া কুমীর এবং অন্যান্য খোঁড়া জীব-জন্তুগণের অধিষ্ঠাত্রী পীরানী বলে তাঁর এই নামকরণ। তিনি নিজে খোঁড়া ছিলেন বলে খুঁড়ি বিবি রূপে পরিচিতি লাভ করেন—এমন একটা অনুমান একেবারে উপেক্ষনীয় নয়। খুঁড়ি বিবির কোন মূল নাম ছিল কিনা আজো অজ্ঞাত। তাঁর কোন মূর্তি নেই। খুঁড়ি বিবির নামে যে দরগাহ আছে এবং দরগাহের মধ্যে যে সমাধি বা কবরস্থান রয়েছে তা থেকে তাঁকে ঐতিহাসিক পীরানী বলে মনে হতে পারে। বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার অন্তর্গত কেন্দুয়া নামক গ্রামে এক সুরম্য দরগাহ-গৃহের মধ্যে উক্ত মাজার দৃষ্ট হয়! স্থানীয় অধিবাসী এবং উক্ত দরগাহের সেবায়েতগণ খুঁড়ি বিবির ঐতিহাসিকতা বা কাল্পনিকতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত দিতে পারেন না। ঐতিহাসিক পীরানী হিসাবে তাঁকে নিঃসন্তানা কোন ধর্মপ্রাণ মুসলিম-মহিলা বলে মনে হতে পারে।

খুঁড়ি বিবিকে দেবী পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না। তাঁর কোন 'থান' নেই। হাজত, মানত ও শিরনি ব্যতীত কোন পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত নেই। নির্দিষ্ট দিনে ওরস হয়, ধর্মসভা হয়, বনভোজন হয়, প্রদত্ত হয় লুট, হয় মেলা। ওরস হয় পৌষ সংক্রান্তিতে, মেলা হয় পয়লা মাঘ তারিখে। প্রায় হাজার লোক সমবেত হন। হয় হিন্দু-মুসলিমের সমাবেশ। ভক্তজন ফল, দুধ, মিষ্টদ্রব্য মানত দেন। তাঁরা শিরনিও দেন। অনেকে দেন হাজত। এই দরগাহে পূর্ব্বে সেবায়েত ছিলেন ফকির নামক এক ব্যক্তি। বর্তমান সেবায়েতের নাম মহম্মদ মঙ্গলজান ফকির (৪০) প্রমুখ। এঁরা দরগাহে বাৎসরিক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাছাড়া তাঁরা প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি প্রদান করেন। খুঁড়ি বিবির অসংখ্য ভক্ত। ভক্তেরা প্রায় প্রতিদিনই দরগাহে দুধ দিয়ে যায়। সে দুধ গ্রহণ করার জন্য দরগাহে একটি নির্দিষ্ট পাত্র আছে। এই পীরানীর নামে প্রায় বাইশ বিঘা জমি পীরোত্তর আছে বলে সেবায়েতগণ

জানান। পীরোত্তর জমির মধ্যেই সুদৃশ্য দরগাহ-গৃহ অবস্থিত। দরগাহটি ইষ্টক-নির্মিত। এ সবই ভক্তগণের শ্রদ্ধার দান বটে।

খুঁড়ি বিবির আবির্ভাব কাল সম্পর্কে সেবায়েতগণ কিছু বলতে পারেন না। ভাটি বা সুন্দরবন অঞ্চলে বনবিবি, ওলাবিবির ন্যায় নারী পীর খুঁড়ি বিবির উদ্ভব খুবই স্বাভাবিক বটে। কল্পিত বনবিবি বা ওলাবিবির ন্যায় কাল্পনিক পীরানী খুঁড়ি বিবির আবির্ভাব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পর বলে অনুমান করা যায়।

এখানে উদ্‌যাপিত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বনভোজন দৃশ্যটি খুবই চিত্তাকর্ষক। গত ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে আমি স্বয়ং উপস্থিত থেকে যে বনভোজন পর্ব্ব সমাধা হতে দেখি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ ঃ—

খুঁড়ি বিবির দরগাহ সংলগ্ন জমির কয়েক গজ ব্যবধানের মধ্যে একটি উঁচু জমি এবং তাতে দু'একটি বৃক্ষও আছে। এই উঁচু জমি সংলগ্ন স্থানে আছে একটি মাঝারি আকারের পুকুর। উক্ত জমি ও পুকুরটি খুঁড়ি বিবির দরগাহের সম্মুখভাগে অবস্থিত।

বেলা তখন প্রায় বারোটা। উক্ত খোলা জমিতে জমায়েত হয়েছেন প্রায় জনা পঞ্চাশ লোক। তাতে নারী, বৃদ্ধ, বালক-বালিকা, শিশু প্রভৃতিও আছে। এক পাশে কয়েকটি জায়গায় 'তিগ্‌ড়ি' অর্থাৎ ছোট গর্তের পাশে ইট দিয়ে রান্নার উপযোগী উনানে ভাত-তরকারী পাক্ হচ্ছে। কেউ পাক করছে, কেউ বা কলাই এর ডিস, গ্লাস প্রভৃতি নিয়ে আহারের জন্য অপেক্ষা করছে। সেখানে উপস্থিত শ্রীসুকুমার সরকার (৩০) এবং শ্রীবিহারীলাল দাস (৪৫) মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে তাঁরা অর্থাৎ হিন্দুরা খুঁড়ি বিবির নামে এই বনভোজন-উৎসব পালন করছেন। রান্নার সামগ্রী প্রথমে খুঁড়ি বিবির নামে উৎসর্গ করেন এবং পরে তাঁরা নিজেরাই সানন্দে ভাগ করে আহার করেন। তাঁরা কেন্দুয়া গ্রামেরই অধিবাসী। প্রতি বৎসরই তাঁরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এটা তাঁদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এইরূপ করলে খুঁড়ি বিবির প্রতি-ভক্তি প্রদর্শন করা হয় এবং তাতে তাঁদের সমূহ মঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস। এই অনুষ্ঠানে পার্শ্ববর্তী চৈতা নামক গ্রামের অধিবাসীও যোগদান করেন।

হিন্দু ভক্তগণের সেই বনভোজন-স্থল থেকে অদূরে অর্থাৎ দরগাহ স্থান থেকে আরো সামান্য দূরে দেখা গেল প্রায় জনা পঞ্চাশেক লোক বড় বড় 'ডেগ্‌চী', ও কড়ায় করে কিছু সামগ্রী পাক করছেন। অনুসন্ধানে জানতে পেলাম যে সেটী মুসলিম ভক্তগণের বনভোজন উৎসব। মুসলিম ভক্তগণও খুঁড়ি বিবির নামে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করছেন। তাঁদের অনুষ্ঠানেও যথেষ্ঠ আড়ম্বর রয়েছে। সেখানে উপস্থিত জছিমদ্দিন বিশ্বাস (৬০), কালু মণ্ডল (৭৫), এসারত মণ্ডল (৫০), আজিবর রহমান (৬৫), ইউনুছ বিশ্বাস (৫০) প্রমুখ জানালেন যে তাঁরা পীরানী খুঁড়ি বিবির দরগাহে তাঁর প্রতি ভক্তি নিবেদন করতে এইরূপ হাজত বা বনভোজন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন। প্রতি বৎসর তাঁরা এইরূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করেন। লক্ষণীয় যে, হিন্দুগণ, মুসলিমগণ অপেক্ষা অধিকতর দরগাহ সমীপবর্তীস্থানে এই অনুষ্ঠান করেন। তবে দেখা গেল হিন্দুগণের বনভোজনস্থলে মুসলিমগণ এবং মুসলিমগণের বনভোজনের স্থলে হিন্দুগণ অবাধ গমনাগমন করছেন।

খুঁড়ি বিবি সম্পর্কে কিছু লোককথা এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে যেটি বহুল প্রচলিত, সংক্ষেপে সেটি এইরূপ ;—

একবার এক সরকারী আমিন জমি জরিপের কাজে এতদ্ অঞ্চলে এসেছিলেন। খুঁড়ি বিবির দরগাহ-সংলগ্ন পীরোত্তর জমির পরিমাণ সম্পর্কে তাঁর খুব সামান্যই ধারণা ছিল। জমি জরিপের কাজে তিনি জমির বিবরণ নিতে গিয়ে জমির মালিকের নাম জানতে চান। তিনি যে জমির কথাই জিজ্ঞাসা করেন সেটিই খুঁড়ি বিবির নামের জমি। আমিন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হন। তিনি অবাক হয়ে ভাবেন,—কি করে সম্ভব যে এত সব জমি খুঁড়ি বিবির। ধৈর্য্যহারা হয়ে সে দিনের মতন তিনি জমি মাপা শিকল ত্যাগ করেন।

সে রাত্রে তিনি স্থানীয় অধিবাসী বিপিনবিহারী সরকারের দহলিজে শয়ন করেন। খুঁড়ি বিবির অসাধারণ প্রভাবের কথায় বিস্মিত হয়ে চিন্তা করতে করতে তিনি নিদ্রাভিভূত হন। মাঝ রাতে সেই দহলিজে অকস্মাৎ এক বিশালকায় বাঘের আগমন ঘটে। আমিন বাবু তা অবলোকন করে

কিংকর্তব্য বিমূঢ় হন। হঠাৎ তাঁর স্মরণ হয় পীরানী খুঁড়ি বিবির কথা। তিনি তৎক্ষণাৎ খুঁড়ি বিবির নাম জপ করতে থাকেন। দেখা গেল অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই বাঘ কোনরূপ আক্রমণ না করে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

পরদিন আমিনবাবু যত্ন সহকারে এতদ্ অঞ্চলে জরীপের কাজ সমাপ্ত করেন এবং গত রাত্রের অলৌকিক ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন। শেষ পর্য্যন্ত আমিন বাবু খুঁড়ি বিবির প্রতি এতখানি শ্রদ্ধাবনত হন যে সর্ব্বসাধারণের নিকট পীরানীর দরগাহে হাজত, মানত, শিরনি দেওয়া উচিত কর্তব্য বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করে যান।

————

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ত্রৈলোক্য পীর

পূর্ব্ববঙ্গে মৎসেস্যন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও সত্যনারায়ণ—এই তিনে মিলে ত্রিনাথ অথবা ত্রৈলোক্য পীর হয়েছেন। দ্রষ্টব্যঃ শ্রী ১৪৬ (লিপিকাল ১২০১), ২৪৭, ২৪৮ (মনোহর সেনের), ৪২৩, ৪৩৫ (কৃষ্ণদাসের)। বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ১-১ পৃঃ ২৪, ৯৪-৮৫। দুইটিতে লেখকের নাম আছে, হরিনারায়ণ (অথবা হরিরাম) দাস ও 'দ্বিজ' রামগঙ্গা (অথবা রামগঙ্গা দাস)।[৪১]

হরিনারায়ণ অথবা হরিরাম দাস এবং দ্বিজ রামগঙ্গা অথবা রামগঙ্গা দাস বিরচিত পাঁচালীদ্বয়কে ডঃ সুকুমার সেন অত্যন্ত নিরর্থ ও তুচ্ছ রচনা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হরিনারায়ণ দাসের পাঁচালীতে ত্রৈলোক্য পীরের সাথে মোচরা পীরের উদ্ভট সম্পর্কের কথা এইভাবে লিখিত হয়েছে,—

মোচরা পীরে কহে কথা সত্যপীরের ঠাঁই
ত্রৈলোক্য পীর আছে মোর জ্যেষ্ঠ ভাই।

মোচরা পীর (আদি নাথ গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ ও স্থানীয় যোদ্ধাপীর মসনদ্ আলি মিলিত হয়ে মছন্দলী পীর বা মোছরা পীরে পরিণত হয়েছেন), ত্রৈলোক্য পীরকে আপনার জ্যেষ্ঠ ভাই বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে ত্রৈলোক্য পীরকে 'একজন' পীর হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ত্রৈলোক্য পীরের নামে কোন দরগাহ্ বা নজরগাহ (কল্পিত দবগাহ) বা স্থায়ী 'থান' নেই। ত্রৈলোক্য পীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন-পদ্ধতি অন্যান্য পীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। কেবলমাত্র সত্যনারায়ণ পূজা বা সত্যপীরের পূজার সঙ্গে তার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।

সাধারণতঃ পূর্ণিমা তিথিতে ত্রৈলোক্য পীর বা ত্রিনাথের পূজানুষ্ঠান হয়। কোন ভক্তের বাড়ীর উঠানে বা বারান্দায় বা কোন কক্ষের একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এই পীরের পূজা উপলক্ষে ঘট স্থাপন করা হয়।

ভক্ত সেখানে ধূপ-বাতি জ্বালিয়ে দেন। ভক্তগণ বাতাসা, ফুল, পান, ·তেল, গঞ্জিকা প্রভৃতি নিবেদন করেন। রোগ নিরাময় বা কোন সুফল লাভের আশায় লোকে তাঁর নামে মানসিক করে এবং আশানুরূপ ফল লাভের পর ত্রিনাথের পূজার আয়োজন করে। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধু, যাঁরা গোসাঁই নামে সমধিক পরিচিত, তাঁরাই বিশেষভাবে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঘট স্থাপনার পর থেকে গোসাঁইগণ ডুগী, একতারা ও জুড়ী সহযোগে সেখানে দেহতাত্ত্বিক বা ভাবগান পরিবেশন করেন এবং মাঝে মাঝে পীরকে প্রস্তুত গঞ্জিকার কলিকা নিবেদন করে নিজেরা সেবন করেন। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে সাধারণের মধ্যে মিষ্টান্নাদি বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠান ত্রিনাথের মেলা নামে অভিহিত। ত্রিনাথের মেলা উপলক্ষে ত্রৈলোক্য পীরের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক পাঁচালী পাঠ করা হয়। সম্প্রতি (১৯৭০) শ্রীমহেশচন্দ্র দাস বিরচিত যে ত্রিনাথের পাঁচালীখানি পাওয়া গেছে তাতে মুসলমানী কোন ভাব দৃষ্ট হয় না। পুস্তিকাখানি ৭"×'৫ আকৃতি বিশিষ্ট। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪। এর প্রথমে ত্রিপদী ছন্দে বিষ্ণুর বন্দনা আছে।

ত্রিনাথ কেশব নমঃ, তুমি হে পুরুষোত্তম,
চতুর্ভুজ গরুড় বাহন।
জলদ-বরণ ঘটা, হৃদয়ে কৌস্তুভ ছটা,
বনমালা গলে সুশোভন।...ইত্যাদি।

ত্রিনাথের আবির্ভাবের কারণ দর্শাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,—

কলির আরম্ভ কালে দেব নারায়ণ।
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপ করেন ধারণ॥
দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে নাম সংকীর্তন।
হরিবোল বিনা আর নাহিক বচন॥
তবু নাহি কলির নরের পাপ যায়।
দেখিয়া কি করে হরি ভাবেন উপায়॥
নবদ্বীপে ত্রিনাথরূপ করেন ধারণ।...ইত্যাদি।

এখানে ত্রিনাথ এক অবতার-স্বরূপ। আপনার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য যে ঘটনা সংঘটিত হয় তা এই পাঁচালী কাব্যের মূল কাহিনী।

সংক্ষেপে কাহিনীটি এইরূপ :—

নবদ্বীপের জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। গাভী পালন করে তাঁর জীবিকা নির্বাহ হয়। একদিন তাঁর গাভীটি গেল হারিয়ে। গাভীর শোকে ক্রন্দনরত ব্রাহ্মণ সরোবরে ডুবে আত্মহননে উদ্যত হলে দেব নারায়ণ দৈববাণী দিলেন,—

ত্রিনাথে করহ পূজা অবোধ ব্রাহ্মণ ॥
গাভীর কারণে কেন জীবন ত্যজিবে।
পুণর্বার ধন-রত্ন গাভী তব পাবে ॥

দেব নারায়ণের আরো নির্দেশ অনুযায়ী তিনি পান, গাঁজা ও তেল সংগ্রহ করতে দোকানে গেলেন। তেল নেবার পাত্র তাঁর নেই। তিনি দুঃখিত হলেন। আবার দৈববাণী হল,—তৈল আন বস্ত্রমধ্যে করিয়া বন্ধন।

বস্ত্রমধ্যে তেল নেবার কথায় দোকানী তাঁকে উন্মাদ বল্‌লে এবং তেল দেওয়ার মধ্যে প্রতারণা কর্‌লে। তখন গদাধর সেই মুদীর তেলের কলসী হরণ করলেন। এই ঘটনায় দোকানীর সম্বিৎ ফিরে এল। সে ব্রাহ্মণকে দেবতাজ্ঞানে পা জড়িয় ধর্‌ল। ব্রাহ্মণ তাকে ত্রিনাথের পূজা মান্‌তে পরামর্শ দিলেন। পূজা মানত করে মুদি ফিরে পেল তেলের কলসী।

ব্রাহ্মণ ফিরে এলেন গৃহে। তিনি ত্রিনাথের নামে ঘট স্থাপনা করে পূজার আয়োজন করলেন। নিবিষ্ট মনে তিনি বসলেন পূজায়। এমন সময় ব্রাহ্মণের গুরু এসে শিষ্যকে ডাকলেন। ধ্যানমগ্ন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে গুরু ক্রুদ্ধ হলেন এবং লাথি মেরে ঘট দিলেন ভেঙে। ক্রুদ্ধ গুরু তৎক্ষণাৎ অভিমানে ফিরে এলেন ঘরে। ততক্ষণে তাঁর "স্ত্রী-পুত্র মরেছে তিনজনে।" মনের দুঃখে জলে ডুবে তিনি আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে আবার আকাশবাণী হল। আকাশবাণীর নির্দেশমত তিনি শিষ্যগৃহে এসে শিষ্য-সমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন এবং প্রতিকার প্রার্থনা করলেন। ব্রাহ্মণ বললেন,—

বিধিমতে কর তুমি ত্রিনাথ পূজন।

গুরু এবার ত্রিনাথের পূজা মানত করলেন,—শিষ্যের কাছ থেকে কোল্কে পোড়া ভস্ম এনে স্ত্রী-পুত্রের অঙ্গে মাখালেন। স্ত্রী-পুত্র জীবন পেল ফিরে। গুরুও ত্রিনাথের পূজা দিয়ে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করলেন। এর পর থেকে ত্রিনাথের পূজা প্রচলন হল।

সর্বশেষে কবি তাঁর ভণিতায় গেয়েছেন,—

হরি হরি বল সবে যত বন্ধুগণ।
মহেশচন্দ্র দাস ভনে শুন ভক্তগণ॥

কবি মহেশচন্দ্র দাস নিজের কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন নি! এই ধরণের পাঁচালীতে অধুনা আর কবির বিবরণ প্রদত্ত হয় না। এই সব পাঁচালী বাজারে বিক্রয় করে লেখক ও বিক্রেতা আংশিক জীবিকা অর্জন করেন মাত্র। তাই কাব্য হিসাবে গুরুত্বহীন এতদ্জাতীয় পাঁচালীকারগণের বিষয় জনসাধারণের সম্মুখে আনবার রেওয়াজ কমে গেছে।

ত্রিনাথের পাঁচালীর কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ব্রাহ্মণ্য আদর্শ থেকে এর উৎপত্তি। ত্রিনাথ এখানে লৌকিক দেবতা বিশেষ। এই ধরণের পাঁচালী সম্পূর্ণরূপে হিন্দুর ব্রতকথা জাতীয় পাঁচালী।

কবে থেকে ত্রিনাথের পূজা পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে বৈষ্ণব-সহজিয়া গোষ্ঠী বা ফকির দরবেশগণের মধ্যে প্রচলিত ত্রিনাথের মেলা উদ্‌যাপনের ঘটনা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা ষোড়শ শতাব্দীর যে কোন সময় থেকে সূত্রপাত হয়। পাঁচালীকার মহেশচন্দ্র দাসের কাহিনী-আরম্ভে প্রদত্ত বক্তব্য থেকে এর কিছু আভাষ পাওয়া যায় মাত্র।

———

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পাগল পীর

হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য উভয় তরফের প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবে মধ্যস্থতা করার সহায়ক হিসাবে মধ্যযুগে কিছু কাল্পনিক মিশ্র-দেবতার আবির্ভাব প্রয়োজন হয়েছিল। তেমনি একজন কাল্পনিক মিশ্র পীর হলেন পাগল পীর। পাগল অর্থে বিকৃত মস্তিষ্ক নয়, পাগল এখানে আত্মভোলা শিব এই অর্থে ব্যবহৃত এবং পীর অর্থে ইসলাম প্রচারক শান্তির দূত স্বরূপ সুফী ফকির। দিগম্বর শিব ও সংসার ত্যাগী দরবেশ বুঝি মিলিত হয়ে হয়েছেন পাগল পীর। এ যেন পীর ও নারায়ণের একাত্মরূপ। ফকির-বেশী ধর্মঠাকুর যেমন পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দের শেষভাগে ধীরে ধীরে সত্যপীরে মিশে গেছেন—সংসার-ত্যাগী শ্মশানবাসী মহাদেব তেমনি ধীরে ধীরে ফকিররূপে পাগল পীরে মিশে গেছেন। পীর বড়খাঁ গাজীর কাহিনীতে বিবৃত দুই ধর্মের বিরোধের মতন পাগল পীরের কোন বিরোধ-কাহিনী নেই।

কয়েকটি অঞ্চলে পাগল পীরের দরগাহ দেখা যায়। তাঁর প্রভাবও কম নয়। কোথাও তিনি পাগল পীর, কোথাও বা পাগলা পীর, কোথাও বা পাগল বাবা নামে অভিহিত। আবার কোথাও তিনি পাগলা গাজী নামে পরিচিত। বারাসত মহকুমার ঝালগাছি গ্রামে পাগল গাজীর নামে থান আছে। প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে সেখানে ওরস হয় এবং এক দিনের মেলা বসে। বসিরহাট মহকুমার বেনিয়াবৌ গ্রামের পাগল পীরের দরগাহটি উল্লেখযোগ্য। দরগাহটি ইষ্টক নির্মিত। বর্তমান (১৯৬৮ খৃঃ) সেবায়েতের নাম বারিতুল্লাহ্ ফকির প্রমুখ। লক্ষ্য করবার বিষয় যে পীরের দরগাহের সমস্ত সেবায়েতই ফকির বেশধারী বা উপাধিধারী। কেহ কেহ শাহ্‌জী উপাধিতেও ভূষিত। সেবায়েতগণ পাগল পীরের দরগাহে প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে ধূপ-বাতি প্রদান করেন। এ যেন লৌকিক আচারে তুলসী তলায় নিত্য সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়া। দরগাহ-গৃহের মধ্যে

মেঝেতে সামান্য উঁচু মাটির পিঁড়িতে একপাশে সোলার টোপর। অনুরূপ টোপর বিবাহের সময় বরকর্তৃক মস্তকে গৃহীত হয়। পিঁড়ির চারকোণে চারটি ত্রিশূল প্রোথিত রয়েছে। পিঁড়িটির দৈর্ঘ্য প্রায় দুই হাত এবং প্রস্থ এক হাত। ত্রিশূল চারটি লৌহ নির্মিত। এ ত্রিশূল দেবাদিদেব মহাদেব-ব্যবহৃত কল্পিত ত্রিশূল। চিত্রখানি এমন যে কোন এক দেব বা দেবীমূর্ত্তি উক্ত পিঁড়ির উপর বসালে তা হিন্দুর পূজা বেদীতে পরিণত হতে পারে। পাগল পীরের আবির্ভাব কিরূপে হল এ সম্পর্কে একটি লোককথা এতদ্ অঞ্চলে প্রচারিত আছে। লোককথাটি এইরূপ,—

মহম্মদ একব্বর আলি বাস করতেন বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত সরফরাজপুর গ্রামে। তাঁর কোন এক পূর্ব-পুরুষ এক রাত্রে স্বপ্নাদেশ পান। কে যেন বল্ছেন,—আমি বেনিয়াবৌ গ্রামে আছি। আমি মহাদেব, আমি তারকনাথ, আমি ভোলানাথ। তুমি অবিলম্বে বেনিয়াবৌ গ্রামে এসে আমার সেবার আয়োজন কর।

স্বপ্নাদেশ পেয়ে সেই ব্যক্তি চলে এলেন বেনিয়াবৌ গ্রামে এবং একটি 'থান' কল্পনা করে মহাদেবের আসন স্বরূপ পিঁড়ি নির্মান করেন এবং চারটি ত্রিশূল চার কোনে বসিয়ে সেবার আয়োজন করেন। তিনি তো মুসলিম ;—কিভাবে তিনি মূর্তি কল্পনায় পূজা করবেন। তাই সেখানে মুসলিম আদর্শে কোন মূর্তি স্থাপনা করলেন না। সেইদিন থেকে সেখানে ধূপবাতি দেওয়া শুরু হল। পরে ভক্তগণ হাজত, মানত ও শিরনি দেওয়া প্রচলন করেন।

পাগল পীরের থানে দুধ, ফল, বাতাসা, পয়সা, অন্যান্য মিষ্টদ্রব্যও ভক্তগণ কর্তৃক প্রদত্ত হয়। বহু রমণী সন্তান কামনায় দরগাহে ইট বাঁধেন। ইপ্সিত ফল লাভ হলে তাঁরা ইট খুলে দেন,—অনেকে যথেষ্ঠ মিষ্টান্ন বিতরণ করেন,—এমন কি সন্তান ওজনে মিষ্টদ্রব্যাদি সমবেত লোকের মধ্যে বিতরণ করে দেবার ব্যবস্থা করেন। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে পাগল পীরের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠান হয়। সে সময় আট-দশ দিনের বিরাট মেলা বসে। সেখানে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলিম নর-নরীর সমাবেশ হয়। স্থানীয় লোকে এই মেলাকে বলেন 'পাগলের মেলা'।

পাগল পীরের দরগাহের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ একব্বর আলি একখানি 'আশাবাড়ি' ব্যবহার করতেন। সেই আশাবাড়ি নাকি অলৌকিক শক্তি

সম্পন্ন ছিল। তিনি আশাবাড়ির সাহায্যে ভূতে পাওয়া রোগীকে নিরাময় করতেন। কোন স্থান থেকে রোগী দেখার জন্য 'ডাক' এলে তিনি আশাবাড়ি হাতে নিয়ে বুঝতে পারতেন যে সেই স্থানে যাওয়া উচিত কিনা। আশাবাড়ি হাতে নিয়ে তিনি নিরুদ্বেগে পথ চলতেন।

পূর্বে দরগাহে মেলা উপলক্ষ্যে গান বাজনা হত। ভিন্ন মতাবলম্বী মুসলিমগণের আপত্তিতে দরগাহস্থানে আর মেলা বসে না। অনতিদূরে আরো একটি 'থান' স্থাপিত হয়েছে; সেখানে বেশ কয়েক বছর ধরে ফাল্গুনের সংক্রান্তি থেকে মেলা বসে। সর্বশেষ স্থাপিত পাগল পীরের 'থান' অর্থাৎ মন্দিরটি তৃতীয় 'থান'। প্রথম দরগাহের ধ্বংসাবশেষ-মাত্র অবশিষ্ট আছে। দ্বিতীয় দরগাহটি ইস্টক-নির্মিত হওয়ার মূলে প্রচলিত লোক-কথাটি এইরূপ :—

পানিতর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি একবার যক্ষাকাশ রোগে আক্রান্ত হন। তিনি চিকিৎসার ত্রুটি করেন নি,—তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল। ডাক্তার, কবিরাজ, হেকিম কেউ যখন কোনরূপ উপায় দর্শাতে পারলেন না, তখন তিনি হতাশায় ভেঙে পড়লেন। জীবনের আশা তিনি একপ্রকার ত্যাগই করলেন। এমত অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি তাঁকে পাগল পীরের থানে গিয়ে পীরের শরণাপন্ন হতে বললেন। তিনি শেষ আশা নিয়ে পাগল পীরের থানে এলেন এবং সেবায়েতের কথায় থানের মাটি এবং সেবায়েত-প্রদত্ত তেল ব্যবহার করতে লাগলেন। অল্পদিন মধ্যে তিনি আরোগ্যলাভ করলেন।

উক্ত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে ভক্তি-অবনত হয়ে কাঁচা মাটির দরগাহটি পাকা করতে মনস্থ করেন এবং কিছুকালের মধ্যে ঐ দরগাহটি পাকাগৃহে পরিণত হয়।

গাছাগ্রামে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পাগল পীর পাগল ঠাকুর নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। গাগল ঠাকুরের মন্দিরের পরিচালকরূপে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ মহাশয় ১৪।৯।১৯৫১ তারিখে যে জবানবন্দী দিয়েছেন তা এইরূপ—

তাঁরা বিশ বছর ধরে গাছা মৌজার ১৪৬৬ দাগ নম্বর জমিতে স্থাপিত পাগল ঠাকুরের উৎসবের পরিচালনার ভার বহন করছেন। এই উপলক্ষ্যে প্রতি ফাল্গুন মাসের শেষে সংক্রান্তি থেকে সাতই চৈত্র পর্যন্ত এখানে মেলা বসে।

সেবায়েত শ্রীকালিপদ ঘোষ (ফকির) ; বয়স আনুমানিক ষাট বৎসর। পূরা হিন্দুমতে পাগল ঠাকুরের মন্দিরে পূজা হয়। এখানে পূজার সময় বাজনা বাজে, বেলপাতা, ফুল-বাতাসাদি অর্ঘ্য হিসাবে প্রদত্ত হয়। অনেকে ফল, বাতাসাদি মানত হিসাবে দিয়ে থাকেন। বাৎসরিক অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবারে এখানে পূজা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

মুসলিমের শরীয়তী মতে বাধা হওয়ায় ৺বরদাকান্ত ঘোষের উদ্যোগে উক্ত নতুন স্থান তৈরী করা হয় এবং পাগল পীরের দরগাহটি পাগল ঠাকুরের মন্দির নামে অভিহিত হয়। উক্ত মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বনবিবি

মুনশী মোহম্মদ খাতের সাহেব তাঁর বোন বিবি জহুরা নামক গ্রন্থে লিখেছেন,—বেরাহিম (ইব্রাহিম) নামে জনৈক ফকির মক্কা শহরে বাস করতেন। তাঁর ঔরসে গোলাল বিবির গর্ভে এক বনে বনবিবি এবং শা জঙ্গলির জন্ম হয়। বনবিবি ও শাজঙ্গলি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে মদিনা শরীফে এলেন এবং সেখানে হাসেনের আওলাদের কাছে মুরিদ হয়ে যাত্রা করলেন হিন্দুস্তান অভিমুখে।

বোনবিবি ও শা জঙ্গলি আগে বেহেস্তে ছিলেন। আল্লার হুকুমে তাঁদেরকে বেরাহিমের ঘরে জন্ম নিতে হয়। কারণ, আঠারো ভাটিতে তাঁদের জহুরা হবে।

আরব থেকে রওনা হয়ে প্রথমে তাঁবা এলেন বঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলে,—ভাঙ্গড পু রের নিকট।

কহেন ভাঙ্গড শাহা শুন দিয়া মন।
এই তে ভাটির দেশ আইলে এখন ॥ ইত্যাদি

মোহম্মদ মুনশী সাহেবও বনবিবির পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর বনবিবি জহুরা নামক গ্রন্থে অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন।

তাঁদের মত অনুযায়ী বনবিবিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে গ্রহণ করতে হয়। তবে তাদের বক্তব্যের সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধিকাংশ গবেষকের বক্তব্য এই যে বনবিবি মূলতঃ হিন্দু দেবী বনদেবীর মুসললিম সংস্করণ। বনবিবি হিন্দু-মুসলমান ধর্মচিন্তার সমন্বিত অরণ্যদেবী। আদিম যুগে হিংস্র জীব-জন্তুর ভয়ে কে না ভীত ছিল! তখন মানুষ আধুনাকালের প্রহরণ আবিষ্কার করে নি। ঐ সব হিংস্র জীব-জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কল্পিত অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত হওয়াই স্বাভাবিক। বনবিবি বনের জীব-জন্তুর এমনই এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুতরাং বনবিবি এক কাল্পনিক পীরানী হিসাবে গ্রহীতব্য। বনবিবি যদিও

হিন্দুর বনদেবীর মুসলমানী সংস্করণ বলে কথিত, তথাপি অধুনা বনবিবি কেবল মুসলিমের নন, তিনি হিন্দু-মুসলিম সকলের।

বনবিবির প্রভাব প্রধানতঃ সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবনাঞ্চলে ব্যাপ্ত। সুন্দরবনে যাঁরাই প্রবেশ করেন তাঁরাই হিংস্র জীবজন্তুর কবল থেকে মুক্ত থাকার প্রার্থনা করেন বনবিবির নিকট,—বনবিবির থানে পূজা অর্পণ করেন কিংবা মানত করে বনে প্রবেশ করেন কিংবা প্রত্যাবর্ত্তন কালে নির্দ্দিষ্ট 'থানে' পূজা অর্পণ করেন। এই সব লোক যাঁরা সুন্দরবনে প্রবেশকারী প্রধানতঃ তাঁরা কাঠ সংগ্রহকারী, মধু সংগ্রহকারী (মৌলে), শিকারী প্রভৃতি।

সাধারণের ধারণা বনবিবি দয়াশীলা। এক শ্রেণীর ফকির দেখা যায় যাঁর মন্ত্রের সাহায্যে বাঘকে নাকি বশীভূত করতে পারেন। এই ফকিরগণ ওঝা বলেও কথিত। বাঘকে বশীভূত করাকে বাঘবন্ধন বলা হয়।

বনবিবির দু'রকম মূর্ত্তি দেখা যায়। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে বনবিবি হন কিশোরী মুসলিম বালিকার ন্যায়—মাথায় লতাপাতা আঁকা টুপি,—মাথায় চুলের বিনুনী, টিক্‌লী,—গলায় নানারকম হার, বনফুলের মালা,—পরনে পিরান বা ঘাঘ্‌রা পাজামা, পায়ে জুতা-মোজা,—গায়ে পাত্‌লা ওড়না। কোন স্থানে তাঁর হাতে আশাদণ্ড এবং ঝাণ্ডা। তাঁর বাহন মুরগী বা বাঘ। তাঁর কোলে বালক মূর্ত্তি। অনেকের ধারণা সেটি দক্ষিণ রায়, মতান্তরে বনবিবি পাঁচালীতে বর্ণিত দুখে নামক কাঠুরিয়া বালক। বনবিবির জয়গায় মুসলিম ফকিরগণ শিরনী হাজত, মানত প্রদানে কর্তৃত্ব করেন। সেখানে মুরগী জবাই হয়. মন্ত্র পাঠ হয় না। কেহ বা কোরাণের দু'একটি বয়েত মনে মনে আবৃত্তি করেন। হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে বনবিবির গলায় হার, বনফুলের মালা,—মাথায় মুকুট,—সর্ব অঙ্গে নানারূপ অলঙ্কার,—হাতে আশাদণ্ড থাকে না,—কোলে একটি শিশু, বাঘের উপর উপবিষ্ট।[৩৮]

বর্ণ ব্রাহ্মণ বনবিবির পৌরহিত্য করেন না, করেন অনুন্নত সমাজের হিন্দুরা। পূজা আচারে লোকায়ত বিধান অনুসৃত হয়। পুরোহিতগণ বনবিবিকে বনচণ্ডী জ্ঞানে নিরামিষ নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করেন,—বলি প্রদত্ত হয় না। বনবিবি যে আদিতে বনদেবী ছিলেন তা তাঁর মূর্ত্তি ভালভাবে

নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায়। এখনও আকৃতি ও বেশভূষায় অরণ্য-বনবিবির বৈশিষ্ট্য লোপ পায়নি।৩৮

বনবিবির নামে শিরনী দিবার প্রচলন কোন কোন স্থানে দেখা যায় না, যা অধিকাংশ পীরের দরগাহে দিতে দেখা যায়। তাঁর নামে হাজত দিতে অধিকাংশ স্থানে মোরগ জবাই হয় না; বনে বনবিবির নামে ছেড়ে দেওয়া হয়। একে বলা হয় 'হাজত-খয়রাত'। ঐ সব মোরগ বা মুরগীকে বনবিবির মোরগ-মুরগী বলে। অন্যে সে মুরগী পালনের জন্যে নিয়ে যায়। মুরগী বনে ছেড়ে দেওয়ার মানসিকতাকে অনেকে বৌদ্ধ ধর্মাদর্শ প্রভাবিত বলে মনে করেন। আবার অনেকে মনে করেন যে মা বনবিবি বা বিবিমা অত্যন্ত দয়াবতী। তাঁর ভক্ত বন্য-সন্তানকে হত্যা না করার সন্তান-বৎসল মানসিকতা থেকে এই প্রথার উদ্ভব।

বনবিবির থান সাধারণতঃ নদ-নদী খাল-বিলের তীরে, গ্রাম পার্শ্বস্থ মাঠের ধারে বট, অশ্বত্থ বা অন্য যে কোন বৃক্ষের তলায় অবস্থিত। থানে মাটির ঢিপির উপর মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। সেখানে সাধারণ ঘট বা চিত্রিত ঘট থাকে। অনেক স্থানে বনবিবির স্থান পীরোত্তর থাকে। অধিকাংশস্থলে সেই থান সরকারী রেকর্ডভুক্ত না থাকলেও ন্যূনপক্ষে এককাঠা জমি ছাড় থাকে। দরগাহ 'থান' উন্মুক্ত স্থানেই থাকে। তবে থানের সম্মুখভাগ প্রাচীর দিয়াও আবৃত থাকে না। লোকের বিশ্বাস যে তাঁর থানে গভীর রাত্রে বাঘ নিঃশব্দে সালাম জানাতে আসে;—দেবীও গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ঐ 'থানে' একবার আসেন এবং ভক্ত পশুকুলের প্রণতি নিয়ে যান। বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত ভুরকুণ্ডা নামক স্থানে বনবিবির নামাঙ্কিত এবং কাব্য-খ্যাত এইরূপ একটি 'থান' আছে। থানটি ইছামতী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। সেখানেই নাকি বনবিবির আপনার আসন। কাব্যে আছে,—

বহু দেখে বনবিবি রওয়ানা হইল,
ভুরকুণ্ডায় আপনার আসনে বসিল।

বনবিবির নামে কয়েকখানি মুদ্রিত পাঁচালী কাব্য, কয়েকখানি অমুদ্রিত নাটক আছে। মুদ্রিত কাব্যগুলি লিখেছেন বয়নদ্দিন, মুন্‌শী মোহাম্মদ খাতের ও মোহাম্মদ মুন্‌শী সাহেব। উহাদের রচনায় তেমন মৌলিক পার্থক্য

দৃষ্ট হয় না। কাব্যের নাম বোনবিবি জহুরা নামা। এতে দুটি কাহিনী আছে। একটি নারায়ণীর জঙ্গ (জঙ্গ অর্থে যুদ্ধ) এবং অপরটি ধোনা-দুখের পালা। মোহাম্মদ মুন্‌শী সাহেব প্রণীত পাঁচালীর বিবরণ এইরূপ ;—

কবি আত্মপরিচয় দিয়ে লিখেছেন—

কহে মোহাম্মদ মুন্‌শী জোন'বে সবায়,
ভুরসুট কানপুরে বসতি আমার।
শেক দারাজতুল্লা জান আমার ওয়ালেদ,
আল্লাতালা পূরা করে দেলের মকছেদ।

এই কাব্যের মধ্যে অন্য অংশে অন্য কবির ভণিতা পাওয়া যায়। যথাঃ—বনবিবি ও সা জঙ্গলি মদিনা থেকে বনে আসার কাহিনী-অংশের শেষে আছে, —

বোনবিবি সেথা হইতে বিদায় হইল,
অধম ছাদেক মুনশী পয়ারে রচিল।

আবার, নারায়ণী বনবিবির তাঁবেদারী করবার বয়ানে আছেঃ—

শোন এবে ধোনা মৌলে কাহিনী দুঃখের।
কহে শোন আছিরদ্দিন জোনাবে সবার,
চব্বিশ পরগণা বিচে বসতি যাহার।

এ থেকে অনুমান করা যায় যে কাব্যখানিতে বিভিন্ন কবির হস্তাবপলেপ আছে। তবে মুনশী মোহাম্মদ খাতের প্রণীত কাব্যে এরূপ ভিন্ন কবির হস্তাবলেপ আছে বলে কোন ভণিতা নেই। মোহাম্মদ খাতের আপনার পরিচয়ে দিয়ে বলেছেন—

মোহাম্মদ খাতের কহে আছি করি সার,
হাবড়া জেলার বিচে বসতি যাহার।
বালিয়া গোবিন্দপুরে কদিমি মোকাম,
মোহাম্মদ হেছামুদ্দিন বাবাজীর নাম।

তিনি কেন এই কাব্য লিখলেন তার ব্যাখ্যায় লিখেছেন,—

লিখিতে কাহিনী কেচ্ছা নাহিক আছিল ইচ্ছা

কি করিব জেদ করে সবে ॥
পূর্ব্বদেশ বাদাবন সেথা হৈতে লোকজন
আইসে যারা কেতাব লইতে।
হামেসা খায়েস রাখে জেদ কোরে কহে মোকে
এই পুথি রচনা করিতে ॥
কহে সকলেতে ইহা বোনবিবির কেচ্ছা যাহা
বিরচিয়া ছাপ যদি ভাই।
সে হইলে দেশে পুথি মোরা অনায়াসে
সকলেতে ঘরে বসে পাই ॥
শুনিয়া এয়ছাই কথা দেলেতে পাইয়া ব্যথা
ভেবে গুনে আখেরে তখন।
বোনবিবি কেচ্ছা যাহা আওয়াল আখেরে তাহা
একে একে কৈনু বিরচণ ॥

মোহম্মদ মুনশী সাহেব এরূপ কোন কৈফিয়ৎ দেন নি। কাব্যখানি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে লিখিত। কবি লিখেছেন :—

"তেরশো পাঁচ সাল বারই ফাল্গুনে।
কলমে বিদায় করিলাম ভেবে গুণে ॥

মোহম্মদ মুনশী সাহেব বিরচিত বনবিবি জহুরানামা কাব্যের কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ :—

মক্কা সহরে আল্লার এক ফকির ছিলেন,—নাম তার রহিম। তাঁর পত্নীর নাম ফুলবিবি। তাঁরা নিঃসন্তান। সন্তানের জন্য তাঁরা আল্লার দরগায় এবং পরে রসুলের গোরে প্রার্থনা জানালেন। রসুল বেহেস্তে গিয়ে জিবরিলকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

লাডকা নাহি হয় বেরাহিম ফকিরের
এ কারণে আইনু আমি নজদিকে তোমার।
হবে কি না হবে দেখে আইস একবার—

জিবরিল তখন খোদার আরশের নীচের কেতাব দেখে এসে রসুলকে জানালেন। রসুল তা জেনে তখনই ফিরে এসে তাঁদেরকে বল্লেন যে

ফুলবিবির পেটে ছেলে হবে না। দ্বিতীয় বিবাহ করলে তার গর্ভে বেটা ও বেটি হবে। ফুলবিবি দুঃখে কাতর হলেন। ফকির দ্বিতীয় বিবাহ করতে চান। কপাল মন্দ বুঝে ফুলবিবি একটি ইচ্ছা পূরণের সর্তে সে বিবাহে অনুমতি দিলেন।

বেরাহিম ফকির এবার শাহা জলিলের চৌদ্দ বছর বয়সের কন্যা গুলাল বিবিকে বিবাহ করে নিয়ে এলেন।

বোনবিবি জঙ্গলি বেহেস্তে আছিল,
তাহাদিগে আল্লা তালা হুকুম কবিল। ...
পয়দা হও গিয়া গুলাল বিবির সেকমে,

বনবিবি ও সা জঙ্গলি রাজী হলেন,—'খোদাই মদদ মোরা চাহি হর বাতে।'

গুলালবিবির গর্ভ হল। দিনে দিনে দশ মাস পূর্ণ হয়ে এল। ফুলবিবি এবার ফকিরকে তাঁর সর্ত পূরণের জন্য গুলালবিবিকে বনবাস দিতে বল্লেন।

ফকির শিরে করাঘাত করে বল্লেন,—

কেমনে এ হালে তাকে বনবাস দিব।
খোদার হুজুরে কোন মুখ দেখাইব ॥......
মাফ কর বিবি আর কিছু চাহ তুমি।

ফুলবিবি রাজী হলেন না। অগত্যা ফকির এক ফন্দি স্থির করলেন। তিনি গুলালবিবিকে বল্লেন যে,—আমার এমন কেহ নাই যে খালাসের দিন তোমার দুঃখের কেউ শরিক হয়। 'ফুলবিবি তেরা পরে আছে ত বেজার।' এখন উচিত কাজ এই যে,—'তেবা মা বাপের ঘরে দিই পৌঁছাইয়া।'

গুলালবিবি রাজী হলেন। কিছুদূর গিয়ে বেরাহিম বনের পথ ধরলেন। গুলালবিবি জিজ্ঞাসা করলেন,—রাস্তা ভুলে এ তুমি এলে কোথায় ?

বেরাহিম বল্লেন,—

সাদীর আগেতে ছিল মান্নাত আমার,
কবিলা আমার যবে হবে বারদার,
জিয়ারতে যাব হজরত আলীর রওজায়
নজদিগে পৌঁছিলে হবে মান্নত আদায়।

কিছুদূর গিয়ে ক্লান্ত গুলাল শুয়ে পড়লেন এক গাছতলায়। মৃদুমন্দ

হাওয়ায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লে বেরাহিম তিন বার ডাকলেন বিবিকে। ঘুমন্ত বিবি উত্তর না দেওয়ায় বেরহিম

কহে আল্লা নাহি এতে অজাব হওয়াব,
তিনবার ডাকিলাম না দিল জওয়াব।

এটাই বেরাহিমের একটা সুযোগ। তিনি গুলালবিবিকে সেখানে ফেলে ঘরে ফিরে এলেন।

গুলাল বিবি ঘুম ভেঙে দেখেন বেরাহিম নেই। তিনি কেঁদে উঠ্‌লেন। বললেন,—

বুঝিনু এ দুনিয়াতে কেহ কার নয়,
আল্লা ছেওয়া আর কেহ নাই দয়াময়।

তিনি হাত তুলে কাঁদতে কাঁদতে আল্লার দরগায় মোনাজাত করলেন এবং বেহুশ হয়ে পড়লেন। তখন আল্লার হুকুমে চার জন হুর এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন,—আল্লার ফজল হবে তোমার উপর।

যথাসময়ে তিনি এক ছেলে এক মেয়ে প্রসব করলেন। দুঃখ ভুলে তিনি বেটা-বেটি কোলে নিলেন। দুটি শিশুকে পালন করা কঠিন ভেবে তিনি বেটিকে হায়াতের উপর ভরসায় বনে ফেলে বেটাকে কোলে নিয়ে অন্যত্র গেলেন। বনের এক হরিণা সেই বেটিকে পালন করতে লাগল।

বেটার নাম সা জঙ্গলি ও বেটির নাম বনবিবি। তারা দিনে দিনে বড় হতে লাগল। সাত বছর পর,—হুকুম করিল দোহে খালেক কিবরিয়া।

বাদাবনে যাও দোহে ভাটীর সহরে।

ফুলবিবি ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেল। বেরাহিম এবার চল্‌লেন গুলালবিবির সন্ধানে। জঙ্গলের ভিতর তাদের সাক্ষাত হল বেরাহিম তাঁকে ঘরে ফিরতে অনুরোধ করলেন!

বিবি বলে চাতুরি করিতে কেন আইলে।
আমি খুব জানি যাহা আছে তেরা দেলে॥
লইয়া আল্লার নাম জঙ্গলে রহিব।
জেন্দেগী থাকিতে নাহি আলাপ করিব॥

বিবি শেষে ঘরে ফিরতে রাজী হলেন। পথে দেখা বনবিবির সাথে। বনবিবি এবার,— সা জঙ্গলিকে হেঁকে বলে কোথা যাও ভাই।

মা-বাপের সাথে যাওয়া আবশ্যক নাই ॥…
আঠারো ভাটিতে যেতে হবে আমাদের।
খোদার হুকুম এয়ছা আমাদের পরে ॥
আমাদের জহুরা জাহের সেথা হবে।…

সা জঙ্গলি তখনই বনবিবির আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাতার কোল থেকে নামলেন। বনবিবি, মাতা ও পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় নিলেন। বেরাহিম ও গুলালবিবি দুঃখিত মনে ফিরে এলেন।

বনবিবি ও সা জঙ্গলি প্রথমে এলেন মদিনাতে। নবীর এক আওলাদের নিকট মুরিদ (শিষ্য) হলেন। পরে তাঁরা ফাতেমার রওজায় গিয়ে জিয়ারত করলেন। তাঁরা প্রার্থনা করলেন নবীর রওজায় গিয়ে।

তাহা বাদে বোনবিবি ভাই-বহিনেতে।
খেলাফত চাহিতে লাগিল নবী হইতে ॥
গায়েব থাকিয়া খেলকা টুপি দোহে দিল।
চুমিয়া সে এনায়েত হাতে তুলে লিল ॥

মদিনা শহর ত্যাগ করে কতদিন পর তাঁরা হিন্দুস্থানে এলেন। গঙ্গা পার হয়ে এসে সাক্ষাত পেলেন ভাঙ্গড়-সাহার। ভাঙ্গড় সাহা তাঁদের পরিচয় পেয়ে বল্‌লেন,—

এই ত ভাটির দেশ আইলে এখন ॥
নামেতে দক্ষিণা রায় ঈশ্বর ভাটির।
এ সব জঙ্গল জান তাহার জায়গীর ॥…
চান্দখালি রায়-মঙ্গল শিবদাহ আর।
প্রথমে এসব ঠাঁই কর এক্তিয়ার ॥
তা বাদে জুড়িতে গিয়া আসন করিবে।
সেথা হইতে খবরদার আগে না বাড়িবে ॥

সা জঙ্গলিকে নিয়ে বনবিবি বাদা-বন দখল করতে চললেন। প্রথমে জুড়িতে পৌঁছে তাঁরা নামাজে বসলেন। আজানের সে আওয়াজ শুনে দক্ষিণ রায় বীর সনাতনকে ডেকে বল্‌লেন,—

কিসের আওয়াজ এয়ছা বাদল গরজে যেয়ছা
জেনে আইস গিয়া বাদা-বনে ॥
বড়খান বন্ধু আইলে হাঁকে নাহি কোন কালে
আসিয়াছে দোসরা যে আর।
ভাগাইয়া দেহ তাকে কোথা হইতে এসে হাঁকে
নাহি জানে সীমানা আমার ॥

রায়ের হুকুম নিয়ে সনাতন বনে গিয়ে দেখে যে দুজনে নামাজের আসনে বসে আছেন। তাঁদের শিরে টুপী গায়ে জুব্বা। তাঁরা সামনে এক ঝাণ্ডা পুঁতে তছবি জপছেন। ভয় পেয়ে সনাতন ফিরে এসে রায়কে বল্‌লে,—

এক মর্দ্দ এক বিবি কি সব দোছরা ছবি,
রূপে বন হয়েছে উজালা।
বদনে মলেছে থাক, বন্ধ করে দুই আঁখ,
তছবি হাতে বলে আল্লা আল্লা ॥

এ কথা শুনে দক্ষিণ রায় ক্রোধান্বিত হয়ে সদলে সজ্জিত হলেন যবনকে ভাগিয়ে দিতে। এমন সময় তাঁর মাতা নারায়ণী এসে বল্‌লেন যে,—আওরাতের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলে তার অখ্যাতি হবে! অতএব নারায়ণী নিজে যাবেন যুদ্ধে।

নারায়ণী যুদ্ধ সাজে সজ্জিতা হলেন। তাঁর সাথে চল্‌ল ভুত, প্রেত, ডাকিনী-যোগিনী, দেও-দানো। বনবিবি তা দেখতে পেয়ে সা জঙ্গলিকে জোরে আজান দিতে বল্‌লেন। নামাজের আওয়াজে ভুত-প্রেত পলায়ন করল। পলায়ন করল ডাকিনী-যোগিনী। নারায়ণী ভীতা হলেন। তবু যুদ্ধ হল। তিনি নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন তাঁদের দিকে কিন্তু তাঁদের বিপদ অপসারিত হল না। অবশেষে নারায়ণী আত্মসমর্পন করলেন এবং আপনার মোকামে ফিরে গেলেন।

বনবিবি এবার বেরুলেন জহুরা করতে। একে একে সব ভাটি ভ্রমণ করে ভুরকুণ্ডা মোকামে এসে আস্তানা করলেন। দক্ষিণ রায়কে বনবিবি দিলেন কোঁদোখালি অঞ্চল।

আছিল যতেক সেই বনের প্রধান।
বাটওয়ারা করিয়া সবারে করে দেন ॥
যার যে সরহদ্দ লিয়া খুসিতে রহিল।
কেহ কারো সীমানা না হরণ করিল ॥

বনবিবি পাঁচালী কাব্যের অপর কাহিনী এইরূপ ;—

বরিজহাটি গ্রামে ছিল ধোনাই মৌলে অর্থাৎ মধু সংগ্রহকারী। তারা দুই ভাই। ছোট ভাই-এর নাম মোনাই। ধোনাই-এর বাসনা মোম-মধু সংগ্রহ করবে, বাদায় যাবে। মোনাইকে বল্‌ল সাত ডিঙ্গা তৈরী করিয়ে দিতে। মোনাই বাধা দিয়ে বল্‌লে যে,—তাদের ঘরে তো অভাব নেই, তবে কেন বাদাবনে বাঘের মুখে প্রাণ হারাতে যাবে। ধোনাই বল্‌লে,—বসিয়া খাইলে টুটে রাজার ভাণ্ডার।

নাছোড়বান্দা ধোনাই অবশেষে সেই গ্রামের দুখে নামক এক গরীবের ছেলেকে তাদের দুঃখ অবসানের আশ্বাস দিয়ে, সাথী করে নিল। দুখের মাতার অবুঝ মনকে বুঝ দিয়ে, অবশেষে দুখের বিবাহের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়ে তবে ডিঙ্গি ভাসালো। তাদের ডিঙ্গি বরুণহাটি, সন্তোষপুর, ধুলে প্রভৃতি অঞ্চল,—রায়মঙ্গল, মাতলা প্রভৃতি নদী এবং আরো অনেক জায়গা ছেড়ে এসে পৌঁছিল গড়খালি নামক বাদায়। দুখেকে সে ডিঙ্গির মধ্যে হুঁশিয়ার থাকতে বলে নিজে মোম-মধু সংগ্রহে বনের ভিতর গেল।

খাড়ি থেকে দক্ষিণ রায় দেখলেন ধোনাই মৌলে দুখেকে পূজায় নরবলি দিয়ে মোম-মধু পেতে চায়। রাগান্বিত হয়ে তিনি সমস্ত মৌচাকের মধু হরণ করলেন। মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে ধোনাই তো অবাক্। "চাকের ভিতর নাহি মধুর ভাণ্ডার।" তিন দিন বনে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে সে কাঁদতে লাগল। কিস্তিতে ফিরে খানা-পিনা না খেয়ে শুয়ে রইল। দক্ষিণ রায় তাকে স্বপ্নে বল্‌লেন,—

বাদাবনে মোম-মধু আমারই সৃজন ॥···
নরবলি পূজা যদি দিতে পার তুমি।
মোম মধু সাত ডিঙ্গা দিব তোরে আমি ॥

ধোনাই দুঃখিত হল,—এ প্রস্তাবে রাজী হল না। দক্ষিণ রায় বল্‌লেন,—

'দেখি বেটা কেমনেতে যাও দেশে ফিরে।' ধোনাই ভয় পেল। সে বুঝল দুখের উপর রায়ের নজর। অগত্যা সে রাজী হল।

ধোনাই এরূপে রায়ে স্বপনে কহিল।
চেতনে আছিল দুখে তামাম শুনিল॥

দুখে শুনে দুঃখিত হল,—মনে পড়ল তার দুখিনী মাতার কথা। নিরুপায় দুখে স্মরণ করল বনবিবিকে। বনবিবি সে করুণ আহ্বানে আসনে থাকতে পারলেন না। দুখের নিকট এসে আপনার পরিচয় দিয়ে সমস্ত বিবরণ শুনলেন। বনবিবি এবার দুখেকে কোলে নিয়ে,—

কহিতে লাগিল তুমি ফরজন্দ কাহার॥
ধোনাই তোমাকে রায়ে দে যাবে যখন।
তুমি মোরে মা বলিয়া ডাকিও তখন॥
পলকের বিচে আমি আসিয়া পৌছিব।
দক্ষিণা রায়ের হাত হইতে ছাড়াইব॥

পূর্ব-সর্ত মতন ধোনাই সাত ডিঙ্গা নিয়ে এল কেদোখালি নামক জায়গায়। রাত্রে রায় স্বপ্নে বল্‌লেন যে মধু ভাঙার আগে যেন সে তাঁর নাম নেয় এবং মধু নিয়ে যাবার আগে যেন দুখেকে দিয়ে যায়। পরদিন দুখেকে নৌকায় রান্না করে রাখার আদেশ দিয়ে ধোনাই জঙ্গলে গেল। সেখানে দক্ষিণ রায়ের অনুচরগণের সহায়তায় সাত ডিঙ্গা মোম-মধুতে পূর্ণ হল। রায় বল্‌লেন—মধু সব নদীতে ফেলে দাও। মধু ফেলে দেওয়া হল। সেখানকার পানি হল মিঠা,—সে গাঙের নাম হল মধুখালি। এদিকে দুখে তো ভিজে কাঠে রান্না করতে না পেরে স্মরণ করল বনবিবিকে। বনবিবির দোয়ায় বেগর আগুনে খানা তৈরী হল। সে রাতে সকলে খানা-পিনা খেয়ে শুয়ে রইল।

পরদিন ডিঙ্গা খুলবার আগে কাঠ সংগ্রহের প্রয়োজন হল। ধোনাই আদেশ দিল দুখেকে কাঠ সংগ্রহ করতে। দুখে বল্‌ল,— কেদোখালির চরে আমায় ফেলে যেও না; শোকে আমার মা মারা যাবে।

ধোনাই কোন কথা শুনল না—তাকে কৌশলে সেখানেই নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

নরমাংস লোভী রায়মণি খাড়ি থেকে দুখেকে দেখে বাঘের আকৃতি ধরে তার দিকে অগ্রসর হল।

দেখিয়া দুখের গেল পরাণ উড়িয়া।
বলে বনবিবি মাগো লেহ উদ্ধারিয়া॥
পলকেতে ভাই বহিন পৌঁছিল সেথায়॥
দেখে দুখে পড়ে আছে হুস হাবাইয়া।
দুখেকে লইল বিবি কোলে উঠাইয়া॥
সা-জঙলিকে বোনবিবি কহে গোস্বা ভরে।
খাওয়াব গরুর মাংস রাক্ষস বেটাবে॥

বনবিবির আদেশে সা জঙ্গলি, চড মাবল বাঘের মাথায়। তখন দক্ষিণ রায় পলায়ন করতে লাগলেন। সা জঙ্গলি তাঁকে অনুসরণ কবলেন। পথিমধ্যে পড়ল আজিম দরিয়া। নিজের মহিমায় রায় সে নদী পার হলেন। সা-জঙ্গলি আল্লার নাম নিয়ে নদীতে নামলেন। হাঁটু সমান হল জল। দক্ষিণ রায় তা দেখে ভীত হলেন। তিনি তাঁর হাঙ্গর-কুমীরকে আদেশ করলেন সা জঙ্গলিকে গ্রাস করতে। পা ঝাডা দিয়ে সে সব মেবে ফেলে সা জঙ্গলি নদী পার হলেন। ভয়ে রায় দৌডে গেলেন গাজীর কাছে—"এ বিপদে গাজি ভাই করহ উদ্ধার।" সব শুনে গাজী বল্লেন,—

বনবিবি নাম তার ভাটির প্রধান॥
খোদার রহম আছে উপরে তাদের।

রায়কে অনুসরণ করে সা-জঙ্গলি এসে হাজির হলেন সেখানে। গাজির সহিত দক্ষিণ রায়ের বন্ধুত্ব দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। গাজি সকলকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন বনবিবির নিকট। গাজির পরিচয় পেয়ে বনবিবি বল্লেন,—

তুমি এখানেতে আছ ওলি এলাহির।
মানুষ ধরিয়া খায় রাক্ষস বে-পির॥

বনবিবিকে সালাম জানিয়ে গাজী বল্লেন,—মানুষ ধরে খায় তা তো আমি জানিনে। হে জননী এখন তাকে ক্ষমা কর। দক্ষিণা রায়ের তুমি তো সই-মা। কারণ ইনি নারায়ণীর পুত্র। দক্ষিণা রায় বনবিবির পদে পতিত হলেন। বনবিবির রাগ দূর হল। তিনি বল্লেন,—'এখনে মে

তিন বেটা হইল আমার।' গাজি, সা-জঙ্গলি ও দুখে এই তিন ভাই-এর মিলন হল। গাজি, দুখেকে সাত জালা ধন দিতে চাইলেন। দক্ষিণ রায় তাকে আঠারো ভাটির মধ্য থেকে মোম-মধু চাওয়া মাত্র পৌঁছে দিতে চাইলেন। তারপর গাজী ও রায় বিদায় হলেন। বনবিবি দুখেকে কোলে নিয়ে—

"আঠার ভাটিতে সব ভ্রমণ করিল।"
আপনা আসনে বিবি বসিল খুসিতে।
দুখের কপাল ফেরে বনবিবি হইতে॥

এদিকে ধোনাই মৌলে সাত ডিঙ্গা ভর্ত্তি মোম-মধু নিয়ে ঘরে ফিরতে সহরে সে খবর ছড়িয়ে পড়্‌ল। দুখের মা খবর পেয়ে এসে হাজির ধোনাই-এর বাড়ী :—

কোথায় আমার দুখে কহ রে ধোনাই।
চাঁদমুখ দেখে তার পরাণ জুড়াই॥

ধোনাই মাথা নিচু করে বল্‌ল :—

কাঠ কাটিবারে দুখে গেল জঙ্গলেতে।
কেদোখালির চরে খায় ধরিয়া বাঘেতে॥

দুখের মা একথা শুনে কেঁদে আকুল হল। তা "ভুরকুণ্ডায় বনবিবি পারিল জানিতে।" বনবিবি দুখেকে বল্‌লেন,—

"যাহ বাবা ঘরে আপনার।
বুড়ী মাতা কান্দে তোর হয়ে জারে জার॥

দুখে বলে মা জননী :—

কি করিব দেশে গিয়া কি আছে আমার।
তোমা হেন দয়াবতী কেবা আছে আর॥
বনবিবি বলে বেটা না কর ভাবনা।
আমি তোর পিঠ পরে আছি পোস্ত পানা॥
যখন খিয়ান তুমি করিবে আমায়।
মুহূর্তে যাইয়া দেখা দিইব তোমায়॥

অনেক সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে তিনি দুখেকে সেকো কুমীরের পিঠে চড়িয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন।

দুখে এসে পৌঁছুল নিজের গ্রামে। কুমীরের পীঠ থেকে নদীর কিনারায় উঠ্‌ল সে এবং কাতরভাবে মা মা করে ডাকতে ডাকতে ফিরে এল ঘরে। দেখ্‌ল তার মা, কানা ও কালা অবস্থায় অচেতন হয়ে পড়ে আছে। দুখে তৎক্ষণাৎ স্মরণ করল বনবিবিকে। বনবিবি এসে বল্‌লেন,—

লইয়া আল্লার নাম চক্ষু ও কানেতে।
হাত ফিরাইয়া দেহ পাইবে দেখিতে॥
শুনিতে পাইবে হুস হইবে বহাল।...
একথা বলিয়া বিবি গায়েব হইল॥

দুখে ও তার মাতার আনন্দ-করুণ মিলন হল। ছেলের কাছে বনবিবির দয়ার কথা শুনে—

বুড়ী বলে বাঁচাইল তোরে পাকজাত।
বনবিবির নামেতে ক্ষীর করহ খয়রাত॥

মায়ের কথা মত দুখে গলে কুড়ালি বেঁধে সাত গ্রামে ভিক্ষা করে এবং বনবিবির মহিমা প্রচার করে বেড়ালো। গ্রামের ছেলেদের ডেকে এনে বনবিবির নামে খয়রাত দিল। তারপর দুখে বল্‌ল, ধোনাই-এর জন্য এত দুঃখ,—অতএব তার বিচার চাই। বুড়ি বল্‌লে, না, তার সাথে লড়াই করে কাজ নেই। দুখে স্মরণ করল বড়খাঁ গাজীকে এবং প্রতিশ্রুতি মতন সাত জাড়ি ধন-দৌলত চাইল ঘর-বাড়ী নির্মান করবার জন্য। দুখে সে ধন অনায়াসে পেল। তারপর স্মরণ করল দক্ষিণ রায়কে এবং তাঁকে পূর্ব প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করতে অনুরোধ করল। দক্ষিণ রায় তৎক্ষণাৎ অনুচরদের সহায়তায় দুখের বাড়িতে পর্বত-প্রমাণ কাঠ আনিয়ে দিলেন। দুখে মজুর মিস্ত্রির অভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে স্মরণ করল বনবিবিকে। বনবিবির স্বপ্নাদেশে যদু রায় পরদিন প্রাতে গিয়ে দুখের নিকট উপস্থিত হল।

যদু রায় দুখের হুকুমে মাত্তা লিয়া।
দরকার মাফিক লোকজন মাজাইয়া॥
ফরমাইস মোতাবেক বানাইয়া দিল
যেখানে যা আবশ্যক সকলি করিল॥

এবার দুখের বাদশাই ঠাট-বাট হল। "খোদার মেহেরে দুখে বাদশাই পাইল।" বনবিবির নির্দেশে দুখে, মধু রায়কে দেওয়ান করল।

একদিন দুখে কাছারিতে বসে সকলকে তলব করল। সকলে এসে সালাম করে গেল,—এল না কেবল ধোনাই মৌলে। দুখে সাহা পিয়াদা পাঠিয়ে তাকে দরবারে আনালো। ধোনাই এবার দুখেকে সালাম জানিয়ে মাথা নীচু করল। দুখের পায়ে ধরে সে মাফ চাইল। আরো সকলের অনুরোধে দুখে তাকে মাফ করে দিল। ধোনাই বাড়ী ফিরে ভাবল—

কেদোখালির কথা যখন মনেতে পড়িবে।
দুখে, গোস্বা হইয়া তখনি আমাকে বোলাইবে ॥···
সাত পাঁচ ভাবে দেলে ইয়াদ হইল।
কাতর হইয়া বনবিবিকে ডাকিল ॥

দয়াবতী বনবিবি বল্লেন—

শোন বে-আক্কেল ধোনা কহি যে তোমায় ॥
দুখের হাতে প্রাণ যদি বাঁচাইতে চাহ।
দুখের সাথে আপনার বেটী বেহা দেহ ॥

বনবিবি সেইমত দুখেকেও নির্দ্দেশ দিলেন। ধোনাই বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এল। দুখে তাতে সম্মত হল।

"বেটার সাদীর বাতে আহ্লাদ বুড়ীর।
চলিল দুখের বাড়ী তুফান খুসির ॥···
গরীব কাঙ্গাল খুব নেহাল হইল।
বনবিবির নামে খুব খয়রাত করিল ॥···
কাতরেতে ডাকিতে লাগিল মা বলিয়া।
বনবিবি ধিয়ানেতে জানিতে পারিয়া ॥
শ্বেত মক্ষি হইয়া দুখের কাছেতে পৌছিল।
কেন বাছা ডাকিলে কহিতে লাগিল ॥
দুখে বলে মা জননী তোমার কৃপায়।
চৌধুরী করিয়া তুমি দিয়াছ আমায় ॥
তোমার কৃপায় মোর হইল কোঠাবাড়ী।
বিয়াহ দিইলেন মোরে ধোনায়ের বাড়ী ॥

বহু দেখে যাহ মাতা আসনে আপন।
বিপদে রাখিও পদে করিলে স্মরণ॥
বহু দেখে বনবিবি রওয়ানা হইল।
ভুরকুণ্ডায় আপনার আসনে বসিল॥

মোহম্মদ মুনশী সাহেব বিরচিত কাব্যখানি ১০"×৬½" আকৃতিবিশিষ্ট। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। হামদো-নাত, কাহিনী ও সূচীপত্র। প্রধানতঃ এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। বারোটি শিরোনামা আছে। দ্বিপদী ও ত্রিপদী পয়ারে রচিত। প্রথম পংক্তির শেষে দুই দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে তারকা চিহ্ন। ভণিতার নমুনা এইরূপ :—

খোদার-দরগায় ভেজ হাজার শোকরানা।
কহে মুনশী মোহম্মদ ভাবিয়া রব্বানা॥ (পৃঃ ৬)

অথবা, কহে হীন কবিকার ভাবিয়া রব্বানা॥ (পৃঃ ১৭)

এ কাব্যেরও পৃষ্ঠাগুলি ডাইন দিক থেকে বাম দিকে সাজানো অর্থাৎ ডাইন দিক থেকে পড়ে বাম দিকে যেতে হয়। ভাষা দক্ষিণ বঙ্গের বিশেষতঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার। প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বহু অশুদ্ধ বর্ণ আছে। তবে ভাষা বেশ সরল। গ্রামের সাধারণ মানুষের বুঝবার পক্ষে বটেই।

প্রত্যক্ষভাবে বনবিবির মাহাত্ম্য-কথা হলেও পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তালার মাহাত্ম্য-কথা বিবৃত হয়েছে। কবি, কাহিনীর আরম্ভে লিখেছেন,—

দণ্ডবক্ক মুনি মৈলে পুত্র রাজ্য পাইল।
দক্ষিণা রায়ের নাম প্রকাশ পাইল॥
হিন্দুতে দিইত পূজা দেবতা বলিয়া।
অত্যাচার করে খায় মানুষ ধরিয়া॥
বাদাবনে মানুষের দেখা যদি পায়।
বাঘের ছুরত হইয়া পাকড়িয়া খায়॥
রাক্ষসের জাত মানুষ খাইতে লাগিল।
কেহ তার প্রতিকার করিতে নারিল॥
আদম জাতের পরে আল্লা নেঘেবান।

আলেমল গায়েব তিনি রহিম রহমান ॥
বনবিবি সাজংলিকে ভেজে দুনিয়াতে।
হুকুম হইল যাও আঠারো ভাটিতে ॥

আল্লাহ্ তালা কেন বনবিবি ও সা-জংলিকে আঠারো ভাটিতে পাঠালেন, আঠারো ভাটিতে এসে তাঁরা কি করলেন—এই নিয়ে কাহিনী হলেও—এ সবই যে মানবীয় প্রয়োজনে সংঘটিত হয়েছে তা সুস্পষ্ট। অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নয় বা পূজা প্রচলনের জন্য বনবিবিকে মর্তে পাঠানো হয় নি। তবে বনবিবির প্রভাব যে জনমানসে বিশেষভাবে পড়েছে তা কবি বিকৃত না করেই লিখেছেন। বনবিবির দয়ায় দুখে অবশ্যম্ভাবী বিপদ থেকে রেহাই পেয়ে—

"চাল চিনি ও দুধ এনে ক্ষীর পাকাইল ॥
গ্রামের ছেলে সব আনে বোলায়া।
বনবিবির নাম লিয়া দিল খেলাইয়া ॥
দুধ চিনি ক্ষিরের হাজত সেই হৈতে।
শুরু হৈল, আদায় করেন সকলেতে ॥

বনবিবি কাব্যের কাহিনীর আরম্ভ আরবে এবং সমাপ্তি আঠারো ভাটিতে। কবি যদিও নারায়ণী জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা বলেছেন,--অন্যত্র শুধু তিনি ধোনা মৌলে ও দুঃখের পালা বলে উল্লেখ করেছেন। বনবিবি জহুরা নামায় অন্য নামকরণও তিনি করেছেন—"বনবিবি কেবামতি।"

বনবিবি কাব্যের দুটি কাহিনী পৃথক হলেও উভয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে। দুটি কাহিনীই মিলনান্ত। নাটকে রূপ দিবার খুবই উপযোগী, এবং তা হয়েছেও। গল্পের আকর্ষণী শক্তি প্রবল।

পাঁচালী কাব্যখানি নর, নারী, দেবতা, দানব প্রভৃতি চরিত্র সমন্বিত। বনবিবিকে কেন্দ্র করে সমগ্র কাহিনী গড়ে উঠেছে; সুতরাং কাব্যের নামকরণ সার্থক হয়ে উঠেছে। কাহিনী থেকে বোঝা যায় যে ভাটি অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বড়খাঁ গাজীর সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের যে সংঘর্ষ হয়েছিল,—বনবিবির সংগে তাঁর সংঘর্ষের কারণও ঠিক তাই। তবে দক্ষিণ রায়কে মুসলিম বিদ্বেষীরূপেই দেখা যায়। শক্তিতে পেরে

না ওঠায় বনবিবির সহিতও তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন। বড়খাঁ গাজীব সহিত সংঘর্ষে কবি কৃষ্ণরাম দাসের "রায়মঙ্গল" কাব্যে দক্ষিণ রায়ের হীন পরাজয়ের চিত্র নেই।

মুসলিমের বঙ্গ-অভিযান সফল হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্থানীয় অধিপতিব পরাজয় ববণ করতে হয়েছিল—এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য। স্থানীয় অধিপতিদের অন্যতম দক্ষিণ রায়ের পরাজয় হয়েছিল—একথা অসত্য নয়। তাঁকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত করাব জন্য কাল্পনিক মিশ্র দেবতার আবির্ভাব প্রয়োজন হয়ে থাকতে পাবে। কবির কল্পনাব রাজ্যে তা সম্ভব—কিন্তু পরাজয়কে পরাভূত করে বড়খাঁ গাজী তথা বনবিবির আধিপত্য রক্ষার উপর কোন প্রভাব দক্ষিণ রায় বিস্তার করতে পারেন নি। তাঁকে পরাজয়ের মাধ্যমেই সহাবস্থানের পরিস্থিতিতে আসতে হয়েছিল। তবে একথাও সত্য যে তৎকালীন মুসলিম শাসকগণ বুঝেছিলেন, নিজেদেবকে স্থায়ী করতে গেলে স্থানীয়দেরকে চির-বিরোধী কবে বাখা চলে না। অতএব স্থানীয় অধিবাসীগণের সংস্কৃতিতে আঘাত যতখানি সম্ভব না কবাই উচিত এইরূপ হয়ত ধারণা করেছিলেন।

মুনশী সাহেবের এই কাব্যেব সহিত মোহাম্মদ খাতেবেব কাব্যখানির কাহিনীগত মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। ভাষায় অবশ্য কিছু কিছু পার্থক্য আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দগুলি হুবহু ব্যবহৃত হয়েছে। মুনশী সাহেবের কাব্যে যে একাধিক কবির হস্তক্ষেপ হয়েছে তা বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন ভণিতা থেকে বোঝা যায়। যেমন :—

বোনবিবি সেথা হইতে বিদায় হইল।
অধম ছাদেক মুনশী পয়াবে বচিল ॥

অথবা, কহে হীন আছিরদ্দীন জোনাবে সবার।
চব্বিশ পরগণা বিচে বসত যাহার ॥

লক্ষ্যনীয় যে কবি তাঁর ভণিতায়, "হীন" "অধম" এই সব শব্দ ব্যবহার করেছেন। বৈষ্ণব সুলভ দীন, দাস প্রভৃতির ন্যায় হীন, অধম শব্দ ব্যবহার করে কবি তাঁর ভক্তমনের পরিচয় দিয়েছেন। বনবিবি কাব্যে দয়াবতী মা বনবিবির নিকট সন্তানের যে ভক্তি বা সন্তানের প্রতি মাতার যে স্নেহ তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

নারীর সহিত নারীর যুদ্ধ বিবরণ শুধু এই কাব্যের কাহিনীতে নয়, সমগ্র পীর সাহিত্যে এক নব সংযোজন। দুরাচারী ধোনা মৌলের শাস্তি বিধান এবং ভক্ত দুখের ভক্তির পুরস্কার প্রদান বনবিবি চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে। দক্ষিণ রায়কে রাক্ষস-রূপেই চিত্রিত করা হয়েছে। তিনি এবং তদীয় মাতা নারায়ণী বিক্রমশালী। তাঁরা দৈব বলে বলীয়ান নন। নানাবিধ বাণ নিয়ে তাঁরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন,—কিন্তু বনবিবি ও সা-জঙ্গলির আছে কিছু অস্ত্র ছাড়াও আল্লার কুদরত। দুখের দুঃখিনী মাতার মাতৃ হৃদয়ের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এক স্থানে আছে—

বিদেশে তোমাকে আমি যেতে নাহি দিব।
মুষ্টি ভিক্ষা মেগে আমি তোরে খাওয়াব॥
তোমার রোজগারে মোর না আছে দরকার।
ঘরে বসে থাক বাবা নজরে আমার॥

এই উক্তি থেকে প্রকৃত বাঙালী মাতৃহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। মায়ের আঁচলের তলায় থাকার বাঙালী-সুলভ মনোভাব এতে সুস্পষ্ট। তবে সব ক্ষেত্রে বাঙালী সন্তান মায়ের আঁচলের তলায় থাকে না।—

দুখে বলে মাতা তুমি না পার বুঝিতে।
বিদেশেতে যায় লোক উপায় করিতে॥
জওয়ান হইনু অবশেষে কি হইবে।
তুমি বাদে ভিক্ষা মেঙ্গে কে মোরে খাওয়াবে॥
নছিবে কি লিখিয়াছে—আল্লা পরওয়ার।
আজমায়েস করিয়া আমি দেখিব একবার॥

বনবিবি কাব্যে দক্ষিণ বঙ্গের বিবরণ প্রসঙ্গে কিছু কিছু ভৌগোলিক তথ্য পাওয়া যায়। ধোনাই—দুখের পালায় সুন্দরবন বিশেষতঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলের চিত্র পাই। বরুণহাটি, সন্তোষপুর, রায়মঙ্গল, মাতলা, হেড় ভাঙ্গড়, ফুলতলি, গড়খালি, কেদোখালি, ভুরকুণ্ডা, হাসনাবাদ প্রভৃতি স্থান মানচিত্রে শুধু দৃষ্ট হয় তাই নয়, ভুরকুণ্ডায় বনবিবির যে স্থায়ী আসন ছিল তা আজো বিদ্যমান। এই ভুরকুণ্ডা হল হাসনাবাদের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ইচ্ছামতীর পূর্ব্ব কূলে অবস্থিত। তার জে, এল নং ৭৬। ডক্টর সুকুমার

সেন তাঁর ইসলামি বাংলা সাহিত্যে ভুরকুণ্ড নামক স্থানটি বর্দ্ধমান—হুগলী সীমান্তে তিরোল গ্রামের কাছে মুড়াই নদীর ধারে বলে উল্লেখ করেছেন। তবে দখিনের বাদাবন, হাসনাবাদের সন্নিকটস্থ এবং আঠারো ভাটি অঞ্চল বলতে হাসনাবাদ থানায় অন্তর্গত উক্ত ভুরকুণ্ডাকেই বুঝায়। ব্যক্তি হিসাবে দক্ষিণ রায়, বড়খাঁ গাজী, ভাঙ্গড় শাহ্ প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তির কথা এতে আছে। সুন্দরবনের কুমীর বাঘ-হরিণ প্রভৃতি জীবজন্তু, কাঠ-মোম-মধু প্রভৃতি বনজ সম্পদের পরিচয় এই কাব্যে পাওয়া যায়। কবি এখানে সুন্দরবনের মনুষ্য ভক্ষণকারী রাক্ষস চরিত্র অঙ্কন করে বুঝি তৎকালীন বিবরণ দিতে চেয়েছেন।

বনবিবির কাহিনী ভিত্তিক কয়েকখানি নাটক লিখিত হয়েছিল। নাটকগুলির মুদ্রিত রূপ আজিও পাওয়া যায় না, কিন্তু বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনেও এই নাটক গ্রামাঞ্চলে অভিনীত হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ কতই না আনন্দ লাভ করছে, রাত্রি জাগরণে তা দর্শন-শ্রবণ করে। এইরূপ একখানি নাটকের পরিচয় এইরূপ ঃ—

নাটকের নাম বনবিবি। রচয়িতা সতীশচন্দ্র চৌধুরী। রচনাকাল বাংলা ১৩১৬ সালের ৪ঠা মাঘ সোমবার থেকে ৯ই মাঘ শনিবারের মধ্যে। নাট্যকারের পরিচয় "বড়খাঁ গাজী" অংশে প্রদত্ত হয়েছে। নাটকের আকৃতি ১৩½′ × ৮″। নাটকখানি সাধারণ সাদা রঙের কাগজে লেখা।

নাট্যকাহিনী পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭। প্রতি অঙ্কে আছে পাঁচটি করে দৃশ্য। অবশ্য দৃশ্যগুলি সংক্ষিপ্ত। নাটকখানির পাঁচটি অঙ্গ যথাক্রমে,—বন্দনা, ভূমিকা, আবহন-গীতি, পাত্র-পাত্রী পরিচয় ও নাট্যকাহিনী। বন্দনা ও ভূমিকা পয়ার ছন্দে রচিত। নাটকের আরম্ভে আছে "শ্রীশ্রীহক নাম।" পয়ারের প্রতি পংক্তিতে ছাব্বিশটি অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। একস্থানে আছে "শ্রীশ্রীএলাহি ভরসা। ব্রাহ্মণ হিন্দু নাট্যকারের পক্ষে "শ্রীশ্রীহক নাম" বা "শ্রীশ্রীএলাহি ভরসা" লেখায় এলাহি বা হকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। নাট্যকার উল্লেখ করেছেন যে নাটকের সংযোগস্থল আরব ও ভারতবর্ষ।

নাটকখানিতে সর্বমোট উনপঞ্চাশটি গীত আছে। তন্মধ্যে প্রথম ও শেষ

গান দুখানি বন্দনাগীতি। আবাহন গীতিতে নাট্যকারের ভণিতা আছে। আছে সাতখানি কোরাস গান। ভূমিকার মধ্যে কাহিনীর চুম্বক প্রদত্ত হয়েছে।

নাট্যকারের বাসস্থান ছিল বারাসতে। সুতরাং এ নাটকে স্থানীয় ভাষার পরিচয় আছে। একস্থানে ধোনাই বলছে ঃ—

ধোনাই—বলবো কি ভাই, আমার আর ভাল লাগচে না। যাহোক আমরা লিখতে পড়তে শিখিচি, হিসেব কিতেব রাখতে জানি—বাপ-দাদার পেশা ছাড়ি কেন? চোৎমাস এলো, মৌচাকে অসমোর মধু।

[দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য]

অথবা,

মফিজদ্দি—হালিমা-দিলজানি। মোরে খুসী মনে হাসি মুখে মহলে যেতে হুকুম কর। তোগা কান্না দেখলে মুই যাব কেমন করে হালিমা। একে তো আমার পা বাড়াতি মন সরচে না। কি করি বল মোনাই বড্ডি ধরেচে। [৩য় অংক ১ম দৃশ্য]

কয়েকটি স্থানীয় শব্দ ঃ—

গুচ্‌কে সুচ্‌কে লে	অর্থ	গুছিয়ে নিয়ে
চলব্যানি	অর্থ	চল্‌বে'খন
চল্লুম	অর্থ	চল্‌লাম
ফির্‌তি	অর্থ	ফেরার বা ফির্‌বার
তোম্‌গা	অর্থ	তোমাদের
চুব্‌গে	অর্থ	চুবিয়ে ; ইত্যাদি।

আরবী, ফারসী, হিন্দী প্রভৃতি বেশ কিছু শব্দ এতে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি প্রবাদও আছে। যেমন—

১। জোর যার মুল্লুক তার।
২। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।
৩। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।
৪। বসে খেলে রাজার ভাঁড়ারও খালি হয়ে যায়। ইত্যাদি।

নাট্যকারের ভণিতায় যে ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে তা লক্ষ্যণীয়। বন্দনা

অংশে তিনি লিখেছেন ;—

আর যত পীর ফেরেস্তা আছে ত্রিভুবন।
নতশিরে আজি দীন করে আবাহন ॥

অথবা অধম সতীশে বলে,
বনবিবি কৃপা বলে,
অসম্ভব হইল সম্ভব ॥ [ভূমিকা]

অথবা, বনবিবি জহুরা এখন শুন সর্বজন।
(মা) আঠার ভাটিতে আসি পাতিলা আসন ॥
কাঙালের মা দয়াময়ী আমাদের সর্বজয়ী
থাকে না তার কোনও ভয় যে লয় স্মরণ।
তাই বলি মান একিন দেলে ডাক মা বনবিবি বলে
যাবে দুঃখ-দৈন্য চলে পূজ তাঁর চরণ।
দীন সতীশ বলে কুতূহলে মা বলে ডাক রে মন ॥
[আবাহন গীতি]

নাট্যকার হিন্দুর দেবতা বা মুসলিমের পীর বলে ভক্তি অর্পণে কোন তারতম্য পোষণ করেন নি,—এ ভণিতা তারই নিদর্শন। বলা বাহুল্য, নাট্যকার ব্রাহ্মণ বংশীয় সন্তান।

নাট্যকার যদিও লিখেছেন,—

দোজখ হইতে যদি পরিত্রাণ পাবি।
প্রাণ ভরি' ডাক মন এব্রাহিম নবী ॥ [বন্দনা]

তবু তিনি দেবী-মাহাত্ম্য প্রচারের ন্যায় বনবিবি-মাহাত্ম্যই রচনা করেছেন। ভূমিকায় তাই আছে,—

সব দুখ দূর হল দুখে ফিরে ঘরে এল
ভিক্ষা মাগি মায়েরে পূজিল।
পায় বহু ধন মান অকাতরে করে দান
মায়ের জহুরা প্রচারিত ॥

বনবিবি নাটকের কাহিনী, মোহাম্মদ মুন্‌শী বা মোহম্মদ খাতের সাহেব বিরচিত "বনবিবির জহুরা" কাব্যেরই অনুসারী। তবে এতে আছে,—

হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের সুস্পষ্ট আদর্শ ; বনবিবি, বনাঞ্চলের কর্ত্রী বা দেবী, —তিনি রাণী বা সাম্রাজ্ঞী নন। অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা এখানে কয়েকটি অতিরিক্ত চরিত্র পাই। যেমন,—দক্ষিণ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষম রায় ও বরিজহাটি গ্রামের বণিক মোনাই মৌলের মাতুল মফিজদ্দি।

নাটক খানির গীতগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নাট্যকার এই নাটককে তাই "গীতাভিনয়" বলে উল্লেখ করেছেন। এতে ব্যবহৃত হয়েছে স্থানীয় কথ্য ভাষা। গানগুলি কি সুরে গেয় তার উল্লেখ নেই। প্রত্যেকটি গান ছয় পংক্তিতে সীমাবদ্ধ। এতে স্বদেশ প্রেমাত্মক ভাব আছে, উচ্চ ভাবাদর্শ প্রায় ক্ষেত্রেই নেই। কাহিনীই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গানের অঙ্গ। কয়েকটি গান হাস্যরসাত্মক। একক ও কোরাস উভয় প্রকার সংগীত এতে আছে। বনবিবি নাটকে সর্ব্বশেষ দৃশ্যের সমাপ্তিতে পুনরায় সমস্বরে "জয় মা বনবিবির জয়"— ধ্বনির সাথে নিম্নলিখিত স্তুতি আছে :—

বন্দি মাতঃ বনবিবি বিপদবারিণী।
আশীষ যাচে মা দীন তাপিত তারিণী ॥
মূঢ়মতি হীনগতি,
না জানি মা স্তুতি নতি,
(ওমা) দাসে দয়া দান সতী জগৎ-জননী।
(দীন) সতীশ সভয়ে স্মরে মহিমা বাখানী ॥

বনবিবি মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক প্রাচীন কাব্য হয়ত বয়নুদ্দিন রচিত 'বনবিবির জহুর'নামা'। এই কাব্যের রচনা-কাল বাংলা ১২৮৪ সাল (ইং ১৮৭৭-৭৮ সাল)[৭১] মতান্তরে এর রচনাকাল ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যে।[২৩] মুনশী মোহম্মদ খাতের সাহেবের কাব্যের রচনাকাল বাংলা ১২৮৭ সালের ৭ই কার্তিক (ইং ১৮৮১ সাল)। মোহম্মদ মুনশী সাহেব প্রণীত কাব্যের রচনাকাল বাংলা ১৩০৫ সালের ১২ই ফাল্গুন ইং ১৮৯৯ সাল)। নাট্যকার সতীশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নাটকের রচনাকাল বাংলা ১৩১৩ সালের ৪ঠা মাঘ সোমবার (ইং ১৯০৭ সাল)। নাটকখানির দুই টি কপিই প্রতিলিপি মাত্র। প্রথম কপির লিপিকাল ইং ২১-১২-১৯১৭ সাল, লিপিকর শ্রীঅরুণচন্দ্র চৌধুরী। এবং দ্বিতীয় কপির লিপিকাল ইং ৮-৭-১৯৩৯ ; লিপিকর শ্রীঅমরনাথ চৌধুরী। প্রথম কপির অবস্থা জরাজীর্ণ।

————

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিবি বরকত্

বিবি বরকত্ একজন কাল্পনিক পীরাণী। তাঁর আর কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

পীরানী বরকত্ বিবির নামে বসিরহাট মহকুমায় হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত কাটাখালি নামক গ্রামে একটি কাল্পনিক দরগাহ আছে। দরগাহ স্থানটির পরিমাণ আনুমানিক এক কাঠা। সেখানে আছে শুধু ঝোপ, অর্থাৎ পতিত জমি। দরগাহের সেবায়েত ছিলেন মরহুম আব্বাস আলি গাজী প্রমুখ। তাঁরা ঐ দরগাহে সকাল সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি দান করতেন। বর্তমানে তেমন নিয়মিতভাবে ধূপ-বাতি দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু স্থানীয় বহু ভক্ত সেখানে দুধ, বাতাসা' ফল প্রভৃতি মানত দিয়ে থাকেন। সেখানে বাৎসরিক কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা মেলা হয় না।

বিবি বরকত্, মা বরকত্ নামে অনেকের নিকট অভিহিত হন। তাঁর নামে রচিত একাধিক সাহিত্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। মুহম্মদ আলিমুদ্দিন সাহেব রচিত "মা বরকতের মেজমানি"[২৬] নামক যে কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় তার কিয়দংশের উদ্ধৃতি এইরূপ :—

বরকত রহস্য

ফুলী দাসী বলে বাত জননী আমার
হাসারত হইল আজ ময়দান মাঝার।
সোমার নাহিক লোকের কিবা চমৎকার
দাঁড়াইয়া আছে সব চাঁদের বাজার।
বসিবার জন্যে তারা শোরশার করে
বসাইব কিসে মাগো বল না আমারে।
বিছাওয়ানা যে নাহি মাগো কি করি উপায়
বসাইব কিসে মাগো বলনা আমায়।

মেজমানি করেছ তুমি ফকিরের ঝি
বিছওয়ানা যে নাহি তোমায় বসিতে দিব কি।
তাহার উপায় এখন বলো গো জননী
অকারণ হয় বুঝি সাধের মেজমানি।
এখন বলি যে মাগো আরজ মেরা লও
বসিবার জায়গা এখন জলদি এনে দাও।
এ বাত শুনিয়া বরকত মহলেতে যায়
নামাজের পাটি এনে ফুলির হাতে দেয়।
পাটি দেখে ফুলি বলে বলি মা তোমারে
একপাটি লয়ে আমি বসাইব কারে।
ফুলি তখন বলে বাত আর কিছু আছে
এই পাটি লয়ে আমি দিব কার কাছে।
বেশোমার লোক সেথা আছে সমুদয়
এই পাটি লয়ে আমি বসাইব কায়।
বরকত বলেন ফুলি আমার কথা লও
এলাহি ভাবিয়া পাটি মজলিসেতে দেও।
বরকত বলিয়া পাটি জমিনেতে ডালিবে
বসিবে তামাস লোক নজরে দেখিবে।
এ বাত শুনিয়া ফুলি দেলে খুশী হয়
পাটি লয়ে দৌড়াদৌড়ি মহলেতে যায়।
সেখানেতে গিয়া ফুলি ভাবে আপন মনে
মজলিসেতে পাটি আমি ডালিব কেমনে।
মায়ের কাছেতে আমি হামেশা বেড়াই
আর নামেতে জারি কিছু হবে নাই।
বরকতের কাছে আমি থাকি সর্বক্ষণ
আমার নামেতে পাটি ডালিব এখন।
ইহা বলে ফুলি দাসী পাটি যে ডালিল
দুই হাত ছিল পাটি এক হাত হইল।
কমে যদি গেল পাটি হইল অস্থির
হায় আল্লা বারিতালা কি করি ফিকির।

ইহা বলে ফুলি তখন ভাবিতে লাগিল
এমন মতলব আমার কি জন্যেতে হইল।
বরকতের কাছে আমি সরমেন্দা হইব
কেমন করে মায়ের কাছে মুখ দেখাইব।
ভাবিয়া অস্থির ফুলি দেল পেরেশান
এবার বুঝি বরকতের না রহিবে মান।
ভাবিয়া অস্থির ফুলি ভাবে সোবহান
দয়া যদি কর বারি রহিম রহমান।
তোমা বিনা দয়াবান আর কেহ নাই
দয়াময় নাম তোর জানেন সবাই।
সৃজন পালন আর আপন কৃপায়
দয়া কর অধীনেরে আপে দয়াময়।
তুমি না করিলে দয়া কি হবে উপায়
মুস্কিলে পড়িয়া তোমার দাসী মারা যায়।
কত যে করুণা করে আপনার মনে
রহম হইল বারি পাক নিরঞ্জনে।
রহম হইল যবে আপে দয়াময়
গায়েব আওয়াজ ফুলি শুনিবারে পায়।
হুকুম হইল এয়ছা পাক নিরঞ্জনে
বরকতের নামে পাটি ডাল না এক্ষণে।
আওয়াজ পাইয়া ফুলি দেলে খুশী হইল
বরকত বলিয়া পাটি জমিনে ডালিল।
বরকতের খুব এয়ছা বলা নাহি যায়
বিছাইয়া পাটি ফুলি দিশা নাহি পায়।
এসেছিল যত লোক তামাম বসিল
এক হাত পাটি তার বাকি যে রহিল।
ফুলি দেখে বলে বাত জননী আমার
সকলি করিতে পার মায়া বোঝা ভার।
হাসাতে কাঁদাতে পার জননী সবার
দেল খুশী হয় মোর দেখিলে তোমার। (পৃঃ ১৮-১৯)

মুহম্মদ আলিমুদ্দিন রচিত "মা বরকতের মেজমানি,' নামক কাব্যগ্রন্থখানি আমাদের হস্তগত হয় নি। তার রচনাকাল বা অন্যান্য পরিচয় আপাততঃ প্রাপ্তব্য নয়। কবির রচনা দৃষ্টে এই কাব্যের রচনাকাল আধুনিক যুগের নয় বলে অনুমান করা যায়। ভাষায় কিছু আরবী-ফারসী শব্দ থাকলেও সুখপাঠ্য এবং গল্পের মধ্যে সরলগতি আছে।

বিবি বরকত সম্বন্ধীয় কোন উল্লেখযোগ্য লোককথা হিঙ্গলগঞ্জ থানার উপরোক্ত কাটাখালি অঞ্চলে বা অন্য কোথাও প্রচলিত দেখা যায় না। অবশ্য সেখানকার অর্থাৎ কাটাখালি গ্রামে কল্পিত দরগাহে হিন্দু-মুসলমান অনেক ভক্ত মানত প্রদান করে থাকেন।

————

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মানিক পীর

সত্যপীর যেমন জোড়াতালি (Composite) দেবতা, মানিক পীর ঠিক তেমন নন। মানিক সুফীদের স্বীকৃত পীর। তিনি অনেকটা যীশুর স্থানীয়। কখনও কখনও তিনি যীশুর (ঈসা নবীর) সঙ্গে অভিন্ন। মানিক পীরের নামে মানিক (মানিক্য) শব্দের কোন সংস্পর্শ নেই। এটা এসেছে মানিকী (Manichee, গ্রীক Manikhaios) হতে। ইনি ইরানের লোক ছিলেন এবং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দে জরথুশত্রীয় ও খৃষ্ট ধর্মের সংমিশ্রণে নূতন ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। সুফীরা মানিকীকে পীর বলে—এবং যীশুর মত দয়ালু ও ব্যাধি-নিবারক মহাপুরুষ বলে গ্রহণ করেছিল।[৪১]

মুনশী মোহম্মদ পিজিরদ্দীন তাঁর মানিক পীরের কেচ্ছা নামক পাঁচালি কাব্যে লিখেছেন,—

এলাহির চাহা, কমরদ্দিন সাহা,
যে ছুরাতে গোজারিল।...
আল্লার দোয়ায়, দুই লাডকা হয়,
শাহা কমরদ্দিন ঘরে।...
গজ মানিক নাম, দিছে ছোবহান,
বাড়ে তারা দিনে দিনে॥

ফকির মোহম্মদ তাঁর "মানিক পীরের গীত" নামক পাঁচালিতে লিখেছেন,—

বাতুনে মানিক ছিল এলাহি মাঙ্গায়া নিল
ব্যাধি সোঁপিয়া দিল তারে।
ব্যাধিগণ লয়্যা যত তাহা বা কহিব কত
যান দেওয়ান দুনিয়ার উপরে॥

কেহ বলেন মানিক পীর হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। তার পিতার নাম মনোহর সওদাগর।[৯]

বসিরহাট উত্তরাঞ্চলের কারো কারো মুখে প্রচলিত প্রবাদ যে,—মানিক ও মাদার নামে দুই ভাই আল্লার নির্দ্দেশে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করতে ফকির-বেশে বেরিয়েছিলেন।

সুফীদের স্বীকৃত ঐতিহাসিক এই মানিক পীর ইরানের লোক হলেও বঙ্গে তিনি কল্পিত নানান কাহিনীর মাধ্যমে বাঙালীর মানসে যে ভাবে স্থান লাভ করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দে চব্বিশ পরগনা ও যশোহর জেলার পশ্চিম ভাগে প্রচলিত ছড়াগানে—

ধুয়া ঃ মানিকপীর, ভবপারে যাবার লা।
জয়নাল ফিকির নেলে, ফেনি খালে না॥
[জামাই বারিক ঃ দীনবন্ধু মিত্র, ৩য় অঙ্ক]

অন্যত্র আছে,— মানিকের নামে তোমরা হেলা করো না।
মানিকের নামে থাক্‌লে বিপদ হবে না॥
মানিকের নামে চাল-পয়সা যে করিবে দান।
গইলে হবে গরু-বাছুর ক্ষেতে ফলবে ধান॥
[সংগ্রহ ঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায়]

মানিক পীর বঙ্গে একজন লৌকিক দেবতা বিশেষ। মানিক পীরের মূর্ত্তি বিরল। তাঁর প্রতীক-সমাধি বা ক্ষুদ্র স্তূপই বেশী ক্ষেত্রে দেখা যায়। মানিক পীরের আকৃতি অতি সুন্দর। দেহের বর্ণ শ্বেত, দু'এক স্থানে মেঘের মত। মাথায় বাব্‌রী চুলের ওপর ছোট তাজ পাগড়ী। চোখ দুটি বিশাল। পোষাক পরিচ্ছদ কোন কোন স্থানে হিন্দু পৌরাণিক দেবতার মত। দু'এক পল্লীতে কালো রঙের আলখাল্লা ও টুপী দেখা যায়,—তবে উভয় স্থানেই তাঁর এক হাতে আশাদণ্ড এবং অপর হাতে তস্‌বী বা জপমালা থাকে।

মানিক পীরের পূজা হাজতের কর্ত্তা খাদেম সব ক্ষেত্রেই মুসলমান ফকিররাই হন।[৩৮]

মানিক পীর সাধারণভাবেই গোসম্পদ বা পশু সম্পদ-রক্ষক দেবতা স্থানীয় বলে কল্পিত। মানিক পীরের দরগাহ-স্থানে ভক্তগণ নিয়মিত ধূপ-বাতি প্রদান করেন, হাজত, মানত ও শিরনি দেন। অন্যান্য পীরের দরগাহের সাথেও তাঁর দরগাহ দেখা যায়। বড়খাঁ গাজীর ঘুটিয়ারীর দরগাহস্থানে যেমন

বড়পীরের দরগাহ আছে; অনুরূপভাবে বড়খাঁ গাজী পীরের পাথরা-দাদপুর গ্রামের দরগাহের স্থানে মানিক পীরের দরগাহ আছে।

গাভীর প্রথম দুধ প্রায় ক্ষেত্রে প্রথমেই মানিক পীরের দরগাহে প্রদত্ত হয়। অনেক স্থানে স্থানীয় পীরের দরগাহে যে কোন প্রথম উৎপন্ন দ্রব্য যেমন দুধ, ফল, পাটালী গুড় প্রভৃতি ভক্তগণ দিয়ে থাকেন। মানিক পীরের নামে অনেকে গরুও উৎসর্গ করে মাঠে ছেড়ে দেন। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি (১৯৫১) এইরূপ গোসম্পদ উৎসর্গ করার ঘটনা বিরল। সারা বৎসরের যে কোন সময়ে অথবা বৎসরে একবার মানিক পীরের নামে মেলা বসে। চব্বিশ পরগণার বারাসত মহকুমার কয়েকটি গ্রামে মানিক পীরের কল্পিত দরগাহ আছে। তাদের কয়েকটির নাম যথাক্রমে,—ওটনডাঙ্গা, আরিজুল্লাপুর, সিরাজপুর, বামনগাছি, ছোটজাগুলিয়া, উলা, শিমুলগাছি, কদম্বগাছি, আটিশাড়া পাথরা, বদরপুর, ইছাপুর, পাকদহ প্রভৃতি। গ্রামে গোমড়ক দেখা দিলে মানিক পীরের সেবক ফকিরগণ গরুর রোগ নিরাময়ের জন্য গাছ-গাছড়া বা টোটকা ওষুধ দিয়ে থাকেন। অনেকে জলপড়া, তেলপড়াও দিয়ে থাকেন। হিন্দু এবং মুসলিম উভয় তরফ থেকে এইরূপ গোবদ্যি গ্রামে দৃষ্ট হয়। যে সব ভ্রাম্যমাণ ফকির বাড়ী বাড়া মানিক পীরের গান গেয়ে চাল-পয়সা ভিক্ষা করে বেড়ান তাঁদের একজন ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ তারিখের সকালে আমার বারাসতের গ্রামের বাসায় এসে যে গান শুনিয়ে গিয়েছিলেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :—

> মানিক পীরের মেলা দেখে যে করিবে হেলা ;
> দুই পায়ে চম্পাইবালা চক্ষে লাগুক ঢেলা ॥
> আইল আইলরে পীর আইল লহরবান।...
> শ্যামসুন্দর পীর মুখে চম্পা দাড়ি।
> ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইল গওলার বাড়ি ॥...

এর পর সেই ফকির সংক্ষেপে বললেন ;—

গোয়ালা বধূর নিকট দুধ চেয়ে না পাওয়ায় অভিশাপ দিয়ে পীর চলে গেলেন। অভিশাপে গরু বাছুর সব মরল। পীরের দয়ায় পুনরায় তারা প্রাণ পেল।

এবার ফকির আবার গাইলেন ;—

পূব-দখিনে ঘরখানি মা বেউর বাঁশের রুয়া।
পীর নামে দান কর মা চাল-পয়সা দিয়া ॥
তোমায় বাড়ীর সিধে নিয়ে অন্যের বাড়ী যাই।
তোমার বাড়ীর মানুষ-গরু রাখিবে ভালাই ॥
গরুর মাথায় শিং গো মা মানুষের মাথায় কেশ।
মানিক পীরের কৃপা হতে পালা করলাম শেষ ॥

ফকির তাঁর নাম বলতে চান না। তিনি প্রৌঢ়, রং শ্যামবর্ণ, মাথায় সাদা টুপী, পরণে লুঙ্গি, গায়ে তালি দেওয়া নানা রংএর ফতুয়া, হাতে চামর ও চিমটা। তিনি আমাদের পরিবারের মঙ্গলের জন্য তিনটি জিনিষ দিয়ে যান। সেগুলি এবং সেগুলির ব্যবহার যথাক্রমে,—১। কয়েকটি কালো সূতোর টুকরো। এগুলির এক একটি পরিবারের প্রত্যেকের হাতে বাঁধবে।

২। এক গ্লাস জল যাতে লাল কালিতে লেখা এক টুকরা কাগজ ফেলে দেন। ঐ জল বাড়ীর মানুষ-পশুপক্ষী সকলেই গ্রহণ করবে। এবং

৩। উক্ত কাগজ টুকরা বা কবচটি গ্লাসের জল থেকে তুলে নিয়ে ঘরের দরজার উপরে আঁঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখতে হবে।

কিছু চাল-পয়সা দিলে তিনি হাসি মুখেই চলে যান।

মানিক পীরের মাহাত্ম্য-গীতি পরোক্ষভাবেও অনেক ফকির গেয়ে থাকেন। সে গানে বিশেষভাবে আছে গোসম্পদের মঙ্গল-কথা। সেইরূপ একটি মঙ্গল-গীতির পরিচয় দিচ্ছি ঃ—

ধুয়া- আমার মনে মনে বালা গায়।
মানিক জেন্দার নাম ॥
সকালেতে ছড়া-ঝাঁঠ সন্ধ্যাকালে বাতি,
লক্ষ্মী বলেন তাহার ঘরে আমার বসতি।
সকালেতে সাফাই করে সাঁঝেতে সাজাল,
সেই গোহালেতে রাখলে গরু হবে না নাকাল।
যে গোহালে নিত্য সাঁঝে না পড়ে সাজাল,
সারারাতে দাপায় গরু সকালে ঝিমায়,
আয়ু কমে তারই সাথে দুগ্ধ কমে যায়।

গো-সম্পদের মঙ্গলের জন্য মানিক পীরের দোয়ায় চৌষট্টি দাওয়াই পাওয়ার বিবরণ বিবৃত হয় এইভাবে—

চৌষট্টী বেয়াধি গরুর চৌষট্টি দাওয়াই,
মানিকের দোয়া হলে তবে পার পাই।
মাঝে মাঝে গরুর ঘটে ছোট ছোট রোগ,
মানিকের দোয়া মাঙ্গি শোনেন মুষ্টিযোগ।
জিহ্বাতে হইলে কাটা গলায় হইলে কোলা,
হাতেতে লবণ লইয়া দিবেন তাতে ডলা।
বর্ষাতে কাদায় গরুর পায়েতে হয় এঁশে,
শুক্‌নো ঠাঁয়ে র'খবেন আর ফেনাইল দিবেন ঘষে।
পেট ফাঁপে ছ্যাড়ায় গরু, সিমুলে ব্যামো কয়,
বাঁশের পাতা শুকনো তুষ খাইতে দিতে হয়।
জ্বর আইলে কম্প দিয়া তারে 'খোর' বলি,
গাঁজার সাথে শুক্‌নো ঝিঙা আর ছেঁড়া চুলি।
মুখ চাপিয়া নাক দিয়া ধোঁয়া দিলে পরে,
ভাল হইয়া উঠবে গরু ছাড়ি যাবে জ্বরে।
ইহা ছাড়া গলা ফুল যারে কয় পশ্চিমে,
ঈশেন মূল, মরিচ হুঁকোর জলে যাইবে কমে।
এই তিন দ্রব্য ভাই নিবেন শিলে বেঁটে,
হা করাইয়া ঢালি দিবেন বিঘ্ন নাহি ঘটে।
মানুষের যেমন দাদ তেমনি গরুর কাঁধের কাঁড়,
জল দিয়া দিবেন ধুয়ে টর্চের পুরানো মশলার।...

ধুয়া— মানিক যায় মানিক যায় গো
কানু ঘোষের বাড়ী মানিক যায়।

এর পর ফকির গাইলেন শুধু দুগ্ধবতী গাভীর কথা—

কথায় বলে গাই গরুর মুখে দুগ্ধ রয়,
বেশী কইরে খাইলে গাই বেশী দুগ্ধ দেয়।
চুর্ণি ভূষি খইল-বিচালি ভেলীগুড় আর,

কাঁচা ঘাসে গাইয়ের পেষ্টাই কয়ে দিলাম সার।
লাউ কলাই ফ্যানে ভাতে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়,
দুগ্ধ বাড়ে বাছুর সারে শুনেন মহাশয়।
শীতেতে পরাবেন জামা ছেঁড়া চট দিয়া,
গরমেতে চান করাবেন পুকুরেতে নিয়া।
স্বাস্থ্য-আলা ষাঁড় অথবা নকল পালের বীজে
গোধনের বৃদ্ধি হবে ভাই কয়ে দিলাম ও যে।
যেমন তেমন দুই ভাই আর দুই গাই যদি থাকে,
সংসারেতে চিন্তা নাহি কহি যে সবাকে।
গরুর সেবায় তুষ্ট হয়েন আপনি ভগবান,
যাঁর কৃপায় ছোট কালে বাঁচে বাচ্চার প্রাণ।
পুরাণ-মহাভারতেতে জানি গোধন বড় কয়,
এই ধনে যত্ন নিলে পরমাই বৃদ্ধি হয়।
কথায় বলে দুগ্ধ যদি থাকে আগে পাছে,
কিবা ফল করে ভাই শাকে আর মাছে।
মেঠাই বল মণ্ডা বল দুগ্ধ ছাড়া নয়,
দুধ-ঘিতে শক্তি বাড়ে ব্যামো দূর হয়।
মানিক্ পীরের চরণ বন্দি পালা শেষ করি।
মুসলমানে আমিন বলেন, হিন্দুরা বলেন হরি ॥
[মানিক পীরের গান : সত্যেন রায়]

মানিক পীরের গান গ্রামাঞ্চলে এতখানি বহুল প্রচারিত যে, তাঁর প্রতি গ্রামের হিন্দু-মুসলিম কৃষক এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষ অনেক সময় গায়ক ফকিরকে যেন মানিকপীরের প্রতিনিধিরূপে কল্পনা করে এবং তাঁকে চাল-পয়সা দান করে। সেই ফকিরও তেমন মানিক পীরের প্রতি ভক্তি অর্পণ করতে সকলকে আহ্বান জানান,—

মানিকের নামে তোমরা হেলা করো না,
মানিকের নামে থাকলে বিপদ হবে না।
ভক্তির ভগবান তিনি অভক্তের নয়,
ভক্তিভাবে যেবা ডাকে তার বাড়ী যায়।

মানিকের নামে চাল-পয়সা যে করিবে দান,
গইলে হবে গরু-বাছুর ক্ষেতে ফলবে ধান।

বেশ কয়েকজন কবি মানিক পীরের পাঁচালী লিখেছেন। ফকির মহাম্মদ লিখেছেন—মানিক পীরের গীত। মুনশী মোহম্মদ পিজিরদ্দীন লিখেছেন—মানিক পীরের কেচ্ছা। জয়রদ্দিন লিখেছেন—মানিক পীরের জহুরা নামা। নসর শহীদ লিখেছেন—মানিক পীরের গান। তা ছাড়া বয়নদ্দিন, খোদা নেওয়াজ প্রমুখও মানিক পীরের গান রচনা করেছেন।

পাঁচালিকার কবি মুনশী মোহম্মদ পিজিরদ্দীন সাহেব তাঁর পরিচয় দিয়েছেন অতি সংক্ষেপে। এক স্থানে তিনি লিখেছেন,—

আল্লা আল্লা বল সবে হয়ে এক মন।
অধীনের বসতি রানায় কদিমী মকান॥ (পৃঃ ২১)

কবি অল্প বয়সে মাতাপিতাহীন হন। পঞ্চম বছর পর তিনি কিছু শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ওস্তাদ পীরের বসতি কুমারহাটে। তিনি লিখেছেন :—

জেলা বারুইপুরের থানা
তাহার দক্ষিণে রাণা
মোকাম এই জানিবেন সবাই॥
একা আমি সংসারে,
মা বাপ গিয়াছে মরে,
ভাই বন্ধু আর কেহ নাই॥

অতি অল্প বয়সে কবি মাতাপিতাহীন হয়ে কতখানি অসহায় বোধ করেছিলেন তা নিম্নলিখিত অংশ থেকে বুঝা যায় :—

মা বাপ কেমন চীজ দুনিয়ার পরে।
জানিতে পারিলাম নাহি নছিবের ফেরে॥
বয়স বৎসর চারি যখন হইল।
মা বাপের তরে আল্লা উঠাইয়া নিল॥
পিতা মাতা সকলেতে গেলেন চলিয়া।
মাটির পিঞ্জিরা রহে দুনিয়ায় পড়িয়া॥

অবশেষে ভেবে দেখি আপনার মনে।
দুনিয়াতে কেহ নাই সেই আল্লা বিনে ॥
শেষকালে দাদি মেরা ছিল দুনিয়ায়।
লালন পালন করে আল্লাকে খিয়ায় ॥
তারপরে আল্লা নবী হুকুম করিল।
দেখিতে ২ দাদি ফওত হইল।
যখন আরশে দাদি গেলেন চলিয়া।
পুকুরেতে পানা যেয়ছা বেড়ায় ভাসিয়া ॥

এ ছাড়া কবির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

মুন্সী মোহাম্মদ পিজিরদ্দীন সাহেব প্রণীত গওসিয়া লাইব্রেরীর আদি ও আসল মানিক পীরের কেচ্ছা, কলিকাতায় ৩০নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট হতে নূরদ্দীন আহম্মদ কর্তৃক প্রকাশিত। আকৃতি ৯"×৬"। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০। পৃষ্ঠাগুলি বাম থেকে ডাইনে সজ্জিত। হামদ-নাত, কেচ্ছা ও সুচীপত্র এই তিন অঙ্গে বিভক্ত। কেচ্ছায় ১৬টি উপবিভাগ আছে। প্রতি প্রথম চরণের শেষে দুই দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় চরণের শেষে তারকা-চিহ্ন। কোথাও দ্বিপদী কোথাও ত্রিপদী পয়ার। দ্বিপদী পয়ারে সাধারণতঃ চৌদ্দ অক্ষর। পর পর দুইটি একই শব্দের স্থলে একটি শব্দ ও পরবর্তী শব্দের বদলে "২" ব্যবহৃত হয়েছে। কেচ্ছাটিতে মূলতঃ দুইটি পৃথক কাহিনী রয়েছে।

আল্লার দোয়ায় কমরুদ্দীন শাহার পত্নী দুধবিবির গর্ভে গজ ও মানিক নামে দুই পুত্র হয়।

হীরে দাসী কয়, শুন ওগো জায়
হেন ছেলে নাহি কারে।
ফিরি কত ঠাঁই এমন দেখি নাই
মোম বাতি জ্বলে ঘরে ॥

অহঙ্কারী দুধবিবি তার উত্তরে বল্লেন,—

দু'জনা থাকিলে কত লাড়কা মিলে
শুন দাসী কহি তোরে।
বীজ না রোপিলে কিসে ধান্য ফলে
দেখে দেখ বিচার করে ॥

এ কথা শুনে নিরঞ্জন আরেশেতে বেজার হলেন। তিনি জিবরিল-এর মারফত দুধবিবিকে আজার পাঠালেন। রাত্রে অকস্মাৎ আজারের চাপে বিবি অচেতন হয়ে পড়লেন,—পিপাসায় বুক হল শুষ্ক। পরদিন কমরুদ্দিন খবর পেয়ে এলেন। বিবির এইরূপ অবস্থা দেখে তিনি হায় হায় করে উঠ্‌লেন।

লাড়কাকে দেখিয়া শাহা কান্দিতে লাগিল।
দিনেতে দুনিয়া যেন অন্ধকার হইল॥

ক্রুদ্ধ হয়ে কমরুদ্দিন শাহা বললেন,—

আজার দূরেতে দিব পয়জার মারিয়া।

এ কথাও আল্লা শুনতে পেলেন। অহঙ্কারীকে সাজা দিবার নিমিত্ত আল্লা বললেন জিবরিলকে—

যেমন বড়াই শাহা করিল এখন।
আজার ভেজিয়া দেহ উচিত মতন॥······
গায়ে জ্বর মাথা ব্যথা পৌঁছিল তখন॥
আল্লার হুকুমে শাহা যান গড়াগড়ি।

পতি-পত্নী বিপন্ন হয়ে পড়লেন। কমরুদ্দিন বললেন,—

শুন দাসী এইবারে জান্ বুঝি যায়।
মরিলে এ দোন লাড়কা রহিবে কোথায়॥····
একজনে রাখ দাসী যতন করিয়া।
দুইজনে মরিবে কেন কান্দিয়া কান্দিয়া॥

অগত্যা দাসী একটা ছেলে পেল ; কিন্তু সেই দাসী ছেলেকে নিয়ে চল্‌ল বিক্রী করতে। পথে তার দেখা বদর জেন্দার সাথে। দাসীর অভিপ্রায় জেনে বদর জেন্দা নিজেই দশ টাকা দিয়ে সেই পুত্রটিকে কিনে নিলেন।

দু'মাস কেটে গেলে রোগাক্রান্ত কমরুদ্দিন শাহা কোন প্রকারে উঠে বসলেন।

টলমল করে অঙ্গ রাহে চলে যায়।
শাহাকে দেখিয়া শয়তান আইল তথায়॥

শয়তান বল্‌ল—সরাব খাও—সেরে যাবে। শাহা ও বিবি দুজনেই খেলেন সরাব।

ধন-দৌলত যত কিছু কমরদ্দির ছিল।
একে একে মাল-মাত্তা লুটাইয়া দিল॥

বদর শাহা ক্রীত পুত্রকে গৃহকর্ত্রী ছুরত বিবির কোলে এনে দিলেন। নিঃসন্তানা সুরত বিবির কোলে সেই পুত্রকে এনে দিতে বিবি যেন হাতে চাঁদ পেলেন। পরে বদর শাহা বললেন,—

দিন কত মোর তরে কর না বিদায়।...
জাহির কারণে যাব ...

বদর শাহ বিদেশে রওনা হয়ে গেলেন।

বিদেশে তাঁর বারো বছর কেটে গেল। ততদিনে তিনি পালিত পুত্র মানিকের কথা গেলেন ভুলে।

জাহির সেরে অনেক দিন পর বদর শাহা ফিরে এলেন মহলে। তখন—

মায় বেটা দুইজনে নিদ্রা যায় খুশী মনে,
মানিকেরে চিনিতে না পারে।
না বুঝে বদর মিয়া, কত শত গালি দিয়া,
ছুরতেরে যায় কাটিবারে॥

মানিক চেষ্টা করলেন বদর শাহাকে বোঝাতে। বদর অবুঝ। তিনি মানিককে সিন্ধুকে ভরে জ্বালিয়ে দিতে চান। কাঁদতে কাঁদতে মানিক, আল্লার দরবারে মোনাজাত করলেন। আল্লা বললেন,—

থাক তুমি এইখানে খোসাল হইয়া।
মুস্কিলে পড়িলে তুঝে লিব ত্বরাইয়া॥

মানিককে সিন্ধুকে ভরে, কুঞ্জি তালা লাগিয়ে তিন দিন ধরে আগুন দিয়ে জ্বালানো হল। ছুরত বিবি কেঁদে কেঁদে হয়ে গেলেন অজ্ঞান।

আল্লার দোয়ায় সে আগুন হয়ে গেল পানি। সকালে সিন্ধুকের ঝুলুপ খুলতে মানিক অক্ষত দেহে বাইরে এসে বদরকে সালাম জানালেন। তিনি বললেন,— আল্লার দোয়ায় আমি রক্ষা পেয়েছি। এবার আমার বিদায় দিন। এবার বদর মিয়া আপনার ভুল বুঝতে পেরে কেঁদে ফেললেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বদর শাহা ও ছুরত বিবিকে "সালাম করিয়া মানিক যায় নিকালিয়া।"

এলাহি বল্‌লেন জিবরিলকে—"চৌষট্টী বেদের ভার দেহ মানিকেরে।" জিবরিল এলেন মানিকের কাছে। বল্‌লেন,—

শুন শুন মানিক জেন্দা শুন দস্তগির।
দেরাগ শহরে গিয়া কর না জাহির॥

এই নির্দেশ পেয়ে মানিক এলেন ভাই গজের সাথে সাক্ষাত কর্‌তে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে তিনি বাহির হয়ে পড়্‌লেন ফকিরের বেশে,—হাতে আশাবাড়ি, গলে তছ্‌বি, পায়ে খড়ম, অঙ্গে ছেঁড়া ঝুলি, মাথায় পাগড়ি। তিনি আরো নিলেন জাম্বিল। সেই জাম্বিলের সাহায্যে আল্লার দোয়ায় বিশাল নদী পার হয়ে তিনি এলেন দেরাগ সহরের 'কালে শাহার' বাড়ীতে।

প্রবল প্রতিপত্তি এবং প্রতাপশালী বাদশা কালে শাহা—কিন্তু "ফরজন্দ বিহনে ছিল সকলি আন্ধার।" আল্লার প্রতি তাঁর মতি নেই,—ফকির দেখ্‌লে আগুনের মতন জ্বলে ওঠেন।

মানিক পীর এলেন কালে শাহার দরজায়। বল্‌লেন,—

আসিয়াছে ওগো মাতা তোমার বাটীতে।
থোড়া খানা দেহ মাতা আল্লার নামেতে॥
এক দানা খয়রাত দিলে পাবে হাজার দানা।
খোদার দোয়াতে সেই পাবে বেহেস্ত খানা।... ..
এলাহির দোয়া আছে একিন জানিবে।
খোদার দোয়াতে এক লাড়কা পয়দা হবে॥

জুইন নাম্নী দাসী ফকিরদ্বয়ের উপস্থিতির কথা কালে শাহার পত্নী রঞ্জনা বিবিকে জানাল। বিবি কিছু চাউল ভিক্ষা পাঠালেন। মানিক সে ভিক্ষা নিলেন না;—তিনি বিবির সাক্ষাৎ প্রার্থী। রঞ্জনা বিবি এলেন মানিক পীরের হুজুরে। মানিক পীর বিবিকে আশ্বাস দিলেন যে আল্লার দোয়ায় তাঁর পুত্র হবে। বিবি সে কথায় গুরুত্ব দিলেন না। বল্‌লেন,—

পাগলের মত তোমায় দেখি যে নয়নে।
দূর হয়ে যারে বেটা আমার সামনে॥

বহুদিন এক ফকির এসেছিল হেথা।
কহিয়া গিয়াছে তিনি ঐ সব কথা॥
সেই সব কথা যদি তোমার মুখে পাই।
ভক্তি করে স্থান দিব আল্লার দোহাই॥
সেই কথা না মিলিলে ঝোলা কেড়ে লিব।
হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে কয়েদে রাখিব॥

বিবি আরো গালি দিলেন। তাতে খোদা অসন্তুষ্ট হলেন,—ক্রুদ্ধ হলেন স্বয়ং মানিক পীর। পীর অভিশাপ দিলেন:—

এই দোয়া করি আমি যদি হই পীর।
ভ্রমণ করিবে তুমি আমার খাতির॥
এই বাত কহি আমি যেতে হবে বনে।
বার বৎসর ছয় মাস ঘুরিবে কাননে॥
পশুদের মত তুমি থাকিবে জঙ্গলে।
আহার না পাবে মাতা জঙ্গলে ঢুড়িলে॥
খোদার দোয়াতে তুমি নগর না পাবে।
পক্ষিরা যেমন থাকে তেমনি কাটাবে॥

এ সব কথা শুনে বিবি অন্দর মহলে গিয়ে দাসী জুইনকে বল্‌লে,—ফকিদ্বয়কে মেরে তাগাও এখান থেকে। দাসী ছুটে এসে তরবারির আঘাত করতে গেল কিন্তু সে আঘাত ফকিরের গায়ে লাগল না—নিজের দেহে লাগতে নিজে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং মৃত্যু বরণ করল। অন্য দাসীর কাছে দাসীর মৃত্যুর খবর পেয়ে রাণী তো বাদশার ভয়ে ভীতা হলেন। বিবি, দাসীকে বল্‌লেন,—

কভু না বাদশার কাছে এই বাত কও।
নেমকের দাসী তোরা মোর ছের খাও॥

সভা-অন্তে বাদশা ঘরে ফিরলেন। জোড় হাত করে মায়ের কদমে সালাম জানিয়ে তিনি বাণিজ্যে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

কোমের কথা কিছু বলি গো তোমারে।
আপনা জানিয়া তারে রাখিবে নজরে॥

তোমার হুকুম যদি বজায় না করে।
বসন পরায়ে দিবে জঙ্গল মাঝারে ॥

কালে শাহা লোক-লস্করে সুসজ্জিত হয়ে আল্লার নাম স্মরণ করে বাণিজ্য-যাত্রা করলেন।

পীর এক দিন নামাজ পড়ে আল্লার দোয়া প্রার্থনা করলেন। আল্লা পাঠালেন জিবরিলকে—"বিরাট নগরে ওকে দিবে যে ভেজিয়া।" জিবরিলের কাছে নির্দেশ পেয়ে পীর এলেন বিরাট নগরের কিনু ঘোষ ও কানু ঘোষের বাড়ী।

গৃহস্থ ঘোষ ভাইদের ভালই অবস্থা। ধন-দৌলত, গরু-বাছুর প্রচুর। "কত দুধ-দধি আছে ঘরেতে তাহার"। আর আছে চাঁদের সমান এক ছেলে।

পীর দোর-গোড়ায় এসে 'মা মা' বলে ডেকে ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন ঃ—

সাত রোজ খানা পানি না হয় আহার ॥
থোড দুধ দেহ মাতা আমার তরেতে।
এলাহিব দোষা আছে জানিবে মনেতে ॥

গোয়ালিনী বল্‌ল,—কিছু মাত্র দুধ নাহি কি দিব তোমারে।

পীর বললেন—দশ মন দুধ আছে দেখি তেরা ঘরে।
ঝুটা বাত কহ তুমি আমাদের তরে ॥

গোয়ালিনী সে কথায় গুরুত্ব দিল না। গায়েবের কথা যে ফকির জানে, যার এত গুণ, সে কেন ভিক্ষা করে খায়। সে এক বাজা গাভীকে দেখিয়ে বলল,—

যত পার ওরে ফকির খাওনা দুইয়া।
কেমন সত্যবাদী তোমার দেখিব বুঝিয়া ॥

পীর মনে মনে আল্লাকে বললেন,—

"মুস্কিলে পড়েছি আমি তরাও এইবারে।" ..
জনম ভোর বৎসহীন আছে দুনিয়াতে।
কেমনে দোহন আমি করি এক্ষনেতে ॥

আল্লার হুকুমে জিবরিল মনুরায় নামক বাছুর নিয়ে অদৃশ্যভাবে সেখানে এলেন। খুসি হয়ে মানিক পীর সেই গোয়ালিনী বুড়িকে দুধ দোওয়া একটি ভাঁড় আনতে বললেন। বুড়ি এনে দিল সহস্র ছিদ্র এক ভাঁড়। একে একে সাত ঘড়া দুধে ভরে গেল। গোয়ালিনী সব দুধ ঘরে এনে বলল,—ফকির বেটা যাদু জানে। সে ঘরের দুধ বাইরে নিয়েছে নিশ্চয়। তার পুত্রবধূ সনকা বলল,—"মাতা অতিথ যাবে ফিরে!" সে কিছু দুধ এনে ফকিরকে দিল। ফকির বললেন ;—

জন্মাবধি থাক তুমি এয়ো স্ত্রী হইয়া।
যেই মাত্র মানিক জেন্দা মাথায় হাত দিল।
দেখিয়া সে গোয়ালিনী বড় গোশ্বা হইল॥

বুড়ি তৎক্ষনাৎ কিনু কানুর কাছে গিয়ে বলল,—"কত রঙ্গ করে ফকির-দুই সনকার সাথে।"

ঘোষ তো একথা শুনে বারুদের মত জ্বলে উঠল। সে দ্রুত এসে পীরের মাথায় মারল—'তেগ'। পীর অন্তর্হিত হলেন। তাঁর মাথার মোহরা পড়ল মাটিতে। মোহরা কাল-সাপ রূপে দংশন করল কিনুকে। সকলে হায় হায় করে উঠল।

সনকা বসিয়া তখন আল্লাকে ধিয়ায়॥
সনকার মোনাজাত আল্লা করিল কবুল। ..

সেখানে এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরে মানিক পীর এলেন।

বুড়ি বলে ওরে বাছা বাছায় পেলে আমি।
আমার যত ধন আছে অর্দ্ধেক পাবে তুমি॥

মানিক তখন আল্লার নাম নিয়ে কিনুর পায়ে ফু দিতে সব বিষ হয়ে গেল পানি। কিনু জীবন পেল। অর্দ্ধেক ধন দিবার ভয়ে বুড়ি কপট মূর্চ্ছা গেল। মানিক স্মরণ করলেন আল্লাকে।

ঘরে মৈল গোয়ালিনী বাইরে মৈল গাই।
কতেক বাছুর মৈল লেখা-জোখা নাই॥
সনকা বলে আমি কি বলিব আর।
মানিকের তল্লাসেতে যাই এইবার॥

সনকা, পীরের আগমন, দুধ ভিক্ষা চাওয়া, পীরকে গালি দেওয়া ইত্যাদি সব ঘটনা বলতে,—কিনু ঘোষ চললো পীরের সন্ধানে। সাত দিন সাত রাত সন্ধান করে অবশেষে মানিকের দয়ায় সে সাক্ষাত পেল মানিককে। দু'পায়ে জড়িয়ে ধরে আনুকূল্য প্রার্থনা করতে মানিক পীর সদয় হয়ে কিনুর বাড়ী এলেন। এলাহির নাম স্মরণ করে তিনি দোয়া পড়লেন। আল্লার হুকুমে সব গরু বাছুর বেঁচে উঠল। তখন কিনু ঘর থেকে দশ মণ দুধ এনে খেতে দিল পীরকে। আরো দিল এক গাভী আর দশ বিঘা জমি। মানিক বললেন —এ সবই তোমার রইল।

যে সমেতে গাভী দোহন করিবে আপনে।
আল্লার নামেতে দুধ দিবে যে জমিতে ॥

এই বলে মানিক পীর আপনার আস্তানায় ফিরে গেলেন।

বাদশা কালে শাহা ততদিনে বাণিজ্য-জাহাজ নিয়ে আমিরাবাদের ঘাটে পৌঁছে গেলেন। নিদ্রিত সেই বাদশার শিয়রে গিয়ে হাজির হলেন গঙ্গ ও মানিক। মানিক বললেন—

হইবেক লাড়ক তেরা বিবির উদরে ॥
সেই লাড়কা হৈতে তোমার বাড়িবে ধনেতে।
লাল মানিক পাবে কত হাসিতে খুশীতে ॥

কালে শাহা সেই রাত্রে মানিক-হাঁস পাখীর পিঠে চড়ে এলেন বিবি রঞ্জনার নিকট, তিনি নিজের কাছের চাবির সাহায্যে কুলুপ খুলে বিবির কাছে গেলেন এবং রাত্রি শেষ না হতেই সাক্ষাতকার শেষ করে ফিরে এলেন জাহাজে। মানিক পীর বললেন,—কোন চিন্তা করো না,—ভাটার টানে টানে যাও জাহাজ নিয়ে। পাবে বহুত মাল, বসে খাবে চিরকাল আর এলাহির নাম করবে।

পরদিন বাদশা কালে শাহা সকালে সদলে রওয়ানা হলেন এবং আরো এগিয়ে চললেন।

এদিকে দেরাগ সহরে কালে শাহার মাতা আয়েমনা বিবি সকালে ঘুম থেকে উঠে দাসীকে বললেন পুত্রবধূ রঞ্জনা বিবির খবর নিতে! দাসী এসে

জানালো যে দরজার কুলুপ খোলা, দরজা খোলা, বেহুস হয়ে বিবি পালঙ্কে শুয়ে আছে। বুড়ি বললেন,—

এতদিন পরে তুই কালি দিলি কুলে ॥

ক্রুদ্ধ বুড়ি দাসীকে দিয়ে রঞ্জনা বিবির গায়ের অলঙ্কার খুলিয়ে নিলেন, তার বদলে—পরালেন চট। তারপর তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন বনবাসে আমীরা-জঙ্গলে।

রঞ্জনা বিবির সোনার বরণ দেহ বনে বনে ঘুরে ঘুরে হল মলিন বরণ। তিনি শুধুই কাঁদেন আর স্মরণ করেন আল্লাকে। নয় মাস পর তিনি বনে দেখ্‌তে পেলেন দীনু নামক এক ফকিরের কুঁড়ে ঘর। রঞ্জনা গিয়ে তাঁকে সব কথা বললেন। সব শুনে ফকির তাঁকে আশ্রয় দিলেন।

সেদিন দীনু ফকির গ্রামে গেছেন ভিক্ষায়। রঞ্জনা প্রসব হয়ে বসে আছে ঘরে। ঘরে ঢুকে চাঁদ স্বরূপ পুত্রকে দেখে ফকির তো খুব মুগ্ধ। দাইকে আনালেন সহর থেকে। দাই বললে,—লাড়কা খুবই বেমার। কম্নিা সহরে শাহা হবিবের নিকট নিয়ে যাও—তিনি ভাল করে দেবেন। ফকির, লাড়কা লাল মানিককে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। শাহা হবিব বললেন,—

দাওয়াই খাওয়াই পাছে লাড়কা মারা যায় ॥

ফকির ফিরে এলেন ঘরে। দাই ৫ টাকা নিয়ে ফিরে গেল। শাহা হবিব ডেকে আনালেন উজিরকে। বললেন,—দীনু ফকিরের ঘরের ছেলেকে চুরি করে এনে দাও,—অনেক টাকা পাবে। উজির এক দাসীর সাহায্যে যাদুর জোরে লাল মানিককে এনে দিল হবিবের কাছে।

সকালে উঠে রঞ্জনা বিবি পুত্রকে না পেয়ে কেঁদে উঠলেন। খবর শুনে ফকিরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

লাল মানিকের সন্ধানে বারো বছর কেটে গেল। মানিক পীর এবার এসে তাদের সঙ্গে দেখা দিলেন এবং আপন পরিচয় দিলেন। বিবি তখন পীরের পা জড়িয়ে ধরলেন। পীরের দয়া হল। বিবিকে পীর পরামর্শ দিলেন রাজ-দরবারে নালিশ করতে। বিবি নালিশ করলেন রাজার নিকট। রাজা সে নালিশ নিলেন না, বরং তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন।

পুত্র বিরহে বিবি রাস্তায় বসে কাঁদেন। পুত্র রোজ সেই পথ দিয়ে বিদ্যালয়ে

যায়। নিজের পুত্র বলে চিনতে পেরে বিবি আরো কাঁদতে লাগলেন। লাল মানিক একদিন বলল,—তুমি কাঁদ কেন? বিবি সব কথা বললেন। পুত্রের হৃদয় সেই দুঃখে গলে গেল।

অনাহারে কৃশকায়া মাতার জন্য লাল মানিক আপনার আহারের অংশ এনে দিলে বিবি বললেন,—

যদি সত্য মেরা লাড়কা হও বাপু তুমি।
কেমনেতে ঐ ভাত খাব তেরা আমি।

শাহার উপর লাল মানিকের সন্দেহ হওয়ায় বলল;--

এক বাত কহি বাবা তোমায় হুজুরে॥
ছেরে মেরা এক হাত দেহ উঠাইয়া।
বলিব সকল কথা বয়ান করিয়া॥

শাহা তখনই তার মাথায় হাত দিতে লাল মানিকের আরো সন্দেহ ঘনীভূত হল। মনে মনে সে ভাবল—

পিতা মাতা হইলে পরে বেটার ছেরেতে।
কোন মতে হাত তারা না পারে তুলিতে॥

মানিক পীর এবার রঞ্জনাকে সঙ্গে নিয়ে রাজ দরবারে গেলেন। তিনি ল'ডকা চুরির বিবরণ রাজাকে বললেন। রাজা ডেকে পাঠালেন শাহা হবিবকে। হবিব বললে ঃ ছেলে আমার। রাজা মনে মনে বললেন,—কি করি এখন।

মানিক পীর বলেন লাডকার মুখে সাত জোড়া পটি বাঁধা হোক্।

"সাত পাঁচিল ভেদ করে দুধ যাবে যার।
তার সঙ্গে দাবি-দাওয়া কিছু নাহি কার॥

রাজার হুকুমে শাহা হবিব, দাসীকে আপন স্তন হতে দুধ দিতে বললেন। দাসীর স্তন হতে দুধ তো বের হ'লই না, যন্ত্রণায় সে কেঁদে ফেলল। জন্ম-বাঞ্জার দুধ—সে কি সম্ভব! অপর পক্ষে বিবির স্তন হতে এমন দুধের প্রবাহ এল যে সাত পুরু কাপড় ভিজে গেল।

দুধ দেখে রাজা তখন বেহুস হল।

বিবি লাল মানিককে পেলেন। মানিক পীরকে তিনি সালাম জানালেন।

"সালাম করিয়া বেওয়া জোড় হাতে কয়।
কহ বাবা লাড়কা লয়ে যাইব কোথায়॥"

মানিক বললেন,—লাড়কা নিয়ে নদীর ধারে যাও। তাঁরা নদীর ধারে গেলেন। পীরের পরামর্শে লাল মানিক পথ চলতি যাঁর সাক্ষাত পেল, তিনিই কালে শাহা। সে কালে শাহাকে বললে,—রাজার হুকুম আছে, তাঁর কাছে যেতে হবে। অন্যথায় সব ধন এখানে দিয়ে আপনার ঘরে ফিরে যাও।

কালে শাহা চিন্তিত হয়ে অবশেষে গেলেন রাজার কাছে। তিনি লাল মানিকের নামে পাল্টা নালিশ করলেন। লাল মানিককে আনা হল দরবারে। লাল চান্দ বললে,—

বার বচ্ছর মাতা মেরা ফেরে বনে বনে।
পিতার অন্বেষণ আমি না পাই জাহানে॥
রঞ্জনা আমার মাতা দেরাগ সহর।
সত্য করে বল দেখি কে হয় তোমার॥
যেই মাত্র লাল চান্দ এই কথা বলে।
আপনার লাড়কা বলি তুলে নিল কোলে॥
বুকেতে রাখিল তারে মুখে চুমা দিয়া।
কান্দিতে লাগিল শাহা বিবিকে দেখিয়া॥

লাল শাহা বলল—

মানিক পীর হইতে মোরা আছি যে বাঁচিয়া।
নহে ত জননী মেরা যাইত মরিয়া॥

শাহা এবার মানিক পীরের জন্য আকুল হলেন। দয়াল পীর সেই আকুতিতে সাড়া দিলেন;—আল্লাকে ভেবে পীর সেখানে এলেন। শাহা বললেন—"যাহা চাহ তাহা দিব কহিনু তোমারে।" মানিক পীর বললেন,—"আপনার দেশে যাহ ধনে কাজ নাই॥"

কালে শাহা বলে আমরা যাইব পশ্চাতে।
খয়রাত করিব কিছু মানিকের নামেতে॥

কালে শাহা দেশে দেশে সে খয়রাতের খবর পাঠালেন এবং মানিকের নামে খয়রাত জাকাত দিয়ে সকলে মিলে আপনার মোকামে ফিরে গেলেন।

কাহিনীর আরম্ভে কবি ভণিতায় বলেছেন—

হীন লাচার কয় সবাকার পায়
আমি বড গুণাগার।
নছিবের ফেরে বাপ গেছে ম'রে
ফেলে তুনিয়া মাঝার ॥

মানিক পীর পাঁচালী কাব্যে বিভিন্ন কাহিনী-অংশে শৈশবকালে মাতা-পিতার স্নেহবঞ্চনার করুণ চিত্র যেন কবির অসহায় জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অঙ্কিত হয়েছে।

কমরদ্দিম শাহার পুত্র মানিকের বাল্যজীবনে নেমে এল দুঃখের ভার! মানিক বিক্রীত হল বদর শাহার কাছে মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে। তিনি ছুরত বিবির কোলে মানুষ হতে লাগলেন। পালক পিতা বদর শাহা বাণিজ্য থেকে ফিরে এসে অকারণ সন্দেহে তার কঠোর শাস্তি স্বরূপ পরীক্ষার বিধান করল। তাকে সিন্দুকে বন্ধ করে আগুনে জ্বালানো হল! উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সে দুঃখে কবি বললেন,—

মানিকের দুঃখ যত আমি তাহা কব কত
মুখ দেখে ছাতি ফেটে যায় ॥

অন্য কাহিনী অংশে রঞ্জনা বিবির পুত্র লাল মানিকের এক জঙ্গলে অসহায় অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং সেখান থেকে দুষ্ট ব্যক্তির কবলে পড়ে শৈশবে দুর্দ্দশা ভোগ করার কথায় কবির ভণিতায় আছে—

থোড়াই বয়সে ভাই রাখিয়াছে আল্লা সাই
পিতা মাতা গেছেন মরিয়া।
পঞ্চম বছর পরে ধরিয়া ওস্তাদ পীরে
শিক্ষা করি এলাহি ভাবিয়া ॥
বহুত কচ্ছোলা করে শিখাইল মোর তরে

কুমার হাটে বসতি তাহায় ।…
একা আছি এ সংসারে মা বাপ গিয়াছে মরে
ভাই বন্ধু আর কেহ নাই ।

বাল্যকালে লাল মানিক পালিতা মাতার নিকট নিষ্ঠুর ব্যবহার পেয়েছিল,—যা কবির হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। অভুক্ত মাতার দুঃখে তাই লাল মানিক আপনার আহারের অংশ এনে দান করতে মাতৃ-হৃদয়ে যে বাৎসল্য-ভাব জাগরিত হয় তার বর্ণনায় কবি লিখেছেন,—

রঞ্জনা বলেন বাবা ভাত কোথা পেলে ।
কি রূপেতে এই ভাত এখানে আনিলে ॥

লাড়কা বলে ওগো বেওয়া কহিগো তোমারে ।
দুই দিন তেরা লাগি আছি অনাহারে ॥

একথা শুনে রঞ্জনা বিবির দুঃখ দ্বিগুণ হল। আহা! তোর মুখের ভাত কি করে খাব! তাতে তো তোরই শরীরের জোর কমে যাবে। লাল মানিক সেই মধুর বচন শুনে সত্যই এবার মাতৃস্নেহের স্পর্শ পেল। সে কেঁদে উঠ্‌ল। কিন্তু বাড়ীতে ফিরে এসে পালিতা মাতার কাছে দারুণ ক্ষুধার কথা বলতে তিনি অল্পই ভাত দিলেন। তাতে উভয়ের মধ্যে দেখা দিল অসন্তোষ এবং শেষ পর্যন্ত—

একথা শুনিয়া বিবি জ্বলিয়া উঠিল ।
সাদওান রাখিয়া তারে চাপড় মারিল ॥
এয়ছা জোরে মারে সেই লাড়কার মুখেতে ।
সামালিতে নাহি পারে গিরে জমিনেতে ॥
কতক্ষণ বাদে লাড়কা হুস কিছু হইল ।

কবি তার ভণিতায় বার বার যেভাবে নিজেকে হীন, অধম, লাচার, গোনাগার প্রভৃতি শব্দ দিয়ে আখ্যাত করেছেন তাতে পীরের প্রতি তাঁর অবিচল ভক্তির সাথে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পরম প্রেয়ের নিকট আত্ম সমর্পণের কথাই প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যেও প্রত্যক্ষভাবে পীরের প্রতি এবং পরোক্ষভাবে আল্লার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁদের মাহাত্ম্য-কথাই বিবৃত হয়েছে।

মানিক পীর ভক্তের ভক্তিতে সহজেই সন্তুষ্ট হন। সাত ঘড়া দুধ দোহন করে দিলেন মানিক অথচ সব দুধ ঘরে রেখে সামান্য একটু এনে দিল কিনুর পত্নী সনকা। পীর তাতেও খুসী হয়ে দোয়া করলেন সনকাকে। আবার প্রয়োজনে পীর ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপও দিতে পশ্চাৎপদ হন না। রঞ্জনা বিবির রূঢ় ব্যবহারে পীর ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

খানাপিনা নাহি দিলে আমার তরেতে।
এলাহি করেন যেন যাইবে বনেতে॥
এই দোয়া করি আমি যদি হই পীর।
ভ্রমণ করিবে তুমি আমার খাতির॥
পশুদের মত তুমি থাকিবে জঙ্গলে।
আহার না পাবে মাতা জঙ্গলে ঢুড়িলে॥ ইত্যাদি।

কাব্য রচনায় কবি আপন দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন। তাই বার বার কবি বলেছেন—

হীন পিজিরদ্দিন বলে সবার জনাবে।
ভুল চুক হইলে ভাই সবে মাফ দিবে॥ (পৃ ২৭)

কবি নিজের লেখায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে—

কফিলদ্দিন নাম ঘর জগদিয়া মোকাম।
বড়ই পিয়ারা সেই বড় গুণধাম॥
সমাপ্ত করিয়া কেচ্ছা দেখাইনু তারে।
বহুত কছেল্লা করে দিল মেরা তরে॥

কফিলদ্দিনের মঙ্গল কামনা করে তিনি গাইলেন—

আমি হীন ভাবিয়া আল্লার দরগায়।
সুখে সালামতে আল্লা রাখেন তাহায়॥ (পৃ ১৯)

আজিমাবাদ ধানশিয়া নিবাসী ফকির মহাম্মদ যে পাঁচালী কাব্যখানি লিখেছেন তার কাহিনী থেকে পিজিরদ্দিন সাহেব লিখিত কাব্যের কাহিনী সম্পূর্ণ পৃথক। সংক্ষিপ্ত কাহিনী এইরূপ ;—

ব্যাধি সৃষ্টি করে আল্লা মুস্কিলে পড়েছেন,—তাদের সামলায় কে। ইলাহি

পাঠালেন জিবরাইলকে—মক্কার সব পীর-পয়গম্বরকে ডেকে আন। তাঁরা এলে ইলাহি বললেন,—

শুন সভে এই মতে ব্যাধিগণে লেহ উঠাইয়া।

তাঁরা নিজেদের অক্ষমতা জানিয়ে মাথা হেঁট করে রইলেন। এলাহি তখন মানিককে তাতে ব্যাধি সমর্পণ করে দুনিয়ার 'পরে পাঠালেন। তাঁর সঙ্গী হরজ আলি। মর্তভূমিতে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁরা মক্কায় যেতে মনস্থ করলেন। মক্কায় পৌঁছুবার আগেই নামাজের বেলা হল। জঙ্গলের পাশে নদীর ধারে একান্তে আশাবাড়ি ও সোনার খড়ম রেখে দুজনে বসলেন নামাজে। সেই সময় দুখিয়া ও তার মা জঙ্গলে গরু চরাতে এল। দূর থেকে মানিক—অলিকে নামাজ করতে দেখে দুখের কৌতূহল বেড়ে গেল। মাকে বলে সে দেখতে চলল নামাজ পড়া। পথিমধ্যে দেখে দুটি সোনার খড়ম। লোভ সে আর সামলাতে পারল না। খড়ম দুটি চুরি করে নিয়ে এল মায়ের কাছে। মা তাকে ভর্ৎসনা করলেন।

দুখে গেল খড়ম বেচতে রাজার বাজারে। বেনে তো ফকিরের খড়ম দেখে ভয়ে অস্থির। অমনিই কিছু টাকা দিয়ে সে তো দুখেকে বিদায় করল। সেই টাকায় দুখে হাট-বাজার করে এল। মাতা-পুত্র ভোজন সমাধা করে পালঙ্কে শুয়ে বিশ্রাম করছে—এমন সময় মানিক পীর এলেন খড়মের সন্ধান সূত্র ধরে। ফকিরের জিগীর শুনে দুখের মা এল ঘরের বাইরে। খড়মের কথা দুখের মা স্বীকার করল না। মানিক ধমক দিলেনঃ আমার সঙ্গে কপটতা করা! এল দুখে। সেও প্রথমে স্বীকার করতে চায় না। অবশেষে সে মনের কথা বলল যে তারা কাঙাল দেখে কেউ তার সঙ্গে বেটির বিয়ে দেয় না। তার সাধ—সোনার খড়ম বেচে সে বিয়ে করবে। মানিক পীর বললেন—বীরসিংহ রাজার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দেব, আমার খড়ম এনে দে। দুখে বললেঃ বাগদীর ছেলে আমি, আমি বাগদীর মেয়েকেই বিয়ে করব। মানিক বললেনঃ যা খুসী কর—আমার খড়ম এনে দে। দুখে আবার খড়ম চুরির কথা অস্বীকার করল—

পরিহাস করেছিনু শুন শাহাজী।

মানিক এবার বেনের কাছে টাকা নেবার কথা ফাঁস করলেন। দুখে

তখন জড়িয়ে ধরল মানিক পীরের পা। বললে, তুমি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও।

তিন সত্য করে পীর ব্রাহ্মণের বেশে প্রথমে গেলেন রাজসভায়। সেখানে তিনি রাজার বারো বছরের কন্যার সাথে বিয়ের সম্বন্ধ করলেন। পাত্রের বিবরণ শুনে রাজা কন্যা-সম্প্রদানে ব্যগ্র হলেন। মানিক পীর ফিরে এসে সে শুভ সংবাদ জানালেন দুখেকে। এত দ্রুত সম্বন্ধ করে আসতে দুখে ফকিরকে বিশ্বাস করল না। সে বলল—

কেমন রাজার কন্যা দেখাবে আমারে।

মানিক বললেন,—বেহা না হইলে আগে কন্যা দেখায় কে। দুখে বললে —বাগদীর বিয়ের নিয়ম মান্‌তে পাড়া-পড়শীকে হলদি-তেল মাখতে এবং ক্ষীর পিঠা খেতে দিতে হবে। অতএব দায়ে পড়ে ফকির তখন আসমানের চার শৈলি ডাকিয়ে তাদের দিয়ে সব যোগাড় করালেন। দুখের আরো বায়না ঃ—

পছন্দ মতন দাঁত-রাঙা করার পাতা চাই, বাজনা-বাদ্যির ব্যবস্থা করা চাই, আতস বাজি চাই। আরো বায়না—"আঁধারে কেমনে যাব রাজার দরবারে।" অগত্যা মানিক পীর বনের বাঘদের দ্বারা মশাল বহন করিয়ে বরসহ রওনা হলেন।

বরকে কিছু দূরে রেখে বামুনের বেশে মানিক গেলেন রাজবাড়ীতে। একদল বাঘ আসতে দেখে রাজার প্রাণ গেল উড়ে। রাজা বললেন—

জামাই আর তুমি আসিবে লোকে কাজ কি।

মানিকও তাই চান। বাঘদের বাদ দিয়ে তিনি দুখেকে নিয়ে বিবাহ-সভায় এলেন। সোনার বিছানা দেখে দুখে তো ভয়ে মাটিতে বসল। রাগে মানিক তার গালে মারলেন দুই চড়। দুখে উঠে বসল বিছানায়। পীরের অলৌকিক শক্তিতে তা আর কেউ দেখতে পেল না। পঞ্চ উপকরণে কাঞ্চনের থালায় জামাই বসল খেতে। ঝালের ব্যঞ্জন সে খেতে পারল না। মানিক দেখলেন —বিপদ। সে মন্ত্রই বা পড়বে কি করে। রাজা তাঁর লোকদের বললেন,—জামাইকে আন, কন্যার হাতের সঙ্গে তার হাত বাঁধ। মানিক বললে,—না না, ও সব আমাদের নিয়ম নয়। রাজা

দুঃখিত মনে সে ব্যবস্থা মেনে নিলেন। দুখে বাসর ঘরে কন্যার রূপ দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেল ;—

ইন্দ্রের কামিনী জিনি দেখি তনুবেশ
মুঠিতে কাঁকালি লুকায় পিঠে ভাঙ্গে কেশ।
বিনোদ-বন্ধান হার গাঁথ্যা দিছে গলে
মাথার মানিক কন্যার ধিকি ধিকি জ্বলে।

দুখের মনে হল যেন সাক্ষাত মা মঙ্গলচণ্ডী! সে বারবার গড করে আর বলে—

মাহামাই চণ্ডী ঠাকুরাণী তোমাকে বুঝাই
আজি যদি বাঁচি মাগো কালি ঘরে যাই।

শুনে রাজকন্যা হাসি চাপতে পারে না। কন্যার হাসি শুনে দুখে ভয়ে ঘরের চাল থেকে ঘোডার ঘাস নিয়ে ঘরের এক কোনে বিছিয়ে তাতে শুয়ে রাত কাটালো। সকালে রাজকন্যা কেঁদে সমস্ত মায়ের কাছে জানালে রাণী অভিযোগ আনলেন রাজার নিকট। রাজা হুকুম দিলেন—

ঘটক বামুন কোথা বেঁধে আন গিয়া।

বামুন এসে বললেন—"ঝালে নুনে তোমরা করছে যবক্ষার!" আর কান্নার কথা? বনে বনে বিয়ে হল,—মা-বাপ, আত্মীয়-কুটুম্ব কেউ খবর পেল না—এ কারণে কেঁদে ছিল। গড করার কথায় দুখের জবানে ভর করে মানিক বললেন,—

শোবার তরে এমন জায়গা দিয়াছিল মোকে
বেটার হইয়া গড় করয়াছিলাম তাকে।

তারপর সে নিজের ঐশ্বর্য্যের গল্প করল। রাজা তা দেখতে চাইলেন। জামাই জানালো—পাঁচ দিন পরে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে। পীরকে তখন দুখে বললে,—আমার তো তালপাতার ঘর, কি হবে উপায়। মানিক বললেন—আমি এগিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা করি। দুখে বলল,—আমাকে ফেলে পালাবার মতলব। মানিক আল্লার দোহাই দিয়ে চলে গেলেন এবং গিয়ে সব ব্যবস্থা করলেন। 'হয়জ আলি বললেন,—সবই তো হল, কিন্তু রাজার দলবলের পরিচর্য্যা করবে কে? মানিক বললেন,—

উনকোটি ব্যাধি আমার মাঙ্গাইয়া আন।

ব্যাধিগণ এল পরিচর্য্যা করতে। দুখের কুঁড়ে ঘরের চারদিকে সোনার শহর গড়ে উঠল। 'সেই তালপাতার ঘরে পীর সিদ্দি ঘুটে খায়।'

পাঁচদিন পর। রাজা চললেন জামাই-এর সাথে ঘর দেখতে। দুখে ঘোড়ার পিঠে উল্টো করে বসেছে। সেই ভাবে বসতে দেখে সবে তো হেসে খুন। অন্তর্য্যামী পীরের শক্তিতে ঘোড়ার লেজের দিকে হল তার মুখ।

সৈন্য সামন্ত নিয়ে বাদ্যভাণ্ড করে রাজা এলেন জামাই-এর বাড়ীতে। হরজ আলি এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা করতে। আদর-আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হয়ে রাজা চাইলেন বেহাইকে গড় করতে। দুখে আপত্তি করল। রাজা নিষেধ শুনলেন না। রাজার আসবার আগেই তালপাতার ঘর সোনার মন্দিরে পরিণত হল। মন্দিরে ঢুকে তফাৎ থেকে পীরকে রাজা কুর্নিশ করলেন। পীর আশীর্বাদ করলেন সেই রাজাকে। তারপর বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢোকার অপরাধে পীর তাঁকে দু'চার ঘুষি মেরে সঠিক পরিচয় নিলেন। পরিচয় পেয়ে পীর খুশি হয়ে সকলকে ভোজনে বসালেন। মানিকের হুকুমে হরজ আলি, রাজা ও তার দলবলকে উপযুক্ত ইনাম দিলেন। রাজাও জামাইকে অর্দ্ধেক পরগনা লিখে দিলেন।

সকলে চলে গেলে মানিক বললেন দুখেকে,—

এখন সোনার খড়ম দুটি এনে দেহ মোরে
তোকে দুয়া করয় যাই হজ মক্কা শহরে।

দুখে বললে,—তা হবে না। আগে সাড়ে তিন গণ্ডা বেটা হোক—পরে খড়ম দেবো।

মানিক হেসে বললে,—

বাইশ লক্ষ পরগনার হইল রাজতি
তবু নাঞি ছাড় বেটা রাখালিয়া মতি।

পীর মক্কায় চলে গেলেন। পীরের নামে দুখে ভালো রকম শিরনি দিলে,—

মানিকের গীত যে রহিল এই খানে।··

পিজিরদ্দিন সাহেব বিরচিত কাব্য থেকে ফকির মহাম্মদ বিরচিত কাব্য অন্ততঃ কাহিনী অংশে অত্যন্ত হাল্কা ধরণের। মানিক সম্বন্ধে সাধারণের প্রচলিত ধারণায় ফকির মহাম্মদের কাব্য-কাহিনী পীর-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনুচ্চ ভাব সৃষ্টি করে। বিপদে-আপদে অথবা শোকে-দুঃখে এ দেশে পীরগণের জীবনপণ করে যে দরদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখার ইতিহাস আছে তার সঙ্গে এ কাহিনীর সঙ্গতি নেই। আল্লা উনকোটি ব্যাধি সঁপে দিলেন মানিককে —ভাল কথা। কিন্তু তিনি যে আধি-ব্যাধি থেকে মানুষ বিশেষতঃ পশু-সম্পদকে রক্ষা করেন এ কাহিনীতে তার কোন আভাসই নেই। আপনার খড়ম ফিরে পাওয়াটাই যেন তার সর্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

মানিক পীরকে ধ্বংস করতে পারে এমন কেউ নেই। বদর শাহ তাঁকে সিন্ধুকে ভরে জ্বালিয়ে দিয়েও ধ্বংস করতে পারলেন না, অথচ দুখের বায়না অনুযায়ী তার বিয়ে দেবার এবং সন্তান দেবার প্রতিশ্রুতি পালন করে তবে চুরি যাওয়া আপনার সোনার খড়ম জোডা পেতে হয়েছে। কবির এ কাহিনী হাস্যরসাত্মক। রাজকন্যার সঙ্গে রাখাল যুবকের বিবাহ, উভয়ের আচরণের মধ্যে বৈষম্য পাঠকের যথেষ্ঠ হাস্যোদ্রেক করে। বরকে বিছানা ছেড়ে মাটিতে বসা, বৌকে মঙ্গলচণ্ডী মনে করে গড করা, বাসর ঘরে চালের খড টেনে এনে মাটিতে বিছিয়ে সেখানে শুয়ে রাত কাটানো, রাজকন্যার হাসি শুনে ভয় পাওয়া ইত্যাদি ঘটনা হাস্যরস সৃষ্টির উৎস। এতে পীরের প্রতি ভক্তি জাগাতে সাহায্য করে না। অথচ পিজিরদ্দিনের কাব্যের কাহিনীতে কিনু-কানু ঘোষ সম্পর্কিত ঘটনায়, রঞ্জনা বিবির করুণ জীবন সম্পর্কিত ঘটনায় পীরের ভূমিকা সাধারণের মনে আপনিই ভক্তিভাব জাগরিত করে।

তবে ফকির মহাম্মদের কাব্যে ভাষার কিছু উৎকর্ষ লক্ষ্যণীয়। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রাজা যখন জামাই-এর বাডী এলেন তখনকার একটি মনোরম বর্ণনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ,—

> ক্ষেত্রি কুলেতে কেবল জনম তাহার
> নবীন বয়সে যেন ষোড়শ্যা কুণ্ডার।
> ললাটে চন্দন চাঁদ পরম উজ্জ্বল
> গগন মণ্ডলে যেন শশী টলমল।

খাঁড়া-ধার বাঁশি তার নাসিকার গঠনে
বিজলী ছটকে যেন মুখের দশনে।
কর্ণমূলে বীরবৌলি তাকে ভাল সাজে
রতন-নপুর দুটি চরণেতে বাজে।

এ কাহিনীতে আল্লা মহিমার কথা নেই বললেই চলে ;—আছে শুধু মানিকের মাহাত্ম্য কথা। আল্লা ব্যাধি সৃষ্টি করে মুস্কিলে পড়বেন—এই সব ধারণা ইসলামি আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। মুস্কিলে পড়ার মতন বক্তব্য অন্য কোন পীর-কাব্যে লক্ষ্য করা যায় না। মানিকের মাহাত্ম্যে দয়া, প্রেম, মহানুভবতা, ত্যাগ, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণাবলী অনুপস্থিত। জনৈক রাখাল-বালকের বিবাহরূপ খেয়াল চরিতার্থ করতে মানিক পীর তার বুজরগী বা অলৌকিক শক্তির ব্যবহার করেছেন। এভাবে রাখাল-বালককে রাজার মতন ধনৈশ্বর্য্যশালী করার মধ্যে মানিক পীরের যতখানি যাদুকরের ভূমিকায় প্রতিভাত হতে দেখা যায়, অবহেলিত, বা নিপীড়িত বা দুর্দশাগ্রস্ত কোন ব্যক্তির মুক্তিদাতার ভূমিকায় দেখা যায় না। এ কাহিনী তাই কাহিনী হিসাবে শ্রুতি-মধুর হলেও তা অর্বাচীনের নিকট পরিবেশন-যোগ্য বলে মনে হয়। এ কাহিনীতে সমাজ-হিতৈষণার মূল্য অনুপস্থিত। পাঁচালী কাব্য হিসাবে এর ভাষার চাতুর্য্য অবশ্য প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু ভাবের গাম্ভীর্য্য নেই বলে এর সাহিত্যিক-মূল্যও যে একেবারেই নেই তা বলা যায় না। খড়ম উদ্ধার অভিযান, রাখাল-বালকের নিকট রাজার কন্যার বিবাহ, বিবাহ-রাত্রির বিবরণ ইত্যাদি সাধারণ মানুষের কাছে হাস্য-রস সঞ্চারে সাহায্য করেছে। সেই দিক দিয়ে এই কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য্য।

অনেক অঞ্চলে এক কালে মানিক-যাত্রার বহুল প্রচার ছিল। তাতে মানিক পীরের মাহাত্ম্য-কথাই প্রচারিত হত। আজ আর তার বহুল প্রচার দেখা যায় না। বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট থেকে যে কাহিনী পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত রূপ ঃ—

দানশীল বাদশাহ জায়গুণ। তাঁর দুই বেগম। দুই বেগমই নিঃসন্তানা। সন্তানহীন পরিবারে রয়েছে দুঃখের ছায়া। দুঃখে বাদশাহ খয়রাত দেওয়া বন্ধ করলেন।

মানিক ও মাদার দুই ভাই। মানব কল্যাণে তাঁরা আপনাদের জাহির

করতে বাহির হয়েছেন ; এ হল আল্লার নির্দেশ। ফকিরবেশে এলেন দুই পীর, বাদ্‌শাহ জায়গুণের প্রাসাদে। বাদ্‌শাহের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতকার হল। বাদ্‌শাহকে সান্ত্বনা দিয়ে মাদার-পীর দিলেন এক মন্ত্রপূতঃ ফল। সেই ফল আহার করলে বেগমের সন্তান হবে। সন্তান-গর্বে গরবিণী হওয়ার মোহে বড় বেগম সেই ফল পাথরের শিলায় ছেঁচে একাই ভক্ষণ করলেন,—ছোট বেগমকে প্রতারিত করতে চাইলেন। সন্তান-বাসনায় আকুল ছোট বেগম শেষ পর্য্যন্ত 'শিল-ধোয়া জলটুকুই' পান করলেন।

উভয় বেগমই হলেন গর্ভবতী। ছোট বেগম তো ফল খায় নি, তবে তার গর্ভবতী হওয়ার রহস্য কোথায়! বড় বেগমের নিরন্তর কুপরামর্শে বাদ্‌শাহ শেষ পর্য্যন্ত ছোট বেগমকে বনবাস দিলেন। ছোট বেগম বহু চেষ্টা করেও প্রাসাদে থাকতে পারলেন না।

প্রাসাদে বড় বেগমের দুই পুত্র হল। তাদের নাম যথাক্রমে ইঞ্জিল ও তৌরদ।

বনে ছোট বেগমের হল এক পুত্র। তার নাম তাজল। ফকির বেশধারী মানিক পীর ও মাদার পীর তাদের দেখা শোনা করেন। কালক্রমে তাজল যুদ্ধ বিদ্যায়ও হয়ে উঠল পারদর্শী।

বাদ্‌শাহ জায়গুণ ততদিনে ভুলে গেছেন ছোট বেগমকে। বড় বেগমকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। সে সুখ তাঁর বেশী দিন রইল না।

বাদ্‌শাহ একদিন বনে এসেছেন শিকার করতে। সে বনে তাঁর শিকার-কাজে কেউ বাধা দিতে পারে এমন তিনি কল্পনা করেন নি। বেপরোয়া হয়ে তিনি সংগ্রামে রত হলেন, তৌরদ এবং ইঞ্জিলও হল তাঁর যুদ্ধ সহযোগী। পীরের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পীরের দয়ায় বলীয়ান তাজল যুদ্ধে জয়ী হল। শোচনীয় পরাজয়ের মুখে সেখানে আবির্ভাব হল মানিক পীরের। মানিক পীর অতীত ঘটনার পরিচয় দিলে পিতা-পুত্রের মধ্যে এক করুণাঘন পরিবেশের সৃষ্টি হল। বাদ্‌শাহ এবার পীরের মহত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর অশেষ করুণার কথা ব্যক্ত করতে করতে অভিভূত হলেন।

মুনশী মোহম্মদ পিজিরদ্দিনের কাব্য-রচনার কাল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ।[২৩] ফকির মহম্মদের কাব্যের রচনাকাল আনুমানিক

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেগভাগ [8১] ফকির মুহম্মদ (ফকিরউদ্দিন)-এর মানিক পীর কাবের রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ।[২৩] তাছাড়া আরো কয়েকখানি মানিক-পীর-মাহাত্ম্য প্রচারক পাঁচালী কাব্যের বিবরণ জানা যায়।

জয়রদ্দীন সাহেব রচনা করেছিলেন মানিক পীরের জহুরানামা উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে।[২৩] নসর শহীদ লিখেছিলেন মানিক পীরের গান উনবিংশ-শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে।[২৩] জয়রদ্দীনের কাব্যে, কৃষ্ণহরি দাসের বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথির কাহিনীর প্রারম্ভের ন্যায় মানিক পীরকে দুধ বিবির কানীন পুত্ররূপে দৃষ্ট হয়। তবে তাতে বদর পীরের কথাই বিশেষভাবে রয়েছে। হেয়াত মামুদের আম্বিয়াবাণীর (১৭৫৭) বন্দনা অংশে দুইভাই মানিকপীর ও শাহাপীরের কেরামতির ইঙ্গিত আছে। [8১] জইদি বা জয়রদ্দীনের কাব্যের লিপিকাল ১২২৪ সাল [8১] হলে এর রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই হবে।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,—"অল্পকাল আগেও রামায়ণ-গানের মতন মানিক পীরের গান পথে ঘাটে এবং তাঁর পাঁচালী, পীরের আস্তানায় শোনা যাইত। এই গানের গায়ক ও বাদক প্রায়ই মুসলমান। গায়ক চামর ধরে। বাদকেরা খোল ও মন্দিরা বাজায়।"

মানিক পীরের গান গ্রামাঞ্চলে আজো গীত হয়। বর্তমান বর্ষে (১৯৭৪) অন্যান্য পীরের মতন বারাসতের অন্তর্গত কাজীপাড়ার হজরত একদিল শাহের দরগাহে মানিক পীরের গান গাওয়া হয়েছে। এই গায়ক দলে শুধু মুসলিম নন,—হিন্দুও আছেন। মূল গায়েন মুসলিম কিন্তু দোহার ও বাদ্যকরগণের মধ্যে রামেশ্বর দাস (৪৫) নামক একজনকেও প্রত্যক্ষ করা গেল।

রোগ নিরাময় বিশেষতঃ পশুর রোগমুক্তির ক্ষেত্রে মানিক পীরের অলৌকিকতা পরিচায়ক কিছু কিছু লোককথা প্রচলিত আছে। তাছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক প্রবাদ শোনা যায়। চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত স্বরূপনগর থানাধীন গোকুলপুর নামক গ্রামের

(আমার জন্মভূমি) মানিক পীরের থান সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রবাদটি আজীবন শুনে এসেছি :—

বাংলা ১৩০৭ সালে এক বিধ্বংসী ঝড় হয়। তাতে মানিক পীরের থানের উপরকার বিশাল অশ্বত্থ গাছটির গোড়া উপড়ে যায়। এ ঘটনা ঘটে রাত্রে। পরের দিনে রাত্রিকালে সকলে অবাক হয়ে দেখে যে সে গাছ আবার স্বাভাবিকভাবে সোজা হয়ে উঠেছে। রাত্রি প্রভাতে এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে গ্রামবাসী বিস্মিত হয়ে যান। ভক্তগণের প্রচেষ্টায় অনতিবিলম্বে অশ্বত্থ গাছটির গোড়া ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। গাছটি আজো পরিদৃশ্যমান।

———

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সত্যপীর

কিংবদন্তী অনুসারে বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কোন এক কন্যার গর্ভে সত্যপীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। [দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত লালা জয়নারায়ণ সেনের "হরিলীলা" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯২৮)। রচনাকাল ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ]।[৫৫]

কারো মতে বাগদাদের বিখ্যাত সুফী-সাধক মনসুর আল্ হাল্লাজ যিনি নির্দ্বিধায় "আমিই সত্য" ঘোষণা করে কিছু মুসলিমের হাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তিনিই নাকি মূল সত্যপীর। [মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত কবি বল্লভের সত্য নারায়ণের পুথির ভূমিকা—(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩২২), সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত]।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন,—বহুদিন একত্র বাস নিবন্ধন-হেতু হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে কতকটা উদারভাব অবলম্বন করেছিলেন। সত্যপীর নামক মিশ্র দেবতার আবির্ভাব সেই উদারতার ফল। হরিঠাকুর এই উপলক্ষে ফকিরি আলখাল্লা গায়ে পরেছেন ও উর্দ্দু জবানে বক্তৃতা দিতেছেন,—

> বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝায়ে বলে বাছা।
> দুনিয়ামে এসাভি আদমি রহে সাঁচা॥
> জাওত সত্যপীর মেরা জাওত সত্যপীর।
> তেরা দুঃখ দূর করতত্তা হাম ফকির॥ [২১]

সত্যপীর কোন মুসলমান পীর ছিলেন, পরে সমাজের স্বীকৃতির পর তিনি নারায়ণের সঙ্গে একাকার হয়ে সত্য নারায়ণ রূপে পরিচিত হন। [৭১]

হিন্দু ও মুসলিমের সমন্বয়ের সূত্রপাত কবে আরম্ভ হয়েছিল তা যেমন নির্দ্দিষ্ট করে বলা যায় না, সত্যপীরের উদ্ভব ও পূজা প্রচলনের সূত্রপাত কবে

হয়েছিল তাও নির্দ্দিষ্ট করে বলা যায় না। কেহ বলেন,—পাণ্ডুয়াবাসী বৃদ্ধ গোপ কালু ঘোষ বোধ হয় গৌড়-বঙ্গের সর্বপ্রথম মুসলমান। (পাণ্ডুয়ায় কালু পীরের সমাধি আছে)।[১৪] কেহ বলেন,—সত্যনারায়ণের কথায় যে আলা বাদশাহের কথা আছে, তাকে আমরা আলাউদ্দীন হোসেন শাহা বলে মনে করি। হোসেন শাহ, হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে দেখতেন। তাঁর উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁরই যত্নে সত্যনারায়ণের পূজা প্রবর্ত্তিত হয়।[৭৮]

অবশ্য মৈমনসিংহ গীতিকায় দেখা যায় কবি রামেশ্বর তাঁর বই-এর সূচনাতেই সত্যপীরের পূজার প্রচলন কি ভাবে হল সে সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন,[৪৫]—

কলিতে যবন দুষ্ট হৈন্দবী করিল নষ্ট
দেখি রহিম বেশ হৈলা রাম।

চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতেই অনুরূপ মনোভাব পাওয়া যায় রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরানে,[৪১]—

ব্রহ্মা হৈল মহাম্মদ বিষ্ণু হৈল পেগাম্বর
আদম হৈল শূলপানি
গণেশ হইল কাজী কার্ত্তিক হইল গাজী
ফকির হইল যত মুনি।
তেজিয়া আপন ভেক নীরদ হইল শেক
পুরন্দর হৈল মৌলানা
চন্দ্র-সূর্য আদি দেবে পদাতিক হইয়া সেবে
সবে মেলি বাজায় বাজনা।

সত্যপীর পূজা কবে এবং কার দ্বারা প্রথম আরম্ভ হয়েছিল সে সম্পর্কেও নানা মত আছে। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ কোন সময় সত্যপীরের শিরনি দিয়েছিলেন—সেই কাহিনীই পরবর্তী সাহিত্যে পল্লবিত ও নানা অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িত আকারে স্থান পেয়েছে। (বাংলার নাথ সাহিত্য : বিশ্বভারতী প্রকাশিত সাহিত্য প্রকাশিকা প্রথম খণ্ড)।[৭৭]

সুতরাং আলাউদ্দীন হোসেন শাহ যে সত্যপীর পূজার প্রচলন করেছিলেন এরূপ ধারণার কোন হেতু নেই।[৭৭]

রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন যে, রাজা গণেশ বাংলাদেশে সত্যপীরের শিরনি প্রথা প্রবর্তন করেন।—বলা বাহুল্য, এ উক্তির পিছনেও কোন প্রমাণ নেই। [৭৭]

মূলতঃ 'সত্য' শব্দ এখানে আরবী 'হক'-এর প্রতিশব্দ। সুফী গুরুরা ঈশ্বরকে এই নামে নির্দ্দেশ করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক হতে পীর ও নারায়ণের একাত্ম মূর্তি⋯ : পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে নতুন দেবতা সত্যনারায়ণ অথবা সত্যপীররূপে আবির্ভূত হন। [৪১]

কৃষ্ণহরি দাসের গ্রন্থে (বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি) সত্যপীর ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে উপস্থাপিত। মালঞ্চার রাজা বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ ময়দানবের অবিবাহিতা কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে সত্যপীরের জন্ম। শঙ্কর আচার্য্যের পাঁচালীতে সত্যপীরের ইতিহাস অনেকটা এই রকম—সেখানে তিনি আলা বাদশাহের কানীন দৌহিত্র। [২]

কৃষ্ণহরি দাসের কাব্যে একস্থানে সত্যপীর আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে যে কথা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলছেন—

হিন্দুর দেবতা আমি মুসলমানের পীর।
যে যাহা কামনা করে তাহারে হাসিল ॥

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সত্যপীরের কথা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৩৬ পৃষ্ঠা ১৯) সম্পাদনা করে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মন্তব্য করেছেন ;—ব্রাহ্মণ সন্তান রামেশ্বর, মুসলমান ফকিরের আকৃতিতে বিষ্ণুমূর্তি দেখতে পেলেন। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর উদার ধর্ম-মতের প্রতিফলন। এই উদার ধর্ম-মত আপনা আপনি আসে নি। তুর্ক আক্রমণে যখন উচ্চবর্গ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে এসে গেল নিম্নবর্গের কাছাকাছি, তখন উপর তলার হিন্দুদের মধ্যে ক্রমে নিচের তলার মানুষদের দেবতা এবং তাদের মাহাত্ম্যকেও স্বীকার করে নেবার প্রয়োজন হল। [৪৩]

তুর্কগণ শাসন ক্ষমতায় আসার জন্য হাওয়ার পরিবর্তন হল ;—দেখা গেল আপোষের প্রশ্ন। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, সপ্তদশ শতাব্দের কোন কোন ধর্মমঙ্গল কবি ধর্মঠাকুরকে পীরের বেশে দেখেছিলেন। রূপরাম

চক্রবর্তী নিজেকে পুনঃপুন রূপরাম ফকির বলেছেন। ফকির-বেশী ধর্ম-ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দের শেষভাগ হতে ধীরে ধীরে সত্যপীরে বা সত্যনারায়ণে মিশে গেছেন।[৪১]

এখানে স্মরণীয় যে, আজিকার বাঙালী কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব হতে বংশ পরম্পরায় বয়ে আসা নানা রক্ত, নানা মত, নানা সংস্কৃতি, নানা প্রাকৃতিক প্রভাব, নানা ভাষা প্রভৃতির উত্তরাধিকার। নানা সম্প্রদায়, নানা ধর্মমত, নানা বর্ণ, নানা আদর্শ, নানা সংস্কৃতি নিয়ে একমাত্র বাংলা ভাষার মৌচাকে আবদ্ধ আমরা একটি মাত্র উজ্জ্বল বিশেষ্যে বিভূষিত; সে বিশেষ্য হল বাঙালী।[৩৮] কিন্তু প্রাক্ চৈতন্য যুগের ও চৈতন্য যুগের বাংলা সাহিত্যের মূল প্রেরণা ছিল হিন্দু সমাজের ও হিন্দু সংস্কৃতির আত্মরক্ষার প্রেরণা, প্রতিরোধের সাহিত্য। তার একটা দিক প্রগতির দিক—যেখানে সে লোক-জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত; কিন্তু আর একটা দিক প্রতিক্রিয়ার—যেখানে সে রক্ষণশীল, বিশেষ করে মুসলমান জীবন ও বিষয়ের প্রতি উদাসীন।[৪৩]

কালক্রমে এমন অবস্থাও এল যখন হিন্দুরা ষোড়শ শতাব্দীতে "আল্লোপনিষৎ" রচনা করতেও কুণ্ঠিত হন নি। সম্রাট আকবরকে তো তাঁরা অবতারের আসনে তুলে দিয়েছিলেন।[৩৭]

যাহোক সত্যপীরের রূপবর্ণনায় মুনশী ওয়াজেদ আলী সাহেবের কাব্যে সেই মিশ্ররূপ পাওয়া যায়,—

হেন কালে সত্যপীর সুন্দরে লইয়া,
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি পৌঁছিল আসিয়া।
সর্বাঙ্গে তিলক তার কপালে জোড় ফোটা।
হাতেতে জপনমালা মাথা ভরা জটা। (পৃঃ ১২)

কবি কৃষ্ণহরি দাস তাঁর 'বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথিতে সত্যপীরের বর্ণনায় লিখেছেন,—

অকুমারী সন্ধ্যাবতী তার গর্ভে উৎপত্তি
মালঞ্চা করিল ছারখার।
হাতে আশা মাথে জটা কপালে বৃহতি ফোঁটা

বাম করে শোভে অতি বাহার ॥
সুবর্ণের পৈতা কান্দে কোমরে জিঞ্জির বান্ধে
অঙ্গে শোভে গেরুয়া বসন।
বেড়ায় সন্ন্যাসী বেশে ফিরে অন্য দেশে দেশে
নানা মূর্তি করিয়া ধারণ ॥

এই কাব্যে সূচীপত্রাদির শেষাংশে সত্য পীরের যে চিত্র প্রদত্ত হয়েছে (জল রঙ্) তাতে দেখা যায় তাঁর মাথায় জটা, মুখে শ্মশ্রু-গুম্ফ, গলায় মালা, বাহুতে মাদুলি-সদৃশ বাজু, দুই হাতে বালা, বাম হাতে কৌটা-সদৃশ কমণ্ডলু, ডান হাতে বাঁকা লাঠি বা আশা বাড়ী। গায়ে হতকাটা ফকিরি জামা,—পরণে হাঁটু পর্য্যন্ত তোলা কাপড়—আঁটো করে পরা, ডান কাঁধে ঝোলা ও পায়ে খড়ম। তাঁর পরিপুষ্ট দোহারা চেহারা। তাঁর কল্পিত রঙ্ শ্যামবর্ণ।

বস্তুতঃ সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের কোন মূর্তি স্থাপনা করে পূজা করা হয় না। এমন কি সত্যপীরের নামে নির্দ্দিষ্ট কোন 'থান' বা দরগাহ একান্তই বিরল। গ্রামের হিন্দু গৃহস্থগণ সাধারণতঃ বাটীর উঠানে লেপন করা জায়গায় 'থান' নির্দ্দিষ্ট করেন এবং সেখানেই পূজা প্রদান করেন। শহরের গৃহস্থগণ ঘরের মধ্যেই 'থান' নির্দ্দিষ্ট করে পূজা দেন। পূজারী সত্যপীরের নামে দুধ, আটা, মিষ্ট (সাধারণতঃ আখের গুড়) এবং পাকা কলা একত্রে সংমিশ্রণ করে পীরের নামে অর্পণ করেন। পূজা-অন্তে সেই শিরনি ইতর-অনিতর ভক্তজন কর্তৃক গৃহীত হয়। ভক্তবৃন্দের অনেকে ফল, মূল, সন্দেশাদিও প্রদান করেন। সত্যপীরের পাঁচালী পাঠ একটি অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান। ধূপ-ধূণার দ্বারা স্থানটিকে আরো শুচি-স্নিগ্ধ করতে ভক্তগণ ত্রুটি করেন না। সত্যপীরের নামে স্থায়ী 'থান' দেখা না গেলেও অন্ততঃ দু'একটি স্থায়ী দরগাহ এপর্য্যন্ত পাওয়া গেছে। চব্বিশ পরগনার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত বারাসত মহকুমাধীন কালসরা নামক গ্রামে সেইরূপ একটি দরগাহ অবস্থিত। (বেঙ্গল সেটেলমেণ্ট রেকর্ড ১৯২৮-'৩১ দ্রষ্টব্য)।[৪০] উক্ত সত্য-পীরের দরগাহটি আনুমানিক তিন বিঘা জমির উপর অবস্থিত। সেই দরগাহের সেবায়েতগণ যথাক্রমে বাসারৎ শাহজী, এসারৎ শাহজী, বসিরুদ্দিন শাহজী, দাউদ আলী শাহজী, তছিবদ্দীন শাহজী প্রমুখ (১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ)।

বাসারৎ শাহজী বলেন যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের তরফ থেকে সত্যপীরের নামে এখানে প্রায় পনেরো ষোল বিঘা জমি পীরোত্তর প্রদত্ত হয়েছিল। বজবজ থানার অন্তর্গত বাওয়ালী গ্রামেও সত্যপীরের স্থান আছে। এতদ দৃষ্টে মনে হয় ঐতিহাসিক পীরের ন্যায় সত্যপীরের নামে আরো দরগাহ স্থান কোন কোন অঞ্চলে থাকা অসম্ভব নয়।

সত্যপীরের দরগাহে রোগমুক্তি কামনায় এবং সাধারণ মঙ্গলের আশায় হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ শিরনি ও মানত দেন। কালসরা গ্রামের সত্যপীরের দরগাহে ভক্তগণ প্রত্যহ ধূপ-বাতি দেন। এখানে ফুল, ফল, বাতাসাও প্রদত্ত হয় এবং লুট দিবার রীতিও প্রচলিত। প্রতি বছর ১৬ই ফাল্গুন তারিখে এখানে এক বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে উৎসব অনুষ্ঠান উদযাপনান্তে সেবায়েতগণ সামর্থানুযায়ী অতিথি সৎকার করে থাকেন। বাৎসরিক বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনে এখানে মেলা বসে। তাতে প্রায় দুই তিন শত লোকের জমায়েত হয়। পূর্বে এই সময়ে এখানে কাওয়ালি গান গাওয়া হত।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যপীর ব সত্যনারায়ণকে নিয়ে রচিত এ পর্য্যন্ত প্রায় শতাধিক পাঁচালী কাব্যের কথা জানা গেছে! এই কাব্যকথা মেয়েদের ব্রতকথাতেও সভক্তিতে স্থান পেয়েছে। মনে হয় আরো বহু কাব্য আজো পর্য্যন্ত আছে অনাবিষ্কৃত। সে কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেলে শুধু সত্যপীর কাব্যের আলোচনাই একটা বিরাট অংশ অধিকার করে নেবে। মনে হয় কেবল মাত্র সত্যপীর কাব্যগুলি একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণার অপেক্ষা রাখে। বলা বাহুল্য সত্যপীরের মাহাত্ম্য কথা প্রতি কাব্যে একই কাহিনী-ভিত্তিক নয়।

সমগ্র পীর মাহাত্ম্য-সাহিত্যে সত্যপীরের পাঁচালীই সংখ্যায়, কাহিনী বৈচিত্র্যে ও কাব্যগুণে প্রধান। সত্যপীর হিন্দু-মুসলিম নর-নারীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আজ হিন্দুরাই প্রধান ভক্ত।

সত্যপীর পাঁচালীর সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কাহিনী পশ্চিমবঙ্গ উদ্ভূত হয়ে অন্যত্র বিস্তৃত হয়েছে। এমন কি অর্বাচীন সংস্কৃত পুরানেও প্রবিষ্ট হয়েছে। স্কন্দপুরানের রেবাখণ্ডে যে কাহিনী আছে তাতে ফকিরের স্থান নিয়েছে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।[৪৬]

সমগ্র সত্যপীর পাঁচালী কাব্যের বিবরণ প্রদান করতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অসম্ভব বৃদ্ধির সম্ভাবনা। তাই মাত্র কয়েক খানি কব্যের সীমাবদ্ধ আলোচনা করা হল।

১। সত্যপীরের পাঁচালী

সত্যপীরের পাঁচালীর জনৈক রচয়িতা ফৈজুল্লা। তাঁর কাব্যের কাহিনী রামেশ্বর ভট্টার্য্যের প্রসিদ্ধ রচনার সঙ্গে অভিন্ন। কবি ছিলেন দক্ষিণ রাঢ়ের লোক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্মে ও সংস্কৃতিতে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান যে কতটা এক হয়ে এসেছিল তার মূল্যবাণ প্রমাণ পাওয়া যায় ফৈজুল্লার নিম্নলিখিত বন্দনায়।[২]

সেলাম করিব আগে পীর নিরাঞ্জন
মহাম্মদ মস্তফা বন্দো আর পঞ্জাতন।
সের আলি ফতেমা বন্দো একিদা করিয়া
হাচেন পেয়দা হৈল যাহার লাগিয়া।
রছুলের চারি ইয়ার বন্দো শত শত
চারি দহ ইমামের নাম লব কত।
এবরাহিম খলিলের পায়ে করি নিবেদন
বেটারে করবানি দিল দীনের কারণ।
করবানি করিয়া দিল এসমাল করিয়া
সেই হৈতে নিকে বিভা হইল দুনিয়া।
আম্বিয়ার হাসিল বন্দো পালআন দুইজনে
এসমাইল গাজি বন্দো গড-মান্দারনে।
বন্দিব···জেন্দা পীর কামাএর কনি
বড়-খান মুরিদ মিঞা করিল আপনি।
পাঁড়ুয়ার সাফি-খায়ে করি নিবেদন
অবশেষে বন্দিব সত্যপীরের চরণ।
সম্বল জাহানে বন্দিব পীর আছে যত
এক লাখ আশি হাজার পীরের নাম লব কত।
সম্বল পীরিণী বন্দো বিবিগণ যত
বিবি ফতেমার কদমে বন্দিব শত শত।

হিন্দুর ঠাকুরগণে কবি প্রণিপাত
খানাকুলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ।
নামেতে বন্দিয়া গাইব ধর্ম নিরাঞ্জন
যার ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন।
যমুনার তটে বন্দো রাস বৃন্দাবন
কৃষ্ণ-বলরাম বন্দো শ্রীনন্দের নন্দন।
নবদ্বীপে ঠাকুর বন্দো চৈতন্য গোসাঞি
শচীর উদরে জন্ম বৈষ্ণব গোসাঞি।
কামারহাটির পঞ্চাননে করি নিবেদন
দশরথের পুত্র বন্দো শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দো গঙ্গাভাগীরথী
সীতা ঠাকুরাণী বন্দো আর যত সতী।
দৈবকী রোহিনী বন্দো শচী ঠাকুরাণী
যার গর্ভে গোরাচাঁদ জন্মিল আপনি।
শুনহ ভকত লোক হএ একচিত
সত্যপীর সাহেব সভার করে হিত।......
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি নারায়ণ
শুন গাজি আপনি আসরে দেহ মন।
ভকত না'একের তরে মোকেদ হইয়া
আসিয়া দেখহ পীর আসরে বসিয়া।
ছাড় গাজি মক্কার স্থান আসরে দেহ মন
গাইল ফৈজল্যা কবি সত্য পদে মন।

কবি ফৈজুল্লার বাস ছিল পাচনা গ্রামে। ভনিতার কবি লিখেছেন,—

বলে ফৈজুল্লা কবি পাচনায় বসতি
কহে ফৈজুল্লা কবি পাচনায় থাকিয়া।

কবি ফৈজুল্লা বা ফৈজুল্ল্যা এবং ফয়জুল্লা একই ব্যক্তি কিংবা একাধিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা ডঃ সুকুমার সেন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। "ফয়জুল্লা-রচিত 'গাজী বিজয়' পাওয়া গেছে, ফয়জুল্লা-রচিত 'গোরক্ষ বিজয়'ও আছে। তা ছাড়া 'সত্যপীরের পাঁচালীও' পাওয়া গেছে। তিনটি রচনা কি একজনের

লেখা এবং তা কি তবে এক বৃহত্তর কাব্যসূত্রে গাথা হয়েছিল ?[81] কবির বসতি ছিল হাওড়া জেলার পাচনা (পাচলা ?) গ্রামে।[72]

সত্যপীরের পাঁচালী রচয়িতার নাম দুই বা ততোধিক বানানেও পাওয়া যায়। যথা,—ফৈজুল্ল্যা, ফয়জুল্লা, ফউজুল্ল্যা, ফউজুল্ল বা ফউজুলু ইত্যাদি। মূল বানান যা-ই থাকুক,—মনে হয় লিপিকরগণের মাধ্যমে বানান-ভেদ হয়েছে।

তাছাড়া নিম্নলিখিত ভনিতা থেকেও এরূপ অনুমান স্বাভাবিক ;—

গোর্খ বিজএ আদ্যে মুনি সিদ্ধা কত…
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন…
গাজী বিজএ সেহ মোক হইল রাজি।…
শেখ ফয়জুল্লা ভনে ভাবি দেখ মন।

এবং

সতির কউসে কবি ফউজুল্ল গায়।
হরি হরি বল সবে দিন বএ জায় ॥

শ্রীঅক্ষয় কুমার কয়াল মহাশয় ফউজুলু বা ফউজুল্লর যে সত্যপীরের পাঁচালীখানি আলোচনার জন্য আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন তাতে ভনিতায় কবির বাসস্থানের উল্লেখ নজরে পড়ে না। ফউজল্ল কোথাও বা ফউজুল্ল্য এই বানান এই পাঁচালীর মধ্যে ভনিতায় দৃষ্ট হয়। এই পুঁথিতে ব্যবহৃত 'ল্ল' 'লু' রূপেও দৃষ্টিগোচর হয়। সেই হিসাবে ফউজুলু হতেও পারে।

এই পুঁথির পাঠ উদ্ধার করা খুব সহজসাধ্য নয়, বিশেষ কয়েকটি স্থানের কয়েকটি শব্দ খুবই দুর্বোধ্য। এই পুঁথিটির প্রথম থেকে কয়েক পৃষ্ঠা পোকায় কেটে দেওয়ায় পঠোদ্ধার সম্ভব নয়। ১০"×৬½" মাপের এই পুঁথিটির পৃষ্ঠাগুলি অমসৃণ সাদা কাগজের। কালো মোটা কালিতে লেখা। শব্দগুলি বামদিক থেকে ডান দিকে এবং পৃষ্ঠাগুলি ডানদিক থেকে বাম দিকে সাজানো। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় সওয়া পঁচিশ।

ফউজুল্ল্য রচিত সত্যপীরের পাঁচালীর যে কাহিনী পাওয়া যায় তার চুম্বক এখানে পরিবেশিত হল ;—

সুবর্ণ নামক সাধু সদাগরের পত্নী রতন মালার এক পুত্র হয়েছে,—নাম তার কুঞ্জবিহারী। কুঞ্জবিহারী দিনে দিনে বাড়তে লাগল এবং সাবালক হল। কুঞ্জবিহারী ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তার পিতা গেছেন বানিজ্যে। কুঞ্জ বড় হয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করল যে সে যাবে তার পিতার সন্ধানে। তাই মা রতনমালার মনে নানা ভাবনা ;—

রাজা হোক আর যে-ই হোক, পুত্র যার ঘরে নাই তার জীবন বৃথা। অতএব পুত্র কুঞ্জবিহারী নির্ব্বিবাদে ফিরে আসুক এই কামনা মাতার। তাই তিনি সত্যপীরের মানত করেছেন।

কিছু বাহানা করে শেষে সত্যপীর চললেন কুঞ্জবিহারীর সাথে তার পিতার উদ্ধারে খঞ্জন পাখীর রূপ ধরে। তিনি চলেছেন কুঞ্জবিহারীর ডিঙ্গায় করে। কলিঙ্গ থেকে রওনা হয়ে নানা গ্রাম পার হয়ে চলেছে সে ডিঙ্গা। নানা বিপদ লঙ্ঘন করে চলেছে ডিঙ্গা, সত্যপীরের অলৌকিক ক্ষমতার জন্যে। অবশেষে ডিঙ্গা এসে পৌঁছুল অমরানগরে।

অমরানগরে এসে নাগরা বাজাতেই রাজার কোটাল এল ছুটে। চোর বলে কুঞ্জবিহারীকে সে পাকড়াও করল। কুঞ্জবিহারী জানালো যে সে এ দেশের রাজার ঘর জামাই হয়ে থাকতে চায়।

কোটালের কাছে জানা গেল সে দেশের রাজকন্যার নাম মালতী : বয়স তেরো।

কোটাল পাঞ্চাশ টাকা ঘুষ নিয়ে রাজ-কন্যার সাথে কুঞ্জবিহারীর প্রথম দর্শনের ব্যবস্থা করে দিল।

সাধু কুঞ্জবিহারীর সাথে মালতীর প্রণয় আদান-প্রদান হল দাসীর মধ্যস্থতায়।

পরদিন সাধু গেল রাজ-দরবারে। দরবারে সাক্ষাত হল রাজার সাথে। অম্ল ও মধুর কথোপকথনের পর রাজা মহাখুশী হলেন কুঞ্জবিহারীর উপর। তার রূপ ও গুণের পরিচয় পেয়ে রাজা প্রস্তাব দিলেন কন্যা মালতীর সাথে কুঞ্জবিহারীর বিবাহের। তবে সর্ত্ত যে তাকে ঘর জামাই থাকতে হবে। কুঞ্জবিহারী তাতেই রাজী। খঞ্জন পাখীর রূপধারী সত্যপীরের নির্দ্দেশে কুঞ্জবিহারী কর্ত্তৃক অঙ্গীকারপত্র লেখা হল। এ বিবাহে রাণীও সম্মতি

দিলেন। সত্যপীর এ সব ব্যবস্থা করে জাহাজে ফিরে এলেন। মালতীর সাজ সজ্জা হল। সাধু কুঞ্জবিহারীও সজ্জিত হয়ে এসে পীরের পরামর্শ মতন রাণীর "বন্দী-শালা।" বিবাহের যৌতুক স্বরূপ চাইল। ঐ বন্দী ঘরেই বন্দী ছিল তার পিতা সাধু সদাগর। রাজা অবশ্য সহজেই স্বীকৃত হলেন বন্দীঘর দান হিসাবে দিতে। সাধু তখনি কোটাল গুলিরাম হাজারিকে আদেশ দিল সব কয়েদীকে মুক্তি দিতে। কয়েদগণ মুক্ত হয়ে সকলকে আশীর্বাদ করে প্রস্থান করল; কিন্তু সাধুর পিতার সাক্ষাত পাওয়া গেল না। অনেক অনুসন্ধানের পর সাধু সুবর্ণবিহারীকে পাওয়া গেল এক অন্ধকার কুটীরের কোণে। তাঁর অবস্থা তখন শোচনীয়। কারণ তাঁর বাক্‌শক্তি এবং শ্রবণ শক্তি রহিত হয়ে গেছে। তিনি কাউকে চিনতে পারলেন না।

সাধু, বন্দীঘর থেকে মুক্ত হয়ে ডিঙ্গা করে ফিরে চলল কলিঙ্গের দিকে। ভোমরার পাড়ায় আসতে পীরের ইচ্ছানুসারে ডিঙ্গা গেল ডুবে। পীরকে অবহেলা করার জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটল। কোন প্রকারে রক্ষা পেয়ে সাধু সদাগর অর্থাৎ কুঞ্জবিহারীর পিতা ঘরে ফিরে এলে রতনমালা তাঁকে অনেক সেবা শুশ্রূষা করল।

কিন্তু তাঁর সাথে পুত্র ফিরে না আসায় রতনমালা কাঁদতে লাগলো। পুত্রের কথা শুনে সদাগর তো হতবাক। তিনি খুব খুশী হলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে পিতার সন্ধানে সে ডিঙ্গায় করে দক্ষিণে গেছে তখন পিতা ভীত হয়ে বললেন—

দক্ষিণের কথা মোর কহিতে প্রাণ ফাটে।
পক্ষীতে তরণী নেয় হাঙ্গরে মানুষ কাটে॥
অবলা ছাওয়ালে তুমি দিলে পাঠাইয়ে।
কোনখানে মাছে তারে ফেলিল গিলিএ॥

পরক্ষণে তিনি পত্নী রতনমালাকে সান্ত্বা দিয়ে বললেন,—

আমি যে থাকিলে কত পুত্র পাবে তুমি।
রতনমালা বলে সাধু তোর মুখে ছাই
পুত্রের বিহনে আমি দেশান্তরে যাই।

গয়া গঙ্গা—উড়িষ্যা পার হয়ে রতনমালা যেতে যেতে প্রথমে সত্য পীরের সাক্ষাত পেলেন। পীর কিছু পূর্ব-ঘটনা বললেন এবং পুত্র ও পুত্রবধূকে এনে দিতে প্রতিশ্রুত হলেন।

পীর অমরানগরে গিয়ে কুঞ্জবিহারীকে তার মায়ের অবস্থার কথা জানালেন। কুঞ্জবিহারী মায়ের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ল। মালতী তো বাপের বাড়ী ছেড়ে আসতে চায় না। বিশেষতঃ ঘর জামাই থাকার মত খত তো লেখাই আছে। তখন সাধুপুত্র নিজ রাজ্যের প্রশংসা করে বলল ;—

বিভা করেছি আমি সাত রাজার ঝি ॥
…পালঙ্ক ছাড়িয়ে তারা ভূমে না দেয় পা ॥
মালতী বলেন তবে আমি সঙ্গে যাব
সেবায় সতীন সব বশ করে থোব ॥

মালতী তার মাতাকে বলল,—

ছাড়ি মাগো স্বামীর তরে, কে আছে বাপের ঘরে
কহ দেখি করি নিবেদন।

এই প্রসঙ্গে শিব-উমা, রাম-সীতা প্রমুখের কথা হল।
মালতী আরও বলল,—…

…ছাড়ি এ সোয়ামির কে থাকে বাপের ঘরে
সে কেমন কুলবতীগণে ॥
…সব তীর্থ থাকিতে নারীর তীর্থ পতি।

পতিগৃহে যাবার জন্য মালতী প্রস্তুত হল। অবশেষে রাণী অনেক মনোবেদনার মধ্য দিয়ে কন্যা মালতীকে বিদায় দিলেন।

সত্যপীর এবার কুঞ্জবিহারীকে দেশে ফেরার জন্য বললেন। সাধু বলে ;—

ঘর-জামাতা রব বলে লিখে দি খত,
সত্যপীর বলে যাও অমরার তটে।
আপনি আসিবে রাজা তোমার নিকটে।

সত্যপীরের সহায়তায় সকলে রাজার কাছে বিদায় নিল।

সত্যপীর এবার সুবর্ণ সাধু সদাগরের ডুবে যাওয়া ডিঙ্গাও উদ্ধার করলেন। সব ডিঙ্গা একসঙ্গে ফিরে এল কলিঙ্গে, রতনমালার পুত্র কুঞ্জ বিহারীও ফিরে এল বধূ মালতীকে নিয়ে।

সাধু বলে জননী গো ঘরে যাও তুমি।
সত্য পীরের নামে আগে সিন্নি দেই আমি ॥
···কলিঙ্গে নগর যেন হইল সুরপুরি।
প্রতিদিন পূজে পীর কুঞ্জবিহারী ॥

ফয়জুল্লার সত্যপীরের পাঁচালীর (কুঞ্জবিহারীর পালা) কাহিনী বল্লভের সত্যপীরের পাঁচালীর (মদন সুন্দরের পালা) কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। উভয় কাহিনীর মূলগত ভাব এক থাকলেও কাহিনী হিসাবে তাদের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে।

ফয়জুল্লার কবিত্ব শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। এমন কতকগুলি স্থান আছে যেখানকার বর্ণনার সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সাধু কুঞ্জবিহারী ও রাজকন্যা মালতীর প্রথম সাক্ষাতকারের বর্ণনা :—

খোপায় উড়িছে কন্যের রূপ মহজায় (?)
রূপ দেখিলে গাছ পাষাণ মিলায় ॥
ঘাটে দাঁড়াইল কন্যা চাহে চারিদিক।
রূপ দেখি এ রূপ করে ঝিকমিক ॥

অথবা

শ্বশুরালয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত মালতী যেভাবে মায়ের কাছে কথোপকথনে লিপ্ত তার বর্ণনায় সতীর পতিগৃহে যাবার মুহূর্তকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কবি লিখেছেন,—

কোলেতে মালতী, ব্যাকুল হইল সতী
কান্দে রাণী বাম পানে চেয়ে।
অতি দূর দেশান্তরে পাঠাব পরের ঘরে
কেমনে ধরিঞ রব এ হিয়ে ॥

অনেক বিলাপ করি মালতীর গলা ধরি
কান্দিয়া আপনি বলে রাণী।
বিধাতা দারুণ বড় পালিয়া করিনু বড়
বিধি মোরে দুঃখ দিল আনি ॥—ইত্যাদি

২। লালমোনের কেচ্ছা

কবি আরিফ রচিত সত্যনারায়ণ পাঁচালীর যা লালমোনের কথা, ফকির রামের ফাঁসিয়াড়ার পালাও তা-ই। [৪১]

আরিফের নিবাস ছিল দেশড়ার নিকট তাজপুর গ্রামে। তিনি দক্ষিণ রাঢ়ের লোক। কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ ঃ—

কেরবি শহরের উজীর সৈয়দ জামালের কন্যা লালমোন। একদিন বাদশা হোসেন তাকে দেখে আকৃষ্ট হলেন। পত্র মাধ্যমে উভয়ের আলাপ এবং সাক্ষাত হল। পরস্পর প্রেমে নিমজ্জিত হওয়ার পর হোসেন তাকে বিয়ে করতে চাইলেন। সত্যপীরকে সাক্ষী করে সে বিয়ে সম্পন্ন হল। লালমোন তো খুব খুসী।

গাজী সত্যনারায়ণ এলেন লালমোনকে আশীর্বাদ করতে। বাদশা তাড়িয়ে দিলেন ফকিরকে। ফকির অভিশাপ দিলেন,—পথে লালমোনকে সে হারাবে।

ঘটনাটি জানাজানি হওয়ায় বাদশা তখনই লালমোনকে নিয়ে ভিন্ন দেশে পালিয়ে গেলেন। লালমোন পুরুষের সাজ নিল।

জুলুমাত শহরের দশ ক্রোশ তফাতে থেকে যেতে যেতে তারা ভুলে ফাঁসিয়াড়ার বাড়ীর দরজায় এসে হাজির।

ফাঁসিয়াড়া শিকারে গিয়েছিল। বাড়ীর দরজায় বসে আছে এক বুড়ী। তাঁরা বুড়ীর অতিথি হলেন। সেখানে রান্না সেরে নিলেন বটে কিন্তু খাবার আগে বুড়ীর হাব-ভাবে ভয় পেয়ে তাঁরা পালাতে চেষ্টা করলেন। বুড়ীর হাঁকে শিকারীরা এসে পড়ায় বেগতিক দেখে বাদশাকে লালমোন বল্‌ল,—

ঘোড়া হেঁকে প্রাণনাথ ভেগে যাহ তুমি
ফেসেড়ার সাথেতে লড়াই দিব আমি।

বাদশা বল্লেন,—তা হয় না। তখন উভয়ে লড়াইতে অগ্রসর হল। লালমোনের হুঙ্কারে ফাঁসিয়াড়ারা হটে গেল। যে অগ্রসর হয় সেই পড়ে কাটা। অবশেষে এক অল্পবয়সী ছোকরাকে দেখে বাদশার মায়া হল। লালের মানা না শুনে বাদশা তাকে সঙ্গে নিলেন এবং তিনদিন বনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এক গাছ তলায় মোকাম করলেন।

একদিন লালমোন স্নানে গেলে সেই ছোকরা সেখানে ঘুমন্ত বাদশার শির তলোয়ারের আঘাতে ছিন্ন করল। বাদশার কাটা মুণ্ডু লালমোনের নাম ধরে ডাক্‌তে লাগ্‌ল। ছোকরা তখন বাদশার পোষাক পরে লালমোনের কাছে গিয়ে বল্‌ল,—তোমার পতি আমার হাতে নিহত; তুমি আমার ঘরে চল।

স্বামীর মৃতদেহ কোলে নিয়ে লালমোন বিলাপ করতে লাগ্‌ল।

চারদিন পর সত্যপীর এলেন লালমোনের কাছে এবং পূর্ব ঘটনা জেনে বল্‌লেন,—

"মরেছে তোমার পতি সত্যপীরের হটে।"

লালমোন তখন সত্যপীরের শিরনি মানলেন। পীর এবার এলাহি ভেবে বাদশার কাটা মুণ্ড জোড়া লাগিয়ে দিলেন।

আবার দুজনে পথে চল্‌তে লাগলেন। লালমোন কিন্তু পীরের শিরনি দিতে ভুলে গেলেন।

তাঁরা এলেন মৃগাল শহরে। এক পুকুরের ধারে তাঁরা বিশ্রাম নেবেন। একস্থানে তাঁরা আস্তানা করলেন। কিছু পর বাদশা চললেন বাজার করতে। পথে পারুল মালিনী বাদশার রূপে মুগ্ধ হল, বাদশাও হলেন মুগ্ধ পারুলের রূপে। যোগ বিদ্যায় বাদশা শেষে হলেন মেড়া। মেড়া হয়ে তিনি চল্‌লেন পারুলের সঙ্গে। রাত্রে তিনি মানুষ হন, দিনে হন মেড়া।

এদিকে মৃগাল শহরের রাজার ঘোড়া চুরি যাওয়ায় রাজার কোটাল সেই ঘোড়া খুঁজতে খুঁজতে পুকুর ধারে এসে পুরুষবেশী লালমোন এবং বাদশার ঘোড়াকে নিয়ে রাজার কাছে গেল। রাজা বল্‌লেন,—"এই বেটারে লয়্যা কাট দক্ষিণ মশান।"

লালমোন বল্‌ল,—রাজা তুমি আগে বিচার কর।

রাজা তাকে বন্দীশালায় পাঠালেন। ছ'মাস পর পীরের দয়া হল। তিনি শহরকে উৎখাত করলেন এবং জঙ্গল থেকে এক গণ্ডার পাঠালেন। গণ্ডার এসে উৎপাত আরম্ভ করল। সকলে গণ্ডারের কাছে হার মানল।

রাজা জানালেন, যে গণ্ডার মারবে, সে বাদশাজাদীকে বিয়ে করতে পাবে। লালমোন কোটালকে ঘুষ দিয়ে ছাড় পেল এবং গণ্ডারকে হত্যা করে বাদশাজাদী মহাতাবকে বিবাহ করল।

মহাতাব পরে লালমোনকে কাঁদতে দেখে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করল। লালমোন বল্‌ল—পরে বল্‌ব।

পরে নাটগীতের আসর বসানো হল। উদ্দেশ্য সেখানে বাদশা হোসেন যদি আসে।

মালিনী এল নাটগীতের আসরে। বাদ্‌শা হোসেন তার সাথে ছিল; কিন্তু তাঁকে চেনা গেল না। ফিরে যাবার আগে গোপনে বাদশা তাঁর দুঃখের কথা মসজিদের গায়ে লিখে গেলেন। পরদিন তা দেখে লালমোন, কোটালকে দিয়ে শহরের সব মেড়াকে আনালো। সে মালিনীকে বল্‌ল,—মেড়াকে মানুষ করে দাও।

মালিনী রাজী না হওয়ায় তাকে বেদম প্রহার করা হল। অবশেষে সে সেই মেড়াকে মানুষ করে দিল।

স্বামীকে পেয়ে লালমোন নিজের পরিচয় দিল মহতাবের কাছে। মহতাব তার পিতার কাছে কেঁদে সব কথা জানালো। রাজা তখন মহতাবকে লালমোনের অনুমতি নিয়ে বাদশা হোসেনের নিকট অর্পণ করলেন। তিনি বাদশাকে তাঁর পুত্রবৎ সেখানে রাজত্ব করতে অনুরোধ করলেন। লালমোন এবার সত্যপীরের মানত শোধ করল।

ডঃ সুকুমার সেন স্পষ্টই বলেছেন,—এইসব রচনাগুলির বিষয় রূপকথা অথবা অলৌকিক গল্প হতে নেওয়া।

আরিফের এ কাব্য সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছে। কৃষ্ণহরি দাসের কাব্যে যেমন দেখা যায় বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যপীরকে সংগ্রামী ভূমিকায় আসতে হয়েছে, এখানে ঠিক তেমনটি দৃষ্ট হয় না। এখানে

লালমোন প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে,—এটাই এ কাব্যের মূল বক্তব্য। সত্যপীরকে অবজ্ঞা করায় বাদশা হোসেনের কিছু দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে বটে কিন্তু যথার্থ কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে সাধ্বী লালমোনকে।

প্রেমের কারণে গৃহত্যাগ এ কাহিনীর লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। মঙ্গল কাব্যের যে সব লক্ষণের সংগে সংযুক্ত করে এ কাহিনীকে মঙ্গল কাব্য-ধারায় আনা যায় তার ব্যাখ্যায় বলতে হয় যে, সত্যপীরের মঙ্গল দৃষ্টিতে হোসেন-লালমোনের পুনর্মিলন সম্ভব হয়েছে। এই কাব্যে বিশেষ করে আধুনিক প্রেমাদর্শের আভাসই অধিকতর স্পষ্ট।

কাহিনীটি আপাততঃ মুসলিম চরিত্র-ভিত্তিক বলে মনে হয়। কিন্তু ফাঁসিয়াডার সভার প্রধান গোপাল, জগাই, দামুদর এবং মালিনী, পারুল প্রমুখের চরিত্র এই কাহিনীতে রয়েছে। কবিও হিন্দু এবং মুসলিম উভয় আদর্শ ভাবাপন্ন ছিলেন তা বোঝা যায়, তাঁর পুঁথির আরম্ভে এবং শেষে লিখিত "শ্রীদুর্গা" উল্লেখ থেকে।

এই কাব্যের লিপিকাল ১২৫৩ সাল, ইংরাজী ১৮৪৫/৪৬ সাল।

৩। সত্যপীরের পাঁচালী

বল্লভের কাব্যের লিপিকাল ১২২৯ সাল। এর কাহিনী রূপকথা স্থানীয়। কাহিনী অভিনব বটে। ভনিতায় কবি কোন স্থলে শ্রীবল্লভও লিখেছেন।

সদানন্দ ও বিনোদ দুই ভাই। তারা সদাগর। রাজা তাদেরকে আদেশ দিলেন বাণিজ্যে যেতে। অগত্যা তারা সফরে চলেছে। সমুদ্রে তারা দেখল এক অপূর্ব দৃশ্য!

পাথরের গোর এক ভাসয়ে দরিয়ায়।
নৃত্য করে নর্তকী কিন্নরে গীত গায়
দরিয়ার বিচেতে অপূর্ব শোভা পায়।
মৃগছাল পানির উপরে ডাল্যা দিয়া
চারি ফকির নিমাজ করে পশ্চিম মুখ হয়্যা।

সদাগরগণ সেখানকার রাজাকে এ দৃশ্য দেখাতে পারল না বলে কারারুদ্ধ হল। গৃহে তাদের পত্নীরা এক ফকিরের পাল্লায় পড়ে সিদ্ধাই শিখে ডাকিনী হয়ে গাছে চড়ে দেশে দেশে ঘুরছে।

ছোট ভাই মদন একবার তাদের সঙ্গে গিয়ে এক রাজকন্যাকে বিবাহ করে পালিয়ে এল। অনেক বিড়ম্বনার পর তাদের মিলন হল।

ডাকিনীদ্বয় বুঝতে পারল যে মদন তাদের কাণ্ডকারখানা বুঝতে পেরেছে। তারা মন্ত্র পড়ে মদনকে শ্যেনপক্ষী করে দিল। খোদা বাজ পাখী হয়ে তাকে তাড়িয়ে পাটনে নিয়ে গেলেন। সেখানেই তার দুই ভাইও বন্দী ঘরে ছিল।

খোদা রাজাকে স্বপ্নে ভয় দেখালেন। রাজা ভয় পেয়ে সদাগর দু'ভাইকে মুক্তি দিলেন। তারা গৃহে ফিরে এল। সংগে নিয়ে এল সেই শ্যেন পাখী। কারণ মদন তাদেরকে বাণিজ্য শেষে ফিরবার পথে একটা শ্যেন পাখী আনতে বলেছিল।

দেশে ফিরে তারা ভাই মদনকে না দেখে শোক করতে লাগল।

খোদা ফকিরের রূপ ধরে মদনের পত্নীকে সত্যনারায়ণের পূজা দিতে বললেন। মদনের পত্নী তা করল এবং পিঞ্জরের শ্যেন পাখীকেও সেই শিরনি কিছু দিল। সেই শিরনি খেয়েই মদন ফিরে পেল মনুষ্যরূপ।

৪। সত্যপীরের পাঁচালী

কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের শেষ কবি (১৭১২—১৭৬০)। সেই হিসাবে তাঁর রচিত "সত্যনারায়ণের ব্রতকথা" সত্যপীর পাঁচালী কাব্যসমূহের মধ্যে অবশ্য উল্লেখযোগ্য।

"সত্যনারায়ণের ব্রতকথা" দু'খানি। এক খানি ত্রিপদী ছন্দে এবং অপরখানি চৌপদী ছন্দে রচিত এইটিই। কবির প্রথম কাব্য-রচনা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন—"নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি 'ভুরসুট' পরগনার মধ্যস্থিত 'পেঁড়ো' নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি অতি সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন, সর্বসাধারণ তাঁহারদিগ্যে সম্মানপূর্বক রাজা বলিয়া সম্মান করিতেন। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রে মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, বিষয়-বিভবের প্রাধান্য জন্য 'রায়' এবং 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইহার বাটীর চতুর্দ্দিগে গড় ছিল, এ কারণ সেই স্থান 'পেঁড়োর গড়' নামে আখ্যাত হইয়াছিল"।

"ভারতচন্দ্র হলেন নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চতুর্থ পুত্র।

"জিলা হুগলীর অন্তঃপাতি বাঁশবেড়িয়ার পশ্চিম দেবানন্দপুর গ্রাম নিবাসী কায়স্থ কুলোদ্ভব মান্যবর ৺রামচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের ভবনে আগমনপূর্বক ভারতচন্দ্র পারস্যভাষা অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন।...উক্ত মুন্সী বাবুদের বাটীতে এক দিবস সত্যনারায়ণের পূজার শিরনি এবং কথা হইবে তাহার সমুদয় অনুষ্ঠান ও আয়োজন হইয়াছে।...একখানি পুথির প্রয়োজন। রায় কর্তাকে) কহিলেন,—আমার নিকটেই পুঁথি আছে, পূজা আরম্ভ হউক, আমি বাসা হইতে পুঁথি আনিয়া এখনি পাঠ করিব।—এই বলিয়া বাসায় গিয়া তদ্দণ্ডেই অতি সরল সাধু ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতায় পুঁথি রচিয়া শীঘ্রই সভাস্থ হইয়া সকলের নিকট তাহা পাঠ করিলেন,—যাঁহারা সেই কবিতা শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা তাহাতেই মোহিত হইয়া সাধু সাধু ও ধন্য ধন্য ধ্বনি করিতে লাগিলেন।"

গুপ্ত কবির মতে ১১১৯ সনে অর্থাৎ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের জন্ম। ডঃ দীনেশ সেন তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের একস্থানে ভারতচন্দ্রের জন্ম ১৭১২ খৃষ্টাব্দ এবং অন্যস্থানে ১৭২২ খৃষ্টাব্দ লিখেছেন। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন ভারতচন্দ্রের জন্ম বোধহয় ১১১৯ সালে।[৪১]

ভারতচন্দ্র অল্প বয়সে ঘর ছেড়ে পলায়ন করে দেবানন্দপুরে আসেন। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি কালিকা-মঙ্গল অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান-ভিত্তিক কাব্য রচনা। তাঁর অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণামঙ্গল যে তিন ভাগে বিভক্ত কালিকামঙ্গল তার দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম ভাগ শিবায়ন বা দেবীমঙ্গল, তৃতীয় ভাগ মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য-ভবানন্দ উপাখ্যান অর্থাৎ অন্নপূর্ণা পূজা প্রচার উপলক্ষ্যে কবির পোষ্টা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রশস্তি। তিনি 'নাগাষ্টক' 'গঙ্গাষ্টক' নামে সংস্কৃত কবিতা লিখেছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে এসে তিনি মৈথিল কবি ভানু দত্তের 'রসমঞ্জরী' নামক গ্রন্থের অনুবাদ করেন।[৪১]

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ভারতচন্দ্রকে তাঁর রাজসভায় মাত্র চল্লিশ টাকা বেতনে সভাকবি নিযুক্ত করেছিলেন। এই শুভ যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন ফরাস ডাঙ্গার বিখ্যাত দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

কবির নাগাষ্টক পড়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সন্তোষ লাভ করেন এবং দয়াপরবশ হয়ে আনোয়ারপুরের গুস্তিয়া গ্রামে একশত পাঁচ বিঘা ও মূলাযোড়ে ষোল বিঘা জমি নিষ্কর প্রদান করেন। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কবি ভারতচন্দ্র বহুমূত্র রোগে মৃত্যুবরণ করেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য: ডঃ দীনেশ সেন)।

ত্রিপদী ছন্দে ভারতচন্দ্র রচিত সত্যনারায়ণের ব্রতকথার সংক্ষিপ্ত কাহিনী :—

দ্বিজ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রকে ক্ষুদ্র ও যবনকে বলবান করতে হরি এক ফকিরের শরীর ধারণ করতঃ অবতার হয়ে এক বৃক্ষতলে অবস্থান করতে লাগলেন।

তাঁর নম্রমান দাড়ি-গোঁপ, গায় কাঁথা, শিরে টোপ, হাতে 'আসা' কাঁধে ঝোলাঝুলি।

তেজঃপুঞ্জ যেন রবি, মুখে বাক্য পীর নবি
নমাজে দর্গার চুমে ধুলি ॥

সেই বৃক্ষতলে বসে ভাবছেন যে কিরূপে তিনি নিজেকে জাহির করবেন। এমন সময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিষ্ণু নামে এক বিপ্র দ্রুত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। হরি দেখলেন যে দ্বিজ বড়ই দীন। তিনি দ্বিজকে বললেন,—তুমি সত্যপীরকে শিরনি দিয়ে পুলকে প্রসাদ খাও। বিপ্র মনে মনে বললেন,—তিনি তো হরি বিনা কাউকে পূজা করেন নি। আর এই দুরাচার ফকির কি বলে! অকস্মাৎ তিনি ফকিরের দিকে তাকিয়ে দেখেন ফকিরের স্থলে দাঁড়িয়ে আছেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। তাঁকে প্রণতি জানিয়ে বিপ্র পুনরায় সামনে তাকিয়ে দেখেন—তিনিও অদৃশ্য। তবে শূন্য থেকে বাণী হল। তদনুযায়ী দ্বিজ দিলেন সত্যপীরের শিরনি এবং অন্তে তিনি গেলেন শ্রীনিবাসধামে।

বিপ্রের কাছে ভেদ পেয়ে সাতজন কাঠুরিয়াও সত্যপীরের শিরনি দিল।

দুঃখ তিমিরের রবি সকল বিদ্যায় কবি
অন্তে পেল অনন্ত শরীর ॥

সদানন্দ বেনে সত্যপীরের শিরনি মানল। তার কামনা এক সন্তান। সে পেল এক কন্যা চন্দ্রমুখী চঞ্চল-নয়না। তার নাম রাখা হল চন্দ্রকলা।

চন্দ্রকলা দিনে দিনে বেড়ে হল বিবাহযোগ্যা। এক বণিক-পুত্রের সঙ্গে চন্দ্রকলার বিবাহও হয়ে গেল। সদানন্দ ভুলে গেল সত্যপীরের শিরনি দেবার কথা। সত্যপীর ক্রুদ্ধ হলেন। ফলে রাজার কোটাল কর্তৃক সদাগর হল অবরুদ্ধ। সাধু-কন্যা দেখল মহা বিপদ। সে মানল সত্যপীরের শিরনি। সত্যপীর সন্তুষ্ট হলেন। সদাগর ফিরে পেল সাতগুণ ধন। সে ধন নিয়ে সাধু চলল নৌকা বেয়ে। পথে দেখা ফকির বেশধারী সত্যপীরের সাথে। সদাগর তাঁকে চিনতে না পেরে যোগ্য ব্যবহার না করায় নৌকোর সব ধন হয়ে গেল নীর। অবশেষে অনেক স্তুতিতে সদাগর সে ধন পেয়ে ফিরে এল দেশে।

সাধু-কন্যা সে সংবাদ পেয়ে সত্যপীরের শিরনি হাতে নিয়ে ছুটে চলল সদাগরের কাছে। দ্রুত গমনের ফলে হাতের শিরনি গেল ছড়িয়ে। সত্যপীর তাতে ক্রুদ্ধ হলেন। ফলে জামাতার হল মৃত্যু। চন্দ্রকলা কাঁদতে বসল। সে জলে ডুবে মরতে চাইল। এমন সময় হল দৈববাণী। পীরের নির্দেশে সে ফিরে পেল শিরনি। সে তা খেলও। এবার তার মৃত স্বামী হল জীবিত। সদাগর সুখী হল—সত্যপীরের নামে শিরনিও করল।

কবি গুণাকরের চৌপদী ছন্দে রচিত সত্যনারায়ণের ব্রতকথা বা 'সত্যপীরের কথা'র কাহিনীও মূলতঃ ত্রিপদী ছন্দে রচিত পাঁচালী খানির ন্যায়। তবে কিছু আঙ্গিক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রথম কাব্যের আরম্ভে আছে ;—

গণেশাদি রূপ ধর বন্দ প্রভু স্মর হর
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতারি সত্যপীর নাম ধরি
প্রণমহ বিধির বিধাতা॥

দ্বিতীয় কাব্যে আছে ;—

সেলাম হামারা পাঁড়ে ধূপমে তুম্ কাহে খাড়ে
পেরেসান দেখে বড়ে মেরে বাৎ ধরতো।
শিরনি দেবে পীর বা সভে হামছে মিরবা
মোকামে জাহির বা দরব্ হস্তে তপতো॥

কাব্যের শেষাংশে কবি ভণিতায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন। চৌপদী ছন্দে

রচিত কাব্যে তাঁর পরিচিতি কিছু বেশী পাওয়া যায়। এখানেই তিনি এই কাব্যের রচনাকাল নির্দ্দেশ করেছেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

ডঃ দীনেশ সেন মহাশয় ভারতচন্দ্রের কবিতার গুরুত্বকে শ্রদ্ধেয় বলে মনে করেন নি। কারণ কবি এই কাব্যে জীবনের কোন গূঢ় সমস্যা কি কঠোর পরীক্ষা উদ্‌ঘাটন করে উন্নত চরিত্রবল দেখান নি।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন—ভারতচন্দ্র শব্দকুশলী কবি। তাঁর কাব্যে শব্দ ও অর্থালংকারের যথেষ্ঠ ছড়াছড়ি।

বাস্তবিক তৎকালে কবিতায় এমন মিল, এমন বাছাই করা শব্দ সংযোজন এমন অনুপ্রাস সৃষ্টি বিস্ময়ের উদ্রেক করে! চৌপদী ছন্দে রচিত নিম্নে উদ্ধৃত অংশে কবি যৌবন সম্পর্কে যা বলেছেন তা লক্ষণীয় ;—

যৌবনে প্রভুর কাল মদন দহন জ্বাল
কোকিল কোকিলা কাল রাখ পদতলে হে।
যৌবন প্রফুল্ল ফুল কেবল দুঃখের মূল
খেদে হয় প্রাণাকুল ঝাঁপ দিই জলে হে॥

সত্যনারায়ণ পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ। পাঁচালী পাঠের ডাক পড়েছে। তখনি বাড়ী থেকে পাঁচালী এনে পাঠ করার কথা। প্রকৃত কবি ব্যতীত যে কোন ব্যক্তির পক্ষে বাড়ীতে গিয়ে তখনই এমন সুললিত ভাষায় যথাযথ কাহিনী কবিতার ছন্দে গ্রন্থনা করে এনে পাঠ করা যে কতখানি দুরূহ ব্যাপার তা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই অনুধাবন করতে পারেন। উপরি লিখিত পংক্তিগুলির 'ল'-কারের অনুপ্রাসটি সাধারণ পাঠকের সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ল-কারের কোমল অক্ষর দ্বারা যে যাদু সৃষ্টি করা হয়েছে তা শ্রুতির পক্ষে অমৃত বটে। অবশ্য এ কথাও সত্য যে তাঁর বর্ণনা বেশ প্রাণহীন। তাঁর কাব্যে কোন স্থানে এমন হৃদয়-ব্যাকুলতা পরিস্ফুট হয় নি যা আমাদের নিকট মর্মস্পর্শী হতে পারে।

ভারতচন্দ্র, সত্যনারায়ণের ব্রতকথার রচনাকাল নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিচার এইরূপ ;—

"আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কতিপয় প্রামাণ্য লোকের প্রমুখা

জ্ঞাত হইলাম, যৎকালে ঐ পুস্তক প্রচারিত হয় তৎকালে পুস্তককারকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হয় নাই। এ জন্য...রুদ্র শব্দে একাদশ, এই একাদশ পূর্ব্বভাগে স্বতন্ত্র রাখিয়া তৎপরে 'অঙ্কস্য বামাগতি'-ক্রমে চৌ, গুণার, অর্থ ৩৪ নির্ণয় করিয়াছি। এরূপ না করিলে তিনি ১৫ বৎসর বয়সের কালে গ্রন্থ রচিয়া ছিলেন, তাহা কোনো মতেই প্রামাণ্য হইতে পারে না।"।

গুপ্ত কবির বিচারে এই কাব্যের রচনাকাল ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,—"...হীরারাম রায়ের এবং রামচন্দ্র মুন্সীর অনুরোধে ভারতচন্দ্র দুইটি ছোট সত্যনারায়ণ-পাঁচালী কবিতা লিখেছিলেন। শেষের কবিতাটির রচনাকাল ১১৪৪ সাল (১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) "সনে রুদ্র চৌগুণা"। কি জানি কেন প্রায় সকলেই ১১৩৪ সাল ধরিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালায় 'চৌ' শব্দের প্রয়োগ নাই, ইহা সমাসযুক্ত পদের পূর্ব্বপদরূপেই পাওয়া যায়। তর্কের খাতিরে 'চৌ' শব্দের স্বাধীন অস্তিত্ব মানিয়া লইলেও ১১৪৩ সাল হয়। অঙ্কের অর্ধাংশে মাত্র 'বামাগতি' হয় কোন যুক্তিতে?"

ডঃ দীনেশ সেনের মতের সঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মতভেদ নেই। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে ভারতচন্দ্রের জন্ম তারিখ যখন তাঁরা সকলেই ১৭১২ খৃষ্টাব্দ বলে ধরেছেন তখন কবির পঞ্চদশ বছর বয়সের কালে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচিত হলে তা তো হয় ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ। ডঃ দীনেশ সেনের পুস্তকে যেখানে কবির জন্ম তারিখ ১৭২২ খৃষ্টাব্দ লিখিত আছে, তার সাথে পঁচিশ বছর যুক্ত হলে এই কাব্যের রচনাকাল হয় ১৭৪৭ খৃস্টাব্দ। অর্থাৎ কবি যখন এই কাব্য রচনা করেন তখন তাঁর বয়স পঁচিশ বা পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে থাকবে। অবএব কবির জন্ম সাল ১৭২২ খৃষ্টাব্দ নয়—তা ডঃ দীনেশ সেনের গ্রন্থ দৃষ্টে মুদ্রণ প্রমাদ বলে মনে হয়।

৫। বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি

সত্যপীরের পাঁচালী কাব্যের মধ্যে কৃষ্ণহরি দাসের "বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথি" বৃহত্তম। গ্রন্থের এক স্থানে লেখা আছে, "ছহি বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথি।"

কৃষ্ণহরি উত্তরবঙ্গের কবি। ভণিতায় তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

তাহের মামুদ গুরু শমস নন্দন
তাহার সেবক হয়ে কৃষ্ণহরি গান।

রামদেব দাস পিতা মইপুরে নিবাস
আমর সেবক হরনারায়ণ দাস।
পঞ্চমীর পুত্র আমি নাম কৃষ্ণহরি
জন্মভূমি ছিল আমার বোনগাও সাখারী। (পৃঃ ১৯২)

অবশ্য তিনি একস্থানে লিখেছেন,—"কৃষ্ণহরি দাস ভণে বাস মেহেরপুর।" (পৃঃ ৩২) মেহেরপুর কি মইপুরের সংস্কার করা নাম নাকি মইপুর শব্দ, মেহেরপুর শব্দের অপভ্রংশ! নাকি কবি পরবর্তীকালে মেহেরপুর নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ সংশয় আজো রয়ে গেছে। তাঁর জন্মভূমি বৌনগাও সাখারিয়া গ্রাম; গুরুর নাম তাহের মামুদ সরকার, পিতার নাম রামদেব দাস, মাতার নাম পঞ্চমী, রচয়িতা তিনি নিজে এবং লেখক তাঁর শিষ্য হরনারায়ণ দাস। ভণিতায় তিনি বলেছেন,—

হরনারায়ণ দাসে লেখে রচে কৃষ্ণহরি
শিরে যার সত্যপীর কণ্ঠে বাগেশ্বরী।

কবির জন্ম তারিখ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। তিনি বাউল-দরবেশ সম্প্রদায়ের শিষ্য।[৪১] হিন্দু ও মুসলিমের সমন্বয়মূলক ভণিতা বিশেষ লক্ষ্যণীয়ঃ—

হরনারায়ণ দাসে লিখে রচে কৃষ্ণহরি
মুসলমান বলে আল্লা হিন্দুতে বলে হরি! (পৃঃ ১১৭)

অথবা—

এই পর্য্যন্ত হলাম ক্ষান্ত রাধাকান্ত স্মরি
মুসলমানে বল আল্লা হিন্দুরা বল হরি। (পৃঃ ২১৬)

কৃষ্ণহরি কি কোন প্রেরণায় কাব্য রচনা করেছিলেন? কবি নিজে তাঁর ভণিতায় বলেছেন,—

শতেক বন্দেগী মোর সত্যপীরের পায়
তোমার আদেশে গান কৃষ্ণহরি গায়। (পৃঃ ১৮৬)

এই সুবৃহৎ কাব্যের ভাষা কিন্তু প্রাঞ্জল! এইরূপ বৃহদাকার কাব্য কবিকে বহুশ্রমে সমাপ্ত করতে হয়েছে। কবি তাই লিখেছেন,—

এই পর্য্যন্ত পুথিখান সমাপ্ত হইল।
বহুশ্রমে কৃষ্ণহরি দাস বিরচিল ॥

আরবী ও ফারসী শব্দের সাথে কিছু ইংরাজী শব্দও এতে প্রবেশ করেছে। বাংলা ও সংস্কৃতে মিশ্রিত কয়েকটি শ্লোক এর লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। বেশ কিছু বর্ণশুদ্ধি আছে। অনেক স্থলে পদান্তে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে।

কাব্যখানি মুদ্রিত। আকৃতি ৯"×৬"। পৃষ্ঠাগুলি সেমেটিক রীতিতে (ডান থেকে বামদিকে) সজ্জিত। ছন্দ ঃ পয়ার—দ্বিপদী এবং ত্রিপদী। পংক্তিগুলি গদ্যের আকারে সাজানো। প্রথম পংক্তির শেষে দুই দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে তারকা চিহ্নের ছেদ। মধ্যে মধ্যে 'কমা' ব্যবহৃত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা—২২০। পীর পাঁচালী কাব্যে চিত্র সংযোজন একান্তই বিরল। কিন্তু সর্বমোট ছয়খানি ছবি সন্নিবিষ্ট রয়েছে এই পাঁচালীতে। পীর পাঁচালী কাব্যের ইতিহাসে এটী একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। ধূয়া, দিসা এবং শ্লোকের সংখ্যা সতেরো। তাদের মধ্যে একটি মন্ত্র। সমগ্র কাহিনী তিয়াত্তরটি শিরোনামায় বিভক্ত। এতে আছে নিম্নলিখিত দশটি পালা ঃ—

১। মালঞ্চার পালা,
২। শিশুপাল রাজার পালা,
৩। হীরা মুচির পালা,
৪। শশী বেশ্যার পালা,
৫। জসমন্ত সাধুর পালা,
৬। শুদ্দি সওদাগরের পালা,
৭। কাশীকান্ত রাজার পালা,
৮। ধনঞ্জয় গোয়ালার পালা,
৯। মঙ্গলু বাদ্যকরের পালা ও
১০। ময়েন গিদালের পালা।

মালঞ্চার পালা ঃ

মালঞ্চার রাজা মৈদানব। বড়ই পাষণ্ড তিনি। ফকির তাঁর পরম শত্রু। তিনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর পূজা করেন, সেবা করেন। ফকিরকে তিনি জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

আল্লাহ্ তালা দেখ্‌লেন পাষণ্ড মৈদানবকে দমন করা দরকার। নবীর পরামর্শে কলিকালের অবতার রূপে সত্যপীরকে আল্লাহ্ তালা মর্তে পাঠাতে মনস্থ করলেন। স্থির হল বেহেস্তের চান্দবিবি জন্ম নেবেন মৈদানব রাজার পত্নী প্রিয়াবতীর গর্ভে।

যথাসময়ে প্রিয়াবতী এক কন্যা-সন্তান প্রসব করলেন। তাঁর নাম রাখা হল সন্ধ্যাবাতী।

সন্ধ্যাবতী বয়ঃপ্রাপ্তা হলেন। সখি সমভিব্যাহারে তিনি একদিন স্নান করতে গেলেন এমর নদীতে। সেখানে ভেসে-আসা এক ফুল পেয়ে সন্ধ্যাবতী যেইমাত্র তার ঘ্রাণ নিলেন অমনি তাঁর গর্ভসঞ্চার হল। এ সবই হল আল্লাহ্ তালার ইচ্ছায়।

রাণী প্রিয়াবতী বিব্রত হয়ে পড়লেন যখন জান্‌লেন কুমারী সন্ধ্যাবতী হয়েছেন গর্ভবতী। দাই-এর সাহায্যে তিনি সন্ধ্যাবতীর গর্ভপাত করাতে চাইলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। অগত্যা তাঁকে বনবাসে পাঠাতে হল ;—সঙ্গে গেল দুই সখী। কোটাল তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন কুলবনে। সেখানে রেখে মালঞ্চায় ফিরে সে খবর দিল রাজাকে। হাঁটাপথে ফিরতে তার সাতদিন সময় লাগল।

বনমধ্যে সন্ধ্যাবতী ক্ষুৎপিপাসায় আকুল হলেন। তাঁর ক্রন্দনে দীননাথের আসন উঠ্‌ল কেঁপে। নিরঞ্জন তখনই ফেরেস্তাকে কোটালবেশে পাঠালেন। যথা নির্দেশে ফেরেস্তা অবিলম্বে সন্ধ্যাবতী ও তাঁর সখীদ্বয়ের আহারের ব্যবস্থা করে দিলেন।

কুমারী সন্ধ্যাবতীর গর্ভের সন্তানই সত্যপীর। গর্ভে থেকেই সত্যপীর ডেকে পাঠালেন লোকমান হাকিমকে। তাকে বল্‌লেন,—এই কুলবনে সুন্দর পুরী নির্মাণ করে দাও। লোকমান হাকিম তা-ই করল।

মাঘ মাসের রাত। সন্ধ্যাবতী প্রসব করলেন। কিন্তু একি! সন্তান কোথায়! এ যে মাত্র একদলা রক্ত! সন্ধ্যাবতী অতি দুঃখে সেই রক্তের দলা বেগবতী নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন। এক পাপীয়সী কচ্ছবিনী ভক্ষণ করল সে রক্তের দলা। রক্ত-দলারূপী সত্যপীরের স্পর্শে পাপ থেকে সেই কচ্ছবিনীর মুক্তি ঘটল। পীরকে বন্দনা করে সে চলে গেল স্বর্গে।

পাঁচ বছরের শিশুরূপে সত্যপীর মাতা সন্ধ্যাবতীর নিকট স্বপ্নে আপনার পরিচয় দিয়ে ফকিরবেশে ফিরে এলেন। সন্ধ্যাবতী তাঁকে সাদরে কোলে তুলে নিলেন। সত্যপীর এবার মায়ের দুঃখ দূর করতে মনস্থ করলেন।

কুলবনে কিছু জনবসতি গড়ে ওঠা দরকার। ঝাড়খণ্ডের কিছু প্রজাকে সেখানে আনতে তিনি চেষ্টা করলেন,—কিন্তু প্রজাগণ আসতে রাজী হল না। সত্যপীর এবার রোগীশ্বরীর শরণাপন্ন হলেন। রোগীশ্বরীর সহায়তায় কুষ্ঠ–মড়কের পরোক্ষচাপে চান্দ খাঁ প্রমুখ প্রজা ঝাড়খণ্ড থেকে কুলবনে এল। ঝাড়খণ্ডের রাজা বসন্ত এ সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হলেন। প্রজাগণকে ফিরিয়ে আনতে সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু সৈন্যগণ 'সোটার' (লাঠি-সোটা) বাড়ি খেয়ে পলায়ন করল। রাজা নিজে এলেন যুদ্ধে। সেখানে সত্যপীরের শরীর হল যেন প্রকাণ্ড পাথর।

বন্দুকের গুলি যেন তারা হেন ছুটে।
অঙ্গে লাগি গুলী সব পক্ষী ডিম্ব ফুটে।
সত্যপীর "চতুর্ভুজ মূর্তি তবে করিল ধারণ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নিল চারি হাতে,
আসিয়া হইল খাড়া রাজার সাক্ষাতে।

রাজা এবার গলবস্ত্রে সত্যপীরের স্তব করলেন এবং নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

মাতা সন্ধ্যাবতীর নিকট তাঁর প্রথম জীবনের আরো দুঃখকথা সত্যপীর শুনে নিলেন। পাষণ্ড রাজা মৈদানবের উপর তাঁর প্রচণ্ড রাগ হল। তিনি মালঞ্চায় গিয়ে এর যথাবিহিত করে মাতার কলঙ্ক দূর করতে চাইলেন। মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল—পাছে পুত্রকে হারাতে হয়। তিনি পুত্রকে নিষেধ করলেন মালঞ্চায় যেতে। সত্যপীর অবশ্য তখনকার মতন মাতার কথায় সম্মত হলেন।

একরাত্রে সত্যপীর মাতাকে নিদ্রিতা অবস্থায় রেখে গৃহত্যাগ করলেন। পরদিন পুত্রকে না দেখে সন্ধ্যাবতী কেঁদে আকুল হলেন। শুয়াপক্ষীকে ডেকে তিনি পুত্রের খবর জানতে চাইলেন। শুয়াপক্ষী সত্যপীরের মালঞ্চা অভিমুখে গমনের কথা সন্ধ্যাবতীকে জানালো। পুত্রশোকে আকুল জননী কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে উঠলেন।

মালঞ্চার পথে সত্যপীর এলেন গোমনি নদীর কূলে। নদী পার হওয়া দরকার। ঘাটের পাটনী কে? পাটনী এক কুম্ভীর। তার খেয়ায় পার হতে হলে কড়ি সে নেবে না,—নেবে একটি ছাগল। অন্যথায় সে সোওয়ারীর অর্দ্ধেক ভক্ষণ করে। সত্যপীর এই উদ্ধত কুম্ভীরের পেটের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং পরক্ষণে পেট চিরে বাহির হয়ে এলেন। এ কুম্ভীরও আগে থাকতে অভিশপ্ত ছিল। সত্যপীরের স্পর্শে সে পাপমুক্ত হল দ্বাদশ বৎসর পর। সে পাপমুক্ত হয়ে বিদ্যাধরীরূপে পীরের বন্দনা করে চলে গেল স্বর্গে।

সত্যপীর এগিয়ে চলেছেন। পথে দেখা ভীমা নমঃশূদ্রের সাথে। সে চোর। সেবার নামে ছলনা করে সে পীরের সুবর্ণ-কঙ্কন চুরি করল। ফলে মরল তার চার পুত্র। সত্যপীর বললেন,—অকুল্লপুরে তোকে 'শূলে' যেতে হবে। ভীমা বলল—প্রতিজ্ঞা করছি, নয় টাকা খরচ করে 'শিরনি' দেবো। সত্যপীর দয়াপরবশ হয়ে পুত্রগণসহ তাকে সে যাত্রা রক্ষা করলেন; কিন্তু পীরের অভিশাপে সে পরে অকুল্লপুরে চুরির দায়ে ধরা পড়ল এবং শূলে যেতে হল।

সন্ন্যাসীর বেশ ধরে সত্যপীর এগিয়ে চলেছেন গ্রামকে গ্রাম পার হয়ে। এবার সত্যপীর যাঁর রাজ্যে এলেন তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, তিনি মালঞ্চার রাজা, তিনি সন্ধ্যাবতীর পিতা মৈদানব।

সত্যপীর প্রথমে গেলেন রাজ-অন্তঃপুরে রাণী প্রিয়াবতীর নিকট। পরিচয় পেয়ে রাণী শঙ্কিত হলেন, পাছে রাজার কোপে তার কোন অমঙ্গল হয়। তিনি সত্যপীরকে দূরে সরে যেতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সত্যপীর বেপরোয়া। দারোয়ানকে দিয়ে খবর পাঠালেন রাজার কাছে—জনৈক ফকির তাঁর সাক্ষাত প্রার্থী। রাজা সাক্ষাত-প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন না,—ভিক্ষা নিয়ে বিদায় হতে বললেন। ফকিরকে ভিক্ষা এমনকি মানিক দিয়েও বিদায় করা গেল না। রাজা অবশেষে সত্যপীরকে বন্ধন করে নিক্ষেপ করলেন কারাগারে। পরের দিন তাঁর শিরঃশ্চেদ করা হবে। সত্যপীর স্মরণ করলেন আল্লাহতালাকে। আল্লাহতালার দয়া হল। ফুলের আঘাতে কপাট গেল ফেটে,—সত্যপীর মুক্ত হলেন।

সাত বছরের বালক-রূপ ধরে সত্যপীর এলেন মালাবতীপুরে। "না

হৈল সন্ন্যাসী বেশ না হৈল ফকির।" সেখানে ক্রীড়ারত রাখাল-বালকগণের সাথে তিনি চৌগান খেলায় যোগদান করলেন। ক্রীড়া বিদ্যায় তিনি সকলকে পরাজিত করলেন এবং সেখান থেকে প্রস্থান করে ব্রাহ্মণ বালকের রূপ ধারণ করলেন।

চলার পথে সাক্ষাত হল কুশল ঠাকুরের সঙ্গে। কুশল ঠাকুর নিঃসন্তান। তিনি বালকের সাধারণ পরিচয় পেয়ে আপনার বাটীতে নিয়ে আসেন। তদীয় পত্নী ব্রহ্মণী আনন্দী ক্ষুধার্ত্ত বালককে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন! তিনি পুত্রকে রন্ধন করা খাদ্য আহারের জন্য পরিবেশন করে জান্তে পেলেন,—

জনম অবধি আমি অন্ন নাহি খাই।
কাঁচা দুধ আটা রম্ভা ফল-মূল আদি,
তাহা খাইতে শিখিয়াছি জনম অবধি।

রাজকার্য্যে বসে রাজা মৈদানবের মনে পড়ল বন্দী সেই ফকিরের কথা। কালী পূজায় তাকে বলি দিবার জন্য কোটালকে হুকুম দিলেন। দর্পচুর, শোভা সিংহরায়, মনোহর রায়, দণ্ড রায় প্রমুখ অনেকেই সেই ফকিরকে বলিদান দিবার কাজে এগিয়ে এল। পোতা মাঝি এগিয়ে গেল কারাগারের দিকে; কিন্তু ফকির কোথায়! ফকির তো নেই। সে দ্রুত এসে খবর দিল রাজাকে। শুনে রাজা বিস্মিত হলেন, চিন্তিত হলেন,—ব্যাপার কি!

কুশল ঠাকুর পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু বালকের পড়াশুনায় মতি নেই। ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হয়ে তিরস্কার করতে সত্যপীররূপে ব্রহ্মণকে স্বপ্নে আপনার পরিচয় দিলেন। ব্রাহ্মণ সে কথা প্রকাশ করলেন না।

নুর নদী থেকে স্নান করে ফেরার পথে কুশল ঠাকুরের পোষ্য-পুত্র কুড়িয়ে পেলেন একখানি কোরাণ। পুত্র বললেন,—

আমায় পড়াও বাপ কোরাণ কেমন
কথা শুনি স্তব্ধ হইল কুশল ব্রাহ্মণ।
কহিতে লাগিল ঠাকুর হয়ে ক্রোধভার
কি কারণে চাহিস তুই কোরাণ পড়িবার।
ব্রাহ্মণে কোরাণ পড়ে কোন শাস্ত্রে বলে
এই ক্ষণে কোরাণ ভাসায়ে দেহ জলে।

সত্যপীর বলে কোরাণ পড়িলে কিবা হয়
দ্বিজ বলে কোরাণ পড়িলে জাতি যায়।...
এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই
সকলের কর্ত্তা এক নিরঞ্জন গোসাই।...
সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্লা কয়
বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়।
কেহ কোন নদী বইয়া কোন দিকে যায়
সমুদ্রে যাইয়া সব একত্র মিশায়।
তেমন ছত্রিশ জাতি এক জাত হইয়া
একপথ দিয়া সবে যাবে মিশাইয়া।

ব্রহ্মজ্ঞান শুনে ঠাকুর স্তম্ভিত হলেন। তিনি কোরাণ পড়তে উৎসুক হলেন। খোদার আজ্ঞায় তিনি সত্বরে কোরাণের হরফ চিনতে পারলেন এবং তা পাঠ করলেন। এবার তিনি কোরাণখানি সযত্নে গৃহে রেখে দিলেন।

রাজবাটীতে ভাণ্ডারী এল পুরোহিত কুশল ঠাকুরকে ডাকতে। সত্যপীরের ছলনায় পুরোহিত তো অসুস্থ। অগত্যা তাঁর পুত্র অর্থাৎ সত্যপীর দশকর্ম-পুঁথি নিয়ে পূজা করতে গেলেন।

বালক পুরোহিত শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে আচমন করলেন, বিছমিল্লা বলে কুর্ণে হাত দিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত মহম্মদাদি কলমা দিয়ে সকল কাজ সমাধা করলেন। পরে তিনি সেখান থেকে দক্ষিণা নিয়ে ঘরে ফিরে এলে মাতা আনন্দীর তো মহা-আনন্দ।

কুশল ঠাকুর রাজ-পাঠশালের শিক্ষকও বটে। তিনি শিক্ষকতায় অবসর নিলেন। তাঁর আসনে এলেন (সত্যপীর) তাঁর পোষ্যপুত্র। রাজার পুত্র শ্যামসুন্দর এবং দামুদর দুজনেই পড়ে সে পাঠশালায়। শিক্ষক মহাশয়ের তাড়না তারা সহ্য করল না। গুরু-শিষ্যে দেখা দিল সংঘর্ষ। তাতে শ্যামসুন্দরের মৃত্যু হল। সংবাদ পেলেন রাজা। ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি শিক্ষককে কামানের গোলার আঘাতে হত্যার আদেশ দিলেন। কামান গর্জ্জে উঠল কিন্তু সত্যপীরের মৃত্যু হল না। তাঁর গলায় পাথর বেঁধে জলে নিক্ষেপ করা হল। সেই পাথর হল তাঁর ভেলা। ভেলায় ভেসে তিনি ফিরে এলেন।

কুশল ঠাকুরের বাড়ীতে। রাজ-দরবারে কুশল ঠাকুর আটক পড়লেন। সত্যপীরের কারণে কুশল ঠাকুর বাঁধা পড়েছেন; অতএব আনন্দী ঠাকুরাণী বাঁধলেন সত্যপীরকে। পীর বললেন,—

বন্ধন দারুণ জ্বালা সহিতে না পারি।...
সত্যকালে জন্ম মোর নাম সত্যপীর,
কলি কালে জন্মিয়া হইনু জাহির।
হিন্দুর দেবতা আমি মোমিনের পীর,
যে যাহা কামনা করে তাহারে হাসিল।

এ দিকে রাজা মৈদানব খড়্গাঘাতে ব্রাহ্মণ কুশল ঠাকুরকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। এমন সময়ে পীর এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। পিতার বন্ধন নিজের হাতে নিলেন;—ব্রাহ্মণ ফিরে গেলেন গৃহে। সত্যপীর আপনার পরিচয় দিলেন রাজার কাছে। তবুও তিনি শান্ত হলেন না। পীরকে নিয়ে যাওয়া হল বধ্যভূমিতে। সেখানে তিনি শ্বেত মাছির রূপ ধরে অন্তর্হিত হয়ে সাহায্যের জন্য গেলেন অমরাপুরীর রাজা ইন্দ্রের নিকট। সেখানে আছে আবর্ত্ত, সাবর্ত্ত প্রভৃতি বারোখানা মেঘ। সেই মেঘ থেকে ভয়াবহ বৃষ্টি হল মালঞ্চায়। তাতে ভেসে গেল মালঞ্চা। রাজা জলবন্দী হলেন। রাজার পুত্রবধূ রূপবতী এবং মালাবতী অঙ্গীকার করলেন যে তাঁরা সত্যপীরকে পূজা দেবেন। সত্যপীর বললেন যে, শিরনি পেলেই তিনি সকলকে উদ্ধার করবেন। বধূদ্বয় মহামূল্য কঙ্কনের বিনিময়ে শিরনি আনালেন কিন্তু বীরবল ছলনা করায়, সত্যপীর গেলেন সেখানে। বীরবল প্রহার করতে এল সত্যপীরকে। পীর অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং এক রুগ্ন ফকিররূপে পুনরায় বীরবলের নিকট এলেন। তবুও পীর অপমানিত হলেন। ফলে বীরবলের পুত্র সর্পাঘাতে মরল।

এবার বীরবলের সম্বিৎ ফিরল। সে ফকিরের পা জড়িয়ে ধরল। দয়ার পীর তার পুত্রের জীবন ফিরিয়ে দিলেন। রূপবতী-মালাবতী পেলেন কঙ্কন ও আধমন চিনি।

রূপবতী ও মালাবতীর স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে সত্যপীর মায়াতরীর সাহায্যে রাজা মৈদানবকে উদ্ধার করলেন। বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়ে দশ দণ্ডের মধ্যে রাজপুরী পুনর্গঠিত হল সুন্দর রূপে। তবুও রাজা অস্বীকৃত হলেন সত্যপীরের শিরনি দিতে। তিনি বললেন,—

সকলি পাইনু আমার হরিহর কোথায়।

হরিহর বারো বছর বয়সে কুমীরের পেটে নিহত হয়েছিল। সত্যপীর ডেকে পাঠালেন কুমীর-রাজকে। ব্যাপার শুনে কুমীর-রাজ তিমিরিঙ্গা তো অবাক! হরিহরের খোঁজ পড়ল এখন! কুমীর-রাজা ডেকে পাঠাল অনেক কুমীরকে। কেউই তো হরিহরকে খায় নি। ছেদড়া নামক কুমীর বলল যে তার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। সত্যপীর তখন জিগীর (অর্থাৎ চীৎকার) ছাড়লেন। ছেদড়া দ্বিখণ্ডিত হল :— প্রথম খণ্ড কুমীর নিজে আর দ্বিতীয় খণ্ড হল হরিহর। কুমীর জলে নেমে গেল; হরিহরের জীবন যমরাজের বাড়ী সন্ধ্যামণিনগর থেকে এনে তাকে পীর সঞ্জীবিত করলেন।

সত্যপীরের সাথে হরিহর এল রাজ-দরবারে। রাজা আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে সিংহাসন থেকে নামলেন এবং লক্ষ টাকা ব্যয়ে সত্যপীরের শিরনি দেবার ব্যবস্থা করলেন। সাড়ম্বরে শিরনি দেওয়া হল। রাজার সম্বন্ধী গোকুল ঠাকুর এতে অবজ্ঞা করলে তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হল। অবশ্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় পীর সদয় হয়ে তাকে ক্ষমা করলেন।

মৈদানব রাজাকে এবার সত্যপীর আদেশ করলেন সন্ধ্যাবতীকে ফিরিয়ে আনার জন্য। রাজা তাতে সম্মতি দিলেন। পুত্র হরিহর হাতীর পিঠে চড়ে চলল কুলবনে। সত্যপীর চললেন নৌকায় চড়ে।

নৌকা চলেছে নুর নদী বেয়ে। অনেক গ্রামের পর এল 'বাইনট' নামক গ্রাম। সেখানকার রাজা, শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন ভেবে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। সত্যপীরের কোন কথাই তিনি শুনলেন না। অবশ্য মায়াবলে সত্যপীর যুদ্ধে জয়ী হলেন। রাজা নিজ কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে হরিহরের বিবাহ দিলেন। বিবাহান্তে লীলাবতীও চলল হরিহর ও সত্যপীরের সঙ্গে।

সত্যপীর সকলকে নিয়ে মাতা সন্ধ্যাবতীর নিকট এলেন এবং সাথী সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরে তাঁকে মালঞ্চাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা জানালেন। অকস্মাৎ একথা শুনে সন্ধ্যাবতীর সন্দেহ হল। হরিহর সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলতে তবেই তিনি রাজী হলেন মালঞ্চায় ফিরে যেতে। তখন সমস্ত ধন-সম্পদ চাঁদ খাঁ মণ্ডলকে বুঝিয়ে দিয়ে—

সন্ধ্যাবতী চড়িলেন দিব্য মহাফায়।
…অবিলম্বে এলেন মালঞ্চায়।
মহাফা হইতে তবে নামে সন্ধ্যাবতী,
মায়ের চরণে পড়ে করেন প্রণতি।…
প্রিয়বতী বলে বাছা দেবী সন্ধ্যাবতী
সত্যপীরে কৈল মাও এতেক দুর্গতি।…
দুধ কলা আনিয়া দিলেন মালাবতী,
খাইলেন সত্যপীর হইয়া কৃপামতী।
তবে পুনঃ সত্যপীর হইল অন্তর্দ্ধান,
অমর শহরে গিয়া দিল দরশন।

শিশুপাল রাজার পালা ঃ

সত্যপীর সন্ন্যাসীর বেশে অমর শহরে গেলেন। সেখানকার রাজার নাম শিশুপাল। রাজা নরবলি দিয়ে অর্দ্ধকালী পূজা করেন।

সেদিন পূজা। সুদর্শন এক বালককে বলিদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসহায় বালকটিকে দেখে পীরের প্রাণে জাগল মায়া। তিনি রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন। রাজা ভিক্ষা দিতে রাজী হলেন না। সত্যপীর সেই বালককে উপহার স্বরূপ চাইলেন। রাজা বললেন,—স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণুকেও এই ভিক্ষা দেওয়া হবে না। সক্রোধে সত্যপীর স্থান ত্যাগ করলেন। বালক এক মনে সত্যপীরকে স্মরণ করতে লাগল।

বলিদানের জন্য বালকের স্কন্ধে খড়্গাঘাত করা হল, কিন্তু খড়্গের আঘাত তার লাগল না, বরং খড়্গ ভেঙে হল দু'খণ্ড। রাজা চিন্তান্বিত হয়ে হুকুম দিলেন,—নিয়ে এস 'সোম ছেদা' খাঁড়া। আনা হল খাঁড়া। তাতে মন্ত্র পড়ে দেওয়া হল। ইতিমধ্যে সত্যপীর শ্বেতমক্ষি-রূপে বালকের স্কন্ধে এসে বসলেন। তিন তিন বার বালকের স্কন্ধে সে খাঁড়া নিক্ষেপ করা সত্বেও যখন বালকের কোন আঘাত লাগল না তখন,—

রাজা বলে দাওলিয়া ফেলাও হাতের দাও।
খিল খসাইয়া ছেলের মুখে জল দাও

রাজা নদীতীরে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর বিবরণ জেনে নিলেন এবং তাঁকে ডেকে পাঠালেন সন্ন্যাসী রাজ-আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে রাজাকেই তাঁর কাছে আসতে বললেন। রাজা এলেন ফকিরের নিকট।

করজোড়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে রাজা বললেন,—বংশ রক্ষার জন্য এইরূপ বলিদানের ব্যবস্থা ;—

সত্যপীর বলেন রাজা গন্ধ পুষ্পে কর পূজা
নরবলি দিতে না জুয়ায়।
নরবলি দিতে চাহ পুত্রের কারণ।
পরকালে কি হইবে না বুঝ রাজন্ ॥

সত্যপীর আত্মপরিচয় দিলেন এবং বললেন,—পাঁচ রাণী যদি 'নিলা' নদীতে স্নান করে তপস্যা করেন তবে পাঁচটি রম্ভা পাবেন। সেই রম্ভা প্রাপ্তি-যোগের কার্য্যক্রমে রাজার বংশ রক্ষা হবে।

রাণীগণ যথা-পরামর্শ ব্রত পালন করে পাঁচটি রম্ভা পেলেন। নদী থেকে ফেরার পথে সাক্ষাত হল এক ফকিরের সাথে। ফকির বল্লেন,—আমি ক্ষুধার্ত, ঐ ফল আমায় খেতে দাও। চার রাণী ফকিরকে অবহেলা করলেন। ছোটরাণী বিন্দুমতী ভাবলেন,—"ফলদানে ফল পায় লোকমুখে শুনি।" তিনি তাঁর রম্ভা ফলটি ফকিরকে দিলেন। ফকির সেটি খেয়ে শুধু চোচা খান রাণীকে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন,—

ধর বাছা চোচায় ধুইয়া খাও জল।
অবশ্য খোদায় তোরে দিবে বংশ বল ॥

চার রাণী চার ফল আনায় রাজা খুশী। ছোট রাণী 'চোচাখান' আনায় রাজা তাঁকে গালি দিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস,—

ছোট রাণীর গর্ভ হইল সত্যপীরের বরে,
চারজন বাঞ্জা হইল অভাগ্যের ফলে।

ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে দাই-এর সাহায্যে ছোট রাণীর গর্ভ নষ্ট করার জন্য চার রাণী চেষ্টা করলেন ; কিন্তু পারলেন না। সত্যপীর তাঁকে রক্ষা করলেন এবং দাই-এর নাক-কান কেটে শাস্তি দিলেন।

যথাসময়ে ছোট রাণীর অপরূপ এক ছেলে হল। খল দাসাগণ রাজাকে জানাল,—

ছোট রাণীর হৈল এক চাঁদের বালক।

রাজা বিমর্ষ হলেন। অন্য রাণীরা হলেন আনন্দিত। তাঁরা কৌশলে সেই ছেলেকে বাক্স-বন্দী করে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করলেন; কিন্তু তাঁকে রক্ষা করলেন গঙ্গাদেবী। খোওয়াজের অনুরোধে বসুমতী শিশুকে দুধ দিয়ে বাঁচালেন। বসুমতীর সহিত খোওয়াজের কলিকাল-বিষয়ক কথোপকথন হল। শেষে সত্যপীর নিয়ে গেলেন শিশুটিকে।

পুত্রশোকে কাতর হয়ে ছোট রাণী ঝাঁপ দিতে গেলেন 'নিলা' নদীতে। সত্যপীর সেখানে হাজির হলেন। শিশুপুত্রকে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বল্‌লেন,—

পূর্বে যেই ফকিরকে কলা দিছ ভিক্ষা,
সেই ফকির আসি তোমার পুত্রকে কৈলাম রক্ষা।

রাণী তো মহা খুশী। রাজার কাছে সংবাদ গেল। পুত্রকে পেয়ে রাজা মুক্তি দিলেন বন্দীদের, ষড়যন্ত্রকারী রাণীগণকে ঘর থেকে বের করে দিলেন, পুত্রের নাম-কল্প করে সত্যের সেবার ব্যবস্থা করলেন। সত্যপীর এবার চল্‌লেন মাইলানিনগরে হীরা মুচির বাড়ী।

হীরা মুচির পালা ঃ

সত্যপীর হীরা মুচির বাড়ীর সামনে এসে জিগীর ছাড়লেন। হীরা মুচী তো মহাখুশী। কিন্তু হায়! ফকিরকে দিবার মত তার ঘরে তো কিছু নাই। পুত্র মধুরামের সঙ্গে সে পরামর্শ করলো। কোনও উপায় না দেখে, ফকিরকে অপেক্ষা করতে বলে, সে বাজারে চল্‌ল জুতা বিক্রী করতে। পথিমধ্যে সত্যপীর, পেয়াদার বেশে তার জুতো কেড়ে নিলেন,—দাম দিলেন না। হীরা ফিরে এল বাড়ীতে। বেঙ্গা মুদীর দোকানে পুত্রের কাজ করার সর্তে আগাম টাকা নেবার পরামর্শ করতে মধুরাম তো ক্ষুব্ধ হল। অবশেষে মধুরাম রাজী হল। তখন পিতা-পুত্রে চল্‌ল বাজারের দিকে।

সত্যপীর, হীরাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মধুরামকে জীয়ন্তে খেয়ে ফেলার জন্য নাগেশ্বরী নাম্নী বাঘকে আদেশ করলেন। নাগেশ্বরী তা-ই করল। হীরা শোকে-দুঃখে আহত হয়ে ভিক্ষা করতে গেল মোগলের বাড়ী। মোগল বল্‌ল যে যদি হীরার স্ত্রী তার মসজিদ তৈয়ারীর সুরকী কুটে দিতে পারে তবে সে আগাম চার আনা দেবে। হীরা দ্রুত বাড়ী ফিরে পত্নী মহেসীর (মহেশীর)

—৩১

সম্মতি চাইল। পতিব্রতা মহেশী সম্মতি দিলে, পত্নীকে সঙ্গে নিয়েই হীরা গেল মোগলের কাছে। সেখান থেকে যখন সে ফকিরের কাছে ফিরে এল, ততক্ষণে বিলম্বের দরুণ ফকির অধৈর্য্য হয়ে গেছেন। তিনি এর জন্য হীরাকে তিরস্কার করলেন। হীরা বল্‌ল,—

যে জন ফকির হয় বৃক্ষ হইতে ছোট।
ফকিরে না করে ক্রোধ সিধা হয়ে চলে,
হইয়া থাকিবে যেন তরুর সামিলে।
শুকাইয়া গেলে বৃক্ষ জল নাহি পায়,
গাছ-সম হৈতে পারে ফকির বলি তায়।
মালিকের নিজ নাম জপিয়া অন্তরে,
হইয়া নিরঘিন বেশ দেশে দেশে ফিরে।
শোনহ্‌ ফকির সাহেব আমার বচন,
ফকির হইয়া এত ক্রোধ কি কারণ।······
মুচারে কহিল এহি শাস্ত্র-যুক্তি কথা,
শুনিয়া লজ্জিত ওলি হেট কৈল মাথা।

ফকির সন্তুষ্ট হয়ে হীরাকে আটা, কলা, ঘি, মধু প্রভৃতি কিনে আন্‌তে বল্‌লেন। হীরা তা-ই করল।

হীরা বলে মোর হাতে কেহ নাহি খায়,
তুমি যে খাইতে চাহ শুনি লাগে ভয়।······
সত্যপীর বলে মোর জাতি-ভেদ নাই,
যে জন ভক্তি করে তার হাতে খাই।

ফকিরের শিরনি প্রস্তুত হল। বস্ত্রদ্বারা আড়াল করে তিনি আহার করতে চাইলেন। হীরার বস্ত্রের অভাব কিন্তু চর্ম আছে ঘরে। তা দিয়ে আহারের জায়গা আড়াল করা হল। ফকির জিগীর ছেড়ে সেই চর্ম স্পর্শ করতে তা সুন্দর দেওয়াল হল। ফকির এবার হীরার পরিবারের সকলকে কাছে ডাকলেন; কিন্তু হীরা ছাড়া কাউকে পেলেন না। সমস্ত বিবরণ জেনে ফকির ফিরিয়ে আনলেন মধুরামকে।

সত্যপীর বলে তুমি ধন্য রে মুচার
তোমার সমান ভক্ত কেহ নাহি আর।

পিতা-পুত্র ও সত্যপীর একসাথে শিরিনি গ্রহণ করলেন। সত্যপীর এতক্ষণে আপনার পরিচয় দিলেন।

এ দিকে মোগল, সুন্দরী মহেশীকে সম্ভোগ করার ব্যবস্থা করল। সত্যপীর শ্বেত-মক্ষিরূপে মহেশীকে অভয় দিলেন। সত্যপীরের অভিশাপে মোগল অন্ধ হল। মোগল, মহেশীর পায়ে ধরতে দয়াপরবশ হয়ে মহেশী বল্‌ল,—

সত্যপীর করুক তুমি পাও চক্ষুদান।

পীরের দয়ায় মোগল চক্ষুষ্মান হল। তখন সে মহেশীকে একশত টাকা, কিছু অলঙ্কার দিয়ে দুই জন দাসীর সাথে সসম্মানে বাড়ী পাঠিয়ে দিল। পত্নীকে দেখে হীরা হল খুশী।

হীরার দুঃখ মোচনের জন্য সত্যপীর তাকে দুই-ঘড়া ধন দিতে চাইলেন—,

হীরা মুচি বলে সাহেব ধনের নাই কাম,
ভিক্ষা করিয়া আমি লব তোমার নাম।

শেষে হীরা সে ধন নিতে রাজী হল। ফেরার পথে বুনন কোতালিনী এক ঘড়া ধন চাইল। হীরা তাকে কৌশলে এড়িয়ে বাড়ী চলে এল।

সত্যপীর বিশ্বকর্মাকে দিয়ে এক গৃহ নির্মান করিয়ে দিলেন। হীরা খুশী হয়ে সেখানে বাস করতে শুরু করল।

হীরার বাড়ী যেন রাজপুরী। নাম তার হীরাগঞ্জ। হিংসায় উন্মত্ত বুনন কোটাল গিয়ে সে বিবরণ জানালো রাজা মানসিংহের কাছে। মানসিংহ ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্যদ্বারা হীরাকে বেঁধে রাজসভায় আনালেন। রাজা বললেন,—'সব ধন নিয়ে এস।' হীরার সঙ্গে লোকজন গেল। মোহর, মোতি, হীরা, পান্না দেখে তো তারা অবাক। কিন্তু হায়! সে সব সিন্ধুকে পুরে তারা দেখল—সবই 'খোলা আর খাপার।' হীরার চাতুরী মনে করে তাকে খুব প্রহার করা হ'ল। হাতে কড়া, পায়ে বেড়ী ও বুকে পাথর দিয়ে তাকে বন্দীশালায় নিক্ষেপ করা হল। হীরা কারাগারে বসে সত্যপীরের চৌতিশা পাঠ করতে লাগল, অভিমান ভরে অনেক মন্দ কথা বলতে লাগল।

সত্যপীর কয়, প্রাণে নাহি ভয়,
কেনে মোরে মন্দ বল।

পোহাক তিমির, দেখাব জাহির
যতেক করিব আমি ॥

সত্যপীর নিশি শেষে রাজা মানসিংহকে স্বপ্নে বললেন,—তোমাকে মারিয়া রাজ্য মুচারকে দিব।

স্বপ্নভঙ্গে ভীত রাজা মানসিংহ পরদিন কোটালকে ডেকে হীরাকে মুক্ত করালেন এবং সমস্ত ধন-সম্পদসহ বাড়ীতে ফেরবার ব্যবস্থা করলেন। হীরা বাড়ীতে ফিরে এলে মহেশী খুব খুশী হল। হীরা আবার সত্যপীরের শিরনি দিল। সত্যপীর তাদেরকে সুখে থাকবার আশীর্ব্বাদ করে স্থানান্তরে চলে গেলেন!

শশী বেশ্যার পালা ঃ

সত্যপীর চলেছেন বগজোড় সহরে। আজাজিল তাঁকে ছলনা করবার জন্য পাটনী সেজে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। সে ভগ্ন-মনোরথ হলো না। শশী বেশ্যাকে মাধ্যম করে পুনরায় চেষ্টা করতে লাগল।

শশী মাঝপথে সত্যপীরকে ধরে রাখতে চাইল। সত্যপীর ছেলের মূর্ত্তি ধরতে শশী তাঁকে কোলে নিতে গেল। সত্যপীর তৎক্ষণাৎ শুয়া পক্ষী হয়ে উড়ে গেলেন। শশী হার মানল; ক্ষমা প্রার্থনা করল। সমস্ত ধন-সম্পদ বিতরণ ক'রে সে সত্যপীরের নিকট আত্ম-সমর্পন করল। পীরের নির্দ্দেশে সে সরযূ নদীতে স্নান করে নীল শাড়ী পরিধান করে পীরের চরণে পতিত হল এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। পীরের নির্দ্দেশে সে পুনরায় সরযূ নদীতে স্নান করে তীরে প্রাপ্ত পাথর বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে সেখানে মাথা কুটে মরতে চাইল। সত্যপীর সেই পাথরকে সেবা করবার জন্য শশীকে বললেন। শশীর বেশ্যা নাম ঘুচে গেল; নূতন নাম হল জসি ফকিরাণী। সেই নীলবর্ণ পাথর শ্বেত পাথর হল। সত্যপীর তাতেই গায়েব হলেন।

এক মালিনী বাজারে চলেছে ফুল বেচতে। ফকিরাণী তার কাছে পীরের পূজার জন্য ফুল চাইল। সে ফুল দিল না। বাজারে গেলে আকস্মাৎ সে ফুলে আগুন জ্বলে উঠল। মালিনীর সম্বিৎ ফিরে আসতে সে ফকিরাণীর নিকট এসে ক্ষমা চাইল। পরদিন সে ফুলের সুন্দর একটি মালা এনে শ্বেত-পাথরে পরিয়ে দিল। অমনি বাজারে তার ফুলের চাহিদা বেড়ে গেল। ষোল কাহন কড়ি পেয়ে সে সত্যপীরের শিরনি দিল।

জসমন্ত সাধুর পালা :

কদম্ব বৃক্ষের তলে পাথররূপে সত্যপীর অবতার হয়েছেন। "যে যেমন কামনা করে সিদ্ধ হয় তার।" জসমন্ত সাধু বাণিজ্য-যাত্রা করেছেন। তিনি কদম্বতলে এসে ফকিরাণীকে বললেন,—তেলঙ্গা পাটনে গিয়ে যদি দশগুণ বেপার হয় তবে ধন-পুত্র নিয়ে ফেরবার সময় যত বেপার লাভ হবে তার সবই সত্যনারায়ণকে দিয়ে যাবেন। ফকিরাণী তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

জসমন্ত সাধুর নৌকা সরযূ নদী বেয়ে হস্তিনানগর অতিক্রম করে দিল্লী থেকে আরো এগিয়ে চলল। তিনি ত্রিপুরার ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ালেন। চা'ল, গম, সরষে, কলাই প্রভৃতির ব্যবসায় করে তাঁর দশগুণ বেপার হল। ব্যবসায়-অন্তে তিনি ফিরে এলেন বগজোড়ে, কিন্তু সত্যপীরকে প্রতিশ্রুত এক ডিঙ্গা ধন না দিয়ে, দিতে চাইলেন কেবল মাত্র শিরনি। সত্যপীর অসন্তুষ্ট হয়ে জসমন্ত সাধুর প্রধান ডিঙ্গা হংসমোড়ার দাঁড়ি-মাঝিকে নদীতে ফেলে দিয়ে সেই ডিঙ্গাকে কদম্বের তলে এনে বাঁধলেন। সকালে তিনি নিদ্রাভঙ্গে ঘাটে ডিঙ্গা নেই দেখে কেঁদে ফেললেন। পুত্রের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত থেকে অবগত হয়ে তিনি পুত্রসহ সত্যপীরের দরগাহে আবার এসে কেঁদে পড়লেন। সাধুর পুত্র ঘাটে সেই ডিঙ্গা পেয়ে হল আনন্দিত।

শুদ্দি সওদাগরে পালা :

সত্যপীর এলেন বনগ্রামে। সেই অঞ্চলের কর্ণপুর গ্রামে নিঃসন্তান শুদ্দি সওদাগর থাকেন। পুত্র কামনায় তিনি ফকির-বৈষ্ণবকে দুধছত্র দেন। দুধছত্র দিতে দেখে পীর সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন। শুদ্দি তো নাছোড়বান্দা। পীর বললেন,—

দুধ খাওয়াইয়া তুমি দোওয়া শিখাও আগে।
এহি সে কারণে কারো দোওয়া নাহি লাগে॥

সত্যপীরের কথানুযায়ী সওদাগর তদীয় পত্নীকে বাড়ীর বাইরে ডেকে আনলেন। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে,—যদি দুই পুত্র লাভ হয় তবে কনিষ্ঠ পুত্রকে তাঁরা পীরের নফর হিসাবে দান করবেন। পীর তাঁদেরকে মুচিকান্ত ও নিশিকান্ত নামে দুটি ফুল দিলেন। সেই ফুল-ধোওয়া জল খেয়ে সওদাগর-পত্নী গর্ভবতী হলেন। যথা সময়ে তাঁর অপরূপ দুই পুত্র ভূমিষ্ঠ হল।

কনিষ্ঠ-পুত্রকে ত্যাগ করতে হবে—এ কথা ভাবতে তাঁদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়।

বারো বছর পর পীর এসে উপস্থিত। তিনি কনিষ্ঠ পুত্রকে চাইলেন। সওদাগর বললেন,—কনিষ্ঠ জন তো পুত্র নয়,—কন্যা। পীর বুঝলেন সওদাগরের কপটতা। পীর বললেন,—আমি তাদেরকে আশীর্বাদ করতে চাই। সওদাগর অগত্যা পুত্রকে আনলেন নারীর সাজে। পীর তখন পবনের সহায়তায় তাকে বিবস্ত্র করলেন ;—সওদাগরের কপটতা ফাঁস হয়ে গেল। সওদাগর পীরের পায়ে ধরলেন,—তবুও পুত্রকে দিতে হল। পীর তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলে সওদাগর পুত্রশোকে নিদারুণ অভিভূত হলেন।

কাশীকান্ত রাজার পালা ঃ

সত্যপীর এলেন শঙ্খহাটা নামক গ্রামে। সেখানে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি। পীরের বেশ এবার অর্দ্ধসন্ন্যাসী-অর্দ্ধফকিরের।

সে গ্রামে এক পাঠশালা চলছে। পীর সেখানে গিয়ে উপস্থিত। তাঁর চেহারা দেখে তাঁকে কেউ বলল—পাগল, কেউ বলল—নাড়া, কেউ বা বলল শাস্ত্র ছাড়া। পীর বললেন,—কাঁচা দুধ, পাকা রম্ভা, মধু, চিনি ও আটা দিয়ে ফলাহার দাও ; আর দাও একটা পৈতা। এক ছাত্র পীরকে একটি সংস্কৃত শ্লোকে গালি দিল। পীর তাকে সাত পুরুষ মূর্খ থাকবার অভিশাপ দিয়ে চলে গেলেন।

পীর এক পুকুরের ধারে গিয়ে আসন করলেন এবং অলৌকিক শক্তিতে সেখানকার সমস্ত ব্রাহ্মণের পৈতা হরণ করলেন। ব্রাহ্মণগণ এসে পীরকে ধরলেন—

কে তুমি কপট বেশে,
ফিরি সব দেশে দেশে,
দয়া করি দেহ পরিচয়।
কেনে মনে ক্রোধ করি, যজ্ঞসূত নিলে হরি,
তোমার এমত ধর্ম নয়॥

পীর বললেন—

তোমরা ব্রাহ্মণ বটে,
কেহ নহ বড় ছোট,

কাল সর্প-সকলি সমান।
সন্ন্যাসী ফকির প্রতি,
কিছু কর ভয় ভক্তি
তোরা হৈলি পড়ুয়া শয়তান।

অতঃপর তিনি আত্ম-পরিচয় দিলেন। ব্রাহ্মণগণ আত্ম-সমর্পণ করায় পীর তাঁদেরকে আশীর্বাদ করলেন। সকলে মিলে সত্যনারায়ণের ভোগ দিলেন এবং তা জাতিভেদ বিচার না করে সকলে বণ্টন করে খেলেন।

রাজা কাশীচন্দ্র এ ঘটনার কথা শুনে রেগে আগুন। পেয়াদা এসে শঙ্খহাটির ব্রাহ্মণগণকে বেঁধে নিয়ে চল্‌ল। সেই সাথে সন্ন্যাসীও চললেন।

বিপ্রগণ রাজাকে সত্যপীরের কথা জানালেন। রাজা বল্‌লেন,—আপনারা ব্রাহ্মণত্ব হারিয়েছেন। সন্ন্যাসী তাঁর পীরত্ব জাহির করুক তো দেখি।

পীর শ্বেত মক্ষিরূপে রাজ-অন্তঃপুরে গেলেন এবং রমণীগণের সুবুদ্ধি হরণ করলেন। তারা তখন বেশ্যাবৎ "বিদ্যাধরি হইয়া সবে নাচিতে লাগিল।" ব্যাপার দেখে সকলে স্তম্ভিত। রাণীও কি পাগলিনী হলেন! রাজাও বিস্মিত হলেন—

বীরভূমের রাজা আমি রাঢ়ে বঙ্গে নাম।
কলঙ্ক রাখিল রাণী ছাড়ি নিজ ধাম॥

সত্যপীর রাজাকে বললেন,—আর কি জাহির দেখতে চান? রাজা রেগে পীরকে ইন্দারাতে ফেলে দেওয়ালেন।

এক গাছি সূতা বেরিয়ে এসে রাজার গলায় আবদ্ধ হল। রাজা আকৃষ্ট হলেন কূপের মধ্যে। কোন অস্ত্রে কোন উপায়ে সে সূতা কাটা গেল না। রাজা গিয়ে পড়লেন কূপের মধ্যে। রাজা বল্‌লেন, অপরাধ মার্জনা করুন। পীরের দয়া হল। তিনি ক্ষমা করে রাজাকে কলেমা শোনালেন। রাজা পীরকে সযত্নে নিজ পুরীতে নিয়ে রত্ন-সিংহাসনে বসালেন। লক্ষ টাকা ব্যয় করে পীরের ভোগ দিলেন। পীর সন্তুষ্ট হয়ে পূর্বদিকে চল্‌লেন।

ধনঞ্জয় গোয়ালার পালা ঃ

ধনঞ্জয় গোয়ালার বাড়ী। সে বড় অহঙ্কারী। সত্যপীর এলেন ধনঞ্জয়ের বাড়ী এবং তাঁর আগমন-বার্তা জিগীর ছেড়ে জ্ঞাপন করলেন। ধনঞ্জয় গোয়ালা ঘরের বাইরে এল। ফকিরকে সে দিল তার এঁটো অন্ন। পীর অভিশাপ দিলেন,—আজ থেকে তোর লক্ষ্মী ছাড়্ল। পর জন্মে তুই শৃগাল-কুকুর হয়ে পরের এঁটো খেয়ে জীবন কাটাবি। গোয়ালা তাঁকে পাগল বলে গালি দিল। সেই মুহূর্তে এক শঙ্খচিল গোয়ালার হাতের থালা উঠিয়ে নিয়ে তার মাথায় নিক্ষেপ করল। ধনঞ্জয় গোয়ালা নিদারুণ আঘাত পেয়ে ভূমিতলে পড়ে গেল।

ধনঞ্জয়ের ধানের গোলা মাটির তলায় গেল। হাজার গরু মৃগ হয়ে বনে প্রবেশ করল। তাকে নিঃস্ব হয়ে চার পুত্রের হাত ধরে ভিক্ষায় বেরুতে হল! শেষে সে এমন অবস্থায় এল যাতে তাকে লুটিয়ে পড়তে হল পীরের পদতলে। দয়ার পীর সত্যপীর তাকে ক্ষমা করলেন।

মঙ্গলু বাদ্যকরের পালা ঃ

দূর্বাদল নগর। মঙ্গলু বাদ্যকরের সেখানে বাড়ী। কুঁড়ে-আতুররূপে সত্যপীর এলেন তার বাড়ীতে। তিনি কিছু খাবার চাইলেন। মঙ্গলু বড় গরীব। সে সময় তার ঘরে একটু জলও আনা ছিল না। আহা! ফকিরকে সে কি দেবে! ফকির বল্লেন,—তোর ঘরে দু'হাঁড়ি ভর্তি কাঁচা দুধ, আটা ও রম্ভা আছে। মঙ্গলু তো অবাক্। ঘরে গিয়ে সে দেখ্ল,—কথা সত্য বটে। সেগুলি যত্ন করে এনে সে ফকিরকে খেতে দিল। ফকির তা সানন্দে আহার করলেন। তিনি মঙ্গলুকে আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন,—

রোজা ও নামাজ পরে কায়েম রহিবে,
গরীব দুঃখীর পর রহম করিবে।

তিনি আরো বল্লেন,—সে যেন মইন গিদালের গৃহে তার কন্যার বিবাহ দেয়।

সত্যপীর সেখানে আরো কিছুদিন রইলেন। মঙ্গলুর পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। তাকে আশীর্বাদ করে সত্যপীর চল্লেন ময়েন গিদালের বাড়ীর দিকে।

ময়েন গিদালের পালা ঃ

রাজা ময়েন গিদালের প্রাসাদ জয়নগরে। তিনি মুসলিমের শত্রু। মমিন-মুসলমানকে পেলে তিনি মা কালীর মন্দিরে বলি দেন। সত্যপীর সে অঞ্চলে গিয়ে জিগীর ছাড়লেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এল বুড়ী। বালক ফকিরকে দেখে বুড়ীর বড় মায়া হল। বালকের কেহ নেই শুনে বুড়ী তাকে আপনার ঘরে স্থান দিল। সে বালক-ফকির খেলেন দুধ-কলা এবং আটার তৈরী খাদ্য।

পরের দিন বালক-পীর ধরলেন আসলরূপ। সত্যপীর এবার এলেন রাজবাড়ীর কাছে। তিনি জিগীর ছাড়লেন। রাজা এলেন প্রাসাদের বাইরে কিন্তু পীরের প্রতি কোন রুক্ষ ব্যবহার করলেন না। বরং তিনি খুবই নম্র ব্যবহার করলেন। কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর মনের এই পরিবর্ত্তন হয়েছিল। তিনি পীরকে প্রণতি জানালেন। পীরের নামে তিনি শিরনি দিলেন এবং তাঁর চিরদাস হলেন।

সত্যপীরের মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের একটা মিলনের চেষ্টা এই কাব্যের মূল লক্ষ্য।

বিভিন্ন পাঁচালী কাব্যের প্রভাব এই কাব্যে সুস্পষ্ট। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্যনীয়।

পীর একদিল শাহ কাব্যে আছে,—আশক নূরী, 'সান' নদীতে স্নান করতে গিয়ে ভেসে আসা 'দুলাল' ফুল পান। তার ঘ্রাণে আশক নূরীর গর্ভ সঞ্চার হয়। এ কাব্যেও অনুরূপ ঘটনায় দেখা যায়, সন্ধ্যাবতী, এন্নর নদীতে স্নান করতে গিয়ে ভেসে আসা দুলাল ফুল পান। তার ঘ্রাণে সন্ধ্যাবতীর গর্ভ সঞ্চার হয়।

সত্যপীরের পবিত্র স্পর্শে পাপীয়সী কচ্ছবিনী মুক্তি পেয়ে স্বর্গে যাওয়ার কাহিনী অহল্যার শাপ-মোচনের কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সত্যপীরের গলায় পাথর বেঁধে তাঁকে জলে নিক্ষেপ করা হল, তাতেও তাঁর মৃত্যু হল না। পুরাণে বর্ণিত প্রহ্লাদের চরিত-কাহিনীর সংগে এর সাদৃশ্য বিদ্যমান।

সত্যপীর এই কাহিনী-অংশের একস্থানে বলছেন,—

"বন্ধন দারুণ জ্বালা সহিতে না পারি।"

ননী চোর কৃষ্ণের বন্ধন জ্বালার কথা আমাদের মনে পড়ে। এখানে কৃষ্ণ-কাহিনীর প্রভাব লক্ষণীয়।

মুসলিম বিদ্বেষী মৈদানবের পুত্রবধূদ্বয় যথাক্রমে রূপবতী ও মালাবতী পীর-ভক্ত। বধূদ্বয় পীরকে পূজা করলেন। মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা বিদ্বেষী চাঁদ সওদাগরের পুত্রবধূ বেহুলা মনসা-ভক্ত। মানিক পীর কাব্যেও দেখা যায় পীর বিদ্বেষী এক বৃদ্ধা ঘোষ জননীর পুত্রবধূ সনকা, মানিক পীরকে শ্রদ্ধাদি নিবেদন করেছেন।

শিশুপাল রাজার পালায় দেখা যায় রাজা শিশুপাল অর্ধকালী ভক্ত। তিনি নরবলি দেন। সত্যপীরকে জনৈক বালকের প্রাণ রক্ষার জন্য রাজার সঙ্গে তাঁকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। পীর গোরাচাঁদ কাব্যে দেখি জনৈক মমিন এবং তার পরিবার ঠিক অনুরূপভাবে হাতিয়াগড়ের অধিপতি কর্তৃক অনুসৃত বলিদান কুপ্রথার শিকার হয়েছে। এর বিরুদ্ধে এবং উক্ত পরিবারের প্রাণ রক্ষার জন্য পীর গোরাচাঁদকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। অবশ্য সত্যপীরকে সংগ্রামের সাফল্যের সাথে পীর গোরাচাঁদের ন্যায় শহীদ হতে হয় নি।

এক স্থানে হীরার কথায় আছে,—

> ফকিরে না করে ক্রোধ সিধা হয়ে চলে,
> সহিয়া থাকিবে যেন তরুর সামিলে।
> শুকাইয়া গেলে বৃক্ষ জল নাহি পায়,
> গাছ সম হৈতে পারে ফকির বলি তায়।

এই অংশে বৈষ্ণব প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,—"হীরা মুচির কাহিনীতে ধর্মপূজা পদ্ধতির সদাই ডোমের উপাখ্যানের প্রভাব আছে।" অন্যত্র আছে রাজা কাশীকান্ত, সত্যপীরের কিছু কেরামতির পরিচয় পেতে চাইলেন। সত্যপীর আপনার যথাযথ পরিচয় দিলেন। পীর গোরাচাঁদ কাব্যে দেখা যায় রাজা চন্দ্রকেতু, গোরাচাঁদের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেতে চাইলেন। "সেক শুভোদয়ায়" সেককে অনুরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতে হয়েছে।

এই কাব্যে মানব চরিত্রই প্রধান,—পশু চরিত্র প্রায় অনুপস্থিত। কোন]

দেব-চরিত্রও নেই। কাহিনী কিছুটা উপকথা জাতীয়। কাহিনা ঐতিহাসিক মনে হলেও বস্তুতঃ ইতিহাসের বস্তু এতে নেই। চর্য্যাপদের ন্যায় এর সাধন-ভজন প্রকাশক পদ লক্ষ্যণীয় ;—

বুঝিলাম ২ গুরুকথা কহি সার
ফকিরের অন্ত এই শরীর বিচার।
পড়িলে সে পড়া নহে বুঝিলে সে হয়,
বুঝিলে সে বড় নহে সাধনে সে পায়।
এক গোটা তালবৃক্ষ দেখিতে সুন্দর,
একটা ছাগল বান্ধা তলায় তাহার।
তালের শিকড় যদি ছাগলে না চাটে,
তবে আর তালগাছের মাঞ্জা নাহি ফুটে।
ছাগল চাটেন যদি তালগাছের গোড়,
বুঝ বাবা সত্যপীর ফকিরের ওড়। ইত্যাদি।

সত্যপীর এই কাব্যের মূল চরিত্র। তাঁকে কেন্দ্র করে দশটি খণ্ড কাহিনী গড়ে উঠেছে। খণ্ড কাহিনীগুলি অবশ্য এক-একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কাহিনী। বনবিবি কাব্যে অবশ্য নারায়ণী জঙ্গ পালা ও ধোনা-দুখে পালা নামে দুটি খণ্ড কাহিনী আছে ; মানিক পীর কাব্যে কিনু গোয়ালার কাহিনী ও রঞ্জনা বিবির কাহিনী নামে দুটি খণ্ড কাহিনী আছে ; বড়খাঁ গাজীকে নিয়ে রায়মঙ্গল কাব্য, গাজী সাহেবের গান এবং কালু-গাজী-চম্পাবতী কাব্য পৃথক পৃথকভাবে রচিত হয়েছে—কিন্তু বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথির ন্যায় এতগুলি খণ্ড কাহিনী এদের আর কারো মধ্যে দেখা যায় না যাদের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মালঞ্চার পালায় মুসলমান-বিদ্বেষী রাজা মৈদানবের গৃহে জন্মগ্রহণ করে সত্যপীর তাঁকেই দমন করেছেন।

শিশুপাল রাজার পালায় দেখা যায়, অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন রাজা, অর্ধকালীর পূজায় নরবলি দিয়ে (নর) সন্তান কামনায় উন্মত্ত। তাঁর সেই উন্মত্ততাকে সত্যপীর দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করেছেন।

হীরা মুচির পালায় দেখা যায়—হীরা দরিদ্র কিন্তু পরম অতিথি-বৎসল।

হীরা তার এই সদ্‌গুণের অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সত্যপীর কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে।

শশী বেশ্যার পালায় দেখা যায়—হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যাদের চিরকালের মত স্থান নেই দয়ার পীর সত্যপীর তাঁর আদর্শ মাধ্যমে সুপথে আগমনকারী শশীকে শুধু সত্যপীরের সেবার অধিকার নয়,—সে যাতে সমাজে পূজারিণীরূপে স্থান পায় তার ব্যবস্থা করেছেন।

জসমন্ত সাধুর পালায়, জসমন্তর ন্যায় প্রতারককে সত্যপীর উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন। শুন্দি সওদাগরের পালায়ও তিনি অনুরূপভাবে শুন্দি সওদাগরকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছেন।

কাশীকান্ত রাজার পালায় দেখা যায় যে, বর্ণাশ্রম প্রথার অপপ্রয়োগকারীকে সত্যপীর উপযুক্ত শাস্তি ও শিক্ষা দিয়েছেন।

ধনঞ্জয় গোয়ালার পালায় দেখা যায় ধনঞ্জয় বড় অহঙ্কারী। মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করায় সত্যপীর তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন।

মঙ্গলু বাদ্যকরের পালায় দেখা যায়,—ভক্ত মঙ্গলুকে সত্যপীর উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করেছেন।

ময়েন গিদালের পালায় দেখি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে ময়েন গিদাল আপনা-আপনিই পরিবর্তিত হয়ে ধর্মবিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়েছে।

সত্যপীরের নামে এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত পাঁচালীকারের কাব্যগুলির কথা জানতে পারা গেছে ঃ—

ক। ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড অপরার্ধ) গ্রন্থে উল্লিখিত ;—

১। ভৈরবচন্দ্র ঘটক—১৭০০-১৭০৯
২। ঘনরাম চক্রবর্তী—১৩৫১ সালে বর্ধমান সাহিত্য-সভা কর্তৃক প্রকাশিত।
৩। রামেশ্বর (ভট্টাচার্য্য) চক্রবর্ত্তী—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।
৪। ফকির দাস

৫। বিকল চট্ট—১৬৩৪
৬। দ্বিজ গিরিধর—১০৭০
৭। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী—১০৭০
৮। মৌজিরাম ঘোষাল
৯। কৃষ্ণকান্ত
১০। শিবচরণ
১১। রামশঙ্কর সেন
১২। দ্বিজ কৃপারাম—১৭৭৯-১৮৩২
১৩। কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম—১৭৪০
১৪। দ্বিজ রামধন
১৫। দ্বিজ নন্দরাম—১২৩২ সাল
১৬। অযোধ্যারাম রায় কবিচন্দ্র
১৭। দ্বিজ রামভদ্র
১৮। দ্বিজ বিশ্বেশ্বর—১১৫১ সাল
১৯। ভারতচন্দ্র রায়—১৭৩৭ ইং
২০। দ্বিজ জনার্দ্দন—১১৭০
২১। দ্বিজ অমর সিংহ
২১। দ্বিজ রামচন্দ্র—উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ
২৩। দুর্গাপ্রসাদ ঘটক—১২১০
২৪। ঈশান গোস্বামী—১২৫৬
২৫। নরহরি
২৬। মধুসূদন
২৭। দ্বিজ কালিদাস
২৮। দ্বিজ বিশ্বনাথ
২৯। গোবিন্দ ভাগবত
৩০। শিবচন্দ্র সেন
৩১। বিপ্রনাথ সেন
৩২। দ্বিজ রামকিশোর

৩৩। লালা জয়নারায়ণ সেন

৩৪। দ্বিজ রামানন্দ

৩৫। দ্বিজ রঘুনাথ—১২৬৬

৩৬। দ্বিজ রামকৃষ্ণ

৩৭। ফকিরচাঁদ

৩৮। দ্বিজ দীনরাম—'অবসর' পত্রিকায় ১৩১২ ফাল্গুন সংখ্যা।

৩৯। নয়নানন্দ

৪০। দ্বিজ রঘুরাম

৪১। দ্বিজ হরিদাস

৪২। বিজয় ঠাকুর

৪৩। শিবরাম রাজা

৪৪। দেবকীনন্দন

৪৫। গঙ্গারাম

৪৬। শিবনারায়ণ

৪৭। কুমুদানন্দ দত্ত

৪৮। মুক্তারাম দাস—১১৮৭ সাল

৪৯। বিদ্যাপতি—১০৯০ মল্লাব্দ

৫০। বল্লভ (শ্রীকবি বল্লভ)—১২২৯, বল্লভ দাস স্বতন্ত্র কবিও হতে পারেন।

৫১। কিঙ্কর,—ভনিতায় শঙ্করও পাওয়া যায়

৫২। ফকির রাম—১২০৫

৫৩। কৃষ্ণবিহারী

৫৪। আরিফ—১২৫৩

৫৫। দ্বিজ গুণনিধি

৫৬। লালমোহন—১২৫৩, চন্দ্রকেতু পালা

৫৭। দয়াল—শঙ্কর গুড়্যা পালা

৫৮। ফৈজুল্লা

৫৯। শঙ্কর আচার্য—১০৬২ মল্লাব্দ। শঙ্কর আচার্যের ভনিতায় এক ছোট পৃথক পাঁচালীও পাওয়া যায়। লিপিকাল—১২৫২

৬০। কৃষ্ণহরি দাস—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ।

খ। আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্তৃক তার পুথি পরিচিতি গ্রন্থে উল্লিখিত—

১। ওয়াজেদ আলি

২। লেংটা ফকির—উনবিংশ-বিংশ শতাব্দী

৩। শেখ তনু—অষ্টাদশ শতাব্দী

৪। সেরবাজ চৌধুরী—অষ্টাদশ শতাব্দী

৫। গরীবুল্লাহ্

গ। পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর পুঁথি পরিচয়ে উল্লেখ করেছেন,—

১। খোকনরাম দাস—১০৮৭

২। অজ্ঞাত—১১০৪

৩। অজ্ঞাত—১১৩১

৪। দ্বিজ রামপ্রসাদ—১১৩৫

৫। অজ্ঞাত—১১৪৩

৬। অজ্ঞাত—১১৪৮

৭। অজ্ঞাত—১১৬২

৮। অজ্ঞাত—১২১২

৯। অজ্ঞাত—১২৮২

১০। অজ্ঞাত—১২৪৮

১১। অজ্ঞাত—১৩০১

১২। হরেকৃষ্ণ দাস চক্রবর্তী—১৩১২

১৩। অজ্ঞাত—১৩১৬

১৪। অজ্ঞাত—১৩৭০

ঘ। আরো যে সমস্ত পাঁচালীর সন্ধান পাওয়া গেছে,—

১। রঘুনাথ সার্বভৌম ৫৩

২। তারিণী শঙ্কর ঘোষ ৫৩

৩। নন্দরাম মিত্র ৫৩

৪। দ্বিজ শুকদেব ৩

৫। বেচারাম ৫৩

৬। কৌতুকরাম চট্টোপাধ্যায় ৫৩

৭। কালাচাঁদ ৫৩

৮। অজ্ঞাত ৫৩

৯। অজ্ঞাত ৫৩

১০। জৈমিনী ৫৩

১১। কালীচরণ ৫৩

১২। মথুরেশ ৫৩

১৩। নায়েক মরাজ গাজী ২১

১৪। রামানন্দ ২১

৬। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থতালিকা অনুযায়ী,—

১। সত্যনারায়ণ ইতিহাস ও জীবনী (রচনা ঘনরাম কবিরত্ন)—
সম্পাদনায় — মহেন্দ্রনাথ ঘোষ

২। সত্যনারায়ণ কথা — মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন

৩। সত্যনারায়ণ পাঁচালী

৪। সত্যনারায়ণ ব্রতকথা — অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ

৫। সত্যনারায়ণ ব্রতকথা — মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য

৬। সত্যনারায়ণ ব্রতকথা — যোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ

৭। সত্যনারায়ণ ব্রতকথা — রাধানাথ মিত্র

৮। সত্যনারায়ণ ব্রতকথা — সরোজাক্ষ চক্রবর্ত্তী

৯। সত্যনারায়ণ ব্রতকথা — সুরনাথ ভট্টাচার্য্য

১০। সত্যনারায়ণ সেবার পাঁচালী — বৃন্দাবনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১১। সত্যনারায়ণ পাঁচালী — প্রঃ গুরুচরণ নাথ

১২। সত্যনারায়ণ পাঁচালী — জগদ্বন্ধু বিদ্যাবিনোদ

১৩। সত্যনারায়ণ পাঁচালী — দুর্গাপ্রসাদ ঘটক

১৪। সত্যনারায়ণ পাঁচালী — সঃ যাদবেশ্বর তর্করত্ন

১৫। সত্যনারায়ণ পাঁচালী — সঃ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১৬। সত্যনারায়ণ পাঁচালী — রমণীমোহন গুপ্ত

১৭। সত্যনারায়ণ পাঁচালী — রাধামণি গঙ্গোপাধ্যায়

১৮। সত্যনারায়ণ পুস্তক — বীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১৯। সত্যনারায়ণ ব্রতকথা — ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

২০। সত্যপথ বা সত্যনারায়ণ ব্রতকথা — হৃষীকেশ দত্ত

২১। সত্যপীর ব্রতকথা — গণপতি চক্রবর্ত্তী

২২। সত্যপীরের কথা সঃ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
২৩। সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ লীলা রাজকৃষ্ণ রায়
২৪। সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পাঁচালী দ্বিজ কৃষ্ণধন।

চ। নিম্নলিখিত দুইখানি পাঁচালীর সন্ধান পাওয়া গেছে ;—

১। সত্যনারায়ণের পাঁচালী সম্পাদনা। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন
২। সত্যনারায়ণ দেবের পাঁচালী সম্পাদনা। কুমুদ বিহারী বসু
১৯৩৪ ইং।

বলাবাহুল্য কত শত কবি কর্তৃক যে প্রায় তিন শত বছর ধরে সত্যপীরের পাঁচালী বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচিত হয়েছিল তার আজো ইয়ত্তা হয় নি। সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রচার এই সব পাঁচালীর মূলগত উদ্দেশ্য হলেও কাহিনীগত ঐক্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না।

সত্যপীর পাঁচালীর শতাধিক রচয়িতার প্রাচীনতম কে তা আজো নির্ণীত হয় নি। কেহ মনে করেন কবি ফয়জুল্লা রচিত সত্যপীরের পাঁচালীই প্রাচীনতম।[৩৫] ডঃ এনামুল হক্ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় (ভাদ্র) লিখেছিলেন,—

এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন
মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন যে 'মুনি রস বেদ শশী' পাঠ নিশ্চয়ই ভ্রান্ত, শুদ্ধ পাঠ 'মুনি বেদ রস শশী' হবে। সত্যপীরের সবচেয়ে পুরানো পাঁচালীগুলি হচ্ছে ভৈরবচন্দ্র ঘটকের, ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর, রামেশ্বর (ভট্টাচার্য্য) চক্রবর্ত্তীর, ফকিরাম দাসের ও বিকল চট্টের। বর্ধমান জেলায় সাহাবাদ পরগণার অন্তর্গত ভারুহা গ্রাম নিবাসী দ্বিজ গিরিধরের নিবন্ধ ১০৭০ সালে লেখা হয়েছিল, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর মতে। ১০৭০ মল্লাব্দ না হলে এইটিই প্রাচীনতম পাঁচালী। তবে এই তারিখের যথার্থতার প্রমাণ নেই।[৪১]

সত্যপীরের নামে বহু পাঁচলী কাব্য রচিত হয়েছে শুধু তাই নয়,—অনেক লোককথাও প্রচারিত আছে। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার অধীন কালসরা গ্রামে সত্যপীরের যে স্থায়ী থান বা দরগাহ আছে সেখানকার একটি লোককথা এখানে প্রদত্ত হল,—

সত্যপীর ছদ্মবেশী এক ভ্রাম্যমান ফকির। কৃষ্ণনগরের রাজার তরফ থেকে নাকি ফকিরকে আদেশ দেওয়া হয়:—কালসরা অঞ্চলের প্রজাগণের বকেয়া খাজনার হিসাব সংগ্রহ করে অবিলম্বে রাজদরবারে পাঠাও। সংসার-বিরাগী ফকির এতে বিক্ষুব্ধ হলেন। তিনি রাজ-আদেশ মানলেন না। অনেক দিন পরে রাজ-প্রতিনিধি রাজস্ব আদায়ের জন্য নিজে এলেন কালসরা গ্রামে। এসেই তিনি খোঁজ করলেন সেই ফকিরকে।

ফকিরকে ডাকতে গেল লোকে। ইতিমধ্যে অনেক লোক জমে গেছে সেখানে। রাজ-প্রতিনিধিরও পেয়েছে পিপাসা। তিনি ডাব খেতে চাইলেন। কাছেই ছিল ডাব-গাছ। গাছটি এত উঁচু যে কেউ তাতে উঠতে রাজী হল না। ভীড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন এক ফকির। তিনি বললেন,—আমি আপনার পিপাসা নিবারনের জন্য ডাবের ব্যবস্থা করতে পারি।

রাজার প্রতিনিধি পিপাসায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন,—তাই করো।

ফকির ডাব-গাছকে অবনত হতে বললেন। আশ্চর্য্য! তখনই ডাব-গাছ অবনত হল। রাজ-প্রতিনিধি বিস্মিত হলেন।

গাছ থেকে ডাব পাড়া হল। রাজ-প্রতিনিধি তার স্নিগ্ধ জল পান করে তৃপ্ত হলেন। ফকিরকে তিনি অন্য কথা বললেন না; শুধু অনুরোধ করলেন,—আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক একদিন রাজ-দরবারে আসুন,—আমরা খুবই খুশী হব।

কিছুদিন পরে ফকির রাজ-দরবারে গিয়েছিলেন। তিনি নাকি দেওয়ালের উপর সওয়ার হয়ে যাওয়ায় তাঁর সেই অলৌকিক শক্তি দেখে সকলে আরো বিস্মিত হন।

————

পরিশিষ্ট

বাংলা পীর-সাহিত্যের গ্রন্থতালিকা

[ক] পীর-কাব্য

১। আদমখোর আকানন্দ-বাকানন্দের পুথি : আবদুল লতিফ
২। কালু-গাজি-চম্পাবতী : মহম্মদ মুনশী সাহেব
৩। কালু-গাজি-হামিদিয়া : অজ্ঞাত
৪। কালু-গাজি-চম্পাবতী : আবদুল গফ্ফর
৫। গোরাচাঁদ পাঁচালী : শেখ লাল ও শেখ জয়নদ্দি
৬। রওশন বিবির পুথি : অজ্ঞাত
৭। গাজী-কালু-চম্পাবতী কন্যার পুথি : আবদুর রহিম
৮। গাজী সাহেবের গান : কলেমদ্দী গায়েন (নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত)
৯। গাজী-কালু-চম্পাবতী : গোলাম খয়বর ও আবদুর রহিম
১০। তরিকায়ে কাদেরিয়া ও পীর গোরাচাঁদের পুথি
: মহম্মদ ওমর আলি ওরফে রামলোচন ঘোষ
১১। তিতুমীরের গান : সাজন গাজী
১২। পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী : মহম্মদ এবাদোল্লা
১৩। পীর একদিল শাহ্ পাঁচালী : আশক মহম্মদ
১৪। ফাতেমার সুরতনামা : শেখ তনু
১৫। ফাতেমার সুরতনামা : শেখ সেরবাজ চৌধুরী
১৬। ফাতেমার জহুরানামা : আজমতুল্লাহ্ খোন্দকার
১৭। ফাতেমার সুরতনামা : কাজী বদিউদ্দীন
১৮। বাদশাহ্ আলাউদ্দীন ও পেয়ারশাহের পুথি
: মোহম্মদ আবদুল বারি
১৯। বিবি ফাতেমার বিবাহ : অজ্ঞাত
২০। বোনবিবির জহুরানামা : মোহম্মদ মুনশী
২১। বোনবিবি জহুরানামা : মুনশী মোহম্মদ খাতের

২২। বনবিবি জহুরানামা : বয়নউদ্দীন
২৩। বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি : কৃষ্ণহরি দাস
২৪। বড়খাঁ গাজী : সৈয়দ হালুমিয়া
২৫। মুনশী পীর গোরাচাঁদ : খোদা নেওয়াজ
২৬। মহন্দলীর গীত : জয়নুদ্দীন
২৭। মানিক পীরের কেচ্ছা : মুনশী মহম্মদ পিজির উদ্দীন
২৮। মানিক পীরের গীত : ফকির মহম্মদ
২৯। মানিক পীরের গান : নসর শহীদ
৩০। মানিক পীরের জহুরানামা : জয়রদ্দীন
৩১। মানিক পীরের গান : বয়নদ্দীন
৩২। মানিক পীরের গান : খোদা নেওয়াজ
৩৩। মা বরকতের মেজমানি : মুহম্মদ আলিমুদ্দীন
৩৪। মোবারক গাজীর কেচ্ছা : ফকির মুহম্মদ
৩৫। রায়মঙ্গল : কৃষ্ণরাম দাস
৩৬। লালমোনের কেচ্ছা : আরিফ
৩৭। শশি সেনা (সখি সোনা) : ফকিররাম কবিভূষণ
৩৮। শহিদ হজরত আব্বাস আলির পুথি : মুনশী আহম্মদ শাহজী
৩৯। শহীদ হজরত গোরাচাঁদের পুঁথি : মুনশী নেয়ামতুল্লাহ্
৪০। শাহ ঠাকুরবর : নছিমদ্দীন
৪১ শাহ্ সুফী সুলতান বা পাঁড়ুয়ার কেচ্ছা : মহীউদ্দীন ওস্তাগর
৪২। শাহ মাদার : ছায়াদ আলি খোন্দকার
৪৩। সেক শুভোদয়া (সংস্কৃত) : হলায়ুধ মিশ্র
৪৪। সত্যপারের প্যাথ : ফয়জুল্লা
৪৫। সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী : ওয়াজেদ আলি
৪৬। ,, ,, ভৈরবচন্দ্র ঘটক
৪৭। ,, ,, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী
৪৮। ,, ,, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য (চক্রবর্ত্তী)
৪৯। ,, ,, ফকিররাম দাস

৫০। ,, ,, বিকল চট্ট

৫১। ,, ,, দ্বিজ গিরিধর

৫২। ,, ,, মৌজিরাম ঘোষাল

৫৩। ,, ,, কৃষ্ণকান্ত

৫৪। ,, ,, শিবচরণ

৫৫। ,, ,, রামশঙ্কর সেন

৫৬। ,, ,, দ্বিজ কৃপারাম

৫৭। ,, ,, কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম

৫৮। ,, ,, দ্বিজ রামধন

৫৯। ,, ,, দ্বিজ নন্দরাম

৬০। ,, ,, অযোধ্যারাম রায় কবিচন্দ্র

৬১। ,, ,, দ্বিজ বিশ্বেশ্বর

৬২। ,, ,, ভারতচন্দ্র রায়

৬৩। ,, ,, দ্বিজ জনার্দ্দন

৬৪। ,, ,, দ্বিজ অমর সিংহ

৬৫। ,, ,, দ্বিজ রামচন্দ্র

৬৬। সত্যদেব সংহিতা কাব্য : দ্বিজ রামধন

৬৭। সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী : দুর্গাপ্রসাদ ঘটক

৬৮। ,, ,, ঈশান গোস্বামী

৬৯। ,, ,, নরহরি

৭০। ,, ,, মধুসূদন

৭১। ,, ,, দ্বিজ কালিদাস

৭২। ,, ,, দ্বিজ বিশ্বনাথ

৭৩। ,, ,, গোবিন্দ ভাগবত

৭৪। ,, ,, শিবচন্দ্র সেন

৭৫। ,, ,, দ্বিজ রামকিশোর

৭৬। ,, ,, লালা জয়নারায়ণ সেন

৭৭। ,, ,, দ্বিজ রামানন্দ

৭৮। ,, ,, দ্বিজ রঘুনাথ

৭৯।	,,	,,	দ্বিজ রামকৃষ্ণ
৮০।	,,	,,	ফকিরচাঁদ
৮১।	,,	,,	দ্বিজ দীনরাম
৮২।	,,	,,	নয়নানন্দ
৮৩।	,,	,,	রঘুরাম
৮৪।	,,	,,	দ্বিজ হরিদাস
৮৫।	,,	,,	বিজয় ঠাকুর
৮৬।	,,	,,	শিবরাম রাজা
৮৭।	,,	,,	দেবকীনন্দন
৮৮।	,,	,,	গঙ্গারাম
৮৯।	,,	,,	শিবনারায়ণ
৯০।	,,	,,	কুমুদানন্দ দত্ত
৯১।	,,	,,	মুক্তারাম দাস
৯২।	,,	,,	বিদ্যাপতি
৯৩।	,,	,,	বল্লভ (শ্রীকবিবল্লভ)
৯৪।	,,	,,	কিঙ্কর (ভণিতা শঙ্কর)
৯৫।	,,	,,	ফকিররাম
৯৬।	,,	,,	কৃষ্ণবিহারী
৯৭।	,,	,,	দ্বিজ গুণনিধি
৯৮।	,,	,,	লালমোহন
৯৯।	,,	,,	দয়াল
১০০।	,,	,,	ওয়াজেদ আলি
১০১।	,,	,,	শঙ্কর আচার্য্য
১০২।	সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী :		লেংটা ফকির
১০৩।	,,	,,	শেখ তনু
১০৪।	,,	,,	সেরবাজ চৌধুরী
১০৫।	,,	,,	গরীবুল্লাহ
১০৬।	,,	,,	খোকনরাম দাস
১০৭।	,,	,,	অজ্ঞাত
১০৮।	,,	,,	অজ্ঞাত
১০৯।	,,	,,	অজ্ঞাত
১১০।	,,	,,	অজ্ঞাত

১১১ । ,, ,, অজ্ঞাত
১১২ । ,, ,, অজ্ঞাত
১১৩ । ,, ,, দ্বিজ রামপ্রসাদ
১১৪ । ,, ,, অজ্ঞাত
১১৫ । ,, ,, অজ্ঞাত
১১৬ । ,, ,, অজ্ঞাত
১১৭ । ,, ,, হরেকৃষ্ণ দাস চক্রবর্তী
১১৮ । ,, ,, অজ্ঞাত
১১৯ । ,, ,, অজ্ঞাত
১২০ । ,, ,, রঘুনাথ সার্ব্বভৌম
১২১ । ,, ,, তারিণীশঙ্কর ঘোষ
১২২ । ,, ,, নন্দরাম মিত্র
১২৩ । ,, ,, দ্বিজ শুকদেব
১২৪ । হজরত শাহ সোন্দলের পুথি : মুনশী কাসিম উদ্দীন
১২৫ । হজরত সৈয়দ শাহা মোবারক গাজী সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী : নুর মহম্মদ দেওয়ান ।
১২৬ । শূন্যপুরাণ (নিরঞ্জনের রুস্মা) : রামাই পণ্ডিত
১২৭ । দম মাদার : আলী খোন্দকার

[খ] পীর গদ্য-রচনা

১ । খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তী : মৌলভী আজহার আলী
২ । খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তী : আবদুল ওয়াহীদ কাসেমী
৩ । তিতুমীর ও নারিকেলবেড়িয়ার লড়াই : বিহারীলাল সরকার
৪ । ধন্য জীবনের পূণ্য কাহিনী : আবদুল আজিজ আল আমীন
৫ । ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী : গোলাম মহম্মদ ইয়াছিন
৬ । বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী : আবদুল গফুর সিদ্দিকী
৭ । বাইশ আউলিয়ার পুথি : বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ওরফে শামসুল হক্
৮ । বাউল রাজার প্রেম : পরেশ ভট্টাচার্য
৯ । মেয়েদের ব্রতকথা : পণ্ডিত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
১০ । শহীদ তিতুমীর : আবদুল গফুর সিদ্দিকী
১১ । সাঁই সিরাজ বা লালন ফকির : শ্রীদেবেন নাথ

১২। হজরত বড়পীরের জীবনী : মৌলভী আবদুল মজিদ

১৩। হজরত বড়পীরের জীবনী ও আশ্চর্য কেরামত :
মৌলভী আজহার আলি

১৪। হজরত বড়পীরের জীবনী : কাজী আশরাফ আলি

১৫। হজরত ফাতেমা : মনির-উদ্দীন ইউসুফ

১৬। হজরত ফাতেমা : মনির-উদ্দীন ইউসুফ

১৭। হজরত সৈয়দ মোবারক শাহ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান
: গৌরমোহন সেন

১৮। ফুরফুরার হজরত দাদাপীর ছাহেবের বিস্তৃত জীবনী
: মৌলানা রুহুল আমীন

১৯। বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী (প্রথম সংস্করণ ১৩৪২ বাং)
: মৌলানা রুহুল আমিন

২০। তাপস সন্ধানে—হজরত শাহ্ ছকু দেওয়ান : মহম্মদ আয়ুব হোসেন

[গ] পীর নাটক

১। কালু-গাজী-চম্পাবতী : সতীশচন্দ্র চৌধুরী

২। কালু-গাজী : হাছাম উদ্দীন

৩। গোরাচাঁদ ও চন্দ্রকেতু : হরমুজ আলী

৪। তিতুমীর : শ্যামাকান্ত দাস

৫। বাঁশের কেল্লা : প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

৬। বনবিবি : সতীশচন্দ্র চৌধুরী

৭। সাঁই সিরাজ বা লালন ফকির : শ্রীদেবেন নাথ

৮। শহীদ তিতুমীর : বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত নাটক

গ্রন্থ নির্ঘণ্ট

গ্রন্থ নির্ঘণ্ট (ইংরাজী)

গ্রন্থকারসহ অন্যান্য ব্যক্তি-নির্ঘণ্ট

(১)

অতিরিক্ত নাম-নির্ঘণ্ট

(২)

শব্দার্থ

শব্দার্থ তালিকার অধিকাংশ শব্দ আরবী ও ফারসী। ধর্মীয় আদর্শ ও লৌকিক বিশ্বাসে কোন কোন শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থও থাকতে পারে।

অগণিতে — আগুনে

অলি/ওলি — অভিভাবক, রক্ষক

অর্ঘ — পূজার উপকরণ

অজু/ওজু — নামাজ পড়বার আগে হাত-মুখ ধোয়া

আরজ — আর্জি বা প্রার্থনা

আরশ — আল্লার আসন

আলিম/আলেম — বিদ্বান

আরের — অন্য সকলের

আদম — ইসলামী, খ্রীষ্টীয় ও ইহুদী পুরাণোক্ত প্রথম সৃষ্ট মানুষের নাম

আলেক — ভালবাসা

আড় — আড়াল

আছমান — আকাশ

আছিজেলগপফুল — পুথির দুর্বোধ্য শব্দ

আমিন — তাই হোক্

আউলিয়া — আউল সম্প্রদায়ের লোক

অওরত — রমণী, পত্নী

আখের — পরিণাম

আওয়াল — আউলিয়া শব্দের অপভ্রংশ

আজমায়েস — যুক্তি-পরামর্শ (স্থানীয় শব্দ)

আজর — রোগ, পীড়া

আশা/আসা — পীর বা ফকিরের হাতের দণ্ড (লাঠি)

আজান — নামাজ পড়িতে সাধারণকে আহ্বান

আজব — অদ্ভুত

আঁইট — ক্ষেতের আইলের পাশে বা গায়ে ছোট ছোট মাটির ঢিবি। 'আইল' শব্দের অপভ্রংশ হতে পারে। (আঞ্চলিক শব্দ)

ইমান — পরিপূর্ণ বিশ্বাস

ইমাম/এমাম — মুসলিমদের প্রধান ধর্ম-নেতা

ইয়ার — বন্ধু, ফাজিল ব্যক্তি

ইয়াদ — স্মরণ, খেয়াল

ইনসাল্লা — প্রকৃতিক নিয়মানুসারে আল্লার ইচ্ছার বিকাশের ধারায়।
·উজালা — উজ্জল
·উরস — পীরের জন্ম/মৃত্যু স্মরণে বিশেষ জিয়ারৎ অনুষ্ঠান
·উতারে — নামিয়ে দেয়
·এলাহি/এলাহী/ইলাহী — আল্লাহ তালা
·একিন — নিশ্চয়, দৃঢ় বিশ্বাস
এথা — এখানে, অত্র
·এছা — এমন
·এ্যানাগুলি — (৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
এনসাল্লা — (ইনসাল্লা দ্রষ্টব্য)
·এয়ছায় — এমন
·এয়ছা/এইসা — এমন
·এক্তিয়ার/এখতিয়ার — ক্ষমতা
একিদা — ধর্মে বিশ্বাস
·এঁশে — গরুর পায়ের ক্ষুর-সংলগ্ন একরকম ঘা (আঞ্চলিক শব্দ)
·এসাভি — এই রকম
·এসমাল/এজমালি — যৌথ
·এন্তেকাল/ইন্তিকাল — মৃত্যু
·এমাম — (ইমাম দ্রষ্টব্য)
এ্যমন — আরবের একটি স্থানের নাম
·ওড়ন — স্ত্রীলোকের পাতলা চাদর
ওলি — (অলি দ্রষ্টব্য)
·ওক্ত/ওয়াক্ত/অক্ত — বার, সময়
ওয়ালেদ — বংশধর
·ওর্ফে/ওরফে — ডাক নাম, বেনাম
·ওলা — নামা, দাস্ত হওয়া
·ওয়াজিব — অবশ্য করণীয়
ওয়ারা — অপ্রয়োজনীয় কাজ
ওয়াজ — বক্তৃতা
কাফের/কাফির — ইসলামে অবিশ্বাসী লোক
কবুল — স্বীকার
কেনে — (কেন শব্দের অপভ্রংশ)
কল্লে — করিলে
কেচ্ছা — কাহিনী
কাওয়াল — যে দরবেশী সুরে গান করে
কালাম — জ্ঞানের বাণী
কৌস্তভ/কৌস্তুভ — পুরাণে কথিত মণি বিশেষ
কৈনু — কহিলাম (পদ্যে)
কোলা — মোটা, গরুর গলার কোলা রোগ বিশেষ
কুমে — কমিয়া
কাঁড়/কাঁড়ি — স্তূপ, গরুর কাঁধের ঘা বিশেষ
কাঁকালি/কাঁকল — কোমর
কুঙার — কুমার
কনি — কণা, আত্মতৃপ্তি
কিন্নর — দেবলোকের গায়ক
কাওয়ালি/কাওয়ালী — দরবেশী সুর
কল্মা — ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র
কাফেলা — তীর্থ যাত্রীর দল, ধর্ম-প্রচারকের দল
কুতব — সাধক শ্রেণীর এক পর্য্যায়
কেরামত — শক্তি, বাহাদুরি
কুদরত — রহস্য
কোরবান — মুসলিম শাস্ত্রানুযায়ী বলি (পশু)

কামেল — পরিপূর্ণ
খালে — খাইল
খিদা — ক্ষুধা
খোওাজ/খোওয়াজ — আল্লাহের দূত বিশেষ
খেতি — ক্ষতি
খাপা — ক্ষিপ্ত
খোশাল — খুশি
খচম/খসম — স্বামী, পতি
খুব-ছুরত/খুব-সুরৎ/খুবসুরত — খুব সুন্দর বা সুন্দরী
খালাছ/খালাস — মুক্তি
খামস — সংযত হওয়া
খেলাফত — খলিফা সংক্রান্ত [খলিফা দ্রষ্টব্য]
খয়রাত/খয়রাৎ — বিতরণ, দান
খোর — গরুর একপ্রকার রোগ
খোয়াব — স্বপ্ন
খলিফা/খলীফা — মুসলিম জগতে শ্রেষ্ঠ নৃপতি ও ধর্মনেতার উপাধি
গায়েব — অদৃশ্য
গেহে — গৃহে
গাতি অন্ন — জোত-জমা
গোনাগার — অপরাধের শাস্তি
গোণা — অপরাধ
গুণের চট — শনের সুতোয় তৈরী চট
গোস্বা/গোস্বা — রাগান্বিত
গোর — কবর, সমাধি
গোসাঁই/গোসাঞি — গুরু, গোস্বামী
গোজারিল — অতিবাহিত করিল
গাঁরিদা — ডাকিয়া
চুলা — উনান
চিত — চিত্ত
চাহ — ইচ্ছা
চুলি — চুল
ছালাম/সালাম/সেলাম — মুসলিম প্রথায় অভিবাদন
শহীদ/শহিদ — ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি
ছোন্দল/সোন্দল — শোভাযাত্রা (আঞ্চলিক ভাবে ব্যবহৃত)
ছেদেক — শুদ্ধ, পবিত্র
ছেরে — শিরে
ছিলিমিলি — ঝিলিমিলি
ছেপাই/সিপাই — সিপাহী, প্রহরী
ছোবহান — পবিত্র
ছামনেতে — সম্মুখে
ছুরত/সুরৎ — আকৃতি, চেহারা
ছ্যাড়ায় — পাতলা পায়খানা করে
ছেপায় — লুকায়
ছবক — শিক্ষা
জীবরিল — বাহক ফেরেস্তা
জিনে — জয় করে
জমিন — জমি
জোনাব/জনাব — মহাশয় (মুশলিম আদর্শে ব্যবহৃত)
জেকের/জিগীর/জিগির — উচ্চ-ধ্বনি
জাহের/জাহির — প্রচারিত
জরিপানা — জরিমানা
জোনাজাত — প্রতিজন
জুদা — তফাৎ
জরু/জোরু — স্ত্রী
জিঞ্জির — শিকল

শব্দ	অর্থ
জায়গীর/জায়গির	পুরস্কার প্রাপ্ত নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি
জায়	তালিকা, বিস্তৃত হিসাব
জেন্দা/জিন্দা	জীবিত
জাহান	জগৎ
জায়নামাজ	নামাজ পড়বার জন্য ব্যবহৃত বিছানা
জিয়ারৎ	পীরের বা তৎস্থানীয় ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করা
জেহাদ	অন্তর এবং বাহিরের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা
জঙ্গ	যুদ্ধ
জান্নাতুল	বেহেস্ত বা স্বর্গ সংক্রান্ত
ডগ	শীর্ষদেশ
ঢুঁড়ে	খোঁজ করে
তুড়িয়া	ভাঙ্গা
তেরা	তোদের
তৌহিদ	সাম্য, শান্তি ও স্বাধীনতা, আল্লার একত্বে বিশ্বাস
তাজ্জব	অদ্ভুত
তেরিজ	পাশ কাটিয়ে যাওয়া
তরিখ/তরীকা	ধারা
তামাম	সমগ্র
তরস্থ/তরস্ত	ব্যস্ত
তওবা	পীর কর্তৃক সংসারত্যাগ ও আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকা
তছবি/তসবি/তসবী	মুসলিমের জপমালা
তসাউওফ	পবিত্রতা
দরগা/দরগাহ	সমাধি, কবর
দোয়া	আশীর্বাদ
দোজখ	নরক
দিশা	সন্ধান
দস্তগীর	যিনি হাত ধরে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন
দুয়া	ধিক্কার
ধিয়ান	ধ্যান
ধড়	ছিন্ন মস্তক দেহ
নবি/নবী	পয়গম্বর
নজরগাহ	নজর দেওয়া বা অল্পক্ষণ অবস্থান করার স্মৃতি-পূর্ণ জায়গা।
নাও	নৌকা
নসিব/নছিব	ভাগ্য
নিখাবান/নিগাবান	পাহারাদার
নেসানি	নিশানা
নাস্তি	নাহি
নর্জুম	গণৎকার
নুর	আলো
নাস্তা	খাবার
নাচার	নিরুপায়
পুছিলেম	জিজ্ঞাসা করলাম
পেয়ার/পিয়ার	আদর
পিছন্দে	পিছন দিক থেকে (আঞ্চলিক শব্দ)
পোলাপান	ছেলেপুলে
পামর	পাপিষ্ঠ, নরাধম
পয়দা	
পরওয়ার	শক্তিমান
পেরেশান	পরিশ্রান্ত
পেস্টাই	পিষ্ট করা জিনিস

পরমাই	পরমায়ু
পিঞ্জিরা	খাঁচা
পয়জার	চটীজুতা
ফরজন্দ	সন্তান
ফিকে	ছুঁড়ে
ফতে	জয়, সিদ্ধি
ফেরেস্তা	আল্লাহের দূত
ফরমাইস/ফরমাস	আদেশ
ফওত	সর্বস্বান্ত, শেষ
ফতোয়া	নিজ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও পরের উপকার করা
বগ	বক
বিচে	মধ্যে
বেগর	ব্যতীত
বোরে	বোরো ধান বিশেষ
বাও	বাতাস
ব্যানা	তৃণ বিশেষ
বেহেস্ত	স্বর্গ
বাত	কথা
বন্দেগী	সেলাম
বদকাম	খারাপ কাজ
বাহানা	বায়না
বিধু	চন্দ্র
বেভার	ব্যবহার
বাহাল	নিয়োগ
বকরি	ছাগী
বেপির	যিনি পীর নন
বাথান	গোশালা, পশুপালন
বেশোমার/বেশুমার	অসংখ্য
বাতুন	বাড়ী
বেউর/বেউড় বাঁশ	কাঁটাযুক্ত বাঁশ বিশেষ
বীরবৌলি	পুরুষের কুণ্ডল বা কর্ণাভরণ
বএ	বহন করে
বিজএ	বিজয়ে
ভাতার	স্বামী
ভেজিবে	পাঠাইবে
ভেড়ে	স্ত্রৈণ, ভেড়ুয়া
মাজা	কোমর
মানষির	মানুষের
মোনাজাত	প্রার্থনা
মামদোবাজি/মামদো	মুসলমান ভূত
মস্করীকরণ	তামাসা করা
মুকি	মুখে
মুই	আমার
মোমিন	ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান
মর্জি	খুশি
মাজার	কবর
মকবুল	প্রিয়
মোরসেদ/মুরশিদ	গুরু
মাগ	স্ত্রী
মুছিবত	বিপদ
মুতে	প্রস্রাব করে (আঞ্চলিক শব্দ)
মুরিদ	শিষ্য
মরদ	বীর পুরুষ
মগরব	পশ্চিম
মড়ঘা	মড়ার মতন

মুছল্লি যাঁরা মসজিদে নামাজ সমাধা করেন।

মেকাইল আল্লাহের দূত

মুড়ে ভাঁজ করে

মুনশী কেরাণী, শিক্ষক, বিদ্বান

মকছেদ মনোবাসনা, সংকল্প

মোতাবেক অনুযায়ী

মাঙ্গাইয়া চাহিয়া

মজলিস সভা

মোকাম বাসস্থান

মকুব রেহাই

মরিফত প্রকৃত জ্ঞান

মৌলে মধুসংগ্রহকারী

রওজা সমাধি-স্থান

রব্বানা আল্লাহ্

লায়-লাহা 'There is no God. সেই জন্য ইহা নফি বা Negation ইল্লাহা। But there is God. দ্রঃ মতিলাল দাশ ও পীযূষ কান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত লালন গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬।

শুধা শোধ করা

শরীফ/শরিফ মহানুভব

শিরনী/শীরন পীরের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত মিষ্ট দ্রব্যাদি

শোকরানা/শোকর কৃতজ্ঞতা

শোরশার মেরামত

শহীদ ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি

সিরনী শিরনী দ্রষ্টব্য

সোতার স্রোত

সেবাইত/সেবায়ত জিম্মাদার

সরাঅওলা নিষ্ঠাবান

সরা/শরিয়ত ইসলাম ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক

সাঃ সাল্লাল্লাহ আলায় সালাম (মুসলিমগণের দ্বারা পয়গম্বরের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য ব্যবহৃত শব্দ)

সজুদ বদান্যতার সহিত বা সখার সহিত

স্থাণু মহাদেব

সাতে সাথে

সুপিয়া সমর্পণ করে

সাদী বিবাহ

সরমেন্দা লজ্জিত

সোবহান (ছোবান শব্দ দেখুন)

সাজাল গোয়ালের মধ্যে মশা তাড়ানোর জন্য ধোঁয়া দেওয়া

সাই/সাঁই ধর্ম গুরু

হুর অপ্সরী

হাসেল/হাসিল সমাপ্ত করা, আদায় করা

হামেশা প্রায়ই

হজ মক্কার তীর্থ দর্শন ও অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠান করা

হএ হয়ে

হটে হটকারিতার

হাসারত ইচ্ছা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	পঠিতব্য
৩০	৫	তিতুমীরের
৪২	১	স্বার্থান্বেষী
৪৫	২১	যান
৭৪	৮	৩২
১০৭	২২	৬১
১০৭	২৪	১৪
১২৯	২	বালাণ্ডার
৪৫৭	২৪	সান্ত্বনা

তথ্যপঞ্জী

১। আকবরনামা ঃ আবুল ফজল।
(ভলুঃ ১ পৃষ্ঠা ১৮)

২। ইসলামি বাংলা সাহিত্য ঃ ডঃ সুকুমার সেন।

৩। ইসলামি বাংলা সাহিত্য ঃ (থিসিস) ডঃ ওসমান গণি।

৪। এক্ষণ (ষষ্ঠ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ১৩৭৫) ঃ বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম শিল্পরীতির ধারাবাহিকতা ঃ ডেভিড ম্যাককাচিয়ন।

৫। কুশদহ পত্রিকা (১৩১৮ বাং আশ্বিন)।

৬। কুশদহ পত্রিকা (১৩১৮ বাং কার্ত্তিক)।

৭। কুশদহ পত্রিকা (১৩১৮ বাং পৌষ)।

৮। কুশদহ পত্রিকা (১৩২২ বাং ভাদ্র)।

৯। কুশদহের ইতিহাস ঃ হাসিরাশি দেবী।

১০। কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী (আলোচনা) ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

১১। খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী ঃ মৌলভী আজহার আলী।

১২। খুলনা গেজেটিয়ার ঃ পৃষ্ঠা ১৮২

১৩। গাজী-কালু-চম্পাবতী ঃ আবদুর রহিম সাহেব।

১৪। গৌড় কাহিনী ঃ শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ।

১৫। গাজী সাহেবের গান ঃ কলেমদ্দী গায়েন (সংকলন ঃ নগেন্দ্রনাথ বসু)

১৬। Journal of Royal Asiatic society of Bengal 1818.

১৭। ঢাকার ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ যতীন্দ্রমোহন রায়।

১৮। ঢাকা রিভিউ ঃ Voll. VIII

*১৯। ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী ঃ আবদুল আজীজ আল আমীন।

*২০। নেদায়ে ইসলাম ঃ (১৩৬৫ বাং ১ম সংখ্যা)

*২১। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্ব্বণ ও মেলা ঃ (৩য় খণ্ড) ১৯৬১ সরকারী গেজেট।

২২। পীর গোরাচাঁদ (পাঁচালী) : মহম্মদ এবাদোল্লা।
২৩। পুঁথি পরিচিতি : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ।
২৪। পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামের আলো : শামসুর রহমান চৌধুরী।
২৫। পূর্ব-পাকিস্তানে সুফী সাধক : গোলাম সাকলায়েন।
২৬। পুঁথির ফসল : আহমদ শরীফ।
২৭। ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী : গোলাম মহম্মদ ইয়াছিন।
২৮। ফুরফুরার হজরত দাদাপীর সাহেব
কেবলার বিস্তারিত জীবন : মাওলানা রুহুল আমীন।
২৯। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : ডঃ দীনেশ সেন।
৩০। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা : ১৩২৫ বাং ৪র্থ সংখ্যা
৩১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা : ১৩২০ বাং
৩২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা : ১৩২৩ বাং
৩৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা : ১৩২৫ বাং
৩৪। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা : ১৩৩৫ বাং
৩৫। বঙ্গে সুফী প্রভাব : ডঃ এমামুল হক
*৩৬। বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পত্রিকার প্রবন্ধ (১৯৩৬) :
শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৭। India Through the Ages : Sir J. N. Sarkar.
২৮। বাংলার লৌকিক দেবতা : শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।
৩৯। History of Beagal (Vol-II)—Sir Jadu Nath Sarkar
৪০। বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী : আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
৪১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : (প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ) :
ডঃ সুকুমার সেন।
৪২। বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপ : গোপাল হালদার।
৪৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের রূপরেখা : গোপাল হালদার।
৪৪। Bengal Settlement Record—1928-31.
৪৫। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সত্যপীরের কথা।
৪৬। Bengal Gazette—1928, 1953.
৪৭। Bengal District Gezetteer
৪৮। বাংলাদেশের ইতিহাস : ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।
৪৯। History of India : Dr. R. C. Majumdar.
৫০। ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা : ক্ষিতিমোহন সেন।

৫১। মিহির পত্রিকা ঃ (মার্চ্চ ১৮৯২)

৫২। মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ ঃ ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার।

৫৩। যশোহর খুলনার ইতিহাস ঃ সতীশচন্দ্র মিত্র।

৫৪। রায়মঙ্গল কাব্য ঃ কৃষ্ণরাম দাস।

৫৫। শতরূপা—(৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩৫৯ বাং)
(রচনা ঃ শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়)।

৫৬। শহীদ তিতুমীর ঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

৫৭। শ্রীঅমিয় নিমাই রচিত (৫ম সংস্করণ, ৩য় খণ্ড) ঃ শিশিরকুমার ঘোষ।

৫৮। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ঃ (২য় খণ্ড, ২য় ভাগ)

৫৯। সাংস্কৃতিকী (১ম খণ্ড) অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৬০। সুন্দরবনের ইতিহাস ঃ আবুল ফজল মহম্মদ আবদুল।

৬১। সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ ঃ ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ,
ডঃ আবদুল করিম, মনির-উদ্দীন ইউসুফ প্রমুখ।

৬২। Sufism and Its Saints and Shrines : John A. Subtan.

৬৩। সাধক দারা শিকোহ ঃ রেজাউল করিম।

৬৪। হজরত বড় পীরের জীবনী ঃ মৌলভী আবদুল মজিদ।

৬৫। হজরত বড় পীরের জীবনী ঃ মৌলভী আজহার আলী।

৬৬। হজরত ফাতেমা ঃ মনির-উদ্দীন ইউসুফ।

৬৭। হজরত ফাতেমার জীবন চরিত ঃ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ।

৬৮। হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলী শাহ সাহেবের জীবনচরিতাখ্যান ঃ
—গৌরমোহন সেন।

৬৯। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ঃ বিনয় ঘোষ।

৭০। হিজলীর মসনদ-ই আলা ঃ মহেন্দ্রনাথ করণ।

৭১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ঃ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

৭২। মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম ঃ
শ্রীসুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭৩। লালন-শাহ ও লালন গীতিকা ঃ মোহাম্মদ আবু তালিব।

৭৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (১৯৫১)
রচনা ঃ জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী.

৭৫। Islam in India and Pakistan : M. T. Titus.

৭৬। বাংলার-বাউল ও বাউল গান ঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

৭৭। বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর : শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়।
*৭৮। বিশ্বকোষ : নগেন্দ্রনাথ বসু।
৭৯। তাজকিরা আউলিয়ায়ে বাঙ্গালা : মৌলানা মোহম্মদ আবিদুল হক।
*৮০। বাঙ্গলার ইতিহাস : ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
*৮২। মিজান (পত্রিকা)
*৮৩। কোরাণ প্রচার
*৮৪। হুতোম পেঁচার নক্সা : কালীপ্রসন্ন সিংহ
*৮৫। সেকশুভোদয়া : (সংস্কৃত) হলায়ুধ।
*৮৬। বাংলা সরকারের গেজেট (এল. এস. এস. ওমালী)
*৮৭। বেতার জগৎ (১৯৫০)
*৮৮। আজাদ (পত্রিকা)
*৮৯। জঙ্গম (পত্রিকা) ১৩৫৯
*৯০। ভারতের মুসলমান (ডবল্যু ডবল্যু হাণ্টার)
*৯১। তিতুমীর : শান্তিময় রায়।
*৯২। তিতুমীর ও নারিকেল বেড়িয়ার লড়াই : বিহারীলাল সরকার।
*৯৩। ভারতে আধুনিক ইসলাম : ক্যান্টোয়েল স্মিথ।
*৯৪। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম : সুপ্রকাশ রায়।
*৯৫। খাঁটুয়ার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী : বিহারীলাল চক্রবর্তী
*৯৬। ভারতের ইতিহাস : এলফিন।
*৯৭। মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল।
*৯৮। Note on Arabic and Persian Inscriptions in the Hooghly District : J. A, S. XII
৯৯। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : শ্রীম
১০০। বঙ্গ ভূমিকা : ডঃ সুকুমার সেন।
১০১। সত্যপ্রকাশ পত্রিকা।